গবেষণার শিরোনাম

মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসালামী সংস্কৃতির ভূমিকা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

[The Role of Islamic Culture in the Enriching Human Life: Bangladesh Perspective]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক
কাজী ফারজানা আফরীন
পিএইচ.ডি. গবেষক
ও
সহকারী অধ্যাপক
রেজিস্ট্রেশন নং- ৫৩/২০১৯-২০
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

নভেম্বর, ২০২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক কাজী ফারজানা আফরীন কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য সংশোধিত **'মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট'** (The Role of Islamic Culture in the Enriching Human Life: Bangladesh Perspective) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। আমি এর পাণ্ডলিপি সমূহ মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছি। আমার জানামতে, সংশোধিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা লাভের উদ্দেশ্যে বা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং এই গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি কাজী ফারজানা আফরীন এই মর্মে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি যে, **'মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট'** (The Role of Islamic Culture in the Enriching Human Life: Bangladesh Perspective) শীর্ষক সংশোধিত অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সঠিক দিক নির্দেশনায় আমি আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে সক্ষম হই। আমার জানা মতে এই শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি এবং আমার এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ হয়নি।

আমি এই মর্মে আরও ঘোষণা প্রদান করছি যে, আমার রচিত অভিসন্দর্ভটি মৌলিক এবং এখানে কোন প্রকার কৃত্রিমতা/Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

গবেষক
কাজী ফারজানা আফরীন
পিএইচ.ডি. গবেষক
ও
সহকারী অধ্যাপক
রেজিস্ট্রেশন নং- ৫৩/২০১৯-২০
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৯-২০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে **'মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট'** (The Role of Islamic Culture in the Enriching Human Life: Bangladesh Perspective) শীর্ষক শিরোনামে আমার রচিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। বিধিমোতাবেক যথাসময়ে এটি পুনরায় উপস্থাপন করতে পেরে আমি সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামনব, নবীকূল শিরোমণি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স.) এর প্রতি।

আমার এই গবেষণা কর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী বিভাগ ইসলামিক স্টাডিজ এর স্বনামধন্য, উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অত্যন্ত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করেছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন, উদ্দীপনা যুগিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন। তাঁর এই নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও সুনিপুণ তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর অতি মূল্যবান পরামর্শ ও সঠিক দিকনির্দেশনার ফলে আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। এই গবেষণা কর্মের রচনা সম্পর্কে অবহিতকরণ, গবেষণার নিয়ম মেনে তা রচনা করা সহ প্রয়োজনীয় সকল উপদেশের জন্য তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার বিভাগের সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের প্রতি এবং আমার সহকর্মীদের প্রতি- যাদের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা আমার গবেষণা কর্মের পাথেয় হিসেবে বিবেচ্য। আমি তাদের সুস্বাস্থ্য, সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও নেক হায়াত কামনা করছি।

গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী সহ অন্যান্য লাইব্রেরীর বই, অনলাইন ব্যবহার করেছি। যারা এ বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আবেগের সাথে স্মরণ করছি আমার প্রাণাধিক প্রিয় মরহুম পিতা কাজী মোহাম্মাদ ইদ্রিস এবং মাতা অধ্যাপক হাফিজা খানমকে, যাঁরা আমার উচ্চশিক্ষা অর্জনের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। পরিবারের সদস্যগণ নানানভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ যার কথা না বললেই নয়, তিনি আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী মো. কামরুল হাসান তারেক। তিনি আমাকে এই গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন, পাশে থেকেছেন। তার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ ও স্নেহ জানাই আমার দুই পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে হাসান এবং আহমাদ ইবনে হাসানকে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাস্ততার জন্য তাদেরকে সময় দিতে পারিনি, তাদের আবদার রাখতে পারিনি। তারা ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করেছে, কখনো বিরক্ত করেনি। আল্লাহ তাদেরকে কুর'আনে হাফিজ এবং খাঁটি মুমিন বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই আমার আত্মীয় স্বজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী ও বন্ধুদের, যারা আমাকে প্রতিনিয়তই সাহস ও ভরসা যুগিয়েছে। আমি তাদের সকলের সুস্বাস্থ্য, সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও নেক হায়াত কামনা করছি।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভখানি মূল্যায়ন শেষে একজন সম্মানিত পরীক্ষক কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর প্রদত্ত দিকনির্দেশনার আলোকে অভিসন্দর্ভখানি সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন-বিয়োজন করে পুনরায় উপস্থাপন করা হলো।

পরিশেষে, করোনা মহামারির ভয়াবহতা সহ নানান প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা এবং অনেক অসুস্থতা সত্ত্বেও এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার তৌফিক প্রদান করার জন্য সৃষ্টিকর্তা, মহান রবের শাহী দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা। তিনি সাহায্য না করলে এই অসাধ্য আমার পক্ষে সাধন সম্ভব হতোনা। সষ্টিকর্তা মহান রব আমাদের সকলকে সঠিক পথে থাকার তৌফিক দান করুন এবং উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

গবেষক
কাজী ফারজানা আফরীন
পিএইচ.ডি. গবেষক
ও
সহকারী অধ্যাপক
রেজিস্ট্রেশন নং- ৫৩/২০১৯-২০
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৯-২০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স.	=	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ.	=	‘আলাইহিস সালাম
অনু	=	অনুবাদ
অনূ	=	অনূদিত
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
র.	=	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
ইং	=	ইংরেজি
বাং	=	বাংলা
হি.	=	হিজরী
খ্রি.	=	খৃষ্টাব্দ
ড.	=	ডক্টর
খ.	=	খণ্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সম্পা.	=	সম্পাদিত
হি.	=	হিজরী
তা.বি	=	তারিখ বিহীন
জা.সং.	=	জাতিসংঘ
ঢা.বি.	=	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বা.প.ব.	=	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
প.	=	পরিসংখ্যান
ত.স.	=	তথ্য সংগ্রহ
ন.	=	নম্বর
প্র.	=	প্রভৃতি
SWT	=	Allah Subhanahu wa Ta‘ala
PBUH / SAW	=	Prophet Muhammad (S.A.W.)
RA	=	Radiyallahu ‘Anhu

Dhaka University Institutional Repository

p.	=	page
pp.	=	pages
Pub	=	Publisher
W.D.	=	Without Date.
Ibid	=	(Ibidem) in the same place; from the same source.
Op.cit	=	Operac-citrae
Ed.	=	Edited/ Editor
BB	=	Bangladesh Bank
BBS	=	Bangladesh Bureau of Statistics
CIP	=	Country Investment Plan
CEDAW	=	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
NEP	=	National Education Policy
NSIS	=	National Social Insurance Scheme
Vol	=	Volume
UN	=	United Naions
WHO	=	World Health Organization
n.a.	=	No author
Ed.	=	Edition
Eds.	=	Edited by

Dhaka University Institutional Repository

আরবি বর্ণের প্রতি বর্ণায়ন

আরবি	=	বাংলা
ا	=	অ/আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	গ
ج	=	জ
ح	=	ঘ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	ঐ
س	=	গ
ش	=	ক
ص	=	গ
ض	=	দ/য
ط	=	ত
ظ	=	ঐ
ع	=	‘
غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	কব/ক্
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	এ
ن	=	ই
و	=	ও/ব
ه	=	হ
ء	=	‘
ى	=	য়

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (ABSTRACT)

মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসালামী সংস্কৃতির ভূমিকা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

[The Role of Islamic Culture in the Enriching Human Life: Bangladesh Perspective]

মানবজীবন স্রষ্টার পক্ষ থেকে এক বিশেষ আমানত স্বরূপ, তাই ইহজীবনের সমাপ্তির সাথে সাথেই পরকালীন যে হিসাব নিকাশ শুরু হয় তা মূলত দুনিয়ার জীবনের কর্মের উপরেই নির্ভরশীল। ইসলামের আগমনের সাথে সাথে মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন বাস্তবজীবনে চর্চা শুরু হয়। মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (স.) এর সমগ্র জীবনাদর্শই মূলত ইসলামী সংস্কৃতির বাস্তব রূপ। মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি মানুষকে ইসলামের প্রায়োগিক বিষয়গুলো শিখিয়েছেন। ধীরে ধীরে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে এবং ইসলামী সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সময়ের সাথে সাথে ইসলাম ও এর সংস্কৃতি আরবের গণ্ডী পেরিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী ও তাদের অনুসৃত সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় একটি মিশ্র সংস্কৃতি এ অঞ্চলের মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। সে সব সংস্কৃতির বিশেষত্ব হল, মানুষের তৈরিকৃত অথবা পূর্বপুরুষদের লালিত পালিত সংস্কৃতি। জন্ম লগ্ন থেকেই সভ্য হওয়া বা উন্নত জীবনের প্রতি আসক্তি, এতো মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি। আবার স্রষ্টায় বিশ্বাস স্থাপন করা বা না করা এবং এই বিশ্বজগত সৃষ্টির রহস্য নিয়ে গবেষণা করা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষকে বিভিন্ন মতের অনুসারী হতে দেখা যায়। আল্লাহ মানুষকে বিবেকবান ও বোধসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাছে সত্য-মিথ্যা, ভুল-সঠিক, ভালো- মন্দের পার্থক্যটি স্পষ্ট হওয়া উচিত । যাতে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোনটি করা উচিত আর কোনটি করা উচিত নয়। ইসলামকে সৃষ্টিকর্তা এজন্যই শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছেন যাতে মানুষ বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ ঘটাতে পারে এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃতির চর্চা জীবন থেকে বাদ দিতে পারে। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সাথে আরও অনেক ধরনের অনৈসলামিক চর্চা প্রচলিত রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যা মানব জীবনের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের অন্তরায়। কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম। এর থেকে কিছু অংশ গ্রহণ আবার কিছু বর্জনের কোন সুযোগ নেই। মানব জীবন মহান স্রষ্টার অনন্য সৃষ্টি, যার মাধ্যমে বিশ্বজগতে জ্ঞান, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞান, চিন্তা, নৈতিক বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন, যা তাকে অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। মানব জীবন স্রষ্টার ইবাদত, খিলাফত ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। এই পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। ইসলামী সংস্কৃতি মূলত কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা, যেখানে আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, জ্ঞানচর্চা,

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ন্যায়বিচার, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, পরিবার ও রাষ্ট্র পরিচালনার এক সুশৃঙ্খল রূপরেখা বিদ্যমান। ইসলামী সংস্কৃতি শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তরে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এর উৎপত্তি নবী করিম (স.)-এর যুগে; মক্কা ও মদিনায় ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বিভিন্ন ভূখণ্ডে মুসলিম শাসন বিস্তারের মাধ্যমে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। খলিফাগণ, উলামা, সুফি-দরবেশ, দার্শনিক, শিল্পী, কবি ও স্থপতিরা ইসলামী সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস দীর্ঘ ও গৌরবময়। আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইসলাম আগমনের পর থেকেই এই ভূখণ্ড ইসলামী সংস্কৃতির স্পর্শে আসে। পরবর্তীতে সুলতানি আমল ও মুঘল শাসনামলে মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, সাহিত্য, স্থাপত্য ও সংগীত ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বহন করে। বাংলার সুফি সাধকরা ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছড়িয়ে দেন। ফলে ইসলামী সংস্কৃতি বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। মসজিদভিত্তিক শিক্ষা, কবি-সাহিত্যিকদের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, লোকসংস্কৃতিতে ধর্মীয় প্রভাব এবং পরিবারকেন্দ্রিক নৈতিক চর্চা এর বিশেষ দিক হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের স্থাপত্যশৈলীতে যেমন সোনারগাঁও, ষাটগম্বুজ মসজিদ বা লালবাগ কেল্লা ইসলামী ঐতিহ্য বহন করে, তেমনি সাহিত্য ও সংগীতে ইসলামী ভাবধারা মানুষের নৈতিক জীবন গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

মানব জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রায়োগিক ক্ষেত্র বহুমাত্রিক। ব্যক্তিজীবনে এটি মানুষকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, ধৈর্যশীল ও পরোপকারী করে তোলে। পারিবারিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব, সন্তানদের সঠিক শিক্ষা, নৈতিকতার বিকাশ ও পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। সামাজিক জীবনে এটি ন্যায়বিচার, সহযোগিতা, দান-সদকা, মানবাধিকারের স্বীকৃতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি সততা, আমানতদারিত্ব, সুদমুক্ত লেনদেন, হালাল-হারামের পার্থক্য এবং জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। রাজনৈতিক জীবনে এটি শূরা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনের নীতি প্রবর্তন করে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এটি শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও স্থাপত্যকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, প্রতিটি শিল্পমাধ্যম মানবজীবনের নৈতিক উন্নতিকে লক্ষ্য করে।

তবে বাংলাদেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ প্রয়োগে কিছু প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ ও ভোগবাদী প্রবণতা, ধর্মীয় শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, সমন্বিত জাতীয় শিক্ষানীতির অভাব, সামাজিক কুসংস্কার, উগ্রবাদ ও ধর্মীয় চেতনার ভুল ব্যাখ্যা ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশকে ব্যাহত করছে। গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার না করে অশ্লীলতা ও ভোগবাদী চর্চা সমাজে প্রভাব ফেলছে। পারিবারিক পর্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধের দুর্বল চর্চা এবং অর্থনৈতিক জীবনে সুদভিত্তিক লেনদেনও অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। ফলে ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটছে না।

Dhaka University Institutional Repository

মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য কিছু করণীয় অপরিহার্য। প্রথমত, শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে হবে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পরিবার ও সমাজে নৈতিকতা, দয়া, সততা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চর্চা জোরদার করতে হবে। তৃতীয়ত, গণমাধ্যম ও প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে ইসলামী সংস্কৃতি প্রচার ও ভোগবাদ প্রতিহত করতে হবে। চতুর্থত, রাষ্ট্রীয় নীতিতে ন্যায়, সমতা ও জবাবদিহিতার মূল্যবোধ স্থাপন করতে হবে। পঞ্চমত, আলেম, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক শিক্ষা প্রচার করা দরকার।

সার্বিকভাবে বলা যায়, ইসলামী সংস্কৃতি মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। এটি ব্যক্তির অন্তরকে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করে, পরিবারকে সুদৃঢ় করে, সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্রকে ন্যায়নিষ্ঠভাবে পরিচালিত করে। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধ গভীরভাবে নিহিত। যদি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র মিলে ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত চর্চা ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারে, তবে মানব জীবনের পূর্ণতা, ন্যায়পরায়ণতা ও কল্যাণকর সমাজ গঠন সম্ভব হবে। ইসলামী সংস্কৃতি সেই আলোকবর্তিকা, যা মানুষকে পার্থিব জীবনে নৈতিক উন্নতি ও আখিরাতে মুক্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।

মানব জীবন মহান আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি, যার মূল বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞান, বিবেক, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের সমন্বয়। অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হলো তার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত, খিলাফত ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী সংস্কৃতি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমষ্টিকে বোঝায়, যা মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এর উৎপত্তি নবী মুহাম্মদ (স.)-এর যুগে এবং পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজজীবনের বিকাশের সাথে সাথে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় রূপ লাভ করে।

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস সুদীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল। আরব বণিক ও সুফি সাধকদের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে এবং তা দ্রুত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে ইসলামী সংস্কৃতি শুধু ধর্মীয় কর্মকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং স্থাপত্য, সাহিত্য, শিক্ষা, সংগীত ও সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যমে সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে। ষাটগম্বুজ মসজিদ, লালবাগ কেল্লা কিংবা বাংলার সুফি সাহিত্য ইসলামী ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। ফলস্বরূপ ইসলামী সংস্কৃতি আজও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ও সামাজিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মানব জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রায়োগিক গুরুত্ব বহুমাত্রিক। ব্যক্তিগত জীবনে এটি নৈতিক চরিত্র গঠন, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং আত্মসংযম শিক্ষা দেয়। পারিবারিক জীবনে এটি দাম্পত্য সম্পর্কের ভারসাম্য, সন্তানের সঠিক লালনপালন ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। সামাজিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি ন্যায়বিচার, সহযোগিতা,

Dhaka University Institutional Repository

দান-সদকা ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি নিশ্চিত করে। শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইসলামী সংস্কৃতি সততা, জবাবদিহিতা, সুদমুক্ত লেনদেন এবং শূরা নীতিকে গুরুত্ব দেয়। এইভাবে ইসলামী সংস্কৃতি ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল স্তরে সামগ্রিক উন্নতির ভিত্তি গড়ে তোলে।

তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ বাস্তবায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ভোগবাদী প্রবণতা, ধর্মীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, শিক্ষানীতির অসামঞ্জস্যতা, গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং সামাজিক কুসংস্কার এগুলোর মধ্যে প্রধান। তদুপরি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক লেনদেন ও পারিবারিক পর্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধের দুর্বল চর্চা এই সংস্কৃতির প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এই বাস্তবতায় মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, পরিবার ও সমাজে নৈতিকতার দৃঢ় চর্চা, গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার, রাষ্ট্রীয় নীতিতে ন্যায় ও সমতার প্রতিফলন এবং আলেম-উলামা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। এভাবেই ইসলামী সংস্কৃতি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমন্বিতভাবে উন্নত করে মানবজীবনকে প্রকৃত অর্থে পূর্ণতা দান করতে সক্ষম হবে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, ইসলামী সংস্কৃতি মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনের এক অনন্য মাধ্যম। এটি মানুষকে শুধু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পথে পরিচালিত করে না, বরং সামাজিক শান্তি, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতার মাধ্যমে একটি কল্যাণকর সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইসলামী সংস্কৃতির শেকড়কে দৃঢ় করেছে; এখন প্রয়োজন সমসাময়িক সমাজে এর যথাযথ চর্চা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজ প্রকৃত উন্নতি অর্জন করতে পারবে এবং মানবজীবন পূর্ণতা লাভ করবে।

মানুষ স্বভাবতই জীবনে নানান রকমের সংস্কৃতির চর্চা করে থাকে। এটা তাদের জীবনের একটি স্বভাবজাত বিষয়। তাই জীবনে নানান রকম সংস্কৃতির অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের সাথে মানুষ জড়িয়ে যায়। যাতে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় হয়, চারিত্রিক বিপর্যয় হয়, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। গবেষণার ক্ষেত্র অনুসারে এটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা। পূর্ববর্তী ইতিহাস পর্যালোচনা ও আলোচনা করে ইসলামী সংস্কৃতির প্রায়োগিক বিশ্লেষণের কারনে এটিতে অনুসৃত হয়েছে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি। আবার অন্যান্য সংস্কৃতি বা মুসলমানদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনৈসলামিক সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনা করার ক্ষেত্র বিশ্লেষণে গবেষণাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে তুলনামূলক পদ্ধতি।

আলোচ্য গবেষণায় সার্বিক বিষয় বিশ্লেষণ, মানব জীবন উৎকর্ষের পথে অন্তরায় সমূহ ও ইসলামী সংস্কৃতির সঠিক অনুসরণের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সৃষ্টি লগ্নের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান অনুসরণের প্রতি জোর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে এই অভিসন্দর্ভটিতে মূলত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে আমি আলোচ্য অভিসন্দর্ভখানি, **'মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসালামী সংস্কৃতির ভূমিকা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট** [The Role of Islamic Culture in the Enriching Human Life: Bangladesh Perspective]' পুনরায় উপস্থাপন করতে আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণা কর্মটি ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় মানব জীবনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে, আবেগ সংযোজন করবে এবং পাঠক মহলে সাদরে গৃহীত হবে ইনশাল্লাহ। একই সাথে জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা রাখি। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমার এ গবেষণা কর্মখানি কবুল করুন, আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা নং

গবেষণার শিরোনাম i

মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসালামী সংস্কৃতির ভূমিকা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট i

[The Role of Islamic Culture in the Enriching Human Life: Bangladesh Perspective] . i

প্রত্যয়নপত্র ii

ঘোষণাপত্র iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iv

শব্দ সংকেত vi

আরবি বর্ণের প্রতি বর্ণায়ন viii

সারসংক্ষেপ (ABSTRACT) ix

সূচীপত্র xiv

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

মানব জীবন সৃষ্টির বিশেষত্ব ৮ - ৬৩

১. মানব সৃষ্টির প্রাক কথন ৮

২. মানবজাতি সৃষ্টির বিশেষত্ব ১১

২.১ মানব সৃষ্টি প্রক্রিয়া ১১

২.২ আল্লাহর হাতেই মানব সৃষ্টি ১২

২.৩ কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানে মানবসৃষ্টি ১৫

২.৪ বিজ্ঞানের আলোকে মানব শরীরের উপাদান ২১

২.৫ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা ২২

২.৪ রূহ বা আত্মার ধারণা ২৫

২.৪.১ আল-কুরআনের আলোকে রূহ ২৬

২.৪.২ ইসলামী চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিতে রূহ ২৭

৩. সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ মর্যাদা ৩০

৩.১ উর্ধ্বজগতে প্রাপ্ত মর্যাদা ৩২

৩.১.১ রূহের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মর্যাদা ৩২

৩.১.২ ফেরেশতাদের উপর মর্যাদা দান ৩৩

৩.১.৩ নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ৩৩

৩.১.৪ সঙ্গিনীর সৃষ্টি ও জান্নাতে বসবাস ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ বস্তুজগতে প্রাপ্ত মর্যাদা ৩৫
৩.২.১ খিলাফতের দায়িত্ব ৩৫
৩.২.২ আকৃতিগত বিশেষত্ব ৩৭
৩.২.৩ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দান ৩৮
৩.২.৪ নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থ প্রদান ৩৯
৩.২.৫ দুনিয়ার নিয়ামতকে কাজে লাগানো, চিন্তা করা ও গবেষণা করা ৪০
৩.২.৬ স্রষ্টার প্রদত্ত নি'আমতের মাধ্যমে মর্যাদা দান ৪১
৩.২.৭ বিশ্বময় মানবজাতির বিস্তার ৪৩
৩.২.৮ মু'মিনদের মর্যাদা ৪৫
৪. সৃষ্টির উদ্দেশ্য উপলব্ধি ৪৬
৪.১ হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) কে পরীক্ষা ৪৯
৪.২ মানুষের জীবন এক পরীক্ষার ময়দান ৫০
৪.৩ পরীক্ষার ক্ষেত্রসমূহ ৫১
৪.৪ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ৫৫
৪.৫ পরীক্ষায় সফলতার ফলাফল জান্নাত ৫৬
৪.৬ পরীক্ষায় ব্যর্থতার পরিণতি জাহান্নাম ৫৬
৪.৭ পরীক্ষার সময়সীমা ৫৭
৪.৮ আখিরাতের বিচার প্রক্রিয়া ৫৮
৪.৯ মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৬৫-১২৬

১. সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ ও সংজ্ঞা ৬৬
২. ইসলামি সংস্কৃতির পরিচয় ৭৩
২.১ ইসলামি সংস্কৃতি এর কয়েকটি প্রতিভাষা ৭৪
২.২ ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা ৭৬
৩. ইসলামি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ৭৯
৪. ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব ৮১
৪.১. ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন ৮২
৪.২. ঈমান সংরক্ষণ ৮৩
৪.৩. দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জন ৮৩
৪.৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর ভালোবাসা অর্জন ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫. মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষা ৮৫

৫. ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি ও প্রেক্ষাপট ৮৬

৫.১. তাওহীদ ৮৬

৫.২. রিসালাত ৮৭

৫.৩. আখিরাত ৮৮

৫.৪ ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার প্রেক্ষাপট ৮৮

৫.৫. ইসলামী মৌলিক জীবন দর্শনের চেতনা বাস্তবায়ন ৯২

৬. ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন ৯৫

৬.১ কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৯৬

৬.২ শাসনের উৎস ও কর্তৃত্ব ৯৭

৬.৩ আদর্শ শাসন কাঠামো ৯৭

৬.৪ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৯৮

৬.৫ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও মর্যাদা ১০০

৬.৬ পরামর্শ ও জাবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা ১০২

৬.৭ ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা ১০৩

৬.৮ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ১০৩

৬.৯ বৈশ্বিক সম্প্রীতি ১০৪

৬.১০ আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলাম ১০৪

৬.১১ ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্যমাত্রা ১০৫

৭. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ১০৬

৭.১ গৃহকে শিক্ষালয় ঘোষণা ১০৭

৭.২ গোত্রে গোত্রে শিক্ষায়তন ১০৭

৭.৩ মুক্তিপণ হিসেবে শিক্ষা ১০৭

৭.৪ উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান ১০৮

৭.৫ থেমে থেমে পাঠদান ১০৮

৭.৬ ভাষা ও দেহভাষার সমন্বয় ১০৯

৭.৭ শিক্ষার্থীর নিকট প্রশ্ন করা ১০৯

৭.৮ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা ১১০

৭.৯ আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন ১১০

৭.১০ উপমা দিয়ে বোঝানো ১১১

৭.১১ শিক্ষার্থীর প্রশ্নগ্রহণ এবং প্রশ্নের জন্য প্রসংশা করা ১১১

৭.১২ আমলের মাধ্যমে শিক্ষাদান ১১১

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৩ রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট করা: ১১২
৭.১৪ বার বার পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ ১১৩
৭.১৫ আশা ও ভয়ের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি ১১৩
৭.১৬ মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান ১১৩
৭.১৭ গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি ১১৩
৭.১৮ ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাদান ১১৪
৭.১৯ শাস্তিদানের মাধ্যমে সংশোধন: ১১৪

৮. রাসুল (স.)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ ১১৫
৯. রাসুল (স.)-এর যুগে কুরআন সংকলন ১১৬
১০. শিক্ষা বিস্তারে খুলাফায়ে রাশেদীনের পদক্ষেপ ১১৬
১১. হাদিস সংরক্ষণে উমাইয়া খলীফাদের পদক্ষেপ ১১৭
১২. পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার ১১৯
১২.১ সাহাবিদের যুগে ইসলাম প্রচার ১২০
১২.২ মুসলিম বীরদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ১২০
১২.৩. সূফীগণের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার ১২২

১৩. বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের মৌলিক অবদান ১২২
১৩.১ সাহিত্যে অবদান ১২৪
১৩.২ ইতিহাসে অবদান ১২৫
১৩.৩ দর্শনে অবদান ১২৫

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১২৮-১৮৮

১. বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ১২৮
১.১ বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ১২৯
১.২ বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা ১৩০

২. বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে এখানকার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা ১৩২
২.১ ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি ১৩৪
২.২ প্রাচীন বাংলার মুসলমানদের পালনীয় বিধি-বিধান ১৩৭

৩. বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ১৪৪
৩.১ বণিকদের ইসলাম প্রচার ১৪৫
৩.২ স্থলপথে ইসলামের আগমন ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ সূফী আলিম ও মুজাহিদের ইসলাম প্রচার ১৪৭

৪. বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা ১৫৪

৪.১ সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চা ১৫৪

৪.২ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা ১৫৬

৪.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা ১৫৭

৪.৪ সুফী দর্শনের প্রভাব ১৫৮

৪.৫ ইসলামী শাসকদের প্রভাব ১৬৩

৪.৬ মুসলিমদের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ১৬৮

৪.৭ বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা ১৭০

৪.৮ দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ১৭১

৪.৯ মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ১৭২

৫. ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব ১৭৩

৫.১ আরবের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক বিনিময় ১৭৬

৫.২ আরবসমাজে ভারতের প্রভাব ১৭৮

৫.৩ বাংলা ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব ১৭৯

৫.৩.১ ঐতিহাসিক পটভূমি ১৮০

৫.৩.২. শব্দভাণ্ডারে ইসলামী প্রভাব ১৮০

৫.৩.৩ সাহিত্যিক রচনায় ইসলামী প্রভাব ১৮২

৬. শিক্ষা ও জ্ঞানে প্রভাব ১৮৪

৭. শিল্প ও স্থাপত্যের মাধ্যমে ভাষায় প্রভাব ১৮৪

৮. লোকসংস্কৃতি ও প্রবাদ-প্রবচন ১৮৫

১০. বাংলাদেশ ও ভারতের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ১৮৬

চতুর্থ অধ্যায়
মানব জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রায়োগিক ক্ষেত্র ১৯০-২৪৬

১. মৌলিক ভিত্তিসমূহ ১৯০

১.১ কালিমা ১৯১

১.২ সলাত ১৯২

১.৩ যাকাত ১৯৪

১.৪ সাওম ১৯৫

১.৫ হজ্ব ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ.....১৯৮
৩. পারিবারিক ব্যবস্থাপনা.....১৯৯
৩.২ ভক্তি-সম্মান ও স্নেহ-মমতার উৎস স্থল.....২০১
৩.৩ পারস্পারিক দায়িত্ববোধ.....২০২
৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা.....২০৩
৪.১ সম্পদের মালিকানা.....২০৪
৪.২ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা.....২১১
৪.৩ সৎ উপার্জন ও হালাল জীবিকা.....২১২
৪.৩.১ ব্যবসা বাণিজ্য.....২১৩
৪.৩.২ চাকরি.....২১৪
৪.৩.৩ কৃষিকর্ম.....২১৪
৪.৩.৪ শিল্পকর্ম.....২১৫
৫. সামাজিক নিরাপত্তা.....২১৭
৫.১ আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য.....২১৭
৫.২ প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব.....২১৮
৫.৩ অমুসলিমদের প্রতি কর্তব্য.....২২১
৬. জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম.....২২৩
৬.১ মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা.....২২৩
৬.২ হত্যা নিষিদ্ধ.....২২৪
৬.৩ শান্তিপূর্ণ জীবন পরিচালনা.....২২৪
৬.৪ অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ.....২২৪
৭. দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলাম.....২২৫
৭.১ নৈতিকতা.....২২৫
৭.২ পার্থিব শাস্তির বিধান.....২২৬
৭.৩ আখিরাতের জবাবদিহিতা.....২২৭
৭.৪ আত্মশুদ্ধি.....২২৭
৮. সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম.....২২৮
৮.১ সম্ভ্রমহানি নিষিদ্ধ.....২২৮
৮.২ পর্দার বিধান.....২২৯
৮.৩ গীবত-অপবাদ নিষিদ্ধ.....২৩০
৯. ইসলামী সংস্কৃতিতে বিনোদন.....২৩১
১০. নারীর অধিকার ও মর্যাদা.....২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

১১. শরীয়াহ আইন ও বিচারব্যবস্থা ২৩৮
১২.রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম.....২৪২
১৩. আন্তর্জাতিক.....২৪২
১৩.১ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ২৪৩
১৩.২ দাওয়াহ..... ২৪৩
১৩.৩ খিদমতে খল্ক ২৪৪
১৩.৪ মানবাধিকার সংরক্ষণ ২৪৪
১৩.৫ পরিবেশ সংরক্ষণ.....২৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহারিক পরিস্থিতি ২৪৮-২৯৯

১. দেশের সংবিধান.....২৪৮
১.১ সংবিধানে ইসলাম.....২৪৮
১.২ ধর্মীয় স্বাধীনতা.....২৫১
১.৩ দুর্নীতি ও ঘুষ বিরোধী আইন ২৫২
১.৪ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন ২৫৩
১.৪.১ দেনমোহর ২৫৬
১.৪.২ খোরপোষ.....২৫৭
১.৪.৩ ভরণপোষণ..... ২৫৮
১.৪.৪ অভিভাবকত্ব ও হেফাজত ২৬১
২. স্বাধীন বাংলাদেশের ইসলাম ২৬২
২.১ ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে ২৬৫
২.২ মডেল মসজিদ..... ২৬৭
৩. ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায়..... ২৬৯
৩.১ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মোট আমানত..... ২৭১
৩.২ কৃষি খাতে বিনিয়োগ ২৭২
৩.৩ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তারল্য পরিস্থিতি..... ২৭৩
৩.৪ রেমিট্যান্স সংগ্রহ ২৭৪
৩.৪ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ২৭৬
৩.৫ বিনিয়োগে সুকুক.....২৭৭
৪. মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে ২৭৯
৪.১ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির ধারণা ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১ ব্রিটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ২৮০
৪.১.২ আলিয়া মাদরাসার গোড়া পত্তন ২৮১
৪.১.৩ কওমী ধারা ২৮৩
৪.১.৪ বর্তমানে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ২৮৩

৫. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ২৮৪
৫.১ শিশু ও কিশোরদের ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রচার ২৮৫
৫.২ নারীদের ইসলামী শিক্ষা ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ২৮৬
৫.৩ দরিদ্রদের জন্য জাকাত, ইফতার ও সামাজিক সাহায্য ২৮৭
৫.৪ লোকসংস্কৃতিতে ইসলামী প্রবাদ, গান ও কাব্য ২৮৮
৫.৫ সামাজিক নৈতিকতা বৃদ্ধি সততা, দয়া, অহিংসা ও দুশ্চরিত্র থেকে বিরত রাখা ২৮৮

৬. সূফীগণের মাধ্যমে ইসলাম ও এর সংস্কৃতির বিকাশ ২৮৯
৬.১ ইসলাম প্রচার ও প্রসার ২৮৯
৬.২ সম্প্রীতি স্থাপন, ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ ২৯০
৬.৩ সূফীগণের দাওয়াত পদ্ধতি ২৯১

৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ২৯১
৮. বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ জীবনে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাব ২৯২
৮.১ উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠান ২৯২
৮.২ বিবাহ ও পারিবারিক রীতি ২৯৩
৮.৩ শিল্প ও স্থাপত্য ২৯৩
৮.৪ সঙ্গীত ও লোকসংগীত ২৯৪
৮.৫ খাদ্য ও জীবনধারা ২৯৫
৮.৬ শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ২৯৬
৮.৭ পোশাক ও সাজ-সজ্জা: ২৯৬
৮.৮ মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাব: ২৯৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ৩০১-৩৫৯

১. বাংলাদেশের সংবিধান, ধর্ম ও আইনের ক্ষেত্রে ৩০১
১.১ সাংবিধানিক অবস্থান ৩০২
১.২ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে ৩০৫
১.৩ ধর্মের অবমাননা ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ ধর্মীয় আইন ৩০৬
১.৫ স্ত্রীর ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা ৩০৮

২. ধর্মের নামে রাজনীতি ৩০৯
২.১ প্রায়োগিক প্রতিবন্ধকতা ৩১০
২.২ ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার ৩১১
২.৩ ইসলামপন্থী দলের কার্যক্রম ও রাষ্ট্রনীতি ৩১২

৩. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ৩১৩
৩.১ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবস্তুর আধুনিকতার অভাব ৩১৪
৩.২ কর্মমুখী শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব ৩১৪
৩.৩ প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত বা অনুপস্থিত ৩১৫
৩.৪ গবেষণা, চিন্তাশীলতা ও জ্ঞান উৎপাদনের ঘাটতি ৩১৫
৩.৫ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও তদারকির অভাব ৩১৬
৩.৬ আর্থিক সংকট ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা ৩১৭
৩.৭ জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা ৩১৭
৩.৮ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উগ্রবাদে ঝুঁকি ৩১৮
৩.৯ নারীর অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা ৩১৮
৩.১০ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও মান অর্জনে ব্যর্থতা ৩১৯
৩.১১ সমন্বিত ইসলামী শিক্ষানীতির অভাব ৩১৯

৪. বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের সমস্যা ৩২০
৪.১ পারিবারিক শিক্ষায় ঘাটতি ৩২০
৪.২ বিজ্ঞাপণে নারীকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন ৩২১
৪.৩ কর্ম ক্ষেত্রে নারীদের সমস্যা ৩২২
৪.৪ উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া ৩২৩
৪.৫ মসজিদে নারীদের নামাজের সুযোগ না থাকা ৩২৪

৫. সঠিক ইসলামী জ্ঞানের ঘাটতি ৩২৯
৫.১ ইসলামী জ্ঞানের ক্রমশ হ্রাস ৩২৯
৫.২ শিক্ষকের মান ও প্রশিক্ষণের অভাব ৩৩০
৫.৩ ব্যক্তিগত অধ্যবসায়ের অভাব ৩৩১
৫.৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিকল্পনা, জনসম্পৃক্ততা ও আধুনিকায়নের অভাব ৩৩১

৬. ইসলামি ব্যাংকিং এবং বীমায় সমস্যা ৩৩৩
৬.১ আমানত হারাচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ৩৩৪
৬.২ ইসলামী বীমায় আস্থাহীনতা ৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইসলামী অর্থনৈতিক জ্ঞানের অভাব ৩৩৬
৭.১ যাকাত ব্যাবস্থাপনায় ত্রুটি ৩৩৭
৭.২ মুদ্রাস্ফীতি,পণ্য গুদামজাতকরণ, ব্যবসায় অসাধুতা ৩৩৮
৮. প্রচলিত শির্ক, বিদআত এবং কুসংস্কার ৩৩৯
৯.অন্যান্য সমস্যা ৩৪০
৯.১ প্রযুক্তির অপব্যবহার ৩৪০
৯.২ ভ্রান্ত ধর্মীয় তথ্য প্রচার ৩৪১
৯.৩ ইসলামবিরোধী কনটেন্টের প্রসার ৩৪২
৯.৪ ভণ্ড পীর ও ভ্রান্তপন্থার প্রচার ৩৪২
৯.৫ ইসলামী সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ ৩৪২
৯.৬ সময়ের অপচয় ও বিনোদননির্ভরতা ৩৪৩
৯.৭ হালাল-হারামের সীমা অমান্য ৩৪৩
৯.৮ ইসলামী সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা ৩৪৩
৯.৯ বিভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ৩৪৪
৯.১০ মৌলিক ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহ ৩৪৫
৯.১১ নৈতিক অবক্ষয় ৩৪৭
৯.১২ সুযোগ্য প্রতিনিধির অভাব ৩৪৭
৯.১৩ মসজিদের ইমামদের ভূমিকা ৩৪৯
১০. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা ৩৫০
১১. জাতীয় শিক্ষানীতি ৩৫৬

সপ্তম অধ্যায়

মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও বাস্তবায়নে করণীয় ৩৬১-৪১৮

১. আল-কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ৩৬১
১.১ পারিবারিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়ন ৩৬৩
১.২ তরুণ সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা ৩৬৪
১.৩ সামাজিক অনুষ্ঠানে ইসলামি নীতি প্রয়োগ ৩৬৫
১.৪ মানুষকে সম্মান করা ও নম্র ব্যবহার করা ৩৬৫
১.৫ মাদক, অশ্লীলতা ও অপরাধবিরোধী ইসলামী আন্দোলন ৩৬৭
২. ঈমান ও আমলের সমন্বয় ঘটানো ৩৬৮
২. হাদীসের আলোকে আমলের গুরুত্ব ৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

২.১ ইসলামের প্রথম ভিত্তি ঈমান ৩৬৯
২.১.১ ঈমান অনন্য নিয়ামত ৩৭১
২.১.২ শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড ঈমান ৩৭২
২.১.৩ ঈমানের স্তম্ভসমূহ ৩৭২
২.১.৪ ঈমান বৃদ্ধি ও কার্যকর রাখা ৩৭৩
২.১.৫ ঈমান সফল হওয়ার মাধ্যম ৩৭৩
২.২ আমলের গুরুত্ব ৩৭৪
২.৩ নিয়মিত ও স্থায়ী আমল পছন্দনীয় ৩৭৫
২.৪ সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন ৩৭৬
২.৫ আখিরাতের মুক্তির শর্ত ৩৭৯
৩. ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন ৩৮২
৩.১ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ ৩৮৩
৩.২ জাতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা ৩৮৩
৩.৩ নারীর শিক্ষা ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামী নির্দেশনা অনুসরণ ৩৮৪
৩.৫ ইসলাম ও বিজ্ঞানকে একসাথে প্রচার ৩৮৫
৪. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি ৩৮৬
৪.১ মুয়ামালাত ও আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা ৩৮৭
৪.২ মু'আমালাতের গুরুত্ব ৩৮৯
৪.৩ মু'আমালাতে যা নিষিদ্ধ ৩৮৯
৪.৪ জাকাত, ফিতরা ও ওয়াক্ফ ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩৮৯
৪.৫ মজুদদারী ৩৯১
৪.৬ সুদভিত্তিক চুক্তি নিষিদ্ধ ৩৯২
৪.৭ জুয়াসংশ্লিষ্ট চুক্তি ইসলামে নিষিদ্ধ ৩৯২
৪.৮ ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক মডেল বিস্তৃত করা ৩৯২
৫. ইসলামী সংস্কৃতির সক্রিয়তা ৩৯৩
৫.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলা ৩৯৪
৫.২ সাহিত্য চর্চা ৩৯৪
৫.৩ ক্রীড়া, আনন্দ ও প্রতিযোগিতা ৩৯৫
৫.৪ কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠন ৩৯৬
৫.৫ ধর্মীয় কুসংস্কার ও বিদআতের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা ৩৯৬
৫.৬ আন্তধর্মীয় সম্প্রীতিতে ইসলামী সহনশীলতা চর্চা ৩৯৭
৫.৭ জাতীয় উৎসবে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮ ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক গণমাধ্যমের বিস্তার ৩৯৮

৬. চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ৪০০

৬.১ সত্যবাদিতা ৪০১

৬.২ আমানতদারিতা ৪০১

৬.৩ অঙ্গীকার পূর্ণ করা ও বিনয়ী হওয়া ৪০১

৬.৪ আত্মীয়তা ও সুসর্ম্পক বজায় রাখা ৪০২

৬.৫ লজ্জাশীলতা ৪০৪

৬.৬ ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা ৪০৫

৬.৭ স্বদেশপ্রেম ৪০৫

৬.৮ চারিত্রিক উৎকর্ষতা: ৪০৬

৭. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ৪০৮

৭.১ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আধুনিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা ৪০৯

৭.২ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইসলামী নীতি অন্তর্ভুক্ত ৪০৯

৭.৩ বিচারব্যবস্থায় ইনসাফ ও শুদ্ধতা নিশ্চিত করা ৪১০

৭.৪ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইসলামী আদর্শ প্রবর্তন ৪১০

৭.৫ ইসলামী সংস্কৃতি গবেষণায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ৪১০

৮. পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ ৪১১

৮.১ তাওহিদ ও বিশুদ্ধ ঈমান ৪১২

৮.২ বিশুদ্ধ নেক আমল ৪১৩

৮.৩ তাকওয়া অবলম্বনকারী ৪১৪

৮.৪ আত্মশুদ্ধি অর্জনে ইসলাহী সভা ও দারস তারবিয়াত ৪১৫

৮.৫ নেক সন্তান প্রস্তুত করা ৪১৬

৮.৫ সদকায়ে জারিয়া ৪১৭

উপসংহার ৪১৯

গ্রন্থপঞ্জি ৪২২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমগ্র মানব জাতিকে অনন্য বিশেষত্ব প্রদান করে, মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানবজাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে। এজন্য এই বিশ্বজগতে মানবজাতি হয়েছে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত। এই নশ্বর দুনিয়াতে মানুষের পদার্পণ ঘটেছে হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে। তারপর ক্রমাগতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন- এর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল। যারা দুনিয়ার মানুষকে বিভিন্নভাবে নৈতিক চরিত্রের উত্তম শিক্ষা দান করেছেন। কিন্তু তাদের এই শিক্ষা ও আদর্শের মাঝে পূর্ণতা ছিল না, কারণ তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন কোন বিশেষ সময়, স্থান ও জাতির জন্য। তাই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা সাধন করেছেন। মানবজীবনের বিভিন্ন অঙ্গনের পর্যায়ক্রমিক দিকনির্দেশনা রচিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কার্যক্রমের সমন্বয়ে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের শিক্ষা ও আদর্শ সর্বব্যাপী ছিল না বিধায় মানবজীবনের পরিপূর্ণ আদর্শের রূপরেখা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এই অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করেছেন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) নিজের কর্মময় জীবনের মাধ্যমে। তিনি তার পবিত্র জিন্দেগিকে জীবন ও জগতের প্রয়োজনীয় যাবতীয় নৈতিক চরিত্র মাহাত্ম্যকে পূর্ণতা দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তার মাধ্যমেই বিশ্বজগৎ লাভ করেছে পরম আদর্শভিত্তিক নৈতিক চরিত্রের উজ্জ্বলতম বিকাশ। শুধু তাই নয়, ইসলামী জীবনধারার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে ঈমান। আল্লাহর ওপর ঈমান, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর ঈমান, আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের ওপর ঈমান, কিয়ামতের দিনের ওপর ঈমান, তকদিরের ওপর ঈমান, ভালো এবং মন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের ওপর ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। ইসলাম পৃথিবীতে নিছক রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্য আসেনি। ইসলাম এসেছে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। মানুষের চিন্তা ও কর্মের এ পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টাকেই বলা হয় সামগ্রিক অর্থে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ইসলামকে মনোনীত করে হয়েছে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে। ফলে ইসলাম ছাড়া জীবন পরিচালনা মানেই হচ্ছে, অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা পরিচালিত হওয়া। আর অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা জীবন পরিচালনার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অসঙ্গতি ও ত্রুটিপূর্ণ জীবন যাপন করা। স্বাভাবিকভাবেই এ জীবন অপসংস্কৃতি শিকার হতে বাধ্য। এ জন্যই বলা যায়, পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া ছাড়া পরিপূর্ণ সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব নয়। ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। যে বিশ্বাস ও আচরণ ইসলাম একজন মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে তার সাথে সাংঘর্ষিত হতে পারে এমন কোন কিছুই ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে শামিল হতে পারে না। এ

Dhaka University Institutional Repository

সীমারেখাকে অবহেলা করে বা কৌশলের নামে তাকে অবজ্ঞা করে যা করা হবে তা আর যাই হোক ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রধানত তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মিত হয়। ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তি হচ্ছে এ ১. তাওহিদ, ২. রিসালাত এবং ৩. আখিরাত। মহব্বত, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা খোদার সৃষ্ট প্রকৃতিরই অংশ। মানবীয় গুণাবলি বিকাশে ও মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন বা সুকুমারবৃত্তি অর্জনের মূলে রয়েছে বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা। মহব্বতের ধারাবাহিকতা হলো আল্লাহর প্রতি মহব্বত, রাসুলের প্রতি মহব্বত, আল্লাহ ও রাসুলের প্রিয়জনদের প্রতি মহব্বত, পিতা-মাতার প্রতি মহব্বত, স্বামী-স্ত্রীর প্রতি মহব্বত, সন্তানের প্রতি মহব্বত, ভাইবোনের প্রতি মহব্বত, আত্মীয়স্বজনের প্রতি মহব্বত, পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি মহব্বত, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মহব্বত, বিশ্ববাসীর প্রতি মহব্বত, সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি মহব্বত।

দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বয়ে ইসলামী সংস্কৃতি একটি পরিপূর্ণ ও আদর্শিক সংস্কৃতি। ইসলাম মানবজাতির সুষ্ঠু জীবনযাপনের যে নিয়মনীতি বা বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। তার ব্যবহারিক দিকগুলোকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ইসলামী আচার-আচরণ, জীবনদর্শন, শিক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বোপরি মানবজীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থায় ইসলামী পদ্ধতি অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। মুসলমানদের অনুশীলিত ধর্মাচার, স্থানীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম-পদ্ধতি, জীবনপ্রক্রিয়া ও ঐতিহ্যের যা কিছু ইসলামের নিয়মাবলি অনুমোদন ও প্রতিফলিত হয় সেগুলোকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলোর ইসলামী নীতি, আদর্শ ও শিক্ষাসম্মত উৎকর্ষসাধন পদ্ধতি এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বাস্তব রূপ হলো ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলিম উম্মাহর পরিচিত, অস্তিত্ব, স্বকীয়তা, জাতিসত্তা, স্বাতন্ত্র্য, সাফল্য- এসব কিছুই ইসলামী সংস্কৃতির অধ্যয়ন, অনুশীলন ও অনুকরণের ওপর নির্ভরশীল। মুসলিম জাতির সমগ্র জীবনে তাই ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা। আল্লাহতায়ালা নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। পবিত্রতা বলতে বাহ্যিক বা দৈহিক এবং অন্তরের বা মনের উভয় প্রকার পবিত্রতা বোঝায়। ইসলাম উভয় ধরনের পবিত্রতার ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। ইবাদতের জন্য যেমন পবিত্রতা দরকার, তেমনি থাকা-খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবিকা অর্জন, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতার ওপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ইসলামি সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মন ও মননশীলতা সৃষ্টি করে, তা সব ধরনের কলুষতা, পঙ্কিলতা, সংকীর্ণতা, হঠকারিতা, কপটতা, ধোঁকা, প্রতারণা, বকধার্মিকতা, অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পাষণ্ডতা, অমানবিকতা, জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, অসুন্দর, বেমানান,

Dhaka University Institutional Repository

বেআদবি, পাপাচার ও নোংরামি থেকে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হবার জন্য তাড়িত করে। এর অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা দেয়। এর অনুকূল আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সংস্কারের প্রেরণা আসে মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস বা স্রষ্টা প্রেরিত দর্শন থেকে। মুসলিম জীবনে সে ধর্মীয় বিশ্বাস বা বিধিবদ্ধ দর্শনটি হলো ইসলাম। মুসলিম ব্যক্তির প্রতিটি কর্ম ও আচরন মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহীতার ভয়ে সদা নিয়ন্ত্রিত ও সতর্কিত। ঈমানদারের চাওয়া-পাওয়ার উপর হিসাব- নিকাশের শক্ত লাগাম পড়িয়ে দেয় সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহতায়ালার ভয় ও নিষেধাজ্ঞা । তাঁর জীবন হয় ইসলামী শরিয়ত দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত। প্রতিটি ক্ষেত্রে কি আনন্দ-উল্লাস, কি কথা-বার্তা, কি দুঃখ-বিষাদ-সব কিছুতেই থাকে মহান আল্লাহতায়ালার উপর অটল নির্ভরতা ও শুকরিয়া। সাংস্কৃতিক কর্ম মুসলিমের কাছে নিজেই কোন লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার মাধ্যম মাত্র। ইসলামের মূল লক্ষ্যই হলো মানুষের মাঝে গুণের উৎকর্ষ ঘটিয়ে তাঁকে মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে অনন্য মর্যাদায় পৌঁছানো। মানব শিশু ইসলামের উপরে জন্মালেও সে প্রকৃত মুসলিম রূপে বেড়ে উঠে একটি ইসলামী পরিবার ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে-প্রক্রিয়ার মধ্যে বসবাসের মধ্য দিয়ে। সুস্থ সংস্কৃতির বিনির্মাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদানকারী হলো পবিত্র কুর'আন, যা মহান রবের পক্ষ থেকে নাযীল হয়েছে। সেই সাথে সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ইসলামের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। ইসলাম তাই শুধু কালেমা, নামাজ-রোজা ও হজ্জ-যাকাত শেখায় না। ইসলামী রাষ্ট্র, মসজিদ-মাদ্রাসা, শিক্ষালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও গড়তে বলে। দেহকে বাঁচাতে হলে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যকে দূষিত হওয়া থেকে বাঁচাতে হয়। তেমনি জাতিকে বাঁচাতে হলে চেতনার দূষিতকরণ প্রক্রিয়াকে অবশ্যই বিলুপ্ত করতে হয়। নইলে জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি ও চরিত্র বাঁচে না।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের মানুষের জীবনে প্রচলিত সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য অন্বেষণ করা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী সংস্কৃতি পালন না করায় মানব জীবনের যে নৈতিক অবক্ষয় সাধিত হচ্ছে, তা উপস্থাপন করা। ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক চর্চার মাধ্যমে মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। তাই আলোচ্য গবেষণায় ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যে মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, যাতে এ দেশের মুসলমানদের জীবনের উৎকর্ষ সাধন হয়। এই গবেষণাটি উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে একটি তাত্ত্বিক গবেষণা। যা পুরোপুরি মৌলিক এবং এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত চর্চা ও বাস্তবায়নের দিকগুলো তুলে ধরা ও তা বাস্তবায়নে উৎসাহিত করার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন করা। মানুষ স্বভাবতই জীবনে নানান রকমের সংস্কৃতির চর্চা করে থাকে। এটা তাদের জীবনের একটি স্বভাবজাত বিষয়। তাই জীবনে নানান রকম সংস্কৃতির অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের সাথে মানুষ জড়িয়ে যায়। যাতে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় হয়, চারিত্রিক বিপর্যয় হয়, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। গবেষণার ক্ষেত্র অনুসারে এটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা। পূর্ববর্তী ইতিহাস পর্যালোচনা ও আলোচনা করে ইসলামী সংস্কৃতির প্রায়োগিক বিশ্লেষণের কারনে এটিতে অনুসৃত হয়েছে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি। আবার অন্যান্য সংস্কৃতি বা মুসলমানদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনৈসলামিক সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনা করার ক্ষেত্র বিশ্লেষণে গবেষণাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে তুলনামূলক পদ্ধতি। মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধন একটি চিরন্তন অন্বেষণ। মানুষ তার নৈতিকতা, জ্ঞান, আচার-আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক ও মানসিক শান্তির মাধ্যমে ক্রমাগত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে চায়। এই উৎকর্ষের পথ নির্দেশ করেছে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন, তবে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সুষমতার শিক্ষা প্রদান করে। ইসলামী সংস্কৃতি কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধ কাঠামো নয়; বরং এটি জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক আচরণ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহভীতি ও মানবকল্যাণের ভিত্তিতে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, সংগীত ও আচার-আচরণে ইসলামী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম আগমনের পর থেকে বাংলার মানুষ নতুন জীবনবোধ, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়ের দীক্ষা লাভ করেছে। ফলে ইসলামী সংস্কৃতি কেবল ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং জাতীয় সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অতএব, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধনের প্রশ্নে এক অপরিহার্য গবেষণা ক্ষেত্র। এই থিসিসে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমাজে তার প্রভাব, এবং আধুনিক প্রেক্ষাপটে এর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে কিভাবে ইসলামী সংস্কৃতি ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

আলোচ্য গবেষণায় সার্বিক বিষয় বিশ্লেষণ, মানব জীবন উৎকর্ষের পথে অন্তরায় সমূহ ও ইসলামী সংস্কৃতির সঠিক অনুসরণের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সৃষ্টি লগ্নের প্রাথমিক শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শুরু করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান অনুসরণের প্রতি জোর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে এই অভিসন্দর্ভটিতে মূলত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে সর্বমোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে, মানব জীবন সৃষ্টির বিশেষত্ব: এই অধ্যায়ে মানব সৃষ্টির প্রাককথন, সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ সম্মান, সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য, মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে, ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: এই অধ্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির গোড়ার কথা, সংস্কৃতির পরিচয়, ইসলামী সংস্কৃতির উপাদান ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলচিত হয়েছে। আলোকপাত করা হয়েছে ইসলামী স্বর্ণজুগের আদর্শ শাসন-কাঠামো, সামাজিক, অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক কাঠামো, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিশ্বসভ্যতায় ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনামে আছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য: এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ইসলাম আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের ভমৌগোলিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, মানব জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ আলোচিত হয়েছে। এখানে মৌলিক ভিত্তিসমূহ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা, জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম, দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলাম, সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম, রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনামে, বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহারিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ইসলামের মৌলিক ভিত্তি, পারিবারিক জীবন,সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়াবলীর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে দেশের সংবিধান, ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন , বাংলাদেশের পারিবারিক আইন, ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা , শিক্ষা ক্ষেত্র, ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহারিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রসমূহ। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা, সাংবিধানিক জটিলতা, ইসলামিক জ্ঞানের ঘাটতি, প্রচলিত নানান ধরণের কুসংস্কার, বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে শিরোনাম দেয়া হয়েছে, মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও বাস্তবায়নে করণীয়। এখানে আল-কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, ঈমান ও আমলের সমন্বয় ঘটানো, মানুষকে সম্মান করা ও নম্র ব্যবহার করা, মুয়ামালাত ও আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা, ইসলামী সংস্কৃতির সক্রিয়তা, চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন, পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও আমার এই অভিসন্দর্ভে সঠিক বিষয়ে পর্যালোচনা করে সংক্ষেপে উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে আমি যে সকল গ্রন্থ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগহ ও সংযোজন করেছি এবং যে সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি তার একটি বিস্তৃত তালিকা 'গ্রন্থপঞ্জি' শিরোনামে অভিসন্দর্ভের শেষে উপস্থাপন করেছি।

উপর্যুক্ত বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে আমি বক্ষমান অভিসন্দর্ভখানি, **'মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসালামী সংস্কৃতির ভূমিকা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট** [The Role of Islamic Culture in the Enriching Human Life: Bangladesh Perspective]' শিরোনামে পুনরায় উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণা কর্মটি ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় মানব জীবনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে, আবেগ সংযোজন করবে এবং পাঠক মহলে সাদরে গৃহীত হবে ইনশাল্লাহ। একই সাথে জীবনের উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা রাখি। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমার এ গবেষণা কর্মখানি কবুল করুন, আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
মানব জীবন সৃষ্টির বিশেষত্ব

প্রথম অধ্যায়

মানব জীবন সৃষ্টির বিশেষত্ব

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর অপার রহস্যঘেরা সৃষ্টি এই নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-উপগ্রহ সমূহ। মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ বিশাল এ সৃষ্টিজগৎ নিয়ে প্রচণ্ড কৌতূহলী। আমাদের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য এই সুবিশাল সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তাই সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রকৃতিগত জীবনবিধানই হচ্ছে ইসলাম। যার জন্য সৃষ্টি জগতের সকলেই কৃতজ্ঞতা সহকারে মহান রবের তাসবীহ পাঠ করে প্রতিনিয়ত। আল্লাহ্‌র শেখনো পন্থায় তারা সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিই অতি বিস্ময়কর। মানুষের আগ্রহের বিষয় হলো এই অতি বিস্ময়কর সৃষ্টজগত।[১] যা মূলত রহস্যে ঘেরা। এই জন্যে মানুষের গবেষণা পর্যালোচনার এই সৃষ্টি ঘিরেই। আল কুরআন এমন এক মহা পবিত্র গ্রন্থ যাতে সেই রহস্যের জট খুলে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের জয় জয়কার সময়ে মানুষ কুরআনের নির্দেশনার সত্যতা খুঁজে পায়। তাই সেই সংস্কৃতি মানুষের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ, যা তার জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে এবং জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে অতি আবশ্যক।

১. মানব সৃষ্টির প্রাক কথন

আমরা মানবজাতি হিসেবে নিজেদের যাপিত জীবনের সবসময় সব কিছুর চূড়ান্ত ভাবনা ভাবতেই পছন্দ করি। এই ভাবনাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি ভাবনা হচ্ছে মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত ভাবনা।[১] ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কেউ কখনো নিজেকে তার স্রষ্টা হিসেবে দাবি করেনি। একই ভাবে জন্মদাতা বাবা-মাও সন্তানের স্রষ্টা হিসেবে নিজেদের কর্তা দাবি করতে কখনো পারেনি।[২] এভাবে নিজেকে প্রথম মানবের স্রষ্টা হিসেবেও দাবি করা অসম্ভব। একইভাবে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা হওয়ার কথাও কেউ কোনো দিন দাবি করেনি। সবচেয়ে বড় বড় অস্তিত্ব যেমন- সূর্য, চাঁদ, পর্বতমালা, সাগর-মহাসাগর এগুলোর উদ্ভাবক স্রষ্টা হিসেবে কোনো মানুষ নিজেকে দাবি করে না।[৩] মানব সৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন সময় যেসব গবেষণা হয়েছে; তা সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য দাঁড় করাতে পারেনি। প্রতিটি চিন্তাই মানুষের নির্ধারিত সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। কোনোকালেই মানুষ নির্ভুল ভাবনা ভাবতে পারেনি। তবে স্রষ্টা যা বলেছেন, তা নিশ্চিত করেই বলেছেন। সেসব কথায় কোনো প্রকার বিচ্যুতি দেখা যায়নি। সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর আগে মানুষকে লক্ষ্য করে স্রষ্টা যা যা বলেছেন, প্রকৃতিতে ঠিক সেভাবেই

---

১ ইমাম আল গাযালী (রহ.), *সৃষ্টির রহস্য*, অনুবাদ. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, ঢাকা: রশীদ বুক হাউস, ২০১১ খ্রি., পৃ.২৬

২ আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী (র.), *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, অনু. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন ও অন্যান্য, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৪৩

৩ এম. শমসের আলী ও অন্যান্য, *আল কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৫৬

তা বিরাজমান। এর কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পৃথিবীতে দৃশ্যমান প্রাণীদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ। দুনিয়ায় দৃশ্যত সবচেয়ে কর্তৃত্ববানও মানুষ। মানুষের ওপর কার্যত অন্য কোন প্রাণীর নিয়ন্ত্রণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই মানুষ এসবের উৎপত্তি নিয়ে নিশ্চিত করে কোনো কথা বলতে পারে না। অন্য দিকে আল্লাহ এসব কিছুর একক স্রষ্টা বলে তিনি নিশ্চিত করে তা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ মানুষকে বিশেষ এক কৌশল ও অনুগ্রহের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি একটি বিশেষ প্রক্রিয়াই অবলম্বন করেছেন। তা হলো পৃথিবীর সব মানুষকে আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন। ইসলামের ভাষ্য মতে, মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী, সবচেয়ে দামি এবং সবচেয়ে সুন্দর এক জীবের নাম। যাকে আল্লাহতায়ালা অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় সুন্দরতর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

'আমি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।'[৪]

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করার আগে বিশ্বজগৎ তথা, চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-তারা, আসমান-জমিন, সাগর-পাহাড়, বন-বাদাড় সৃষ্টি করেছেন।[৫] এরপর আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۝

'স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাই।'[৬]

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে। হযরত আদম (আ.) পৃথিবীর প্রথম মানুষ। আর সকল মানুষ আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টির তথ্য উদঘাটন করতে হলে আমাদেরকে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। আর তাতে দেখা যায় যে, মানব সৃষ্টির সূচনা মাটি থেকে হয়েছে। মৃত্তিকাজাত সকল প্রাণীর জীবনের প্রথম ও মূল একক (Unit) হচ্ছে 'প্রোটোপ্লাজম' (Protoplasm)। যাকে বলা হয় 'আদি প্রাণসত্তা'। এ থেকেই সকল প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী একে Bomb shell বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মাটির সকল প্রকারের রাসায়নিক উপাদান। মানুষের জীবন বীজে প্রচুর

---

৪ আল-কুরআন, ৯৫: ০৪

৫ এম. শমসের আলী, *ইসলাম বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১৫ খ্রি., পৃ. ২৪

৬ আল-কুরআন, ২: ৩০

পরিমাণে চারটি উপাদান পাওয়া যায়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন। আর আটটি পাওয়া যায় সাধারণভাবে সমপরিমাণে। সেগুলি হ'ল- ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার ও আয়রণ। আরও আটটি পদার্থ পাওয়া যায় স্বল্প পরিমাণে। তাহ'লঃ সিলিকন, মোলিবডেনাম, ফ্লুরাইড, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, কপার ও জিংক। কিন্তু এই সব উপাদান সংমিশ্রিত করে জীবনের কণা তথা 'প্রোটোপ্লাজম' তৈরী করা সম্ভব নয়।[৭] জনৈক বিজ্ঞানী দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এসব মৌল উপাদান সংমিশ্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাতে কোন জীবনের 'কণা' পরিলক্ষিত হয়নি। এই সংমিশ্রণ ও তাতে জীবন সঞ্চার আল্লাহ ব্যতীত কারও পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টির মৌলিক উপাদানই হল পানি, যা পৃথিবীর সকল জীবদেহের মধ্যে বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে বলেন,

وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۝

'আর প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে'[৮]

জীববিজ্ঞানের মতে, সাগরের অভ্যন্তরের পানিতে যে প্রটোপ্লাজম বা জীবনের আদিম মূলীভূত উপাদান রয়েছে তা থেকেই সব জীবের সৃষ্টি। মহান আল্লাহ এই ধরণিতে সর্বপ্রথম মাটি থেকে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করেন এবং তারপর তার থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এই মানবজাতি। মহান আল্লাহর ভাষায়,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى ۝

'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।'[৯]

উল্লেখ্য যে, মাটি থেকে সৃষ্ট হওয়া আদমের নাম হ'ল 'আদম' এবং জীবন্ত আদমের পাঁজর হ'তে সৃষ্ট হওয়ায় তাঁর স্ত্রীর নাম হ'ল 'হাওয়া'।[১০] আর আদম থেকেই আল্লাহ সকল মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তার মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে মানব জাতির গোড়াপত্তন হয়। মহান আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় স্বতন্ত্র আকৃতি দিয়ে মানব জাতির সূচনা করেছেন।

যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۪ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۝

৭ এম. শমসের আলী ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, ২০০৪ খ্রি., পৃ.৬৯

৮ আল-কুরআন, ২১: ৩০

৯ আল-কুরআন, ৪৯:১৩

১০ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, খণ্ড ৫, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৯৬৭, সূরা নিসা আয়াত ১-এর তাফসির

'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ জোড়া থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অগণিত পুরুষ ও নারী।[১১]

২. মানবজাতি সৃষ্টির বিশেষত্ব

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষের এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যসব মাখলুকে কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীতে মানব শিশু দুর্বল ও অসহায় হয়ে জন্ম গ্রহণ করে অপরের সহযোগিতা ছাড়া মোটেও চলতে পারেনা, বিপরীতে অন্যসকল প্রাণি জন্মের পর সবল থাকে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেড়ে উঠে, নিজের মতো করে চলতে পারে।[১২] তবুও জন্মকালীন দূর্বল মানব শিশুটিই পরবর্তীতে সকল মাখলুকাতের মাঝে স্বীয় যোগ্যতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ও মানবিক গুণে গুনান্বিত হয়ে আ-শরাফুল মাখলুকাত হিসেবে বিবেচিত হয়। যার বিশেষ কারণগুলি নিম্নরূপ:

২.১ মানব সৃষ্টি প্রক্রিয়া

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সর্বোত্তম চমৎকার সেরা পদ্ধতি ও সুনিয়ন্ত্রিত উন্নত প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেন। এ প্রক্রিয়া কেবল তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। মায়ের গর্ভে মানব শিশুকে ধাপে ধাপে তিনি পূর্ণতা প্রদান করেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা সত্ত্বেও বিজ্ঞানে এ বিষয়টি আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ ছিলো এ বিষয়ে অজ্ঞাত। পবিত্র কোরআনে এসেছে,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

অর্থ: 'আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে (জরায়ুতে) স্থাপন করেছি। এরপর শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টিকরেছি, অত-ঃপর জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর গোশতপিণ্ড থেকে অস্থি।[১৩]

তিনি আরো বলেন,

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

অর্থ: 'এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, অতঃপর আমি একে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত সুনিপুণ স্রষ্টা।'[১৪]

---

১১ আল-কুর'আন, ৪:১

১২ এম. শমসের আলী ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৫৬

১৩ আল-কুর'আন, ২৩: ১২-১৪

রাসুলুল্লাহ (সা.) মাতৃগর্ভে মানবশিশু জন্মের স্তর ও সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে এভাবে বলেছেন, 'তোমাদেও প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান আপন মাতৃগর্ভে বীর্যের আকারে ৪০ দিন, জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়ে ৪০ দিন, গোশত আকারে ৪০ দিন। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠান এবং চারটি বিষয়ে আদেশ দেন যে, তার (শিশুর) আমল, রিজিক, আয়ুষ্কাল ও ভালো না মন্দ এসব লিপিবদ্ধ করো। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়।'[১৫]

২.২ আল্লাহর হাতেই মানব সৃষ্টি

পৃথিবীর সব মাখলুক মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলে বলতেন 'কুন' হয়ে যাও! তৎক্ষনাৎ তা হয়ে যেত। সকল সৃষ্টিকে তিনি 'কুন' এর প্রয়োগে সৃষ্টি করেছেন, কেবল মানুষকে তিনি নিজ হাতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুর'আনে এসেছে,

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ

'আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস, আমার নিজ হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল?'[১৬] কুরআনের প্রমাণ,

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ-"বরং তাঁর হাত প্রসারিত।"[১৭]

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ- "তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।"[১৮]

আল-হাদীস থেকে প্রমাণ,রাসূল (স.) বলেছেন:

"আল্লাহর হাত ভরপুর, দিনে ও রাতে দান করতে থাকে, তবুও তা কমে না।"[১৯]

আরেকটি হাদীসে আছে: "আল্লাহর উভয় হাত দানের হাত।"[২০]

সালাফুস সালেহীন (প্রথম প্রজন্মের আলেমদের) মতামত,

যখন আল্লাহর "ইস্তিওয়া" বা "হাতে সৃষ্টি করা" ইত্যাদি সিফাত নিয়ে প্রশ্ন করা হতো, ইমাম মালিক (রহ.) অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলতেন, অথবা কেউ যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আল্লাহর হাত বলতে কী বোঝায়?" তিনি বলেন:

---

১৪ আল-কুর'আন, ৭৭: ২২-২৩

১৫ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা, পরিচ্ছেদ: সাত জমিন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদীস নং. ২৯৬৮

১৬ আল-কুর'আন, ৩৮: ৭৫

১৭ আল-কুর'আন, ৫:৬৪

১৮ আল-কুর'আন, ৪৮:১০

১৯ (يَدُ اللهِ مَلْأَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ) ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, যাকাত অধ্যায়, হাদীস নং.২১৭৭, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৭

২০ (قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ) ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, অধ্যায়: ৩৪/ রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন (كتاب الإمارة), হাদীস নং. ৪৫৭০, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৭

"الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة"

অর্থাৎ, "আল্লাহর হাতের অস্তিত্ব প্রমাণিত, কিভাবে তা তো অজানা, এতে ঈমান আনা ওয়াজিব, আর এ বিষয়ে অতিরিক্ত কৌতূহল করা বিদআত।"[২১]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) তিনি বলেন, "আমরা আল্লাহর যে গুণাবলী এসেছে, তা তেমনিভাবেই গ্রহণ করব, কেমন তা বলব না এবং তুলনা করব না।"[২২]

ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ.) তিনি বলেন,

"আল্লাহর হাত আছে, তবে তা সৃষ্টির হাতের মতো নয়। কুরআন ও হাদীসে যা এসেছে আমরা তা মানি, কিন্তু তুলনা করি না।"[২৩]

ইমাম ইবন কাসীর (রহ.)" خَلَقْتُ بِيَدَيَّ-আয়াতের তাফসীরে" তিনি বলেন:

"এটি আল্লাহর সরাসরি সৃষ্টির নিদর্শন, যা আদম (আঃ)-এর মর্যাদা বাড়ানোর জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।"[২৪]

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তিনি বলেন:

"আল্লাহর হাত বলতে তাঁর কুদরতের নিদর্শন বোঝানো হয়।"[২৫]

ক. কুদরতের নিদর্শন

"আল্লাহর হাত" কথাটিকে আলেমরা অনেক সময় কুদরতের নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কুরআনের বহু স্থানে দেখা যায় যখন বলা হয় "সবকিছু আল্লাহর হাতে" তখন তার দ্বারা আল্লাহর পূর্ণ কর্তৃত্ব, মালিকানা ও ক্ষমতাকেই বোঝানো হয়।[২৬] যেমন আল্লাহ বলেন: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ - "অতি বরকতময় তিনি, যার হাতে সমস্ত রাজত্ব"।[২৭] অর্থাৎ এখানে শারীরিক হাত নয়, বরং মালিকানা ও ক্ষমতার রূপক প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহর হাত মানে তাঁর অশেষ শক্তি ও সরাসরি সৃষ্টিশীলতা, যা মানুষ ও ফেরেশতার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। বিশেষ করে আদম (আ.)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গে যখন আল্লাহ বলেন: - خَلَقْتُ بِيَدَيَّ "আমি যাকে আমার হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি",[২৮] তখন এর দ্বারা বোঝানো হয়

---

২১ আল-যাহাবী, *আল-'উলু লিল 'আলি আল-গাফফার*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড ১, পৃ. ১০৩

২২ ইমাম তাকি উদ্দীন আহমাদ ইবনু তাইমিয়্যা, *আল-আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ*, মাকতাবাতুস সুন্নাহ-২০২১, পৃ. ৪৩

২৩ ইমাম তাকি উদ্দীন আহমাদ ইবনু তাইমিয়্যা, *মাজমূ' আল-ফাতাওয়া*, খণ্ড. ৫, পৃ. ৪৩৪

২৪ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর, *তাফসীর ইবনে কাছীর*, অনু অধ্যাপক আখতার ফারুক, খণ্ড. ৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০০, সূরা ছাদ এর তাফসীর, পৃ. ৫৩১

২৫ ইমাম আবু হামিদ আল-গাজালী, *আল-মাকসাদুল আসনা ফি শারহ মাআনি আসমা আল্লাহ আল-হুসনা*, সম্পাদনা: মাহমুদ বিজাবী কায়রো: আল-মাকতাবাহ আত-তাওফিকিয়্যাহ, ১৯৬৪, পৃ. ৭১

২৬ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), *স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ২০০৫,পৃ. ৫৬

২৭ আল-কুরআন, ৬৭:১

২৮ আল-কুরআন, ৩৮:৭৫

যে এটি আল্লাহর বিশেষ কুদরতের নিদর্শন এবং সাধারণ 'হও, হয়ে যা' আদেশের বাইরে সরাসরি যত্ন ও মর্যাদার সাথে সংঘটিত সৃষ্টি। সুতরাং "আল্লাহর হাত" বলতে মূলত তাঁর অগাধ শক্তি, সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও সরাসরি সৃষ্টিশীল ক্ষমতার প্রকাশকেই বুঝানো হয়েছে।

খ. বিশেষ যত্নে সরাসরি সৃষ্টি

"আল্লাহর হাত" কথাটি অনেক মুফাসসির ব্যাখ্যা করেছেন বিশেষ যত্ন ও সরাসরি সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে। আল্লাহ যখন আদম (আ.)-এর প্রসঙ্গে বলেন: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾-"আমি যাকে আমার হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি",[২৯] তখন এর দ্বারা বোঝানো হয় যে আদম (আ.)-এর সৃষ্টি ছিল অন্যান্য সৃষ্টির মতো সাধারণ 'হও, হয়ে যা' (كُن فَيَكُون) আদেশের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়নি; বরং আল্লাহ তাঁকে সরাসরি নিজ কুদরতে, বিশেষ যত্নে গঠন করেছেন। এ কারণে আদম (আ.)-কে আল্লাহর হাতে সৃষ্টি হওয়া একটি অনন্য সম্মান। ইবন কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, এখানে মানুষের মর্যাদা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি বিশেষ যত্নের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং "আল্লাহর হাত" বলতে বোঝানো হয়েছে মানুষের সৃষ্টি আল্লাহর সরাসরি মনোযোগ, যত্ন ও মহিমার সাথে সম্পন্ন একটি ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া।

গ. বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে মাটির কণার থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বাকশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে অলঙ্কৃত করেছেন। কুরআনে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি নিজের প্রতিনিধিত্ব প্রদানের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তাকে পৃথিবীতে বসবাসের জন্য সকল প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে অভিভূত করেছেন। এমনকি মানুষকে অন্যান্য জীবের উপর কর্তৃত্বের স্থান দেওয়া হয়েছে, যেমন পশুপাখি, বৃক্ষ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ। এই বিশেষ মর্যাদা শুধুমাত্র বাহ্যিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দায়িত্বও বহন করে; অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ অনুসারে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব পালন করতে হবে। এভাবে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের অধিকারী হলেও, এটি তার দায়িত্ব ও পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত, যা তার চিরস্থায়ী গন্তব্য নির্ধারণ করবে।

---

২৯ আল-কুরআন, ৩৮:৭৫

২.৩ কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানে মানবসৃষ্টি

মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়া নিয়ে কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষ্যে বিস্ময়কর মিল আছে। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে অবতীর্ণ কোরআনের এসব অভ্রান্ত বক্তব্যই প্রমাণ করে কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ।[৩০] আধুনিক বিজ্ঞানের মানবসৃষ্টি বিষয়ক আবিষ্কার যা পবিত্র কুরআনের বক্তব্যকে সমর্থন করে এমন কিছু বিষয় এখানে উপস্থাপন করা হলো।

ক. জীবকোষ ও পানি

পৃথিবীতে জীবিত সকল প্রাণই ক্ষুদ্রতম একক কোষ দ্বারা গঠিত। প্রতিটি কোষই মূলত নরম তুলতুলে ছিদ্রযুক্ত গোলাকার সদৃশ বস্তু যার চারিধার অমসৃণ কোষ পর্দার আবরণে ঘেরা এবং সুরক্ষিত। জীবনের সব প্রয়োজনীয় উপাদান একত্রে ধরে রাখাই হল কোষের মৌলিক কাজ ও বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন কোষের নানান প্রকার বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সব কোষে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। এই ভাবে কোষের গঠন ও কাজের উপর ভিত্তি করে কোষ সম্বন্ধে যে মতবাদ বা তত্ত্ব তৈরী হয় তাকে কোষ তত্ত্ব বলে। কোষ যে সজীব, প্রাণবাহী মাতৃপদার্থ নিয়ে গঠিত, তাকে প্রাণপঙ্ক (প্রোটোপ্লাজম) বলে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেছেন,

وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤْمِنُوْنَ ۝

অর্থ: 'আর প্রাণবান সব কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবু কি তারা ঈমান আনবে না?'[৩১]

আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে, সাগরের অভ্যন্তরের পানিতে জীবনের যে আদিম মূলী উপাদান রয়েছে, তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে এবং তা থেকেই সম্ভবত সকল জীবের সৃষ্টি। আবার প্রত্যেকটি জীবদেহ অসংখ্য একক কোষের দ্বারা গঠিত। আর এই সকল কোষে মূল গঠনগত উপাদান হচ্ছে পানি। এই পানিকে আবার কেউ কেউ বলে থাকেন শুক্র। আর পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মাটি থেকে (মানুষকে) সৃষ্টি করেছি।'[৩২]

খ. পানি ও মাটির সম্পর্ক

পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে বলা হয়েছে, মানবজাতিকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

الَّذِیْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ۝

যিনি সৃষ্টি করেছেন সবকিছু সুন্দরভাবে, এবং শুরু করেছেন মানুষের সৃষ্টিকে মাটি থেকে।'[৩৩]

---

৩০ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), *স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব*, প্রগুক্ত, ২০০৫

৩১ আল-কুরআন, ২১: ৩০

৩২ (خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ), আল-কুরআন, ৫৫: ১৪

আবার পানির স্পর্শে জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাছাড়া সমস্ত জীবেরই দৈহিক গঠনে, জীবনের স্পন্দনে এবং জীবন ধারণের জন্য পানি অপরিহার্য এবং এর কোন বিকল্প নেই। জীবনের স্পন্দনে পানির উপস্থিতিই যে একমাত্র পূর্বশত তা আজ একটি চরম বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই ১৪৫০ বছর পূর্বেই ঐশী গ্রন্থ আল-কোরআনে পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির বিষয়ে এই মৌলিক বৈজ্ঞানিক তথ্যটি সংক্ষেপে অথচ কত নিখুত ভাবেই না ব্যক্ত করা হয়েছে- আল-কুর'আনে-

অর্থ:- যারা অবিশ্বাস করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?[৩৪]

অর্থ:- আল্লাহ্ সকল প্রকার প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে।[৩৫]

পবিত্র কুর'আনের অন্যত্র মহান আল্লাহ আরও বলেন, অর্থ:- আল্লাহ্ সকল প্রকার প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কতক বুকে ভয় দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।[৩৬] আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখা গেছে, মাটির অনেক উপাদান মানবদেহে বিদ্যমান। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, সালফারসহ মাটির প্রায় ২৬টি উপাদান মানুষের শরীরে পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে, 'আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।'[৩৭]

গ. মাতৃগর্ভের ধারাবাহিক স্তর

পূর্বে বিজ্ঞানের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন না হওয়ায় মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর সম্বন্ধে কু-র'আনের যে সকল আয়াত রয়েছে , পূর্ববর্তী মুফাসসীর গণের পক্ষে তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। দিন দিন যতই বিজ্ঞান আধুনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভ্রূণ বিদ্যা আলোচনা করতে পারছে, কু-রআনের আয়াতের মর্মার্থও ততোটাই মানুষের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। মাতৃগর্ভে সন্তান গঠনের চক্র সাধার-ণত দীর্ঘ ২৮০ দিন হয়, যা ৪০ দিন অন্তর সুনির্দিষ্ট সাতটি চক্রে বিভক্ত।[৩৮] পবিত্র কোরআনে সাতটি স্তর এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'আমরা মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আঁধারে (জরায়ুতে) স্থাপন করেছি। এরপর শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে

---

৩৩ আল-কুরআন, ৩২: ৭

৩৪ (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ), আল-কুরআন, ২১ : ৩০

৩৫ (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ), আল-কুরআন, ২১:৩০

৩৬ (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ), আল-কুরআন, ২৪: ৪৫

৩৭ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ), আল-কুরআন, ২৩: ১২

৩৮ মুহাম্মদ আবু তালেব, *বিজ্ঞানময় কোরআন*, আরজু পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ. ১৪২

সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে গোশত দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুনরূপে করেছি।'[৩৯]

আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্যও অনুরূপ। তা হলো, নারী-পুরুষের যৌন মিলনের সময় নারীর ডিম্বনালির ফানেলের মতো অংশে ডিম্বাণু নেমে আসে। ওই সময় পুরুষের নিক্ষিপ্ত বীর্যের শুক্রাণু জরায়ু বেয়ে ওপরে উঠে আসে এবং তা ডিম্বনালিতে প্রবেশ করে। এভাবে নারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত (Fertilization) হয় এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুটি জরায়ুতে নেমে প্রোথিত (Embedded) হয়। এখানেও রয়েছে সাতটি স্তর। যেমন: মৃত্তিকার সারাংশ তথা প্রোটোপ্লাজম, বীর্য বা শুক্রকীট, জমাট রক্ত, মাংসপিন্ড, অস্থিমজ্জা, অস্থি পরিবেষ্টনকারী মাংস এবং সবশেষে রূহ সঞ্চারণ (মুমিনূন ২৩/১২-১৪; মুমিন ৪০/৬৭; ফুরক্বান ২৫/৪৪; তারেক্ব ৮৬/৫-৭)।[৪০] মাতৃগর্ভের তিন তিনটি গাঢ় অন্ধকার পর্দার অন্তরালে এইভাবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে বেড়ে ওঠা প্রথমত: একটি পূর্ণ জীবন সত্তার সৃষ্টি, অতঃপর একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবান শিশু হিসাবে দুনিয়াতে জন্ম নেয়া কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার! এটা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই অনন্য-অকল্পনীয় সৃষ্টিকর্ম এর স্রষ্টা কে? আবার মাতৃগর্ভের ঐ অন্ধকার গৃহে মানবশিশুর বিকাশ লাভ সৃষ্টির সেই মহান কারিগর কে? কে সেই মহান স্থপতি, যিনি ঐ গোপন কুঠরীতে পিতার ২৩ জোড়া ক্রোমোজমের সাথে ও মাতার ২৩ জোড়া ক্রোমোজম একত্রিত করে সংমিশ্রিত বীর্য প্রস্তুত করেন? কে সেই মহান শিল্পী, যিনি রক্তপিণ্ড আকারের জীবনের ছোট্ট টুকরাটিকে মাতৃগর্ভে পুষ্ট করেন? অতঃপর ১২০ দিন পরে তাতে রূহ সঞ্চার করে তাকে জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করেন এবং পূর্ণ-পরিণত হওয়ার পরে সেখান থেকে বাইরে ঠেলে দেন।[৪১] এরপর এই নারী ও পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণ ঘুরতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এর চতুর্দিকে একটি বিশেষ আবরণের সৃষ্টি হয়। যাতে করে ভ্রূণটি ধ্বংস হতে না পারে।

এরপর আস্তে আস্তে একবিন্দু রক্তকণায় পরিণত হয় এবং সেই রক্তকণা গোশতপিণ্ডে ও অস্থিমজ্জায় পরিণত হয়, এভাবেই সৃষ্টি হয় মানবশিশু।[৪২]

ঘ. মাতৃগর্ভের পরিবেশ

গর্ভধারণের প্রথম দিন থেকেই ভ্রূণের সেলগুলি দ্রুত বিভক্ত হয়ে বিকাশ শুরু করে। প্রথম তিন মাসে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হৃদয়, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো গঠন হয়। এরপরের মাসগুলোতে শিশুর বৃদ্ধি, পেশী ও হাড়ের শক্তি বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ হয়। এই সময়ে

---

৩৯ আল-কুর'আন, ২৩: ১২-১৪

৪০ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), *স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, ২০০৫.পৃ. ৪৭

৪১ (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ), আল-কুর'আন, ৮০:১৮-২০

৪২ মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *বিজ্ঞান না কোরআন*, ঢাকা: মম পকাশ, ২০২২ খ্রি., পৃ. ২২৫

শিশুর স্বাস্থ্য ও বিকাশ মা এবং পরিবেশের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সঠিক পুষ্টি, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং মানসিক শান্তি শিশুর সুস্থ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া মাতৃগর্ভে শিশুর নার্ভাস সিস্টেম এমনভাবে গড়ে ওঠে যে তিনি স্পর্শ, শব্দ ও আলোকে অনুভব করতে সক্ষম হয়, যা জন্মের আগেই তার শেখার ও প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে। বিজ্ঞান প্রমাণ করে, গর্ভকাল শুধু শারীরিক বিকাশের সময় নয়, বরং শিশুর মানসিক ও স্নায়বিক বিকাশের প্রাথমিক মঞ্চও। নিষেক নারীদেহে সংঘটিত হয়, এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিষেকের পরই কেবল মানব জীবনের অস্তিত্ব বা গর্ভসঞ্চার আরম্ভপর হয়। আর এই গর্ভসঞ্চারের পর থেকে প্রসবের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মোট সময়কে গর্ভকাল বলে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে গর্ভকালে ভ্রূণের বিকাশ বা বৃদ্ধি খুব দ্রুত গতিতে হতে থাকে। সাধারণত স্বাভাবিক নিয়মে ২৮০দিন/৪০ সপ্তাহ/৯মাস ৭দিন পর্যন্ত ভ্রূণ মায়ের গর্ভে থাকে। ভ্রূণের বিকাশকে ভিত্তি করে গর্ভকালীন সময়কে ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যেমন:

১। অঙ্কুরিত কাল (Period of the Zygote): জাইগোট সৃষ্টির মূহূর্তে থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত,

২। ভ্রূণকাল (Pariod of the Embryo): দুই সপ্তাহ পর থেকে ২ মাস পর্যন্ত এবং

৩। ভ্রূণ সমাপ্তিকাল (Period of the Foetus): ২ মাস থেকে জন্ম মুহূর্ত পর্যন্ত

মাতৃগর্ভে আল্লাহ শিশুর পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন এবং তাকে রক্ষা করেছেন। শিশুরা মাতৃগর্ভে তিনটি পর্দা বা আবরণীর অন্তরালে অবস্থান করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে। একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে।'[৪৩] আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও তিন স্তরের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছে যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো- ১. রেহেম, ২. মাশিমা বা গর্ভফুল এবং ৩. মায়ের পেট। অর্থাৎ মানব ভ্রূণ এই ৩টি বিশেষ ঝিল্লি দিয়ে বেষ্টিত থাকে।[৪৪]

এই আবরণীগুলো ভ্রূণদেহের চতুর্দিকে ভ্রূণের আনুষঙ্গিক গঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ঘিরে রাখে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বর্জিত হয়। আবরণীগুলো হচ্ছে–

ক) অ্যামনিওন (Amnion): একটি পর্দা গর্ভবতী মায়ের জরায়ু থেকে ভ্রূণকে সম্পূর্ণ আবৃত করে রাখে। এ পর্দাকে অ্যামনিওন পর্দা বলে। অ্যামনিওটিক ফ্লুইড নামক একটি তরল পদার্থ দিয়ে এ পর্দা পূর্ণ থাকে।

খ) কোরিওন (Chorion): বহিস্থ আবরণী পর্দা- পুষ্টি সরবরাহ, প্লাসেন্টা গঠনে অংশগ্রহণ করে।

---

৪৩ (يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ), আল-কুরআন, ৩৯: ৬

৪৪ ড. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান*, আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ (অনুবাদক), ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০২৪ খ্রি. পৃ. ২৭৭

গ) অ্যালানটয়েস (Allantois): কোরিওনের নিচে বিন্যস্ত পর্দা। এতে রক্তবাহিকা ও জালিকা থাকে। ভ্রূণের শ্বসন, রেচন ও প্লাসেন্টা গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। রেহেমে ভ্রূণ রক্তপিণ্ড ছাড়া কিছুই নয়, এ সময়ে সন্তানের আকার-আকৃতি কিছুই তৈরি হয় না। আর গর্ভফুল (Placenta) ভ্রূণ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, প্রতিরোধ ইত্যাদিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে।

ঙ. শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ

শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ সৃষ্টি কর্তার পক্ষ থেকে আর একটি বিশেষ সৃষ্টি রহস্য, যেখানে বিজ্ঞান পুরোপুরি নীরব। মহান আল্লাহ বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদের পুত্র-কন্যা উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।'[৪৫] রাসুলুল্লাহ (স.) আল-কুরআনের ব্যাখ্যায় বলেন, 'পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করলে পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। আবার স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করলে কন্যাসন্তান জন্ম নেয়।'[৪৬]

আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে এই ভ্রূণের এই ধরণের বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করেছেন। জরায়ুতে যদি কন্যা ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, তাহলে কর্টিক্স কম্পোন্যান্টগুলো (Cortics Componant) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং মেডুলার কম্পোন্যান্টগুলো (Medullar Componant) ধীরে ধীরে কমতে থাকে। পক্ষান্তরে জরায়ুতে যদি পুত্র ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, তাহলে কর্টিক্স কম্পোন্যান্টগুলো (Cortics Componant) কমতে থাকে এবং মেডুলার কম্পোন্যান্টগুলো (Medullar Componant) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে রক্ষিত ডিম্বকোষে প্রবেশ করার পর উভয়ের সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, পুরুষের একবার নির্গত হওয়া লক্ষমান বীর্যে থাকে লক্ষ-কোটি শুক্রাণু। আল্লাহর হুকুমে সাধারণত তন্মধ্যকার একটি মাত্র শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই শুক্রকীট পুরুষ ক্রোমোজম Y অথবা স্ত্রী ক্রোমোজম X হয়ে থাকে। এর মধ্যে যেটি স্ত্রীর ডিম্বের X ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয়, সেভাবেই পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আল্লাহর হুকুমে। গর্ভাবস্থার ৬-৭ সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের প্রাথমিক লিঙ্গ অঙ্গের (genital tubercle) বিকাশ শুরু হয়। ১১-১৪ সপ্তাহে আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে লিঙ্গ শনাক্ত করা সম্ভব হলেও, ভ্রূণের অবস্থান, মায়ের শরীরের বৈশিষ্ট্য এবং যন্ত্রের স্পষ্টতা অনুসারে সঠিকতার হার প্রায় ৯০-৯৫% পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও, কিছু জেনেটিক বা হরমোনজনিত অবস্থার কারণে লিঙ্গ নির্ধারণে ব্যতিক্রমও হতে পারে। বৈজ্ঞানিক

---

৪৫ (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ), আল-কুর'আন, ৪২: ৪৯-৫০

৪৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অধ্যায় কিতাবুল তাকদীর, কুতুবখানা রশীদিয়া, দিল্লী, ১৪০৯ হিজরি, হাদীস নং ৬৫৯৪

গবেষণায় দেখা গেছে, Y ক্রোমোসোমের উপস্থিতি মূলত টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাধ্যমে পুরুষ লিঙ্গ অঙ্গের বিকাশকে উদ্দীপ্ত করে, যা ভ্রূণের জন্মের পূর্বে দৃশ্যমান হয়। এভাবেই মাতৃগর্ভে শিশুর বিকাশ ঘটে। একসময়ে পরিপূর্ণ মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় মানব জাতির বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা চলমান রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে মাটি থেকে সরাসরি আদমকে, অতঃপর আদম (আ.) থেকে তার স্ত্রী হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করার পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ আদম সন্তানদের মাধ্যমে বনু আদমের বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিক ব্যবস্থা করেছেন। পুরুষ ও নারীর সংমিশ্রিত বীর্যে যে সন্তান জন্ম লাভ হয় এই তথ্য পবিত্র কুরআনই সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছে (দাহর ৭৬/২)। আধুনিক বিজ্ঞান এ তথ্য জানতে পেরেছে মাত্র ১৮৭৫ সালে ও ১৯১২ সালে। তার পূর্বে এরিস্টটল সহ পূর্বের সকল বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, পুরুষের বীর্যের আসলে কোন কার্যকারিতাই নেই। রাসূলের হাদীছ বিজ্ঞানীদের এই মতকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করে দিয়েছে।[৪৭] কেননা সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সন্তান প্রজননে পুরুষ ও নারী উভয়ের বীর্য সমানভাবে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর।যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, 'একদিন আনাস (রা.)-এর মা উম্মে সুলায়েম (রা.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ সত্য বলায় লজ্জা পান না। নারীদের স্বপ্নদোষ হলে তাদের গোসল আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন সে পানি দেখে। এতে উম্মে সালামাহ লজ্জায় মুখ ঢাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, নারীর কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন, তোমার ডান হাত ধূলি ধূসরিত হৌক! না হ'লে তার সন্তান তার চেহারার সদৃশ কিভাবে হয়?' ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় বর্ধিতভাবে এসেছে, 'পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রীর বীর্য পাতলা ও হলদে। উল্লেখ্য যে, মাতৃগর্ভে বীর্য প্রথম ৬ দিন কেবল বুদ্বুদ আকারে থাকে। তারপর তা জরায়ুতে সম্পর্কিত হয়। আর একটি বিষয় হলো তিন মাসের আগে সন্তান ছেলে বা মেয়ে সন্তান চিহ্নিত হয় না। চার মাস পর রূহ সঞ্চারিত হয়ে বাচ্চা নড়েচড়ে ওঠে এবং আঙ্গুল চুষতে থাকে, যাতে করে ভূমিষ্ট হওয়ার পরে মায়ের স্তন চুষতে তার কোন অসুবিধা না হয়। এ সময় সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তার কপালে চারটি বস্তু লিখে দেওয়া হয়। তার আজাল (হায়াত), আমল, রিযিক এবং সে ভাগ্যবান না দুর্ভাগা।এভাবেই জগত সংসারে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। কেবল আল্লাহর হুকুম ব্যতীত এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। একারণেই আল্লাহ অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী'। 'সে আমাদের সম্পর্কে নানারূপ

৪৭ মাহমুদুল হাসান নিজামী, *সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান*, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৮ খ্রি., পৃ.৪৫

দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়, আর বলে যে, কে জীবিত করবে এসব হাড়গোড় সমূহকে, যখন সেগুলো পচে গলে যাবে?[৪৮]

উভয়ের মধ্যে (আল্লাহর হুকুমে) যেটি জয়ী হয় অথবা গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে সন্তান তার সদৃশ হয়'। মহান আল্লাহ নিজ ইচ্ছা ও অনুগ্রহে মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। দুনিয়াতে মানুষের আগমন ও জীবনের লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন তথা তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করা।[৪৯]মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করা। আর এই ইবাদত হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে ও মতে সমগ্র মনব জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহ নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনাই হলো মূলত মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর এই নির্দেশ পালনের বাস্তব আমল হলো ইবাদত। মানুষ যখন পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ পালন করে ইবাদত করতে ব্যর্থ হয়; তখন বুঝতে হবে আল্লাহর বান্দা হিসেবে দুনিয়াতে প্রতিটি মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। 'ইবাদত' শব্দটি এসেছে 'আবদ' শব্দ হতে। আর 'আবদ' অর্থ হলো দাস বা গোলাম। সুতরাং 'ইবাদত' মানে হলো-আল্লাহর গোলামি বা বন্দেগি করা। আর দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহর তা যথাযথ করবে, ওই ব্যক্তিই সফলকাম।

২.৪ বিজ্ঞানের আলোকে মানব শরীরের উপাদান

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে মানব শরীরের গঠন ঠিক সেই উপাদান দিয়েই, যা মাটির ভিতরে পাওয়া যায়।

মানুষের শরীর প্রায় ৬০-৭০% পানি দিয়ে গঠিত। মানবদেহ প্রধানত পানি ও বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত। বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী, মানুষের শরীরের ওজনের প্রায় ৯৬% মাত্র চারটি মৌল দিয়ে গঠিত: অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন। শরীরে যে প্রধান রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, সেগুলো হলো:

উপাদান	মানব শরীরে শতকরা ভাগ	পৃথিবীর মাটিতে উপস্থিতি	ভূমিকা	রেফারেন্স
অক্সিজেন (O_2)	৬৫%	মাটি ও পানিতে প্রচুর	পানি, কোষীয় শ্বাসক্রিয়া, শক্তি উৎপাদন	Alberts, *Molecular Biology of the Cell*, 6th ed.
কার্বন (C)	১৮%	জৈব পদার্থে বিদ্যমান	প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, উঘঅ জঘঅ-এর মূল উপাদান	Nelson & Cox, *Lehninger Principles of Biochemistry*
হাইড্রোজেন (H)	১০%	পানি ও জৈব পদার্থে	পানি ও জৈব যৌগের অংশ	tortora & Derrickson, *Principles of Anatomy & Physiology*
নাইট্রোজেন (N)	৩%	মাটির জৈব উপাদানে	অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডে অপরিহার্য	Berg et al., *Biochemistry*

৪৮ (عَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۚ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌۚ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ), আল-কুর'আন,৩৬:৭৭-৭৮

৪৯ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, প্রাগুক্ত,পৃ.৬৫

ক্যালসিয়াম (Ca)	১.৫%	মাটির খনিজে	হাড় ও দাঁতের গঠন, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম	Guyton & Hall, *Textbook of Medical Physiology*
ফসফরাস (P)	১%	মাটির খনিজ ও জীবাশ্মে	হাড়, DNA–RNA, ATP উৎপাদনে অপরিহার্য	Campbell Biology, 11th ed.
সোডিয়াম(Na)	.১৫%	মাটির লবণ ও খনিজে	রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, স্নায়ু ও পেশীর কাজ	Hall, *Guyton & Hall Physiology*
পটাশিয়াম(k)	.২৫%	মাটির খনিজে	স্নায়ু সংকেত পরিবহন, কোষীয় তরল ভারসাম্য	Lehninger Biochemistry
গালফার(S)	.২৫%	মাটির খনিজে	কিছু অ্যামিনো এসিড ও প্রোটিনে বিদ্যমান	Tortora & Derrickson
আয়রন (Fe)	.০০৬-.০১%	মাটির খনিজ ও লোহার খনিজে	হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিনের অংশ, অক্সিজেন পরিবহন, এনজাইম ফাংশন	Hall, *Guyton & Hall Physiology*, 14th ed.; Nelson & Cox, *Lehninger Principles of Biochemistry*
ম্যাগনেসিয়াম(Mg)	.০৫%	মাটির খনিজে	এনজাইমের কোফ্যাক্টর, উঘঅ স্থিতিশীলতা	Nelson & Cox
ক্লোরিন (Cl)	.১৫%	মাটির লবণ ও খনিজে	রক্তে অম্ল-ক্ষার ভারসাম্য	Campbell Biology

মানব শরীরে প্রধান রাসায়নিক উপাদানসমূহ

মানুষের শরীরের সুষ্ঠু কার্যকারণের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান অপরিহার্য। এই উপাদানগুলো প্রধানত খনিজ, ভিটামিন, পানি এবং অণুজীবগত মৌলিক পদার্থের আকারে শরীরে বিদ্যমান। পানি মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা কোষের ভেতরে এবং বাইরে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, পুষ্টি পরিবহন, তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণের জন্য অপরিহার্য। খনিজ যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রন বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁতের গঠন এবং পেশীর সংকোচনে সাহায্য করে, পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম স্নায়ু সংকেত ও শরীরের জলবস্তু ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

ভিটামিনগুলো শরীরের বিপাক ক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ নেয়। উদাহরণস্বরূপ, ভিটামিন উ ক্যালসিয়ামের শোষণ বৃদ্ধি করে, ভিটামিন C কোষের মেরামত ও রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং লিপিড শরীরের প্রধান রাসায়নিক উৎস হিসেবে শক্তি সরবরাহ করে, কোষের গঠন উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং হরমোন, এঞ্জাইম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যৌগের উৎপাদনে সহায়ক। এছাড়া বিভিন্ন ট্রেস উপাদান যেমন জিঙ্ক, সেলেনিয়াম ও আয়োডিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ, থাইরয়েড হরমোনের কার্যকারিতা এবং এন্টিঅক্সিডেন্ট সিস্টেমের জন্য অপরিহার্য।

বিজ্ঞান প্রমাণ করে, এই রাসায়নিক উপাদানগুলো সরবরাহ না হলে শরীরের বিপাক, কোষীয় কার্যকারিতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত হয়। তাই মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শক্তি, শারীরিক কার্যকারিতা এবং রোগমুক্তি নিশ্চিত করতে এই রাসায়নিক উপাদানগুলোর যথাযথ পরিমাণে উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত মানব সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস থেকে জানা যায় এর বিশেষত্বের কথা। মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা মানব জাতির সৃষ্টি ও তার জীবনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে মহান আল্লাহপাক আল কোরআনে বলছেন,

১. "তিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার পশু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ"?[৫০]

অর্থাৎ, মানুষের শুরু হয়েছে হযরত আদম (আ.) থেকে, যাকে আল্লাহ তাআলা তার বিশেষ কুদরতের সাহায্যে মাটি থেকে তৈরী করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকেছিলেন। তারপর তার সঙ্গিনী হযরত হাওয়া (আ.) কে আদম (আ.)-এর বামপার্শ্বের অস্থি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটাও আল্লাহ তাআলার কুদরতের বড় কৃতিত্ব। কারণ হাওয়া ছাড়া কোন নারীর সৃষ্টি কোন পুরুষের অস্থি থেকে হয়নি। ফলে হাওয়ার সৃষ্টি সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত এবং আল্লাহর মহাশক্তির একটি নিদর্শন। এ আয়াতে আল-আন'আম বলতে গবাদি পশু বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে আট জোড়া, কারণ- গবাদি পশু অর্থ উট, গরু, ভেড়া, বকরী। এ চারটি নর ও চারটি মাদি মিলে মোট আটটি নর ও মাদি হয়। (তাবারী, কুরতুবী)। অবলম্বন কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন"।[৫১] এ আয়াতে এক ব্যক্তি বলতে মানবকুলের পিতা আদম (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আদম (আ.) থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। আদম (আ.) থেকে হাওয়াকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হাওয়া পুরুষ অর্থাৎ, আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে। অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, "নারীদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তবে তার মধ্যে বক্রতা অবশিষ্ট থাকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে পারবে"।[৫২]

২. মানব জাতির সৃষ্টি ও তার জীবনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে মহান আল্লাহপাক আল কুর'আনে আরো বলছেন, " তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে এনেছেন শিশুরূপে, তারপর যেন তোমরা

---

৫০ (خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ), আল-কুর'আন, ৩৯: ৬

৫১ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا), আল-কুর'আন, ৪: ১

৫২ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: আম্বিয়া কিরাম, পরিচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হাদীস নং ৩৩৩১

তোমাদের যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা যায়। আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যাতে তোমরা অনুধাবন কর।"[৫৩]

অর্থাৎ,আমাদের আদি পিতা ও প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর মানব বংশের ধারা এবং তার স্থায়িত্ব ও বিদ্যমানতার জন্য মানুষের সৃষ্টিকে বীর্যের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এখন প্রত্যেক মানুষ সেই বীর্য বা শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়, যা বাপের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে মায়ের গর্ভাশয়ে গিয়ে স্থির হয়। মায়ের গর্ভাশয়ে বিভিন্ন দশা ও অবস্থাকে অতিক্রম করে (পেট থেকে) বের হয়ে আসার পূর্বেই কেউ মায়ের পেটে, কেউ শিশুকালে, কেউ যৌবনকালে এবং কেউ বার্ধক্যের শুরুতই মারা যায়। আমরা এই পর্যায়সমূহ ও স্তরগুলোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখব যে, বীর্য থেকে জমাট রক্ত, অতঃপর তা হতে গোশতপিণ্ড, তারপর শৈশব, তারপর যৌবন, তারপর বার্ধক্যের প্রারম্ভিক এবং পরে সম্পূর্ণ বার্ধক্য, তখন আমরা বুঝতে চাইলে বুঝতে পারব যে যে, আমাদেও প্রতিপালক এক ও একক এবং আমাদের উপাস্যও একক, তাঁর কোন শরীক নেই।[৫৪]

এ ছাড়া আরও জেনে যাব যে, তিনি অবশ্যই সকলকে পুনর্জীবিত করবেন। যে আল্লাহ মানুষ সহ এ দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জন্য কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে পুনরায় জীবিত করাও কোন জটিল ব্যাপার নয়।

৩. মানব জাতির সৃষ্টি ও তার জীবনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ আল কুরআনে আরো বলছেন,"আমরা মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে (জরায়ুতে) স্থাপন করেছি। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে, অতঃপররক্তপিণ্ডকে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে এবং গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশত দ্বারা, অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান" ![৫৫]

আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয়– বীর্য, তৃতীয়– জমাট রক্ত, চতুর্থ - মাংসপিণ্ড, পঞ্চম - অস্থি-পিঞ্জর, ষষ্ঠ - অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম - সৃষ্টিটির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারকরণ। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এ শেষোক্ত স্তরকে এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করে বলেছেন,"তারপর আমরা তাকে এক বিশেষ

---

৫৩ (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ),আল-কুর'আন, ৪০:৬৭

৫৪ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র.), *তাফসীরে ইবনে কাছীর*,অনূ. অধ্যাপক আখতার ফারুক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খ.৭, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ৫২৪

৫৫ আল-কুর'আন, ২৩: ১২-১৪

ধরনের সৃষ্টি দান করেছি"। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তরে সে পূর্ণত্ব লাভ করেনি। শেষ স্তরে এসে সে সম্পূর্ণ এক মানুষে পরিণত হয়েছে। এ কথাই বিভিন্ন তাফসীরকারকগণ বলেছেন। তারা বলেন, এ স্তরে এসে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রূহ সঞ্চার করিয়েছন।[৫৬] কোন কোন মুফাস্সির বলেন,"তারপর আমরা তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি"। এর অর্থ তাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে গেছি। প্রথমে শিশু, তারপর ছোট, তারপর কৈশোর, তারপর যুবক, তারপর পূর্ণবয়স্ক, তারপর বৃদ্ধ, তারপর অতি বয়স্ক। বস্তুত দুটি অর্থের মধ্যে বিরোধ নেই। কারণ, রূহ ফুঁকে দেয়ার পর এসবই সংঘটিত হয়।[৫৭]

৪. মানব প্রজাতির শুরু হয়েছে হযরত আদম (আ.) থেকে এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপর থেকে পরবর্তী পর্যায়ে শুক্র থেকেই মানব বংশের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে এবং চলে আসছে। এ ব্যাপারে যারা সন্দেহ পোষণ করন তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ আল কুরআনে বলছেন, "হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ-) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু দেয়া হয় এ বয়সেই, আবার কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানে।"[৫৮]

এ আয়াতটিকে আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের উপর প্রথম প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। প্রথম সৃষ্টি যার পক্ষে করা সম্ভব তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় সৃষ্টি কিভাবে কঠিন হবে? প্রথম সৃষ্টিই প্রমাণ করছে যে, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

২.৪ রূহ বা আত্মার ধারণা

মানব দেহে রূহ আছে একথা কুরআন হাদীছের অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে দেহের মাঝে কোথায় রূহ অবস্থান করে, তার গঠন কেমন, তার প্রকৃতি কেমন ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে যতদিন রূহ থাকে আমরা ততদিন-ই বেঁচে থাকি এ-

---

৫৬ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, ২০১৭ খ্রি.,পৃ. ৫২৮

৫৭ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৭, ২০১৭ খ্রি. ,পৃ. ৫৩০

৫৮ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا), আল-কুর'আন, ২২: ৫

ধরায়। যেদিন রূহ আল্লাহর আদেশে আমাদের দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, সেদিনই আমরা নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে পড়ি। পবিত্র কুরআনে "রূহ" শব্দটি মোট ২৩ বার এসেছে। রূহ সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে, তবে এর প্রকৃত রূপ আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। রূহ হলো মানুষের মধ্যে আল্লাহপ্রদত্ত এক বিশেষ সত্তা, যা জীবন ও চেতনাশক্তির মূল উৎস। রূহ দৃশ্যমান নয়, তবে এর প্রভাব মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও আচার-আচরণে প্রকাশিত হয়। ইসলামী দার্শনিক ও সুফি চিন্তায় রূহকে আল্লাহর এক গোপন আমানত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা মানুষকে আল্লাহর দিকে টানে এবং ইহজাগতিক জীবন ও আখেরাতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। তাই রূহ মানুষের আসল পরিচয় ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রবিন্দু।

২.৪.১ আল-কুরআনের আলোকে রূহ

রূহ' শব্দটি আরবি ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, যার বাংলা অর্থ আত্মা বা প্রাণশক্তি। এটি একটি অদৃশ্য সত্তা যা মানুষের দেহ থেকে পৃথক এবং জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। রূহের ধারণাটি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিতে আলোচিত বিষয়। ইয়াহূদীদের নানান প্ররোচনার এক পর্যায়ে মক্কার কুরায়েশরা যখন মানব রূহের হাকীকাত সম্পর্কে মহানবী (সা.) কে প্রশ্ন করল, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ সম্পর্কে জবাব দেওয়া হল। মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.) কে জানিয়ে দিলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۖ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

(হে রসূল স.)'আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন-রূহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের আদেশ। এ বিষয়ে তোমাদের সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।'[৫৯] উপরোক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, রূহ এর স্বরূপ সম্পর্কে আসলে কেউই পুরোপুরি অবহিত নয়। কেননা আল-কুরআনে রূহ সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তার চাইতে অধিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা কাউকে প্রদান করেননি। তা সত্ত্বেও আলিমগণ রূহ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।[৬০] হাদিসের আলোকে মুমিনদের রূহ মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে। বিপরীতে কাফেরদের রূহ থাকে সিজ্জিনে। যেখানে তাদের রাখা হয় বন্দী অবস্থায়। তারা আজাবের কষ্ট অনুভব করতে থাকে। মুসনাদে আহমদে এমন একটি হাদিস রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন, 'তাকে (কাফেরের রূহকে) সিজ্জিনে পৌঁছিয়ে দাও।'

---

৫৯ আল-কুর'আন, ১৭: ৮৫

৬০ এম. শমসের আলী ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৫৬

২.৪.২ ইসলামী চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিতে রূহ

রূহ হলো অনুভূতি এবং চেতনার মূল। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'মন'কে আত্মা বলা হয়। বুৎপত্তিগত অর্থে যা পূর্ব অভিজ্ঞতায় স্মরণ রাখতে পারে তাই হলো 'আত্মা'। আত্মা সম্পর্কে দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণের যা কিছু বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ অনেকটা নিম্নরূপ-

প্রাণিকুলের খাদ্য গ্রহণের পর বিভিন্ন পর্যায়ে পরিপাক ও হযম হওয়ার মাধ্যমে হৃদপিন্ডে এক প্রকার সূক্ষ্ম তাপের সঞ্চার হয়। বস্তুত এটিই প্রাণের উৎস হয়ে প্রাণিদেহকে জীবন্ত রাখে। আর এটিই হচ্ছে রূহ বা আত্মা। এ ছাড়া অন্য কোন বস্তু নেই যাকে রূহ বা আত্মা নামে আখ্যায়িত করা যায়। প্রাণিদের এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যায় ঠিক তখনই তার মৃত্যু হয়।[৬১]

আর তখনই বলা হয় 'অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে বা অমুকের দেহে আর রূহ অবশিষ্ট নেই'। পিথাগোরাসের অনুসারীদের মতে, দেহের মৌলিক উপাদানসমূহের সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট অবস্থাকে আত্মা বলা হয়, যেমন কতগুলো তারের সংযোজিত বিশেষ অবস্থাকে গিটার বলা হয়। আত্মা বা রূহের বিষয়টি দর্শনের আলোচ্য বিষয় হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে কেবল মানব দেহ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয় । উল্লেখ্য যে, প্রাচীন দার্শনিক ও বর্তমান যুগের আত্মা বিশেষজ্ঞরাও আত্মা সম্পর্কে চিকিৎসকদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, জীবাত্মা ছাড়াও নফস বা রূহ নামে আরেকটি পৃথক সত্ত্বা বা জিনিস আছে। তাদের ভাষায় 'মানবদেহে বস্তুগত ও অনুভূত অংশ ছাড়া আরেকটি পৃথক উপাদান বা শক্তি রয়েছে যা বস্তুগত উপাদানের চাপে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে বটে, তবে রিয়াজাত, মুজাহাদা বা অন্য কোন পন্থায় কিংবা নিন্দ্রার অবস্থায় যখন নিদ্রায় শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখন তা সজীব হয়ে উঠে এবং মানুষ তখন ঊর্ধ্ব জগতের রহস্যাবলি সম্পর্কে অবগত হয় এবং অন্যের কাছে তা প্রকাশ করে।[৬২]

কেউ কেউ বলেছেন, মানবদেহে যে প্রবাহমান রক্ত আছে সেই রক্ত হলো 'রূহ' বা আত্মা। এবার জেনে নিতে পারি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীরা 'রূহ' বা আত্মাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আত্মা এমন বিষয় যার মাধ্যমে মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। যা মানুষের ভেতর হতে বের হয়ে গেলে মানুষ মারা যাবে।" বিশ্বখ্যাত গবেষক আল-ফারাবীর মতে "আত্মা হলো এমন বস্তু যার ওপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল।" যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাযালী বলেন, "আত্মা হলো মানুষের দেহ সংশ্লিষ্ট এবং দেহোত্তীর্ণ আধ্যাত্মিক সত্তা।[৬৩]

---

৬১ ইমাম আল গাযালী (রহ.), *সৃষ্টির রহস্য*, প্রাগুক্ত, ২০১১ খ্রি.,পৃ.২৬

৬২ *كتاب الروح لابن قيم الجوزية*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٧م ،ابن قيم ابن الجوزية

৬৩ মাহমুদুল হাসান নিজামী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

মনীষীদের সারকথা হলো "আত্মা এমন এক বিষয় যা চিরন্তন, অমর, অবিনশ্বর, অদৃশ্য এবং সর্বত্র বিরাজমান এবং যা মানুষের প্রাণশক্তিকে সঞ্চারিত করে।" ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নফস বা আত্মাকে তিনটি শিরোনামে আখ্যায়িত তথা ভাগ করা হয়েছে। যথা- লাওয়ামা, আম্মারা এবং মুতমাইন্না। অবশ্য পবিত্র আল কোরআনেও এ তিন প্রকারের কথা উল্লেখ হয়েছে। ইসলামিক স্কলারগণ নফস বা আত্মার উল্লিখিত তিন প্রকারের সম্পূরক তিনটি স্তরও উদ্ধৃত করেছেন। ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ রূহ বা আত্মা সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, - প্রকৃত পক্ষে আত্মা হল একটি সূক্ষ্ম উপাদান যা প্রাণিদেহে ছড়িয়ে আছে, দেহ হল তার কাঠামো।[৬৪] এটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং দেহকে সম্বল করেই সকল কাজ সমাধা করে। বস্তুত এটাই হল আত্মার বৈশিষ্ট্য অন্যভাবে বললে কথাটি এভাবে বলা যায়- রূহ বা আত্মা হল একটি সূক্ষ্ম জিনিস যা দেহ-পিঞ্জরে অবস্থান করে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এর উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে যে, রূহ বা আত্মা হল আরোহী, আর দেহ হল তার বাহন। সারকথা উপরোক্ত মণীষীদের মতে, আত্মা হল একটা পৃথক দেহ যার অবস্থানস্থল হল স্থূল দেহে। তাঁদের মতে, আমরা একটি মানুষকে কখনো শিশু, কখনো যুবক, আবার কখনো বৃদ্ধ হিসাবে দেখি। কিন্তু অবস্থার এই পরিবর্তন সত্ত্বেও সে পূর্বে যে মানুষ ছিল পরেও সে একই মানুষই থেকে যায়। অতএব রূহ বা আত্মা যদি কেবল সেই জীবন উৎসের নাম হত, যা হৃদপিন্ডে সূক্ষ্ম তাপ সঞ্চারের ফলে অস্তিত্বে আসে কিংবা সেই অবস্থার নাম হত যা উপাদানসমূহের সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট, তা হলে কর্ম ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি নতুন মানুষে পরিণত হত। কিন্তু যেহেতু এরূপ হয় না বরং কর্ম, অবস্থা ও গুণাবলির পরিবর্তন সত্ত্বেও মানুষ মানুষই থাকে, তাই একথা অবশ্যই বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ এ সকল ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনের নাম নয়, বরং সে হল এমন একটি পৃথক সূক্ষ্মদেহ যা বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য তথা সকল অবস্থায়ই অপরিবর্তনীয় থাকে এবং দেহের যাবতীয় পরিবর্তনের প্রভাবকে গ্রহণ করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। এই সূক্ষ্ম বস্তুটিই আত্মা বা রূহ। দেহের মৃত্যু ঘটলেও এর মৃত্যু হয় না। বরং নিজের কর্ম ও বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মানজনক বা অপমানজনক অবস্থান লাভ করে থাকে। আল্লামা রুমী আত্মা সম্পর্কে বলেছেন, প্রাণ বা আত্মা তারই নাম যা ভাল মন্দ সম্পর্কে অবহিত থাকে। কল্যাণে প্রফুল্ল হয় আর অকল্যাণে বিমর্ষ হয়। আত্মায় অনুভূতির প্রভাব রয়েছে। যার আত্মা অধিক উন্নত হবে সেই হবে আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা আবুল বাকার-এর মতে-ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক ও সূফীগণের মধ্যে বিরাজমান মতপার্থক্যের ব্যাখ্যা এই যে, যখন রূহ বা আত্মা বলে কোন জিনিসকে আমরা খোঁজ করি তখন তিনটি

৬৪ ইমাম আল গাযালী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

জিনিস আমাদের কাছে ধরা পড়ে। যথা-জীবাত্মা, স্বভাবাত্মা ও মানবাত্মা।[৬৫] চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আত্মার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হল সেই সূক্ষ্মতাপ মৌলিক উপাদানসমূহের উত্তপ্ততা ও নমনীয়তার ফলে অস্তিত্ব লাভ করে। এটা আসলে জীবাত্মারই অপর নাম। পিথাগোরাস এবং তার অনুসারীরা যে আত্মার কথা বলেছেন সেটা হল স্বভাবাত্মা। আর মানবাত্মা হল সকল কর্ম ও গুণের অধিকারী বা জিম্মাদার।

বিচার দিনের পাপ-পূণ্য এর সাথেই সম্পর্কিত। আল-কুরআনে এই আত্মাকেই সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই মানুষ যার প্রচলিত নাম রূহ বা মানবাত্মা। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের মতে রূহ বা আত্মা তিন ধরনের হয়। যথাক্রমে- (১) রূহে আযীম, (২) রূহে কুদ্দুস এবং (৩) রূহে নফস।

রূহে আযিম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে দেওয়া একটি মহিমান্বিত আধ্যাত্মিক শক্তি বা প্রাণশক্তি, যা তাকে ঈমান, তাওহীদ, সচ্চরিত্র এবং মানবিক মর্যাদা অর্জনে সহায়তা করে। এটি মানুষের উচ্চতম আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়। আল্লাহ প্রদত্ত এই বিশেষ শক্তি মানুষকে নেক ও পবিত্র কাজের দিকে পরিচালিত করে এবং দেহ ও নফসের উপর প্রভাব ফেলে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আমি যখন তাকে সুসজ্জিত করব এবং তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকব"[৬৬], যা রূহে আযিমের অস্তিত্বের প্রমাণ। ইমাম গাযালী তাঁর গ্রন্থ ইলমুল কলব ও রূহ-এ এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

রূহে কুদ্দুস মূলত পবিত্র ও পুণ্যশীল আত্মা, যা আল্লাহর নিকটতম বান্দার মধ্যে উপস্থিত থাকে। এটি মানুষের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা, নৈতিকতা এবং সৎ অন্তরের প্রতীক। কুরআনে "রূহুল আমীন" এবং "রূহুল কুদ্দুস"-এই দুটি উপাধি দ্বারা ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। জিবরাইল (আ.) ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রেরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান ফেরেশতা। রূহুল আমীন (روح الأمين) অর্থ হলো "বিশ্বস্ত আত্মা" বা "নির্ভরযোগ্য রূহ।" কুরআনের সূরা আশ-শু'আরায়ে (২৬:১৯৩) আল্লাহ তায়ালা বলেন: "এটি অবতীর্ণ করেছে রূহুল আমীন, আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।" এখানে রূহুল আমীন বলতে জিবরাইল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে, যিনি বিশ্বস্ততার সাথে কুরআনকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। অন্যদিকে, রূহুল কুদ্দুস (روح القدس) অর্থ "পবিত্র আত্মা।" এই উপাধিও কুরআনে একাধিক স্থানে এসেছে, যেমন সূরা আল-বাকারা (২:৮৭, ২:২৫৩) ইত্যাদিতে। এখানে রূহুল কুদ্দুস দ্বারা জিবরাইল

---

৬৫ ইমাম আল গাযালী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৬৬ (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ), আল-কুর'আন, ১৫: ২৯

(আ.) বোঝানো হয়েছে, যিনি আল্লাহর নির্দেশে নবীদের শক্তি জুগিয়েছেন এবং বিশেষ করে হযরত ঈসা (আ.)-কে সমর্থন করেছেন।

সুতরাং, রূহুল আমীন ও রূহুল কুদ্দুস-দুটিই ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর উপাধি, যা তাঁর বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার পরিচায়ক। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহ তাঁর পবিত্র বাণী সংরক্ষণ ও পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ বিশ্বস্ত ও পবিত্র ফেরেশতাকে নিয়োগ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,"এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহুল কুদ্দুস দ্বারা নাজিল হয়েছে।"[৬৭] ইমাম রামাল্লাহী তাঁর গ্রন্থ মকসাদুল রূহ-এর এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে রূহ বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, কুরআন হচ্ছে এমন রূহ যার দ্বারা অন্তরসমূহ জীবন লাভ করে।[৬৮]

রূহে নফস হলো মানুষের অহংকার, কামনা ও স্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তি, যা তাকে পাপ বা গুনাহের দিকে প্ররোচিত করতে পারে। এটি মানব জীবনের দৈহিক ও মানসিক প্রবৃত্তি হিসেবে কাজ করে। নফস আল্লাহ প্রদত্ত হলেও, নিয়ন্ত্রণ না করলে এটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ইহকালীন লোভ, কামনা ও অহ-ংকারের উৎস হলো নফস, এবং তাসওউফের প্রধান লক্ষ্য হলো নফসকে কাবু করা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় নফস খারাপের ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু আমি আল্লাহর রহমত দ্বারা রক্ষা পেয়েছি।"[৬৯] ইমাম গাযালী তাঁর গ্রন্থ ইলমুল নফস-এ নফসের প্রকৃতি ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

৩. সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ মর্যাদা

সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মানবীয় মর্যাদার বিভিন্ন দিক আছে। প্রথমত, যে আকার-আকৃতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শারীরিক কাঠামো মহান আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন, তা অন্য কোনো সৃষ্টবস্তুকেই দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, যে জ্ঞান মানুষকে দেওয়া হয়েছে, তা অন্য কোনো সৃষ্টবস্তুকে তা দেওয়া হয়নি, যার দ্বারা তারা নিজেদের জীবন গতিশীল করার জন্য নিত্যনতুন বস্তু আবিষ্কার করেছে । তৃতীয়ত, মানুষকে আসমানি কিতাব বা ওহী দেওয়া হয়েছে। এই জ্ঞান দিয়ে তারা কল্যাণ-অকল্যাণ, উপকারী-অপকারী ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য সহজেই অনুভব করতে সক্ষম। চতুর্থত, মানুষকে একধরনের বিশেষ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে সে আল্লাহর অন্য সৃষ্টবস্তু থেকে উপকৃত হতে ও তাকে বশে রাখতে সক্ষম। যেমন- চাঁদ, সূর্য, বাতাস, পানি যার দ্বারা তারা নিজেদের জীবন গতিশীল

---

৬৭ (اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ رُوۡحًا مِّنۡ اَمۡرِنَا), আল-কুর'আন, ৪২:৫২

৬৮ জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস সূয়ূতী (র), *তাফসীরে জালালাইন*, অনুঃ ইসলামিয়া সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-২০১১, খণ্ড-১, পৃ ১১-১৩

৬৯ (وَ مَاۤ اُبَرِّئُ نَفۡسِىۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىۡ اِنَّ رَبِّىۡ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ), আল-কুর'আন, ১২:৫৩

করার জন্য নিত্যনতুন বস্তু আবিষ্কার করেছে মানুষের বশে নেই, কিন্তু দিব্যি এগুলো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۝

'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।'[৭০]

মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হলো, তিনি তাকে বিশেষ দেহ-কাঠামো দান করেছেন। সুন্দর চেহারা, সুষম দেহ, উপযুক্ত প্রকৃতি ও অঙ্গসৌষ্ঠব আল্লাহর বিশেষ দান। ইরশাদ হয়েছে, 'অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।'[৭১]

মানুষকে তার দুই পায়ে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছ। হাত দিয়ে মুঠো করে খাওয়ার শক্তি দেওয়া হয়েছে। মানুষকে যে চোখ, কান ও অন্তর দেওয়া হয়েছে, মানুষ এসব উপাদান সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে। আর মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে নিজের বান্দা ও খলীফা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। সৃষ্টিলোকে মানুষের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশিষ্টতা তো এখানেই। তাই মানুষের সম্মান ও মর্যাদা তার সৃষ্টিগত ও জন্মগত অধিকার। কারণ মহান রব্বুল আলামিন মহাবিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হল মানুষ। অন্য সব সৃষ্টির ওপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। যাদের কাজ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অপর মানুষকে সতর্ক করা, সুসংবাদ দান করা, ভীতি প্রদর্শন করা এবং আহ্বান করা। কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহর কাছে মানুষের নৈকট্য ও মানুষের কাছে আল্লার নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। মানুষ শ্রেষ্ঠ বলেই মানুষের কাছে মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টিলোকের মধ্যে মানুষ ব্যতীত আর কাউকেই এতটা মর্যাদা দেওয়া হয়নি। আল্লাহর বাণীর ধারক ও বাহক এবং প্রচারকরূপে মানুষকেই মনোনীত করা হয়েছে। যেমন– কুরআনে এসেছে–

نَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۝

" নিশ্চয় আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে।"[৭২]

---

৭০ আল-কুর'আন, ১৭: ৭০

৭১ (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ), আল-কুর'আন, ৯৫: ৪

৭২ আল-কু'রআন, ৩৩: ৭২

৩.১ ঊর্ধ্বজগতে প্রাপ্ত মর্যাদা

আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আ.) কে খাসভাবে নিজহাতে সৃষ্টি করেছেন যেমনটি তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। হযরত আদম (আ.) ছাড়া অন্য কোন জীবকে তিনি নিজ হাতে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ ۝

"তিনি বললেন: হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা করতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে; নাকি আগে থেকেই তুমি অহংকারী ছিলে?"[৭৩]

পবিত্র কুর'আনে আরও উল্লেখ আছে,

فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ۝

অতঃপর যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও।[৭৪]

হযরত আদম (আ.) কে সিজদা করার আদেশটি সৃষ্টির সম্মানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছিল, তাঁকে ইবাদতের জন্য ছিল না। আর যেহেতু এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ,তাই এর আবশ্যকতায় কোন সন্দেহ নেই। উচ্চতর জগতে বা আত্মার জগতে মানুষের যে স্থান, তা এতই উচ্চ ও মহান যে, আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মাথা তাদের সামনে অবনমিত হয়ে যায়। উচ্চতর জগতে মানুষের মর্যাদার আসলে কোন তুলনাই নেই। মূলত এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর মহান সৃষ্টি মানুষকে সিজদা করতে।

৩.১.১ রূহের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মর্যাদা

আল্লাহ মানুষের মধ্যে রূহ ফুঁকেছেন, যা তাকে জীবন্ত, বুদ্ধিমান এবং দায়িত্বশীল করেছে। এই রূহ মানুষের আধ্যাত্মিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং তাকে নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা প্রদান করে। রূহের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সচেতন হয়, সৎ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পাপ ও অভ্যাসগত প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে দূরে রাখার সামর্থ্য অর্জন করে। এটি নির্দেশ করে যে মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা তার দেহগত গঠনের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত রূহের মাধ্যমে তার অন্তরের পবিত্রতা, চিন্তা ও ইবাদতের ক্ষমতা অর্জিত হয়।

---

৭৩ আল-কুর'আন, ৩৮: ৭৫

৭৪ আল-কুর'আন, ৩৮: ৭২

৩.১.২ ফেরেশতাদের উপর মর্যাদা দান

ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি এবং তারা নিষ্পাপ ও অধিক সম্মানিত । [৭৫]কিন্তু তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহপাক তাঁর বিশেষ সৃষ্টি পূতঃপবিত্র ফেরেশতাগণের সিজদা সম্মাননার মাধ্যমে আদম (আ.) তথা মানবজাতির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সকল মাখলুকের চাইতে মানবজাতিই শ্রেষ্ঠ এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কুর'আন মাজিদে বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

'আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর'। তখন তারা সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল। আর সে হল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।[৭৬]

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝

তিনি আরো বলেন, 'স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছি, আদমকে সিজদা করো। তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করেছে। ইবলিস বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?[৭৭]

৩.১.৩ নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ও মর্যাদা

হযরত আদম (আ.) কে ঊর্ধ্বজগতের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, যা অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার তুলনা থেকে স্পষ্ট। আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিকভাবে সৃষ্টির শীর্ষে স্থাপন করা হয়েছে। এই বিশেষত্ব তাকে খলিফা হিসেবে দায়িত্বশীল করে, যাতে সে ন্যায়, সদাচার এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে পারে। মানুষের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা তাকে অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় আলাদা এবং বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে, যা কেবল এই জগতের নয়, বরং ঊর্ধ্বজগতের প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষমতা হলো আল্লাহ প্রদত্ত একটি অনন্য উপহার, যা মানুষকে চিন্তা, বিচার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জ্ঞানের আলোকে কাজ করার সক্ষমতা দেয়। নৈতিক বোধ তাকে সৎ, ন্যায্য ও মানবিক পথে পরিচালিত করে, যখন বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা তাকে কল্পনা, জ্ঞান অর্জন এবং সৃষ্টির সূক্ষ্ম নিয়মাবলি বোঝার সুযোগ প্রদান করে। এই গুণাবলীর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নির্দেশনার প্রতি সচেতন হয়, নফসের নিম্ন প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে।

---

৭৫ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), প্রাগুক্ত,পৃ.৩৪

৭৬ আল-কুর'আন, ২ :৩৪

৭৭ আল-কুর'আন, ১৭:৬১

ঊর্ধ্বজগতের মর্যাদা বোঝাতে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ মানুষকে শুধু দেহগত বা ভৌত দিক থেকে নয়, বরং আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার মাধ্যমে উচ্চতর স্থান প্রদান করেছেন। ইমাম গাযালী তাঁর মুকাশাফাতুল কুলুব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এই ক্ষমতা মানুষের দায়িত্বশীলতা, সামাজিক আচরণ, নৈতিক সিদ্ধান্ত এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের প্রধান ভিত্তি। অর্থাৎ ঊর্ধ্বজগতে মানুষের মর্যাদা তার চিন্তা-ভাবনা, নৈতিকতা, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল, যা তাকে শুধু পৃথিবীতে নয়, পরকালের ন্যায় ও মর্যাদায়ও বিশেষ স্থান প্রদান করে।[৭৮]

৩.১.৪ সঙ্গিনীর সৃষ্টি ও জান্নাতে বসবাস

হযরত আদম (আ.) -কে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির পর তাঁর একাকিত্ব দূর করার জন্য এক সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করেন, যিনি হলেন হযরত হাওয়া (আ.)। আদম (আ)-এর সঙ্গিনী হাওয়া (আ.) হলেন মানবজাতির প্রথম নারী, যিনি আল্লাহর ইচ্ছায় আদম (আ.)-এর সহচরী হিসেবে সৃষ্টি হন। আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতে বসবাস করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং সেখানে তাদের জন্য সকল প্রকার সহজলভ্য সান্তনা, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। জান্নাতে তারা মুক্ত জীবন কাটাতেন, যেখানে কোনো দুঃখ, ক্লান্তি বা কষ্ট ছিল না। পবিত্র কুরআনের ভাষায় আল্লাহ বলেন, "তাঁর (আদমের) থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তাঁর কাছে শান্তিতে বসবাস করে"।[৭৯] এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রমাণ করলেন যে মানুষ একাকী নয়; বরং দাম্পত্য জীবন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার ভিত্তিতেই তার প্রকৃত জীবন পূর্ণতা লাভ করে।

হযরত হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টির মাধ্যমে হযরত আদম (আ.)-এর জীবন থেকে নিঃসঙ্গতা দূর হয় এবং তাঁরা জান্নাতে মিলেমিশে বসবাস করতে থাকেন। জান্নাতের প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও অশেষ নিয়ামত তাঁদেরকে ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকে নির্ভয়ে আহার কর।"[৮০]

সুতরাং, আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জান্নাতে বসবাস মানুষের আদি জীবনের প্রকৃত আবাসস্থলকে নির্দেশ করে। এটি ছিল আল্লাহর বিশেষ দয়া ও সম্মানের প্রতীক, যেখানে দাম্পত্য জীবন, ভালোবাসা ও শান্তির পূর্ণতা প্রথমবারের মতো প্রকাশ পায়।

---

৭৮ ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ আল গাযালী (রহ.), *মুকাশাফাতুল কুলুব*, খণ্ড-২, অনু, মুফতী মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, দারুল ইফতা প্রকাশনী, ঢাকা -১৯৯৩ পৃ ১৭০,২৩০

৭৯ (اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا), আল-কুর'আন, ৩০: ২১

৮০ (وَ قُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا), আল-কুর'আন, ২: ৩৫

৩.২ বস্তুজগতে প্রাপ্ত মর্যাদা

বাস্তববাদীদের দৃষ্টিতে যুগ ও কালের বিচারে মানুষ নগণ্য। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ কিছু রাসায়নিক উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই অন্যান্য জীব-জন্তুর সাথে তার কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। ইসলামের আলোকে মানুষ হলো এই জমিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত খলিফা বা প্রতিনিধি। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেছেন, هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ۚ তিনিই তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে খলীফা করেছেন।[৮১] পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۚ

আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি।[৮২]

পৃথিবীতে তাদের জীবন শুরুতে অনিশ্চয়তা, সীমাবদ্ধতা ও কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের জন্য টিকে থাকা ও জীবনযাপন সহজ করার জন্য বিশেষ দিকনির্দেশনা ও সাহায্য প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ আদম (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে খাদ্য উপার্জন করতে হবে, কৃষি ও পশুপালন করতে হবে, এবং জীবন-সংক্রান্ত মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে। একইভাবে হাওয়া (আ.)-কে সহায়তা দেওয়া হয়েছিল পরিবারের পরিচালনা ও সন্তানের লালন-পালনে। আল্লাহ তাঁদের মধ্যে সমঝোতা, ধৈর্য ও পরিশ্রমের শক্তি স্থাপন করেছেন, যাতে তারা পৃথিবীর নতুন পরিবেশে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারে এবং মানবজাতির বংশবৃদ্ধি শুরু করতে পারে। এই সাহায্য ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের জীবনকে সহজ ও নিরাপদ করেছেন। এ বস্তু জগতে মানুষের মর্যাদা হচ্ছে মানুষ পৃথিবীর সকল সৃষ্টির নির্যাস। মানুষকে কেন্দ্র করেই এ বিশ্বলোকের সৃষ্টি। মানুষ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ সকল সৃষ্টির। মানুষের কর্মক্ষেত্র হচ্ছে এই বিশাল বিশ্বলোক। এখানে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। মানুষ তার ওপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে। কিন্তু এখানে কোন সৃষ্টিই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে টিকে থাকতে পারে না।

৩.২.১ খিলাফতের দায়িত্ব

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যা মানবজাতির জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা ও দায়িত্বের প্রতীক। খলিফা হিসেবে মানুষের কাজ হলো পৃথিবীতে ন্যায়, সদাচার ও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করা। কুরআনে উল্লেখ আছে, "আমি তোমাদেরকে

---

৮১ আল-কুর'আন, ৩৫: ৩৯

৮২ আল-কুর'আন, ১৭: ৭০

পৃথিবীতে খলিফা স্থাপন করব।"[৮৩], যা নির্দেশ করে যে মানুষকে কেবল দেহগত জীবনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, বরং তাকে একটি দায়িত্বপূর্ণ ও নৈতিক জীবন পরিচালনার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। খলিফা হিসেবে প্রেরণ হওয়া মানুষের মর্যাদা অন্যান্য সৃষ্টির থেকে আলাদা এবং এটি তার আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক দায়িত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

এ দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা হচ্ছে– সে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে দেখা যায় মানুষ নিকৃষ্ট সারবস্তু থেকে সৃষ্ট। কিন্তু তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ফুঁকে দেয়া রূহ এবং দুনিয়ায় তাঁকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দান করার কারণেই এত বড় মর্যাদার অধিকারী। মানুষের এ মর্যাদা কেবলমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ওপরই নির্ভরশীল। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান তাঁর সৃষ্ট এ সেরা মাখলুকগুলো কেবল তারই ইবাদাত করবে। তিনি চান তারা পৃথিবীতে 'খলিফা' বা পৃতিনিধি হিসেবে তাঁর খেলাফত বাস্তবায়ন করবে। তাঁরই জমিনে খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা, আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় জীবনকাল অতিবাহিত করবে। পবিত্র কোরআনে এসেছে,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۖ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ

'যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।' ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি এর মধ্যে (পৃথিবীতে) এমন একজনকে নিযুক্ত করবেন, যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে, যেখানে কিনা আমরা আপনার পবিত্রতাকে প্রশংসা ভরে বর্ণনা করছি এবং আপনার নিষ্কলুষতাকে ঘোষণা করছি?'[৮৪] তিনি আরও বলেছিলেন,

اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۖ

'আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।'[৮৫]

আদম (আ.)-কে আল্লাহ পৃথিবীতে প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির খিলাফতের দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল। খিলাফতের অর্থ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ন্যায়, সদাচার ও দায়িত্বপালন করা। আল্লাহ আদম (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে মানবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালন করতে হবে, যাতে পৃথিবী একটি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত পরিবেশে পরিণত হয়। খিলাফতের দায়িত্বের মধ্যে ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, সামাজিক সম্পর্কের সঠিক পরিচালনা, ন্যায়বিচার

---

৮৩ (اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً), আল-কুর'আন, ২: ৩০

৮৪ আল-কুর'আন, ২: ৩০

৮৫ আল-কুর'আন, ২: ৩০

প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর ইবাদতে অটল থাকা। এই দায়িত্ব শুধু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর জন্য নয়, বরং তাদের বংশধরদের জন্যও একটি শিক্ষা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল, যাতে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বশীল ও নৈতিক জীবন যাপন করতে পারে। এই বিশ্বলোকে মানুষ মহান আল্লাহর খিলাফতের সুকঠিন দায়িত্ব পালন করে। খিলাফতের দায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত। আর তা হল আল্লাহর শরী'আত বহন, পালন ও আল্লাহর নিকট জবাবদিহির যোগ্যতা অর্জন। আর এজন্য বিশ্বলোকে মানুষের এত মর্যাদা, কারণ বিশ্বলোকে মানুষ ছাড়া এ কঠিন দায়িত্ব আর কারও বহন করার যোগ্যতা নেই।

৩.২.২ আকৃতিগত বিশেষত্ব

মানবদেহের দৈহিক আকৃতি ও গঠন অন্যান্য প্রাণীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ আল্লাহ মানুষকে বিশেষ ক্ষমতা, বুদ্ধি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের দাঁড়ানোর অবস্থান, দুই পায়ে ভর কওে চলা,অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় অনন্য, যা হাতে কাজ করার স্বাধীনতা দেয়। হাত ও আঙ্গুলের সূক্ষ্ম গঠন জটিল কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মানুষের মস্তিষ্কের আকার, জটিলতা এবং চিন্তাশক্তি অন্য কোনো প্রাণীর তুলনায় অনেক উন্নত, যা যুক্তি, পরিকল্পনা, শিক্ষণ এবং নৈতিকতা প্রয়োগে সক্ষম করে। চোখ, কান, নাক এবং অন্যান্য সংবেদনশীল অঙ্গের সংমিশ্রণ মানুষকে পরিবেশ বুঝতে, যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং সৃজনশীলতা প্রকাশে সহায়তা করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষকে প্রাণীর থেকে আলাদা করে এবং আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির প্রথম মানব আদম (আ.) কে পৃথিবীতে অনুপম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, সুনিপুণ ও চমৎকার দেহাবয়বে সৃষ্টি করেছেন। দৈহিক সৌন্দর্য্য, মায়াবী মুখাবয়ব, অকল্পনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা কেবল মানবজাতিকে তিনি দান করেছেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

'অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।'[৮৬]

নিখিল সৃষ্টিলোকের মধ্যে মানুষের অবয়ব, আকৃতি, গঠন কাঠামো অত্যন্ত সুন্দর। সুষম অনুপাতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর দ্বারা মানুষের বাহ্যিক আকৃতি এবং সুষম অঙ্গ সমাবেশ বুঝানো হয়েছে। মানুষই একমাত্র সৃষ্টি, যার মুখ অধোগতি সম্পন্ন নয়। সে ঝুঁকে বুকে ভর দিয়ে চলে না ; বরং তার একটি শারিরীক দৃঢ়তা রয়েছে এবং সে তার খাদ্য হাত দ্বারা গ্রহণ করে। মানুষের হাত, মুখ, মাথা, পা ইত্যাদি সুসামঞ্জস্যভাবে সৃষ্টি যে, তার কাজকর্ম পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে সম্পন্ন করতে

---

৮৬ আল-কুর'আন, ৯৫: ৪

পারে।[৮৭] অভ্যন্তরীণ দিকে বুদ্ধিবৃত্তি, ধীশক্তি, সভ্যতা, শালীনতাবোধ, বাগ্মীতা, উচ্চতর বিচার শক্তি মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে অবশ্যই উন্নততর অবস্থা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।[৮৮]

৩.২.৩ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দান

আল্লাহ তা'আলা সুন্দর আকৃতির সাথে সাথে মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দান করেছেন; কথা বলার যোগ্যতা দান করেছেন। এসব কিছুর মাধ্যমে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বুঝতে পারে, নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারে। সৃষ্টিজগতের অন্যান্য জীব-জন্তু ও সৃষ্টিকে এগুলো দেয়া হয়নি। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অন্যদের উপর দিয়েছেন প্রাধান্য। মহান আল্লাহ কেবল মানবজাতিকেই জ্ঞানবান করে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে তিনি আবেগ বিবেক এবং সকল মানবীয় মূল্যবোধ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রথম মানব ও প্রথম নবী আদম (আ.) সকল কিছু শিক্ষা দিয়েছেন একই ধারাবাহিকতায় মুহাম্মদ (সা.) কে 'উম্মী নবী' হওয়া স্বত্ত্বেও অকল্পনীয় জ্ঞান, হিকমা, প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা, অতুলনীয় যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতিই যুল আকল এর অধিকারী। কুর'আন মাজিদে এসেছে,

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

'আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে-সকল ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'[৮৯]

আল্লাহপাক কেবল মানবজাতির মধ্য থেকেই নবী রাসুল নির্বাচন করেছেন। তিনি তাঁদেরকে বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করেছে। উক্ত জাতিগোষ্ঠীর কতকলোককে তিনি তাঁদের

তিনি আরো বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে। পড়, তোমার প্রতিপালক বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।[৯০] আল্লাহ মানুষকে চিন্তা, বিশ্লেষণ ও বিচার করার

---

৮৭ মাহমুদুল হাসান নিজামী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬
৮৮ আল-কুর'আন, ১৬: ৭৮
৮৯ আল-কুর'আন, ২ : ৩১
৯০ আল-কুর'আন, ৯৬: ১-৫

ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করতে পারে। বিবেক মানুষকে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, যেমন অন্যের প্রতি সহানুভূতি, ন্যায়পরায়ণতা ও সততার পথ অনুসরণ করা। জ্ঞান ও বুদ্ধি মানুষকে সৃষ্টির রহস্য অন্বেষণ, শিক্ষা অর্জন, নতুন প্রযুক্তি তৈরি এবং সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম করে। এই ক্ষমতা শুধু দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বরং আল্লাহর ইবাদত, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের বিবেক ও বুদ্ধি তাকে দায়িত্বশীল, চিন্তাশীল এবং সৃজনশীল করে তোলে, যা অন্য প্রাণীতে দেখা যায় না।

৩.২.৪ নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থ প্রদান

মানুষের হেদায়াতের জন্য তাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। অন্য কোন সৃষ্টি এ বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত নয়। কারণ নবী-রাসূলগণ আল্লাহর মনোনীত প্রিয় বান্দা। অনুসারী ও অনুগামী হিসেবে কবুল করেন। আল্লাহপাক বলেন,

وَ لَقَدۡ بَعَثۡنَا فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ وَ اجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَ ۚ

'আর আমি অবশ্যই প্রতিটি জাতির নিকট একজন করে রাসুল প্রেরণ করেছি, যাতে করে তাদের বলে, 'তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুত তথা শিরক থেকে দূরে থাক।'[৯১]

আল্লাহ তা'আলা একমাত্র মানুষের মধ্যেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য হতে নবী-রাসূল নির্বাচিত করে প্রকারান্তরে মানুষকেই সম্মনিত করেছেন। আল কুর'আনে এসেছে- অর্থ: আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হতে রাসূল মনোনীত করেন।[৯২] মানুষ শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী বলেই মানুষের মাঝে আল্লাহর পথ দেখানোর জন্য নবী- রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যকোন প্রাণির জন্য নবী-রাসূল প্রেরিত হয়নি। মানুষকে আল্লাহ বিশেষ সম্মান দিয়েছেন আসমানী কিতাবের মাধ্যমে। আল্লাহ তার নবী ও রাসূলদেরকে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ সঠিক পথ চেনা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারে। কোরআন শরীফ এই সম্মানের সর্বোচ্চ নিদর্শন, যা মানুষকে জ্ঞান, নৈতিকতা, নির্দেশনা এবং জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট পথ দেখায়। কিতাবগুলো মানুষকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে সচেতন করে, ভুল থেকে বিরত রাখে এবং সৎ জীবনযাপনের প্রেরণা দেয়। এর মাধ্যমে মানুষ শুধু দৈনন্দিন জীবনে নয়, বরং আধ্যাত্মিক উন্নয়নে, নৈতিক দায়িত্ব পালনে এবং খিলাফতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনেও সমৃদ্ধ হয়। এই আসমানী কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। মানুষের পারস্পারিক

---

৯১ আল-কুর'আন, ১৬:৩৬

৯২ (اَللّٰہُ یَصۡطَفِیۡ مِنَ الۡمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ), আল-কুর'আন, ২২: ৭৫

সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধ এজন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আল কুর'আনে আরও এসেছে- অর্থ: 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পারো।'[৯৩]

৩.২.৫ দুনিয়ার নিয়ামতকে কাজে লাগানো, চিন্তা করা ও গবেষণা করা

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন বহু নিয়ামতের সঙ্গে, যেমন জ্ঞান, প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তি, সময় এবং সামাজিক সম্পর্ক। এই নিয়ামতগুলো শুধুমাত্র ভোগের জন্য নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন ও মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য। কুর'আনে আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নির্দশন।"[৯৪]

এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিটি নিয়ামত মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের সুযোগ। দুনিয়ার নিয়ামতগুলো আল্লাহর দেওয়া বিশাল উপহার। সঠিকভাবে তা কাজে লাগানো, চিন্তা করা এবং গবেষণা করা মানুষের জীবনের জ্ঞান ও নেক আমল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই নিয়ামতগুলোর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর শক্তি ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করে, কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আখিরাতের সাফল্যের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন বিভিন্ন নিয়ামত উপভোগ এবং ব্যবহার করার জন্য। এই নিয়ামতগুলো শুধুমাত্র ভোগ বা নেশার জন্য নয়, বরং সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কার করা, জ্ঞান অর্জন করা এবং মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য। কুর'আনে আল্লাহ বলেন,

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيۡلَ عَلَى النَّهَارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيۡلِ وَ سَخَّرَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجۡرِىۡ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡغَفَّارُ ۝

"তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলছে। জেনে রাখ, তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।"[৯৫] অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু, উদ্ভিদ, প্রাণী ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলোতে তাঁর সৃষ্টি ও নিয়ামতের নিখুঁততা পর্যবেক্ষণ করতে। চিন্তা ও গবেষণা করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর শক্তি ও জ্ঞানকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা, কৃষি, জ্যোতির্বিজ্ঞান

---

৯৩ (يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ وَّ اُنۡثٰى وَ جَعَلۡنٰكُمۡ شُعُوۡبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۡا ؕ), আল-কুর'আন, ৪৯: ১৩

৯৪ (اِنَّ فِىۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافِ الَّيۡلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الۡاَلۡبَابِ), আল-কুর'আন, ৩:১৯০

৯৫ আল-কুর'আন, ৩৯:৫

সবই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের সদ্ব্যবহার। একই সঙ্গে এই জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শেখায়, এবং তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথ সুগম করে। দুনিয়ার নিয়ামতকে কাজে লাগানো মানে শুধু বস্তুগত কল্যাণ নয়, বরং আল্লাহর উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। অর্থাৎ, নিয়ামতগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মানুষের উপকারে আসে, অন্যকে সাহায্য করে, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয়। গবেষণা ও চিন্তাশীল কার্যকলাপই মানুষকে সৃষ্টির রহস্য বুঝতে সাহায্য করে এবং তার আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করে। আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন জ্ঞান, স্বাস্থ্য, পরিবার, সম্পদ, প্রকৃতি, সময় ও বুদ্ধি যা মানব জীবনের কল্যাণ ও সাফল্যের মূল ভিত্তি। এই নিয়ামতকে শুধুমাত্র ভোগ করার জন্য নয়, বরং চিন্তা, গবেষণা ও শুদ্ধভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য প্রদান করেছেন। চিন্তা ও গবেষণা করার মাধ্যমে মানুষ কেবল পৃথিবীর রহস্য উদঘাটন করে না, বরং আল্লাহর শক্তি ও মহবত্তও উপলব্ধি করে। শুকরিয়া আদায় হলো এই নিয়ামতের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এটি শুধু জিহ্বায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন নয়, বরং নিয়ামতগুলোকে ন্যায্যভাবে ব্যবহার করা, নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কাজে লাগানো। কুরআনে বলা হয়েছে: "যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি তোমাদেরকে আরও বাড়াব।"[৯৬]

৩.২.৬ স্রষ্টার প্রদত্ত নি'আমতের মাধ্যমে মর্যাদা দান

আদম সন্তানকে তিনি অন্যান্য সৃষ্ট জীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এজন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। যাতে মানুষ ভুল পথ অবলম্বন করে গোমরাহ ও বিপথগামী না হয়। এর মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে শুধু পৃথিবীতে স্থাপনই করেননি, বরং তাঁকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর এক বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন। কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন "আমি আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থল ও জলপথে চলাফেরার উপকরণ দিয়েছি, আমি তাদেরকে উত্তম জিনিস থেকে রিযিক দিয়েছি এবং আমি তাদেরকে আমার সৃষ্ট অনেকের উপর স্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[৯৭]

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে মানুষকে আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত করে তুলেছেন। আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন, যা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। এর ফলে মানুষ পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে,

---

৯৬ (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ), আল-কুর'আন, ১৪:৭

৯৭ (وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا), আল-কুর'আন, ১৭: ৭০

জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে পারে এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

মানুষকে খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করার মাধ্যমে আল্লাহ ইঙ্গিত করেছেন যে পৃথিবীর সম্পদ, প্রাণী, উদ্ভিদ, আকাশ-জল-স্থল সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। তবে এর সাথে এসেছে দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার ভার। মানুষকে পৃথিবীকে ন্যায়, সাম্য ও শান্তির পথে পরিচালনা করতে হবে, অন্যথায় সে তার মর্যাদাকে খর্ব করবে। অতএব, "সকল সৃষ্টির উপরে মর্যাদা দান" মানুষের সেই বিশেষ সম্মান ও দায়িত্বকে প্রকাশ করে, যা তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। এটি মানুষের আধ্যাত্মিক উচ্চতা ও দুনিয়াবি দায়িত্বের সমন্বিত রূপ। আল্লাহ তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নি'আমত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নি'আমত বলতে সেসব নি'আমত কেই বোঝায়, যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবনযাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা এসবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নি'আমত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রুপ দ্বীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ কওে দেয়া, আল্লাহ-রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলিমদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা- এসবই প্রকাশ্য নি'আমত সমূহের পর্যায়ভুক্ত।

আর গোপনীয় নি'আমত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত- যথা ঈমান, আল্লাহর পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিৎ শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি। অথবা যেসব নি'আমত মানুষ জানে না এবং অনুভবও করে না সেগুলো গোপন নি'আমত। মানুষের নিজের শরীরে এবং তার বাইরে দুনিয়ায় তার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে এমন অগণিত ও অসংখ্য জিনিস রয়েছে কিন্তু মানুষ জানেও না যে, তার স্রষ্টা তার হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, তাকে জীবিকা দান করার জন্য, তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য এবং তার কল্যাণার্থে কত রকমের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে রেখেছেন। মানুষকে আল্লাহ অসাধারণ বিশেষত্ব, গুরুত্ব ও অমূল্য নিয়ামত দিয়ে সম্মানিত করেছেন। বিশেষত্বের মধ্যে রয়েছে তার বুদ্ধি, বিবেক, মুক্ত ইচ্ছা, নৈতিক বিচারক্ষমতা এবং সৃজনশীলতা, যা তাকে অন্যান্য জীবজন্তুর থেকে আলাদা করে। এই ক্ষমতার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত পালন করতে পারে, সঠিক ও ভুল পার্থক্য করতে পারে এবং ন্যায় ও অসৎ বিচারে সচেতন হতে পারে। গুরুত্বের দিক থেকে, মানুষ আল্লাহর নির্বাচিত

প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যা তার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে। নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ মানুষকে দেহ, জীবন, বুদ্ধি, জ্ঞান, ভাষা, সমৃদ্ধি, পরিবার এবং আসমানী কিতাব প্রদান করেছেন, যা তার জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনা, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং নৈতিক জীবনের ভিত্তি গঠন করে। এই বিশেষত্ব, গুরুত্ব ও নিয়ামতের সমন্বয়ে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশনায় জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

৩.২.৭ বিশ্বময় মানবজাতির বিস্তার

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর তাদের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির সূচনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের দু'জনের মাধ্যমে বহু পুরুষ ও নারীকে বিশ্বময় বিস্তার করেছেন।"[৯৮] এই আয়াত প্রমাণ করে যে, মানবজাতির উৎস এক আদম ও হাওয়া। তাঁদের বংশধরেরাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে এবং নানা জাতি, গোত্র, ভাষা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ভিন্নতা সত্ত্বেও সব মানুষ একই মানব পরিবারের অন্তর্গত। তাফসির ইবনে কাসীর-এ বলা হয়েছে, এ আয়াত মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের দিকে ইঙ্গিত করে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের বিস্তার আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন, যাতে মানবজাতি পরস্পরকে চিনতে পারে, সহযোগিতা করতে পারে এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে জীবন যাপন করতে পারে।[৯৯]

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এ আয়াতের সত্যতা প্রতিফলিত হয়। জেনেটিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে সমস্ত মানুষ একই জেনেটিক উৎস থেকে এসেছে এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেও তাদের মৌলিক জিনগত কাঠামো এক।

অতএব, বিশ্বময় মানবজাতির বিস্তার শুধু সংখ্যায় বৃদ্ধি নয়, বরং আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ, যাতে মানুষ পৃথিবী ভরে ফেলে, সভ্যতা গড়ে তোলে, এবং একই সাথে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। মহান আল্লাহ অগণিত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনপদ্ধতি, নিয়ন্ত্রিত বিস্তার, নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল বিদ্যমান। পৃথিবীর সর্বত্রই সকল মাখলুকের বিচরণ নেই, কিছু স্থলে, কিছু জলে, কিছু জমিনে, কিছু আকাশে, কিছু দৃশ্যপটে, কিছু আগোচরে। কেবল মানবজাতির বিচরণ পৃথিবীর সর্বত্রই। কিন্তু মহান আল্লাহই জগতের সর্বত্র মানবজাতির বিস্তার ঘটান। পৃথিবীর সকল প্রান্তেই মানুষের বসবাস। পবিত্র কুরআনের আয়াতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় অবয়ব ছাড়াও মানুষের মধ্যে এমন কিছু গুণ মহান আল্লাহ দান করেছেন, যা পৃথিবীর অন্য সৃষ্টির

---

৯৮ (يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً), আল-কুর'আন, ৪:১

৯৯ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.), প্রাগুক্ত, ২০০৫, পৃ. ৬৫

মধ্যে নেই। তাকে নানান রাসায়নিক বস্তুর নির্যাসের সংমিশ্রণে বিভিন্ন শৈল্পিক গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। বাক্‌শক্তি ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের যে ক্ষমতা ও নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্যান্য দৃশ্যমান প্রাণীর মধ্যে বিরল। যদিও এ বিষয়ে আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ ۝

'তারা কি দেখে না যে, তাদের জন্য আমি আমার নিজ হাতের তৈরি বস্তুর দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি,অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক।'[১০০]

এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানব জাতিসহ পৃথিবীতে যত প্রাণি আছে সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, কোন কিছুই এমনিতে সৃষ্টি হয়ে যায়নি। সবকিছু আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। এটা সরাসরি আল্লাহর কাজ। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা দয়া করে মানুষকে সকল বস্তুর মালিকানা দিয়েছেন। মানুষ ছাড়া বিশ্বের আর যত সৃষ্টি আছে সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত নিয়মের অধীনেই চলছে। কেবল মানুষের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন পথে চলার নির্দেশনা দিয়ে আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূল পাঠনো হয়েছে। এটা মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া হিসেবেই মানুষ পেয়েছে। আল্লাহপাক জগতের অগণিত মাখলুককে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুলতঃ মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন। পবিত্র কুর'আনে এসেছে,

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝

তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ন করে দিয়েছেন? এমন লোক ও আছে; যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে।[১০১] তিনি আরো বলেন,

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

'আর তিনি আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমণ্ডলে ও যা আছে ভূমণ্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।[১০২]

---

১০০ আল-কুর'আন, ৩৬: ৭১
১০১ আল-কুর'আন, ৩১: ২০
১০২ আল-কুর'আন, ৪৫: ১৩

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে যেসব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ও সম্মানিত করেছেন তা অনন্য।

সর্বোপরি যারা আল্লাহর প্রতি, তাঁর প্রেরিত নবী রাসুল (আ.) গণের প্রতি ইমান আনে, আল্লাহর আদেশ নিষেদ পালন করে তারাই প্রকৃত অর্থে 'আশরাফু মাখলুকাতের' প্রকৃত দাবীদার। তাদের দাবীর প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ

'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।[১০৩]

৩.২.৮ মু'মিনদের মর্যাদা

সমগ্র মানবজাতির মধ্যে মু'মিনের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সবচাইতে বেশি। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের কে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান করেছেন। যারা ইহকালে ঈমান আনে এবং ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালনা করে তাদের জন্য পরকালে চিরস্থায়ী জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তারা বলে, আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবলরা (সম্মানীরা) অবশ্যই দুর্বলকে (হীনদেরকে) বহিষ্কার করবে। শক্তি(সম্মান) তো আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানেনা।[১০৪] মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় পাত্র। আখিরাতে তাদেরকে চিরশান্তির স্থান জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[১০৫]

তবে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল সৎকর্ম। পবিত্র কু'রআনে মহান আল্লাহ আরও বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট।[১০৬]

অর্থাৎ, যারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনে এবং যারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করে, তারাই সৃষ্টির মধ্যে সবার থেকে উত্তম ও উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। এ দুনিয়ার সবকিছু– যা আছে উর্ধ্বলোকে, যা আছে ভূতলে, ধরিত্রীতে– সেই সবকিছুই মানুষের অধীন, মানুষের একান্ত অনুগত, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আর

---

১০৩ আল-কুর'আন, ৯৮: ৭

১০৪ (يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۗ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ), আল-কুর'আন, ৬৩:৮

১০৫ আল-কুর'আন, ১৮: ১০৭-১০৮

১০৬ আল-কুর'আন, ৯৮: ৭

দৃশ্য-অদৃশ্য যত নিয়ামত ও কল্যাণকর যা কিছু আছে– সবই বিপুলভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য দান করেছেন। এক কথায় সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষকে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন–

হে আদম সন্তান ! আমি তো তোমাকে কেবল আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। আর অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি করেছি তোমার জন্য।' মানুষ কেবল জীব দেহের অধিকারী সত্তা নয়, বরং মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, বিবেকবান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা শক্তি সম্পন্ন সত্তা। আসলে এই মানুষ হল সমস্ত সৃষ্টির নির্যাস, সৃষ্টিকুলের গৌরবের অমূল্য ও অতুলনীয় একমাত্র ধন। পৃথিবীতে যত প্রাণি আছে তার কোনটিই মানুষের ন্যায় ইচছা শক্তি রাখে না। তারা বিবেকবান, বিদ্যাবুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার অধিকারীও নয়। সৃষ্টিলোকের মধ্যে মানুষই একমাত্র দায়িত্বশীল সত্তা। মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করবে। অন্যান্য সৃষ্টি লোকের প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, তা তাকে যথাযথভাবে পালন করে সৃষ্টিলোকের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। মুমিন হল সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, নামাজ ও ইবাদতে নিয়মিত, এবং নৈতিক ও আচার-ব্যবহারে সৎ। মুমিনরা শুধু আধ্যাত্মিকভাবে নয়, সামাজিক ও নৈতিক জীবনে ও সম্মানিত। তাদের জন্য জান্নাতের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যেখানে চিরন্তন শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হবেন। এছাড়াও, আল্লাহ মুমিনদের বিপদ ও কষ্টে সাহায্য করেন, তাদের প্রার্থনা ও ইবাদত কবুল করেন। তাই মুমিন বান্দা আল্লাহর নিকট অনন্য মর্যাদা, দয়া ও আশীর্বাদের অধিকারী।

৪. সৃষ্টির উদ্দেশ্য উপলব্ধি

মানুষ অন্যান্য প্রাণির মতো শুধু খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সৃষ্টি হয়নি। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, মানুষ এই পৃথিবীতে অনর্থক, উদ্দেশ্যহীন, দায়িত্ব-কর্তব্যহীন সৃষ্টি হয়নি। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

১. পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করাই হল মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহান আল্লাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

অর্থ: ' স্মরণ করুন যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করব।'[১০৭]

এ আয়াত থেকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিস্কার হয়ে যায় যে, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

---

১০৭ আল-কুর'আন, ২:৩০

২. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। মানুষকে কেবল তার জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি কিংবা নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্যও সৃষ্টি করা হয়নি। বস্তুজগতের মৌল উপাদানসমূহের কোন একটা বিশেষ উপাদানের দাসত্ব করাও তার কাজ নয়। জীবজন্তু যেমন প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়েই জীবন কাটায়, মানুষ সেভাবে জীবন কাটাতে পারে না। নিরর্থক কাজে জীবন কাটিয়ে দিয়ে সে মরে যাবে, তাকে মাটির নিচে দাফন করা হবে, তারপর দেহটিকে পোকা-মাকড় খেয়ে শেষ করে দেবে, মাটির সাথে একাকার হয়ে মিশে যাবে এই পরিণতিও মানুষের জন্য নয়। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে সে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বলোকের স্রষ্টারূপে চিনবে, জানবে এবং সমগ্র জীবনব্যাপী কেবল তাঁরই দাসত্ব করবে। সে এখানে আল্লাহর খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করবে। তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচেছ- সে তার এ সংক্ষিপ্ত নির্দিষ্ট জীবনকালে বিরাট আমানত বহন করবে। আর সে আমানতের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে। এক্ষেত্রে অবশ্য তাকে বহু প্রকারের বাধা বিপত্তি ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এসব তাকে নীরবে সহ্য করে নিতে হবে, একটুও ঘাবড়ানো যাবে না, ভয় পাওয়া চলবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

'আমি জিন্ন এবং মানব জাতিকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।'[১০৮] সে আমানত হচেছ শারী'আত পালনের দায়িত্ব- আল্লাহর নিকট জবাবদিহির বাধ্য বাধকতা। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝

'তোমরা কি এ ধারণা করে বসে আছ যে, আমি তোমাদেরকে নিতান্তই অর্থহীন সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?'[১০৯]

এ আয়াত থেকে আমরা দু'টি বিষয় জানতে পারি। যথা-

১. মানুষকে এ পৃথিবীতে নিরর্থক, উদ্দেশ্যহীন এবং নিতান্তই খেলার ছলে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং মানব সৃষ্টির মূলে বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিহিত রয়েছে।

২. মানুষ এখানে জীবন যাপন শেষ করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষ হয়ে যাবে, অত-ঃপর তাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না, এই জীবনের কাজ কর্মের কোন হিসাব দিতে হবে না, ভাল কাজের ভাল ফল ও মন্দ কাজের মন্দ ফল ভোগ করতে হবে না এবং এ জন্য তাকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে না- এরূপ মনে করা নিতান্তই বোকামি, মূর্খতা বরং মৃত্যুর পর সে

---

১০৮ আল-কুর'আন, ৫১: ৫৬

১০৯ আল-কুর'আন, ২৩: ১১৫

নতুন এক জীবন লাভ করবে। দুনিয়ার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সর্বশেষে কর্মফল অনুযায়ী চিরশান্তির জান্নাত কিংবা চরম শাস্তির জাহান্নাম লাভ করবে।

ইবাদত সম্পর্কে মানুষ কিছু ভুল ধারণা পোষণ করে থাকে। মানুষ মনে করে রেআনের নির্দেশ পালনে নামাজ আদায় করা, রোজা ও হজ্ব পালন করা, জাকাত দেওয়া, কোরআন তেলাওয়াত করাম তাসবিহ-তাহলিল, জিকির-আজকার ইত্যাদি করার নামই ইবাদত। আসলে শুধু এগুলো করলেই ইবাদত হবে না। কারণ লোক দেখানো ইবাদত করে, মিথ্যা কথা বলে, সুদ-ঘুষে জড়িত থেকে, চোগলখোরি, হিংসা-বিদ্বেষ, বেহায়ানাপনা ও মুনাফেকির সঙ্গে লিপ্ত থেকে শুধুমাত্র নামাজ-রোজার মতো অন্যান্য আমল করার নাম কখনো ইবাদত নয়।

কারআন-সুন্নাহর নিষেধগুলো পরিত্যাগ করে আদেশ পালন হলো ইবাদত তথা বন্দেগি। কারণ ইবাদত হলো আল্লাহতায়ালা হুকুম-আহকামকে যথাযথভাবে পালন করা। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে নির্দেশ প্রদান করেছেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে যা দেন (নিয়ে এসেছেন), তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।'[১১০]

কুর'আনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল-ফাহেশা তথা খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে এবং মিথ্যা কথা বলে; জাকাত দেয় আবার সুদ গ্রহণ করে; হজ্ব করে আবার বেহায়াপনায় লিপ্ত হয়, রোজা পালন করে আবার ঘুষ খায়-তাহলে এ ব্যক্তির নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাতসহ ইত্যাদি ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ ইবাদতের জন্য তাকে সৃষ্টিও করা হয়নি। মানুষ আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের মাধ্যমে ইবাদত করবে তথা সৃষ্টির শুকরিয়া জ্ঞাপন করার কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আগমনের কারণে যে প্রক্রিয়ায় ইবাদত তথা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হবে তা হলো- আল্লাহতায়ালাকে রব হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তাঁর দাসত্ব স্বীকার করা। আল্লাহতায়ালার নির্দেশ মেনে তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা। সব বিষয়ে আল্লাহতায়ালার সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা অর্থাৎ আল্লাহতায়ালাকে প্রভু বলে স্বীকার করা; অন্য কাউকে নয়। আল্লাহর হুকুম-আহকাম তথা হালালকে হালাল আর হারামকে হারাম বলে জীবনের

---

১১০ (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ), আল-কুর'আন, ৫৯:৭

প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সব কাজ-কর্মে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলাই হলো মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।[১১১] আর তাঁর হুকুম-আহকাম পালনের আমলই হলো ইবাদত। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন কোনো উদ্দেশ্যহীন খেলা বা কাকতালীয় ঘটনা নয়; বরং প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ তাআলা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, যেখানে তার প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্ত একটি পরীক্ষার অংশ। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তিনি পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে"।[১১২] অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা, কে প্রকৃত ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ। এই পরীক্ষার ক্ষেত্র বহুমুখী; কখনো ঈমান ও আকিদার মাধ্যমে, কখনো ইবাদত ও ফরজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে, কখনো নৈতিকতা ও চরিত্রের মাধ্যমে, আবার কখনো ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কিংবা দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। কুর'আন স্পষ্টভাবে জানায়,

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান কেবলই পরীক্ষা"।[১১৩] মূলত এই দুনিয়ার জীবনই মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষার সময়সীমা, মৃত্যুর পর আর কোনো সুযোগ নেই; তখন কেবল বিচার ও প্রতিদান থাকবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাত, যা শান্তি, নিরাপত্তা, অফুরন্ত সুখ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আবাসস্থল। অন্যদিকে, পরীক্ষায় ব্যর্থতার পরিণতি হলো জাহান্নাম, যেখানে থাকবে চরম যন্ত্রণা, হতাশা ও শাস্তি। তবে ইসলাম এও শিক্ষা দেয় যে মানুষের আসল গন্তব্য কেবল জান্নাত বা জাহান্নাম নয়, বরং আল্লাহর চূড়ান্ত সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং দুনিয়ার জীবন আসলে একটি সুবিচারপূর্ণ পরীক্ষা, যার ফলাফল অনুযায়ী মানুষের চিরস্থায়ী গন্তব্য নির্ধারিত হবে।

৪.১ হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) কে পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা যখন প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর সঙ্গিনী হাওয়াকে দান করলেন, তখন তাঁদের জান্নাতে বসবাসের অনুমতি দিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে একটি বিশেষ নির্দেশ দিলেন জান্নাতের সব ফল তারা ভোগ করতে পারবে, তবে একটি নির্দিষ্ট গাছের কাছে যেতে পারবে না এবং ঐ বৃক্ষের ফল খেতে পারবেনা। কুরআনে আল্লাহ বলেন "আর আমি বললাম, হে

---

১১১ মুহাম্মদ আবু তালেব, প্রগুক্ত, পৃ. ১৩

১১২ আল-কুর'আন, ৬৭:২

১১৩ আল-কুর'আন, ৬৪:৫

আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে ইচ্ছেমতো প্রচুর ভোগ করো, কিন্তু এই গাছের কাছে যেয়ো না, তা না হলে তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।[১১৪] এখানে উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে কি না। কিন্তু শয়তান, যে আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল এবং প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব ছিল, সে কুমন্ত্রণা দিয়ে আদম ও হাওয়াকে সেই গাছের দিকে প্রলুব্ধ করল। কুর'আনে বলা হয়েছে, "অতঃপর শয়তান তাদেরকে প্রলুব্ধ করল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে বলল, তোমাদের প্রতিপালক কেবল এই জন্যই তোমাদেরকে এ গাছ থেকে বিরত রেখেছেন যে, তোমরা যাতে ফেরেশতা না হয়ে যাও কিংবা অমর না হয়ে যাও"।[১১৫] অবশেষে আদম ও হাওয়া উক্ত গাছ থেকে খেয়ে ফেললেন, ফলে তাঁদের উপর আল্লাহর নির্দেশ অমান্য হলো। তখন তাঁদের পোশাক সরে গিয়ে তারা লজ্জিত হলেন এবং তওবা করতে শুরু করলেন। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় নেমে যেতে আদেশ করলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের তওবা কবুল করলেন। পবিত্র কুর'আনে এসেছে,

فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

"তখন আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু শব্দ শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু"।[১১৬] এই ঘটনা মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বে গভীর তাৎপর্য বহন করে, কারণ এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো মানুষ ভ্রান্ত হতে পারে, শয়তানের প্রলোভনে পড়তে পারে, তবে আন্তরিক অনুতাপ ও তওবা করলে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা সম্ভব। একই সঙ্গে এখানে স্পষ্ট হলো যে দুনিয়ার জীবন হলো পরীক্ষার ক্ষেত্র, আর আদম-হাওয়ার প্রথম পরীক্ষা মানবজাতির জন্য শিক্ষা হয়ে আছে।

৪.২ মানুষের জীবন এক পরীক্ষার ময়দান

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন কোনো উদ্দেশ্যহীন খেলা নয়। বরং প্রতিটি মানুষকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, যেখানে তার প্রতিটি কাজ, চিন্তা ও উদ্দেশ্য একটি পরীক্ষার অংশ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের দুনিয়ার জীবন কোনো উদ্দেশ্যহীন খেলা নয়; বরং এটি একটি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ময়দান। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দেহ ও রূহের সমন্বয়ে, তাকে দিয়েছেন বোধ-বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও নৈতিক দায়িত্ববোধ, এবং পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন খলিফার দায়িত্ব

---

১১৪ (وَ قُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ), আল-কুর'আন, ২:৩৫

১১৫ (وَ قَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ), আল-কুর'আন, ৭:২০

১১৬ আল-কুর'আন, ২:৩৭

পালনের জন্য। এর মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে কিনা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করে কিনা। কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তিনি পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে"।[১১৭] এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে জীবন ও মৃত্যু উভয়ই মানুষের জন্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত কারও জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান হলো পরীক্ষা, কারও জন্য দারিদ্র্য ও রোগব্যাধি হলো পরীক্ষা, আবার কারও জন্য ক্ষমতা ও মর্যাদা পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝

"আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা; আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও"।[১১৮] অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতি সুখ, দুঃখ, সমৃদ্ধি কিংবা সংকট সবই পরীক্ষার অংশ। মানুষের প্রকৃত সফলতা হলো এই পরীক্ষায় ঈমান, ইবাদত, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হওয়া। কারণ দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষা সাময়িক, কিন্তু এর ফলাফল স্থায়ী; যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অপেক্ষা করছে, আর যারা ব্যর্থ হবে তাদের জন্য জাহান্নাম ও অনন্ত শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। তাই দুনিয়ার জীবনকে মুসলমান সর্বদা একটি আমানত ও পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে, যেখানে প্রতিটি মুহূর্তই আখিরাতের ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আসলে আল্লাহর কাছে জমা দেওয়ার মতো একটি উত্তরপত্র।

৪.৩ পরীক্ষার ক্ষেত্রসমূহ

মানুষের দুনিয়ার জীবন একটি পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা, আর এই পরীক্ষার ক্ষেত্র বহুমাত্রিক ও জটিল। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বান্দাকে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচাই করেন। প্রথমত, মানুষের ঈমান বা বিশ্বাস হলো প্রধান পরীক্ষার ক্ষেত্র। আল্লাহতে একত্ববাদে দৃঢ় থাকা, নবী-রাসূলদের অনুসরণ করা এবং কুরআন-সুন্নাহকে জীবন পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করাই এখানে মূল পরীক্ষা। দ্বিতীয়ত, ইবাদত ও ফরজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র। মানুষ কি সালাত, সওম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি আদায় করছে, নাকি অবহেলা করছে এভাবেই তার আনুগত্য যাচাই হয়। তৃতীয়ত, নৈতিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলির মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। সত্যবাদিতা, আমানতদারিত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, বিনয়, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি গুণের প্রকাশ মানুষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মানদণ্ড।

---

১১৭ আল-কুর'আন, ৬৭:২

১১৮ আল-কুর'আন, ২:১৫৫

চতুর্থত, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও সামাজিক মর্যাদাও পরীক্ষার মাধ্যম। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, اِنَّمَآ اَمۡوَالُكُمۡ وَ اَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ ۚ "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান কেবলই পরীক্ষা"।[১১৯] অনেক সময় সম্পদ ও ভোগ-বিলাস মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়, আবার অনেক সময় দারিদ্র্য ও অভাব মানুষকে হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। পঞ্চমত, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি ও জীবনের সংকটও পরীক্ষার ক্ষেত্র। মানুষের জীবনে যত রকম পরিস্থিতি আসে, তা আসলে তার ধৈর্য, ঈমান ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা যাচাইয়ের জন্য। সার্বিকভাবে বলা যায়, মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটি দিক বিশ্বাস, উপাসনা, নৈতিকতা, সম্পদ ও দুঃখ-কষ্ট সবই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য। মানুষকে আল্লাহ তাআলা নানা দিক থেকে পরীক্ষা করেন।

১. ঈমানের পরীক্ষা

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ও মৌলিক পরীক্ষা হলো ঈমানের পরীক্ষা। ঈমান মানে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, তাঁর সব গুণে দৃঢ় আস্থা, তাঁর রাসূলদের প্রতি অনুগত্য এবং কুরআন-সুন্নাহকে চূড়ান্ত জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা মানুষের ঈমানকে নানা অবস্থায় যাচাই করেন। কখনো তা ঘটে অবিশ্বাসী সমাজে বসবাসের মাধ্যমে, কখনো মিথ্যা প্রলোভন ও ভোগ-বিলাসের আহ্বানে, আবার কখনো বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে। কুর'আনে আল্লাহ বলেন,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ يُّتۡرَكُوۡۤا اَنۡ يَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَ هُمۡ لَا يُفۡتَنُوۡنَ

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা শুধু বললেই 'আমরা ঈমান এনেছি' ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?"।[১২০] অর্থাৎ মুখে ঈমানের দাবি যথেষ্ট নয়, বরং বাস্তব জীবনে ঈমানের প্রমাণ দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবারা মক্কা মুকাররমায় ঈমান আনার কারণে নির্যাতিত হয়েছেন, সম্পদ ও পরিবার হারিয়েছেন, এমনকি অনেকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। এগুলোই ছিল ঈমানের প্রকৃত পরীক্ষা। আজও মুসলমানদের জন্য ঈমানের পরীক্ষা নানাভাবে আসে কখনো ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে বাধার মুখোমুখি হতে হয়, কখনো ভোগবাদী সংস্কৃতি বা নাস্তিক দর্শনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি, যে সব প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, তাঁর বিধান মেনে চলে এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার জন্য চেষ্টা করে। কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো যে,

---

১১৯ আল-কুর'আন, ৬৪:১৫

১২০ আল-কুর'আন, ২৯:২

তোমরা মুসলিম থাকো"।[১২১] তাই ঈমানের পরীক্ষা আসলে মানুষের জীবনের সার্বিক পরীক্ষা, যা নির্ধারণ করে সে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা কিনা।

২. ইবাদতের পরীক্ষা

মানুষের জীবনে ঈমানের পরেই ইবাদত হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্যই। পবিত্র কুর'আনে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে, "আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিনি, শুধু এজন্য যে তারা আমার ইবাদত করবে"।[১২২] তাই নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্বসহ প্রতিটি ইবাদতই মানুষের পরীক্ষার অন্যতম ক্ষেত্র। একজন মানুষ সত্যিই আল্লাহর প্রতি অনুগত কি না, তা যাচাই হয় ইবাদতের মাধ্যমে। অনেক সময় মানুষ ব্যস্ততা, দুনিয়ার মোহ, অলসতা বা অন্যদের ভয়ে ইবাদতে গাফিলতি করে এটিই আসলে তার জন্য পরীক্ষা। নামাজই ইবাদতের পরীক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তদ্রূপ, রমযান মাসে রোজা রাখা, ধনীদের জন্য যাকাত আদায় করা, আর সক্ষমদের জন্য হজ্জ পালন করাড় এগুলোও আল্লাহর আদেশ মেনে চলার পরীক্ষাস্বরূপ। এ ছাড়াও দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা, জিকির ইত্যাদিও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইবাদতের পরীক্ষা। প্রকৃত মুমিন সেই, যে ইবাদতকে শুধু আনুষ্ঠানিকতা মনে করে না, বরং আন্তরিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা সম্পাদন করে। তাই ইবাদতের পরীক্ষা আসলে মানুষের আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত প্রমাণ।

৩. নৈতিকতার পরীক্ষা

সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, নম্রতা, সেবা এগুলোর মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের পরিমাপ হয়। মানুষের জীবনে নৈতিকতা বা চারিত্রিক গুণাবলি একটি বড় পরীক্ষা। কেবল ঈমান ও ইবাদত যথেষ্ট নয়, বরং তা মানুষের চরিত্রে প্রতিফলিত হতে হবে। ইসলাম নৈতিকতা বা আখলাককে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। সত্যবাদিতা, আমানতদারিত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, বিনয়, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা এগুলোই মানুষের নৈতিকতার পরিচয়। কিন্তু বাস্তবে এগুলোই মানুষের জন্য বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। কোনো লাভ বা স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলা, দুর্নীতি করা, প্রতার-ণা করা কিংবা অন্যের অধিকার নষ্ট করা এসবের মাধ্যমে মানুষ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়। আবার ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করলে বিনয়ী থাকা, ক্রোধের মুহূর্তে ধৈর্য ধরা, প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা এগুলো নৈতিকতার বড় চ্যালেঞ্জ। কুরআনে আল্লাহ বলেন "আল্লাহ ন্যায়বিচার, সৎকর্ম এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও বিদ্বেষকে নিষেধ করেন"।[১২৩] এ

---

১২১ আল-কুর'আন, ৩:১০২
১২২ আল-কুর'আন, ৫১:৫৬
১২৩ আল-কুর'আন, ১৬:৯০

আয়াত মানুষের নৈতিক পরীক্ষার পূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়। তাই একজন প্রকৃত মুমিন শুধু ইবাদতে নয়, তার কথাবার্তা, ব্যবহার, লেনদেন ও সামাজিক আচরণেও আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। নৈতিকতার এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়।

৪. দুনিয়ার মোহের পরীক্ষা

মানুষের জীবনে দুনিয়ার সম্পদ, সৌন্দর্য ও ভোগবিলাসও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে অর্থ, ক্ষমতা, সন্তান ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছেন, কিন্তু এই সবকিছু প্রলোভন হয়ে পড়লে মানুষের ঈমান এবং নৈতিকতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কুরআনে আল্লাহ বলেন "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান কেবলই পরীক্ষা, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহৎ প্রতিদান"[১২৪]। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তানের স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করার উপায়। অনেক সময় মানুষ এই সম্পদকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে মনে না করে অহংকার, দম্ভ বা অধিকার লঙ্ঘনের জন্য ব্যবহার করে। অন্যদিকে দারিদ্র্য বা অভাবের মুহূর্তও পরীক্ষা হিসেবে আসে তখন ধৈর্য, ধ্যান, ও আল্লাহর প্রতি ভরসা বজায় রাখতে হয়। অতএব, দুনিয়ার মোহ মানুষকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে, আবার এর মধ্যেও সঠিক ব্যবহার করলে তা স্বীকৃত নেকি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হতে পারে। প্রকৃত মুসলিম সেই, যে দুনিয়ার সম্পদ ও সাফল্যকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে, কখনো তা অহংকার বা অবাধ ভোগবিলাসের জন্য ব্যবহার করে না, এবং বিপদ বা অভাবের সময়ও আল্লাহর ওপর স্থির বিশ্বাস রাখে। ধন-সম্পদ, সন্তান, ক্ষমতা, ভোগবিলাস সবকিছুই মানুষকে বিপথে নেওয়ার মাধ্যম হতে পারে। কুর'আনে বলা হয়েছে: "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবলই পরীক্ষা।"[১২৫]

৫. দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা

মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, ক্ষতি ও বিপদও আল্লাহর প্রদত্ত পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা ও সম্পদের ক্ষতি দ্বারা, এবং কিছু প্রাণের ক্ষতি ও ফল-ফলের অভাবে; তবে ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও"।[১২৬] অর্থাৎ, জীবনের যেকোনো সংকট ও কষ্ট আল্লাহর দিক থেকে একটি পরীক্ষা, যা মানুষের ধৈর্য, ধ্যান, বিশ্বাস এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা যাচাই করে। কখনো মানুষ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিপদে পড়তে পারে, কখনো সামাজিক চাপে, কখনো শারীরিক বা মানসিক কষ্টেড় সবই ঈমানের পরীক্ষা। এই পরীক্ষা মানুষকে ধৈর্যশীল, বিনয়ী ও ধ্যানমগ্ন হতে শেখায় দুঃখ ও কষ্টের পরীক্ষা প্রকৃত মুমিনকে আরও দৃঢ় ঈমানী ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল করে তোলে। যারা এই পরীক্ষায় আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ধৈর্য প্রদর্শন

---

১২৪ আল-কুর'আন, ৬৪:১৫
১২৫ আল-কুর'আন, ৬৪:১৫
১২৬ আল-কুর'আন, ২:১৫৫

করে, তাদের জন্য পরকালের প্রতিদান জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই দুঃখ-কষ্ট কেবল শাস্তি নয়, বরং মানুষের আত্মাকে পরিপক্ক করার, তার ঈমান ও নৈতিকতাকে দৃঢ় করার, এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

৪.৪ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য

মানুষের দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহ তাআলা একটি পরীক্ষা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, এবং এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের প্রকৃত চরিত্র ও ঈমানের সত্যতা যাচাই করা। কুর'আনে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেন "মানুষ কি মনে করে যে, তারা শুধু বললেই 'আমরা ঈমান এনেছি' ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?"।[১২৭] অর্থাৎ মুখে ঈমান বা আনুগত্য প্রকাশ যথেষ্ট নয়; প্রকৃত পরীক্ষা ঘটে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে, যখন মানুষকে তার বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার ক্ষমতা যাচাই করতে হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ আলাদা করেন সত্যিকারের মুমিনদের যারা সংকট, প্রলোভন ও বিপদের মধ্যেও তাঁর উপর ভরসা রাখে এবং অন্যদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও দয়াশীল থাকে, আর যারা কেবল মুখে বিশ্বাস প্রকাশ করে বা বিপদের মুখে দুর্বল হয়। পরীক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো মানুষের আত্মাকে পরিপক্ক করা, ধৈর্য ও সংযমের গুণ বৃদ্ধি করা, এবং তাকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা। এভাবে প্রতিটি পরীক্ষা মানুষের জীবনের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা, যা তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, সতর্ক করে এবং চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাত বা জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করে। মানুষের পরীক্ষা করার পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো কে প্রকৃত মুমিন এবং কে কেবল মুখে বিশ্বাস প্রকাশ করে তা প্রকাশিত করা। "মানুষ কি মনে করে যে, তারা শুধু বললেই 'আমরা ঈমান এনেছি' ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?"[১২৮] আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য সে আল্লাহর আদেশ মানবে না কি অবাধ্য হবে। এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের ঈমান, আনুগত্য ও আমলের মান যাচাই করা। আল্লাহ বলেন, "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"[১২৯] অর্থাৎ দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা, আনন্দ-বেদনা সবই মানুষের জন্য পরীক্ষা। এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়, কে আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্য ধরে এবং কে বিপদের সময় হতাশ হয়ে অবাধ্য হয়ে যায়।

পরীক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা এবং তাকে জান্নাতের যোগ্য করে তোলা। আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি মনে কর, জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর এখনো

---

১২৭ আল-কুর'আন, ২৯:২
১২৮ আল-কুর'আন, ২৯:২
১২৯ আল-কুর'আন, ২:১৫৫

আসেনি সেইসব (কষ্ট ও বিপদ) যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল?"[১৩০] সুতরাং দুনিয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাদেরকে বাছাই করেন কারা সত্যিকার মুমিন, আর কারা কেবল মুখের কথা বলে।

৪.৫ পরীক্ষায় সফলতার ফলাফল জান্নাত

মানুষ যদি দুনিয়ার জীবনের সব পরীক্ষায় ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা, ধৈর্য ও আল্লাহর বিধান মানার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়, তবে তার চূড়ান্ত প্রতিদান হলো জান্নাত। জান্নাতকে বর্ণনা করা হয়েছে এক চিরন্তন শান্তি, নিরাপত্তা, সুখ, অফুরন্ত ভোগ, সুন্দর বাগান, নদী, ফলমূল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আবাস হিসেবে। এখানে মানুষের সব আশা পূর্ণ হয়, কোন দুঃখ-কষ্ট থাকে না, এবং সকল কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রতিদান মিলিত হয়। জান্নাত শুধু একটি স্বর্গীয় স্থান নয়; এটি আল্লাহর নিকট প্রিয়তার চূড়ান্ত স্বীকৃতি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন "কয়েকজন বান্দা এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, সে সেখানে চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে" (সহীহ মুসলিম)। তাই মানুষের জীবনের প্রতিটি পরীক্ষা, যখন ধৈর্য, তওবা, ধ্যান ও সৎকর্মের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়, তখন জান্নাত হলো তার চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী পুরস্কার। যারা ঈমান ও সৎকর্মে উত্তীর্ণ হয়, তাদের জন্য জান্নাত চিরস্থায়ী বাসস্থান। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে; সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।"[১৩১] জান্নাতকে কুর'আনে বর্ণনা করা হয়েছে শান্তি, নিরাপত্তা, চিরন্তন সুখ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জায়গা হিসেবে।

৪.৬ পরীক্ষায় ব্যর্থতার পরিণতি জাহান্নাম

মানুষ যদি দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা, ধৈর্য বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তাহলে তার চূড়ান্ত পরিণতি হলো জাহান্নাম। কুর'আনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "যারা আমার আয়াত অস্বীকার করেছে, তাদেরই হবে জাহান্নাম; সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে"।[১৩২] জাহান্নামকে বর্ণনা করা হয়েছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও যন্ত্রণাদায়ক, যেখানে আগুন, তীব্র পিপাসা, অপমান এবং অনন্ত শাস্তি থাকবে। এটি কেবল শাস্তি নয়, বরং মানুষকে তার ভুল, অবাধ্যতা ও অসৎকর্মের জন্য দায়ী করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন "জাহান্নামের এক অংশ এমন, যা প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের জন্য নতুন শাস্তি নিয়ে আসে" (সহীহ মুসলম)। এই কারণে, দুনিয়ার

---

১৩০ আল-কুর'আন, ২:২১৪
১৩১ আল-কুর'আন, ২:৮২
১৩২ আল-কুর'আন, ২:৩৯

জীবন হলো শেষ সময়ে প্রতিদান নির্ধারণের পরীক্ষা; যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে, তাদের জন্য আর কোনো সুযোগ থাকবে না। জাহান্নামের ভয় মানুষকে সতর্ক করে, বিপথগামী হওয়ার থেকে বিরত রাখে এবং জীবনে সৎকর্ম, ধৈর্য ও তওবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের গুরুত্ব শেখায়। সুতরাং, পরীক্ষায় ব্যর্থতা শুধুমাত্র শাস্তি নয়, বরং মানুষের জন্য শিক্ষা, সতর্কতা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উদাহরণ। যারা ঈমান অস্বীকার করে, অন্যায় করে ও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, তাদের গন্তব্য হলো জাহান্নাম। জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে আগুন, পিপাসা, অপমান, হতাশা ও শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৪.৭ পরীক্ষার সময়সীমা

মানুষের দুনিয়ার জীবনই আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষার সময়সীমা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে মানুষকে নানা ধরনের পরীক্ষা মোকাবিলা করতে হয় ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা, ধৈর্য, সম্পদ এবং দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে। মৃত্যুর পর আর কোনো পরীক্ষা নেই; তখন কেবল হিসাব ও প্রতিদান থাকবে। মানুষের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত পরীক্ষার সময়সীমা হলো দুনিয়ার জীবন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তই মানুষের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যুর মাধ্যমে পরীক্ষা করার জন্য কে সৎকর্ম করে আর কে খারাপ কাজ করে। কুরআনে আল্লাহ বলেন: "যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কর্মশীল।"[১৩৩] অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও এটি হলো মানুষের আখিরাতের সাফল্য নির্ধারণের একমাত্র সুযোগ। মৃত্যু এসে গেলে পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় এবং এরপর আর কোনো সুযোগ থাকে না। তাই মানুষকে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজে লাগাতে হবে, কারণ কিয়ামতের দিন এই দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন হলো একটি সীমিত সময়, যেখানে মানুষের প্রতিটি কাজ, চিন্তা ও সিদ্ধান্ত পরখ করা হয়। মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষের আমলনামা (কর্মপঞ্জি) আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা হবে, এবং কিয়ামতের দিন সেই অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি নির্ধারিত হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন "কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ; যদি কেউ এতে মুক্তি পায়, তার পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হবে, আর যদি ব্যর্থ হয়, পরবর্তী ধাপগুলো আরও কঠিন হবে"। তাই দুনিয়ার জীবন হলো সীমিত সময়ের পরীক্ষা, যার মাধ্যমে মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারিত হয়। মানুষের দুনিয়ার জীবনই পরীক্ষার সময়সীমা। মৃত্যুর পর আর কোনো পরীক্ষা নেই; কেবল হিসাব ও প্রতিদান। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "কবর হলো আখিরাতের প্রথম

---

১৩৩ আল-কুর'আন, ৬৭:২

ধাপ। যদি কেউ এতে মুক্তি পায় তবে তার পরের ধাপগুলো সহজ হবে, আর যদি ব্যর্থ হয় তবে পরের ধাপগুলো আরও কঠিন হবে।"

৪.৮ আখিরাতের বিচার প্রক্রিয়া

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন হলো একটি পরীক্ষার ময়দান, আর মৃত্যুর পর শুরু হয় আখিরাতের বিচার প্রক্রিয়া। কুরআনে বলা হয়েছে "তোমাদের প্রতিটি কাজের হিসাব আমরা কিয়ামতের দিন নেব"।[১৩৪] আখিরাতের বিচার প্রক্রিয়া অনেক ধাপে সংঘটিত হয়। প্রথমে কবরের জীবন, যেখানে মুমিন ও কাফিরদের জন্য আলাদা আলাদা পরীক্ষা ও শাস্তি বা শান্তি থাকবে। এরপর কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ পুনরুত্থিত হবে, এবং আল্লাহর সামনে তাদের কাজের রেকর্ড আমলনামা উপস্থাপন করা হবে। প্রত্যেককে তার কাজের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হবে; ডান হাতে পাওয়া ব্যক্তি মুক্তির পথে যাবে, আর বাম হাতে পাওয়া ব্যক্তি শাস্তির পথে পড়বে। এরপর সবার সামনে সেতু (সিরাত) অতিক্রম করার পরীক্ষা হবে, যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত। প্রকৃত মুমিন দ্রুত সেতু অতিক্রম করবে, আর কাফিররা সেখানে পতিত হবে। এভাবে প্রতিটি মানুষের জীবনের সব কাজ, ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা ও ধৈর্য যাচাই করা হয়। বিচার প্রক্রিয়ার শেষে চূড়ান্তভাবে মানুষের স্থায়ী গন্তব্য নির্ধারিত হয় যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা ব্যর্থ হয়েছে তারা জাহান্নামে পতিত হবে। আখিরাতের বিচার মানুষের সকল কাজের যথাযথ ফলাফল নিশ্চিত করে, যা দুনিয়ার জীবনের ন্যায় ও সুবিচারের ধারাকে পূর্ণতা দেয়।

ক. কিয়ামতের দিন হিসাব

কিয়ামতের দিন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মহাবিপর্যয়ের দিন, যখন আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিকে পুনরুত্থিত করবেন। দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পর মানুষকে পুনর্জীবিত করে ময়দানে মাহশারে একত্রিত করা হবে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন:

"সেদিন মানুষ দলবদ্ধভাবে তাদের রবের দিকে ফিরে আসবে, তখন তাদের আমল তাদেরকে দেখানো হবে।"[১৩৫]

এই দিনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ। ফেরেশতারা যে আমলনামা লিখে রেখেছে, তা মানুষের সামনে হাজির করা হবে। কারও আমলনামা যদি নেক কাজে ভরা থাকে, সে জান্নাতের সুসংবাদ পাবে। আর কারও আমলনামা গোনাহ ও অবাধ্যতায় পূর্ণ হলে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

---

১৩৪ আল-কুর'আন, ৮৩:৮

১৩৫ আল-কুর'আন, ৯৯:৬-৭

রাসূল (স.)বলেছেন:

"কিয়ামতের দিন বান্দা তার রবের সামনে দাঁড়াবে। তার দেহ নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে: তার জীবন কিসে কাটিয়েছে, তার যৌবন কী কাজে ব্যয় করেছে, তার সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় খরচ করেছে, আর সে তার জ্ঞান দ্বারা কী আমল করেছে।"[১৩৬]

কিয়ামতের হিসাবের সময় মানুষের মুখ বন্ধ থাকবে, বরং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজেরাই সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ বলেন: "আজ আমরা তাদের মুখমণ্ডলে সীল মেরে দেব, তাদের হাত আমাদের কাছে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তারা কী উপার্জন করত।"

কিয়ামতের দিন মানুষকে তার সমস্ত কাজের জন্য আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে, এবং তখন তার প্রতিটি ছোট-বড় কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন "অতএব প্রতিটি মানুষ তার কাজের জন্য নিজেকে দায়ী করবে"।[১৩৭] এই দিনটি হবে চূড়ান্ত বিচার ও হিসাবের দিন, যেখানে মানুষের জীবনকালের প্রতিটি কাজ, ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা ও আচরণ বিচার করা হবে। হিসাব গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নির্ভুল ও ন্যায্য হবে; কোন কাজই অমুল্য বা অপ্রকাশিত থাকবে না। প্রত্যেককে তার কাজের ভিত্তিতে তার স্থান নির্ধারিত হবেড়ডান হাতে পাওয়া ব্যক্তি মুক্তির পথে যাবে, যা জান্নাতের দিকে নির্দেশ করে, আর বাম হাতে পাওয়া ব্যক্তি শাস্তির পথে পতিত হবে, যা জাহান্নামের দিকে নির্দেশ করে। এই হিসাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে কে প্রকৃত মুমিন ও ধার্মিক, আর কে কেবল মুখে বিশ্বাস প্রদর্শনকারী। কুরআন ও হাদীসে হিসাব গ্রহণের ভয়ঙ্করতা এবং সতর্কবার্তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা মানুষকে দুনিয়ার জীবনকে দায়িত্বশীল ও সঠিকভাবে ব্যবহারের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। এই কারণেই কিয়ামতের দিন হিসাব মুসলমানদের জীবনে সৎকর্ম, ধৈর্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন।

খ. আমলনামা

ইসলামে আখিরাতের বিচার প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো আমলনামা বা কর্মপঞ্জি। কুরআনে আল্লাহ বলেন "আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য তার কাজের নথি তৈরি করেছি; এবং সে তা খোলা অবস্থায় পাবে"।[১৩৮] আখিরাতের দিন প্রতিটি বান্দার সব কাজ সৎকর্ম, পাপ, ইবাদত, নৈতিকতা, দান-সদকা, ধৈর্য, তওবা এর একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। মানুষকে তার নিজের আমলনামা প্রদান করা হবে। ডান হাতে যারা গ্রহণ করবে, তারা উত্তম বান্দা হিসেবে মুক্তির পথে যাবে

---

১৩৬ ইমাম তিরমিজি, *সুনান আত-তিরমিজি*, দারুস সালাম, ১৪২০ হিজরী, হাদিস.২৪১৬

১৩৭ আল-কুর'আন, ৪৫:১৫

১৩৮ আল-কুর'আন, ৯৫:৮

এবং জান্নাত লাভ করবে। আর বাম হাতে যারা পাবেন, তারা শাস্তির পথে পতিত হবে এবং জাহান্নামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। এই আমলনামার মাধ্যমে প্রতিটি কাজের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত হয়। এটি শুধু বিচার নয়, বরং মানুষের জন্য শিক্ষা এবং সতর্কবার্তা, যাতে দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি কাজ সতর্কতার সঙ্গে করা হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।আমলনামা হলো মানুষের দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মের বিস্তারিত রেকর্ড, যা কিয়ামতের দিন তার সামনে উপস্থাপন করা হবে। প্রতিটি মানুষের কথা, কাজ, ইবাদত, পাপ, গুনাহ সবকিছুই আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করেন। কুরআনে এ আমলনামার কথা বহুবার উল্লেখ এসেছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

"যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে: 'এসো, আমার আমলনামা পড়ো! আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমি আমার হিসাবের মুখোমুখি হব।' সুতরাং সে হবে সুখী জীবনে।"[১৩৯]

অপরদিকে, যারা গোনাহ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত ছিল, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"আর যে তার আমলনামা বাম হাতে পাবে, সে বলবে: 'হায় আফসোস! যদি আমাকে আমার আমলনামা না দেওয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব কী!'[১৪০]

গ. সিরাত সেতু

সিরাত সেতু হলো আখিরাতের এক ভয়ংকর বাস্তবতা, যা কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে অতিক্রম করতে হবে। এটি জাহান্নামের উপর বিস্তৃত থাকবে এবং মানুষের ঈমান ও আমল দ্বারা নির্ধারিত হবে তাদের অতিক্রম করার গতি। কুরআনের আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে (জাহান্নামের উপর) উপস্থিত হবে না; এটা তোমার রবের পক্ষ থেকে অবধারিত এক সিদ্ধান্ত। তারপর আমি মুত্তাকীদের উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে সেখানে হাঁটু গেড়ে ফেলে রাখব।"[১৪১]

মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে "উপস্থিত হওয়া" মানে হলো জাহান্নামের উপর দিয়ে সিরাত সেতু অতিক্রম করা। হাদিসের রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন,

"জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপন করা হবে। আমি ও আমার উম্মত হবে প্রথম, যারা এর উপর দিয়ে পার হবে। সিরাত সেতু তরবারির ধার থেকে ধারালো এবং চুল থেকে সূক্ষ্ম। মুমিনরা তাদের আমলের আলো অনুযায়ী পার হবে। কারো গতি হবে চোখের পলকের মতো, কারো হবে বিদ্যুতের মতো,

---

১৩৯ আল-কুর'আন, ৬৯:১৯-২১

১৪০ আল-কুর'আন, ৬৯:২৫-২৬

১৪১ আল-কুর'আন, ১৯:৭১-৭২

কারো হবে বাতাসের মতো, কারো হবে ঘোড়া বা উটের দৌড়ের মতো, আবার কেউ হবে দৌড়ানো, কেউ হাঁটা, কেউ হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থায়"[১৪২]

এই হাদিসে আরও এসেছে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, সর্বপ্রথম আমি সেই পুল অতিক্রম করব। আর সেই দিন সমস্ত রাসূলের দু'আ হবে اللهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! রক্ষা কর, রক্ষা কর। সেই পুলের মাঝে সা'দান নামক (এক রকম কাঁটাওয়ালা) গাছের কাঁটার মত কাঁটা থাকবে। তোমরা কি সা'দানের কাঁটা দেখেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূরাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কাঁটাগুলি সা'দানের কাঁটার[১৪৩] মতই হবে, তবে তা যে কত বড় হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সে কাঁটাগুলি মানুষকে তাদের 'আমল অনুসারে ছিনিয়ে নেবে। তাদের মাঝে কতক লোক এমন হবে যে তাদের 'আমলের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কতক লোক এমন হবে যে তাদের 'আমল হবে সরিষার মত নগণ্য। তবুও তারা নাজাত পাবে। এমন কি আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করবেন এবং لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ এর সাক্ষ্যদাতাদের থেকে যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন আল্লাহ্ তাদেরকে বের করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করবেন। সিজদার চিহ্ন দেখে ফেরেশতারা তাদেরকে চিনতে পারবে।"[১৪৪]সিরাত সেতু হলো মানুষের আখিরাতের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাগুলোর একটি। দুনিয়ার জীবনে সৎকর্ম, নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ, নৈতিকতা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই মুমিনরা আল্লাহর রহমতে নিরাপদে সিরাত অতিক্রম করতে পারবে। ইসলামিক ধারাবাহিকতায় কিয়ামতের দিন আখিরাতের বিচার ও হিসাব গ্রহণের পর প্রতিটি মানুষকে সিরাত সেতু অতিক্রম করতে হবে, যা জাহান্নামের উপর প্রসারিত। কুরআনে বলা হয়েছে "প্রতিটি মানুষকে সেতু অতিক্রম করতে হবে; যা কিছুই সে করেছে তার ওপর নির্ভর করবে সে কোথায় পতিত হবে"। সিরাত সেতু হলো মানুষের জীবনের সব কাজ, চরিত্র, ঈমান ও ধৈর্য পরীক্ষা করার একটি চূড়ান্ত ধাপ। প্রকৃত মুমিনরা আল্লাহর সাহায্য ও নির্দেশনা মেনে দ্রুত ও নিরাপদে সেতু অতিক্রম করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যারা পাপী বা কাফির, তাদের জন্য সেতু বিপজ্জনক হবে, এবং তারা জাহান্নামের দিকে পতিত হবে। হাদীসে এসেছে যে সিরাত সেতুর চেয়ে তীক্ষ্ম কিছু নেই এবং এটি আগুনের উপর তৈরি, যা মানুষের

---

১৪২ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-রিকাক (অধ্যায়: কোমল হওয়া), অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, হাদীস নং. ৬১২৬

১৪৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রগুক্ত, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, হাদীস নং. ৬১২৬ (এই হাদীসের বর্ণনায় এসেছে,এই কাঁটাগুলো দেখতে নজদ এলাকার সাদান কাঁটার মতো, যা অত্যন্ত ধারালো ও বাঁকানো এবং পুলসিরাতকে পিচ্ছিল করে তোলে। এই কাঁটাগুলো পাপী বান্দাদের ধরে ফেলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য ব্যবহৃত হবে, যেখানে মু'মিনরা তাদের ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে এই কাঁটাগুলো অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে।)

১৪৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-রিকাক (অধ্যায়: কোমল হওয়া), অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, হাদীস নং. ৬১২৬

ঈমান ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে তাদের গন্তব্য নির্ধারণ করবে। সিরাত সেতু এইভাবে আখিরাতের বিচারের চূড়ান্ত পরীক্ষা, যা নিশ্চিত করে যে মানুষ তার জীবনকালে করা প্রতিটি কাজের সঠিক প্রতিদান পাবে এবং আখিরাতের স্থায়ী গন্তব্য নির্ধারিত হবে।

৪.৯ মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য আল্লাহর সন্তুষ্টি

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের দুনিয়া হলো পরীক্ষার ময়দান, আর তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা, ধৈর্য এবং দুনিয়ার মোহ ও বিপদের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবে তার জন্য চূড়ান্ত পুরস্কার হবে জান্নাত, যা কেবল শারীরিক সুখ-সুবিধা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নিকটতার স্থায়ী আবাস। সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-তাহরীমের তাফসীর অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন "যাদেরকে আল্লাহ আনন্দিত করেছেন, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা চিরকাল সেখানে থাকবে"। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন মানে হলো মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা, চিরন্তন শান্তি এবং পরিপূর্ণ খুশি। এটি এমন এক পুরস্কার, যা দুনিয়ার কোনো সুখ-সুবিধার সাথে তুলনীয় নয়। মুসলিমদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিটি কাজ ও চিন্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, যাতে মৃত্যুর পর তারা চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। পরীক্ষার লক্ষ্য কেবল জান্নাত লাভ নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে মানুষের আত্মাকে পরিপক্ক করা, জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা এবং চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দ নিশ্চিত করা। তাই মানুষের জীবন, পরীক্ষা, হিসাব, সিরাত সেতু ও আখিরাতের সকল ধাপ মিলিয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। পরিশেষে, মানুষের প্রকৃত গন্তব্য কেবল জান্নাত বা জাহান্নাম নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ সেই সুস-ংবাদ প্রদান করে বলেছেন, "আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ। সেসব জান্নাতে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। যখনই তাদেরকে সেখান থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে: 'এ তো সেই ফল যা পূর্বে আমাদের দেয়া হতো।' আর তাদেরকে সদৃশ ফল দেয়া হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।"[১৪৫] মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। পৃথিবীতে মানুষের প্রতিটি আমল, ইবাদত, নৈতিক আচরণ ও জীবনের পথচলা মূলত আল্লাহর রেজা লাভের মাধ্যমেই সার্থক হয়। মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সফলতা হলো আল্লাহর আদেশ মানা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি খোঁজা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ফলেই মানুষ চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছায়। জান্নাত হলো চিরস্থায়ী শান্তি, প্রশান্তি ও আনন্দের আবাস, যেখানে কোনো দুঃখ, কষ্ট বা ভয় নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টিই জান্নাত লাভের মূল শর্ত। অপরদিকে,

---

১৪৫ (وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ), আল-কুর'আন, ২:২৫

আল্লাহর অসন্তুষ্টি মানুষকে চরম ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। এ ক্ষতির পরিণতি হলো জাহান্নাম, যেখানে শাস্তি ও দুঃখ-কষ্ট অনন্তকালীন হতে পারে। তাই মানুষের প্রকৃত চরম গন্তব্য নির্ধারণ হয় তার আমল, নিয়ত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সুতরাং মানুষের জীবনের আসল লক্ষ্য ও চরম পরিণতি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা এবং তাঁর রহমতের ছায়ায় জান্নাতের অনন্ত সুখ উপভোগ করা।

মানব জীবন সৃষ্টির বিশেষত্বের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই মানবজাতি আল্লাহ্ তা'আলার এক অনন্য সৃষ্টি। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষই একমাত্র সত্তা, যাকে জ্ঞান, বিবেক, আত্মচেতনা ও খলিফাতুল্লাহ্ হওয়ার মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে কেবল মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেননি; বরং তাঁর মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, যা তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল পৃথিবীতে বসবাস নয়, বরং আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ তাই দায়িত্বশীল, চিন্তাশীল ও নৈতিক সত্তা যার জীবন আল্লাহর হিদায়াত অনুযায়ী পরিচালিত হলে সে উভয় জগতে সফলকাম হয়। অতএব বলা যায়, মানব জীবন সৃষ্টির এই বিশেষত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা কেবল দেহের অধিকারী নই আমরা আত্মা, রূহ ও দায়িত্বের অধিকারী। আমাদের অস্তিত্বের প্রকৃত মর্যাদা নিহিত রয়েছে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ ও সৎকর্মের মাধ্যমে সেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানব সংস্কৃতিতে বৈচিত্রতা অত্যন্ত স্পষ্ট । কারণ প্রাচীনকাল থেকে এখন অবধি মানুষের সংস্কৃতি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। পৃথিবীতে কোন সংস্কৃতিই একবারে স্থির নয়। কিন্তু এত এত সংস্কৃতির ভীরেও ইসলামী সংস্কৃতির রয়েছে আলাদা পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি বুঝার জন্য আগে সংস্কৃতি কথাটির বিশ্লেষণ করা এবং জানা দরকার। কারণ সংস্কৃতি প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা নানানভাবে, নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার সংস্কৃতির সাথে জীবন দর্শনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। জীবন দর্শনের ভিত্তিতেই মানুষের চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হয় এবং তার ক্রিয়াকর্ম ও ভাবের পারস্পারিক আদান-প্রদান হয়। জীবনের বিষয়ে মানুষের এই বোধ এবং নানান ধরনের লক্ষ্যই হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান। সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে কোন জাতির শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনীতি, লোকাচার ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো মোটেই সংস্কৃতি নয়, বরং এগুলো সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, ফলাফল বা ধারক ও বাহন মাত্র। যা কেবলই সংস্কৃতির বাহ্যিক রূপের পরিচায়ক। তাই সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হলে অনুসন্ধান করতে হবে তার মৌলিক ভিত্তি ও মৌলিক উপাদান সমূহের। মানুষ কিছুই জানতোনা, তাকে শিক্ষা দিলেন সৃষ্টিকর্তা।[১৪৬] আর এই পৃথিবীতে মানুষের প্রথম জীবনচর্চা যেহেতু মহান আল্লাহর হেদায়েত ও আনুগত্য দিয়েই শুরু, তাই হজরত আদম (আ.)-এর দ্বারাই যে ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয় তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এবং যুগে যুগে নবী-রাসুল (স.)-এর মাধ্যমে তা বিকাশ লাভ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (স.)-এর যুগে এসে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। মানবজাতির হাজার হাজার বছরের ইতিহাস তার সংস্কৃতিরই ইতিহাস। কারণ মানুষকে আল্লাহ সভ্য জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষ একটি সুন্দর-রুচিশীল সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী। একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এর যাত্রা শুরু। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে জ্ঞান দিয়েছেন এবং সব বস্তুর নাম শিখিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে সব বস্তুর তাৎপর্য, ব্যবহারবিধি এবং অনুষঙ্গ আল্লাহর কাছ থেকে শিখেছেন। এর থেকে উপলব্ধি করা যায় সংস্কৃতির অর্থ উৎকর্ষ বা অনুশীলন। অধুনাতন ও সাধারণভাবে একক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিশেষ অর্থ হচ্ছে মানবজীবনের ও মনের উৎকর্ষ। মানুষকে কেবল তার জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি কিংবা নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্যও সৃষ্টি করা হয়নি। বস্তুজগতের মৌল উপাদানসমূহের কোন একটা বিশেষ উপাদানের দাসত্ব করাও তার কাজ নয়। জীবজন্তু যেমন প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়েই জীবন কাটায়,

---

১৪৬ মাহমুদুল হাসান নিজামী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

মানুষ সেভাবে জীবন কাটাতে পারে না। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে সে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বলোকের স্রষ্টারূপে চিনবে, জানবে এবং সমগ্র জীবনব্যাপী কেবল তাঁরই দাসত্ব করবে। সে এখানে আল্লাহর খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করবে। তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে- সে তার এ সংক্ষিপ্ত নির্দিষ্ট জীবনকালে বিরাট আমানত বহন করবে। আর সে আমানতের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে। সে আমানত হচ্ছে শারী'আত পালনের দায়িত্ব- আল্লাহর নিকট জবাবদিহির বাধ্য বাধকতা। সংস্কৃতি শব্দ গঠিত হয়েছে সংস্কার থেকে। যার অর্থ শুদ্ধি, পরিমার্জন ও মেরামত। সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনাচারের এমন সব রীতিনীতি আর আদর্শ, যা ব্যক্তি বা সমাজকে পরিশুদ্ধ করে তোলে। কাজেই একজন মুসলিম তার ব্যক্তি বা সমাজজীবনে সেই সব রীতিনীতি আর আদর্শেরই শুধু প্রতিফলন ঘটাবে, যা ইসলাম তাকে শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম তাকে যেভাবে যেখানে যে ধরনের কথা, কাজ, আচরণ আর আর্দশ শিক্ষা দিয়েছে, সে সবই তার সাংস্কৃতিক চৌহদ্দী। এর বাইরে কোনো রীতিনীতি আর আদর্শ কিছুতেই একজন মুসলিমের সংস্কৃতি হতে পারে না। আর এ কারনেই অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে ইসলামী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।[১৪৭]

কেননা ইসলামী সংস্কৃতি কখনো কেবল কোন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক হতে পারে না। আরো পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণের বাহন হতে পারে না; এবং এখানেই বিভিন্ন সংস্কৃতির সংগে তার পার্থক্য। এটা সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত সত্য যে, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সীমিত পর্যায়ে কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যক্তি-সমষ্টির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন নয়- বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে গোটা মানব-জাতির অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন।

১. সংস্কৃতি শব্দের প্রয়োগ ও সংজ্ঞা

সংস্কৃতি হচ্ছে মানব জীবনের সার্বিক অনুশীলন এবং সভ্যতার চেতনা। সংস্কৃতি মানব আদর্শে লক্ষ্যভূমির পথে অগ্রসরমান সভ্যতা এবং দর্শন। যা মানব মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, নৈতিকবোধ, মূল্যবোধে রুচির আদর্শ এবং সভ্যতার যোগান দিয়ে থাকে। আধুনিক সভ্যতা এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতিরই বিকশিত রূপ। তাতে বিভিন্ন সংস্কৃতির নির্যাস ও বাছাই-করা উপাদান নিঃশেষে লীন হয়ে রয়েছে। গ্রিক, রোমান, তুরান প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতির উত্তরাধিক-ার এতেই একীভূত। সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে অনুধাবন করতে না পারলে সমাজ ও সমাজের কোন আলোচনা বা পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমাজ ও সংস্কৃতি একই সাথে যুক্ত বলে এরা অবিচ্ছেদ্য। সংস্কৃতি শব্দটির ব্যবহার কখন

---

১৪৭ জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ঢাকা: রেদোওয়ান প্রকাশন, ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ৬৭

থেকে শুরু হয়েছে তার নির্দিষ্ট কোন তারিখ বা সময় কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture এর ব্যবহার হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে।[১৪৮]

ইংরেজি কালচার শব্দটির উৎপত্তি অতীত কাল সূচক ল্যাটিন ক্রিয়াপদ Colere থেকে যার অর্থ চাষ করা। শব্দটির বর্তমান ব্যবহার মধ্যযুগের ফরাসি এবং মধ্য ইংরেজি (১১০০-১৪৫০) থেকে। মধ্য ইংরেজিতে Culture শব্দটির অর্থ ছিল কর্ষিত ভূমি খন্ড। প্রাচীন ও মধ্যযুগে Culture শব্দটিকে Cultivation-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এর দ্বারা ভূমির উন্নয়ন এবং ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলকে বুঝানো হতো। পরবর্তীতে Culture শব্দটি দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার, প্রবৃদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ও বিকাশকে বুঝানো হয়। আধুনিক অর্থে প্রত্যয়টির বিকাশ ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊন-বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মধ্যে। Arnold তার Culture and Anarchy গ্রন্থে ১৮৬৭ সালে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতির আলাদা কোন ধারণা আছে বলে এখন আর মনে করা হয় না।

বাংলা ভাষায় "সংস্কৃতি" শব্দের ব্যবহার মূলত আধুনিক সময়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শুরু হয়। এটি সরাসরি সংস্কৃত ভাষার "সংস্কৃত" (संस्कृत) থেকে উদ্ভূত। বাংলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্যে মূলত "সংস্কৃত" বা "সভ্যতা" জাতীয় ধারণা থাকলেও "সংস্কৃতি" শব্দটি আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছে। আবার ইংরেজি Culture এর অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটিকে অনেকে এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলেও ১৯২০-এর দশকে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলা ভাষায় চালু করেন।[১৪৯]আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখের সময় থেকেই এটি দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে "সংস্কৃতি" বোঝাতো ব্যক্তির নৈতিক, বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক উৎকর্ষ এবং সমাজের উন্নতি, যা একটি সমৃদ্ধ জীবন ও সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে, বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ উন্নতির ধারণা প্রকাশের জন্য প্রচলিত হয়।[১৫০]

নৃবিজ্ঞানের আলোকে সংস্কৃতি

নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে সংস্কৃতি আবার ভিন্ন ধরনের একটি জটিল ধারণা। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এ প্রত্যয়টির প্রথম ব্যবহার করেন ১৮৪৩ সালে জার্মানির গুষ্টাভ খেলম Gustav Khelm। ১৮৭১ সালে নৃবিজ্ঞানী

---

১৪৮ ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম, *সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য* (কুষ্টিয়া: ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১৮

১৪৯ নীহারঞ্জন রায়, *কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি*, কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৯খ্রি., পৃ. ১-৮; ড. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ: সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, *ঢাকা*: মজিদ পাবলিকেশন্স,২০০৩ খ্রি, পৃ ১৩

১৫০ নীহারঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

ই.বি টাইলর E.B. Tylor স্বীকৃত নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞাটি প্রদান করেন। নৃবিজ্ঞানী এ.এল. ক্রোবার A.L. Kroeber ও ক্লাইড ক্লুকন Clyde Kluckhohn ১৯৫২ সালে সংস্কৃতির ১৬৪টি সংজ্ঞা লক্ষ্য করেন। আমাদের সাধারণ ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উৎকর্ষতার অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করি। আধুনিক সমাজ ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হয়েছে। নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টাইলরের মতে,"Culture, or civilization, taken in its broad, ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."[১৫১]

"সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচার, জ্ঞান, বিশ্বাস, কথা, নীতি, আইন, প্রথা, সংস্কার এবং অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমাবেশ–সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষ যা অর্জন করে।[১৫২]

জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন-কানুন এবং অনুশীলন ও অভ্যাস, যা মানুষ কোন এক সমাজের পরিবেশে আয়ও করে, সেসব কিছুই সে সমাজের সংস্কৃতি। সংজ্ঞাটির মূল বক্তব্য হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষ যে সব দক্ষতা বা নৈপুন্য অর্জন করে তাই সংস্কৃতি।

মানুষের সমগ্র জীবনব্যবস্থাই তার সংস্কৃতি। নৃবিজ্ঞানীদের মতে অনেকগুলো উপাদান মিলে সংস্কৃতি গড়ে উঠে, যেমন: নৃবিজ্ঞানী ক্লার্ক উইজলার সংস্কৃতির কতকগুলো উপাদানের কথা বলেছেন। যথা:

(১) **ভাষা:** প্রত্যেক সমাজেই ভাবের আদান-প্রদান হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষা একটি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধি দান করে। ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানসমূহের মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

(২) **বস্তুগত বৈশিষ্ট্য:** মানুষের বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৩) **শিল্পকলা:** শিল্পকলার মাধ্যমে একটি সমাজের হাজার বছরের ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ঐহিত্যগত উপাদান, কারুকার্যমণ্ডিত জিনিসপত্র, লোকগান, নৃত্য ইত্যাদি যা শিল্পকলার অংশ তা সংস্কৃতির উপাদান।

(৪) **পৌরাণিক কাহিনী ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান:** কোনো জাতিগোষ্ঠীর পৌরাণিক কাহিনী, যুদ্ধের বিজয়গাথা, মহাপুরুষের আগমন, দার্শনিক সত্য, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয় সংস্কৃতির উপাদান।

---

১৫১ Edward B. Tylor, *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*. ঠড়ষ. ১. খড়হফড়হ: ঔড়যহ গঁৎৎধু, ১৮৭১, ঢ়. ১.

১৫২ মালিক বিন নাবী, *মুশকিলাহ আস-সাকাফাহ*, দিমাশক: দাল আল-ফিকর, ১৯৮১খ্রি., পৃ. ২৮

(৫) **ধর্মীয় আচার-আচরণ:** ধর্মীয় আচার-আচরণ সামাজিক আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। তাই কোনো সংস্কৃতির অনেক উপাদানই সে সংস্কৃতির ধর্মীয় রীতিনীতির মাধ্যমে প্রবেশ করে থাকে। আমাদের দেশে অনেক ধর্মীয় আচার-আচরণ সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

(৬) **পরিবার এবং সামাজিক ব্যবস্থা:** সাধারণত পরিবার এবং সামাজিক অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আচার আচরণসমূহ পালন করা হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, পরিবার এবং সামাজিক ব্যবস্থা সংস্কৃতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৭) **সম্পত্তি:** সম্পত্তিও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়।

(৮) **সরকার:** সরকার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান।

(৯) **যুদ্ধ:** যুদ্ধবিগ্রহ, যুদ্ধের কলা-কৌশল, জয়-পরাজয় ইত্যাদি সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।

নৃতাত্ত্বিক Philip Bagby কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞাটি, "Culture is the socially transmitted patterns of behavior, attitudes, and values which serve as the design for living of a particular society."[153]

নৃবিজ্ঞানী Clark Wissler তাঁর Man and Culture নামক গ্রন্থে সংস্কৃতির নয়টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। যেমন-(১) ভাষা, (২) বস্তুগত বৈশিষ্ট্য (বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র ইত্যাদি), (৩) শিল্পকলা, (৪) পৌরাণিক কাহিনী এবং বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, (৫) ধর্মীয় আচার-আচরণ, (৬) পরিবার ও সামাজিক ব্যবস্থা, (৭) সম্পত্তি, (৮) সরকার এবং (৯) যুদ্ধ,[১৫৪]

সংস্কৃতি মানুষকে সমাজে একত্রিত করে, জ্ঞান সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি হলো মানুষের শেখা, ভাগাভাগি করা ও প্রজন্মান্ড়রে প্রেরিত আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবনধারার সমষ্টি। এটি মানুষের সমাজে অর্জিত সব জ্ঞান, রীতি, শিল্প, ধর্ম, আইন ও নৈতিকতার সমাহার।

সমাজবিজ্ঞানের আলোকে সংস্কৃতি

সমাজবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়াং তাঁর Sociology নামক গ্রন্থে সংস্কৃতির তেরোটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৫৫] যেমন:

---

১৫৩ Philip Bagbey, *Culture and History*, University of California Press-1963, p.72,95

১৫৪ Clark Wissler, *Man and Culture*, Thomas Y. Crowell Company, New York. 1923, pp.74-76

১৫৫ Kimball Young, *Sociology: A Study of Society and Culture*, American Book Compny,1949, p.89

(১) ভাবের আদান প্রদানের ধরন (অঙ্গভঙ্গি ও ভাষা);

(২) মানুষের দৈহিক চাহিদা পূরণের উপাদান ও পদ্ধতি (খাদ্যগ্রহণ, ব্যক্তিগত সেবাযত্ন, আশ্রয়, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি,ইত্যাদি);

(৩) যাতায়াতের উপায় (বাস, ট্রেন, লঞ্চ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি);

(৪) জিনিসপত্র ও সেবার আদান প্রদান (পণ্য বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা ইত্যাদি);

(৫) সম্পত্তির ধরন (বস্তুগত ও ব্যক্তিগত);

(৬) পরিবার ব্যবস্থা (বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ), জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সম্পর্ক, অভিভাবকত্ব এবং উত্তরাধিকার;

(৭) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি প্রতিষ্ঠান (অবশ্য পালনীয় লোকরীতি, জনমত, সংগঠিত রাষ্ট্র, আইন-কানুন, রাজনৈতিক দলসমূহ ও নেতৃত্ব, যুদ্ধবিগ্রহ);

(৮) শৈল্পিক অভিব্যক্তি (স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংগীত, সাহিত্য, নৃত্য ইত্যাদি);

(৯) অবসর বিনোদন মূলক কর্মকাণ্ড (সিনেমা দেখা, গান শোনা, পত্রিকা পড়া, খেলাধুলা ইত্যাদি);

(১০) ধর্ম ও যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও আচার আচরণ;

(১১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি;

(১২) পুরাণ ও দর্শন; এবং

(১৩) মৌলিক মিথষ্ক্রিয়াসূচক প্রক্রিয়াসমূহের সাংস্কৃতিক কাঠামো।

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সংজ্ঞাকে ট্যালকট পার্সনস্ তুলে ধরেছেন তাঁর স্বভাবসুলভ জটিলতায়। "Culture---- consists in patterned ordered systems of symbols which are objects of orientation of action, internalized components of the personalities of individual actors and institutionalized pattern of social system."[156] সমাজবিজ্ঞানে পার্সনস্-এর প্রবল প্রভাবের জন্য সংস্কৃতিকে প্রধানত: প্রতীকি ব্যবস্থা হিসাবে দেখা হয়েছে। ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী এন্থনি গিডেন্স Anthony Giddens (১৯৯৩) সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধ এবং বস্তুগত দ্রব্যকে। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতির আলাদা কোন ধারণা আছে বলে এখন আর মনে করা হয় না। Collins Dictionary of English Language (১৯৭৯)-এ সংস্কৃতির প্রথম যে দু'টি অর্থ উল্লেখ করা হয় তা এই পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।[১৫৭]

---

১৫৬ Talcott Parsons, *The Social System*. Glencoe, IL: Free Press, 1951, p. 51

১৫৭ *Collins Dictionary of the English Language,* Editor- Patrick Hanks, Collins1979, p.156

১. ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের সমগ্র যা সামাজিক কর্মের সাধারণ ভিত্তি গঠন করে The total of the inherited ideas, believes, values and knowledge, which constitute the shared bases of social action.

২. সাধারণ ঐতিহ্যে আবদ্ধ কোন গোষ্ঠীবদ্ধ জনসমষ্টির কার্যাবলী ও চিন্তার সামগ্রিকক্ষেত্র, যা ঐ গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা পরিবাহিত ও শক্তিশালী হয়: যেমন, মায়াদের সংস্কৃতি, The total range of activities and ideas of a group of people with shared traditions, which are transmitted and reinforced by members of the group: the Mayon Culture.

সমাজবিজ্ঞানের মূল ধারার মধ্যে সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও দু'টি বিষয় আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রথমটি হচ্ছে সংস্কৃতির অন্তর্গত বিভাজন। সংস্কৃতিকে কয়েকটি অংশে বিভাজিত করে দেখা যায়।

১. **উঁচু সংস্কৃতি:** প্রধানত: জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক সংস্কৃতি

২. **জনপ্রিয় সংস্কৃতি:** প্রধানত: গণমাধ্যমভিত্তিক সংস্কৃতি যা প্রায় একই রূপে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায় এবং তাদের চিন্তা এবং বিশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে অনেক সময় মাসকালচার বা গণসংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মাসকালচার বা গণসংস্কৃতিতে রুচির অবনতি ঘটে-সরল, উপভোগ্য এবং নৃশংস বিষয় এখানে প্রাধান্য পায়।

৩. **লোক সংস্কৃতি:** লোক সংস্কৃতি বলতে বোঝায় গ্রামীণ বা কৃষকের সংস্কৃতি যেখানে ধর্ম, ঐন্দ্রজালিকতা এবং জ্ঞাতি-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে প্রধানত: নির্মিত হয় প্রতীকি ভুবন।

সংস্কৃতি হচ্ছে-"কোন জাতি বা গোষ্ঠীর শিক্ষা-সাহিত্য, বিশ্বাস, ধর্ম, আচার, আচরণ ও তার চর্চার সামগ্রিক রূপ। শিক্ষা চর্চার ফলে পাওয়া মানসিক বিকাশ।"[১৫৮] এই কালপর্বে সংস্কৃতি চারটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১. 'মানব হৃদয়ের সাধারণ অবস্থা অথবা অভ্যাস' ধারণাটি যুক্ত ছিল মানুষ সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা অর্জনে সক্ষম এই বিশ্বাসের সাথে।

২. সামগ্রিক কোন সমাজের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক উন্নয়নের সাধারণ রূপ।

৩. কোন সমাজের সমগ্র জীবনধারা– তার বস্তুগত, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক রূপ।

৪. সংস্কৃতি হচ্ছে মানব প্রকৃতির আদর্শরূপকে অর্জন করার সচেতন, কঠিন এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টা।

The New Encyclopedia Britannica তে বলা হয়েছে : 'Culture consists of language, ideas, beliefs, customs, taboos, codes, institutions, tools, techniques, rituals, ceremonies and other related components.'[১৫৯]

---

১৫৮ *বাংলা একাডেমী-সহজ বাংলা অভিধান*, সম্পাদক- মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০৩, পৃ-৩৮৮

The world Book Encyclopedia তে বলা হয়েছে, "Culture consists of all the ideas, objects and ways of doing things created by the group. Culture includes arts, beliefs, customs, inventions, language, technology and traditions. The term civilization is similar, but it refers mostly to scientifically more advanced ways of life. A culture is any way of life, simple or complex. Culture consists of learned ways of acting, feeling and thinking, rather than biologically determined ways."[১৬০]

এক কথায় সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন বিশ্লেষণের।

সংস্কৃতির সংজ্ঞায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, নির্মিত সামগ্রীতে শ্রী, যন্ত্র উৎকর্ষ, চিন্তায় শ্রেয়োবুদ্ধির দীপ্তি, কর্মে কল্যাণ চেতনার ব্যঞ্জনা,আচরণে সৌজন্যের আভা, লজ্জায় সৌন্দর্য, কথায় মাধুর্য, চোখে প্রীতির প্রভা, এবং জীবনাচারে সমসবার্থে সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার ও সহাবস্থানের আগ্রহ আর সুরুচির ও সৌজন্যের সামগ্রিক লাবণ্যই সংস্কৃতি।[১৬১]

ড. আহমদ শরীফ এর মতে, সংস্কৃতি একটি পরিশ্রুত জীবন চেতনা। ব্যক্তি চিত্তেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। যার প্রেরণার মূলে রয়েছে সৌন্দর্য্য অন্বেষা। অতএব মৌলিক সংস্কৃতি মাত্রই সৃজনধর্মী ও গতিশীল। ক্রমোৎকর্ষ ও উন্নয়নই এর ধর্ম।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী "তাঁর সংস্কৃতি কথা" গ্রন্থে বলেন, সমাজ মানুষকে সাধারণভাবে, মানুষ আবার নিজেকে বিশেষভাবে গড়ে তোলে শিক্ষা, সৌন্দর্য ও সাধনার মাধ্যমে। নিজেকে বিশেষভাবে গড়ে তোলার নামই সংস্কৃতি। যার লক্ষ্য মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন করা।

পারিভাষিক অর্থে সংস্কৃতি

সংস্কৃতি শব্দটি সংস্করণ বা সংস্কার বিশেষ্য পদ থেকে গঠিত। সংস্করণ অর্থ বিশোধন, সংশোধন। সংস্কার অর্থ শুদ্ধিকরণ, শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও অনুষ্ঠানাদি থেকে পবিত্রকরণ, শোধনকরণ, পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকরণ, পরিষ্কার বা নির্মূলকরণ, অলংকরণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান, মেরামতকরণ। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতিনীতি ও মার্জিত আচার আচরণ ইত্যাদির উৎকর্ষ হচ্ছে কৃষ্টি বা এর বিশেষণ। কৃষ্টিও সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কর্ষণ (অর্থ ঘর্ষণ) থেকে এর উৎপত্তি অনুশীলনও এর এক অর্থ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃতি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে যে সমস্ত শব্দ

---

১৫৯ *The New Encyclopedia Britannica*, vol-3, founded 1768, 15 th edition, p. 784

১৬০ *The World Book Encyclopedia*, (ci-cz), vol-4, Field Enterprises, INC, Chicago.

১৬১ ড. আহমদ শরীফ, *শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতি*, ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ.৩২

ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর শাব্দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংস্কৃতির সার্বিক বৈশিষ্ট্যই হলো মানবীয় বিকাশের ফসল।

বাঙালি সংস্কৃতি বলতে সাধারণত বোঝানো হয় বিশেষ সমাজের সাহিত্য, সংগীত, ললিত কলা, ক্রীড়া, মানবিকতা, জ্ঞানের উৎকর্ষ ও আরো অনেক শান্তি ও সৌন্দর্যের সমাহার। এর পরও, ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে সংস্কৃতি হলো মানুষের জ্ঞান, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতিনীতি, নীতিবোধ, চিরাচরিত প্রথা, সমষ্টিগত মনোভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্জিত কীর্তিসমূহ।

যেহেতু সব সংস্কৃতিই উৎস, বিকাশ, মূল্যবোধ এবং সংগঠনের দিক দিয়ে বিশিষ্ট, তাই বাহ্যিক রূপরেখা, তার বিবিধ প্রকাশ এবং নির্যাসে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি থেকে যথেষ্ঠ পৃথক। হাজার হাজার বছর ধরে নানা নৃতাত্ত্বিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী ও শাখা-গোষ্ঠী, নানা শ্রেণির মিলন, পারস্পরিক প্রভাব এবং সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে বঙ্গীয় সংস্কৃতি। বহু শতাব্দী ধরে সংস্কৃতির বিভিন্ন, এমনকি, পরস্পর-বিরোধী উপাদানের সহাবস্থান এবং সমন্বয়ের ফলে বঙ্গীয় অঞ্চলে বাঙালিত্বের এমন এক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে যাকে বলা যায় বঙ্গীয় সংস্কৃতি এবং এক কথায় বলা যায় বঙ্গদেশ ও বাংলাভাষীদের সংস্কৃতি।[১৬২]

২. ইসলামি সংস্কৃতির পরিচয়

শান্তি, সুন্দর ও মানবতাবাদী আদর্শ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের রয়েছে স্বাতন্ত্র সংস্কৃতি। ইসলামি সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি এক উন্নত মতাদর্শ। ইসলামি শরী'আহ অনুমোদিত সকল কর্মকাণ্ড ইসলামি মূল্যবোধের নিরিখে সম্পাদন করাই ইসলামি সংস্কৃতি।[১৬৩] ইসলামি সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীনভিত্তিক। দ্বীনি ভাবধারাই তার প্রাণশক্তি ও আসল নিয়ামক। আর ইসলামি সংস্কৃতিতে ইসলামি মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে থাকে। ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্বভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার এককত্ব ও অনন্যতা এবং জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার সুদৃঢ় ধারণা এমন এক একাত্মতা ও অভিন্নতার সৃষ্টি করে যার দরুন মানব সমাজের বাধ্যবাধকতা নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে যায় । মূলত আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামি শরিয়াহর আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের জীবনের সব কর্মকাণ্ডই ইসলামি সংস্কৃতির আওতাভুক্ত, যা মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।[১৬৪]

---

১৬২ "বাঙ্গালি সংস্কৃতি," *বাংলাপিডিয়া: জাতীয় বিশ্বকোষ*, খণ্ড.৩, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৫-৪৮

১৬৩ মাজাল্লাহ আল-ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ আল-ইসলামিয়্যাহ, *মাদখাল ইলা ইলম আস-সাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যা*, সং. ২, মুহাররম-১৪১০ হি., পৃ. ৮৯,

১৬৪ মো. জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত, *আমাদের সংস্কৃতি বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০১ খ্রি., পৃ. ১৪৩

সামগ্রিকভাবে মানবজীবনে ইসলামের আদর্শকে মহিমাময় করে তোলাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। মানব জীবনের অনাবিল আচার-আচরণ ইসলামী সংস্কৃতির আওতাভূক্ত হলে ইসলামের মূল্যবোধে পাওয়া যায় সত্যের সন্ধান, তখন জীবন হয়ে ওঠে মহত্ত্বের অধিকারী। ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে মানবজীবনের কল্যাণ সাধন। ইসলামী সংস্কৃতি মানবজাতিকে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সাফল্য লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এই সাফল্য অর্জনের জন্য আল কুরআন এবং হাদিসের আলোকে জীবন-যাপনে মানব জাতির মধ্যে থাকতে হবে সাধনা। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।"[১৬৫]

মোটকথা মানুষের আক্বিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী তার বাস্তব জীবনে, আচার-আচরণে, প্রতিটি কাজে।

২.১ ইসলামি সংস্কৃতি এর কয়েকটি প্রতিভাষা

সংস্কৃতি শব্দটি সাধারণত সাকাফাহ, তাহ্যিব, তামাদ্দুন বা কালচারের প্রতিশব্দ। আরবিতে যাকে সাকাফাহ্ (ثَقَافَة) বলা হয়। আরবী ভাষায় ثقف বা ثقف লাযিম (অকর্ম ক্রিয়া) ও মুতাআদ্দি (সকর্ম ক্রিয়া) উভয় পদেই ব্যবহৃত হয়। আরবী সাকাফাহ শব্দ দক্ষতা, নিপুণতা, কৌশল, বুদ্ধিমত্তা, প্রভাবশালী, বিজয়ী, সোজা করা এবং যোগ্যতা সৃষ্টি করা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৬৬] সাকাফাহ্ শব্দটি প্রায়শই বুদ্ধিমত্তা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন-একে অপরকে 'সাকিফুন' বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণ বলে অভিহিত করে।[১৬৭] আল্লামা মাহমুদ ইবনে ওমর আয-যামাখশারী (র) বলেন: 'সাফাত' শব্দের পরিভাষাগত অর্থ হচ্ছে আদব কায়দা শেখানো সুসভ্য করে গড়ে তোলা।[১৬৮] Cowan তার A Dictionary of Modern Written Arabic-এ ثقافة শব্দটির অর্থ করেছেন: Culture, Refirement, Education, Civilization[১৬৯] শব্দটির অর্থ আরও বিস্তৃত ও প্রশস্ত হয়েছে। এটি

---

১৬৫ আল-কুর'আন, ৪৭:৩৩

১৬৬ হাসান আইয়ুব, *তাবসীতুল আকাইদ আল-ইসলামী* (বৈরুত: দারুন নাদওয়া আল-জাদিদাহ, ১৪০৩হি./১৯৮৩খ্রি.), স. ৫, পৃ. ১০; মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী, *আল-কামুস আল-মুহীত* (মিশর: ১৩৫৪হি., সং-৫৪), খ.৩, পৃ. ১২৫; রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত মাদ্দাহ-*ثقف, পৃ. ১০৭

১৬৭ Michael Philip Wes and James Gareth Endicott : *The New Method English Dictionary*; Revised Edition, longmans, Green and co, London, 1948, p.78

১৬৮ মাহমুদ যামাখশারী, *আসাস আল-বালাগাহ*, কায়রো: আল-হাইয়্যাহ আল-আম্মাহ লিকুসুর আস-সাকাফাহ, ২০০৩খ্রি., পৃ. ৯৫; হাসান আইয়ুব, *তাবসীতুল আকাইদ আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১৬৯ Hans Wehr, J Milton Cowan, Editor, J Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Spoken Language Services, ink. 1976, p. 104

পরিমার্জিত ও শিক্ষিত হওয়া মানুষের মনের যে কোন বিকাশকে বুঝায় (تهذيب أو تثقيف العقل/ To cultivate one's mind)।[১৭০] অর্থাৎ সংস্কৃতি, পরিশোধন, শিক্ষা, পরিশীলিত, প্রশিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুসাক্কাফ' বা সংস্কৃতিবান। আরবী ভাষায় সংস্কৃতিকে تمدن- تهذيب - ثقافة তিনটি শব্দে বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়।

সংস্কৃতি শব্দটি সাধারণত সাকাফাহ, তাহ্যিব, তামাদ্দুন বা কালচারের প্রতিশব্দ। আরবিতে যাকে বলা হয় সাকাফাহ্ (ثَقَافَة) সংস্কৃতি শব্দটি সংস্করণ বা সংস্কার বিশেষ্য পদ থেকে গঠিত। সংস্করণ অর্থ বিশোধন, সংশোধন। আর সংস্কার অর্থ শুদ্ধিকরণ, শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পবিত্রকরণ বা শোধন করণ, পরিষ্কার বা নির্মল করণ, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান ও মেরামতকরণ। অতএব, সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের উপযুক্ত, সুন্দর, মার্জিত ও পরিশীলিত আচার-আচরণ, আহার-বিহার, চলাফেরা, শোক- তাপ, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, ধর্মীয় রীতি-নীতি, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা এবং মানুষের দিন রাত্রির হাজারো কাজ-কর্ম এ সব কিছুরই সমষ্টি।

সাকাফাহ (الثقافة), ইলম (العلم) ও হাদারাহ (الحضارة) বা সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য হলো- সংস্কৃতি হলো মানসিক ও আত্মিক দিক সমূহ – জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সমন্বয়। শহুরে জীবন হলো দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত পদার্থিক উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা এবং সেবা। সভ্যতা হলো এই দুইয়ের সংমিশ্রণ, অর্থাৎ কোনো জাতির ঐতিহাসিক সময়ে অর্জিত জ্ঞান, সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি।[১৭১]

অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামী সংস্কৃতি বলতে সেই ভাবধারাকে নির্দেশ করে যা মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিলো এবং মদিনা রাষ্ট্রের জনগনের মধ্যে সর্বপ্রথম সমাদৃত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা বিভিন্নভাবে ইসলামী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৭২] এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ইসলামী আচার-আচরণ, জীবনদর্শন, শিক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বোপরি মানবজীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থায় ইসলামী পদ্ধতি অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। মুসলমানদের অনুশীলিত ধর্মাচার, স্থানীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়ম-পদ্ধতি, জীবনপ্রক্রিয়া ও ঐতিহ্যের যা কিছু ইসলামের নিয়মাবলি অনুমোদন ও প্রতিফলিত হয় সেগুলোকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে।

---

১৭০ Elias Antoon Elias, *Modern Dictionary English-arabic*, Cairo: Modern Press,1951, p.71

১৭১ প্রফেসর ড. মুস্তাফা মুসাল্লাম ও প্রফেসর ড. ফাতহী মুহাম্মাদ আয-যাগবী, *আস-সাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, মদিনা: মাকতাবাহ আল-জামিয়া, সং-১, ২০০৭খ্রি., পৃ. ১৯

১৭২ ড. এ কে এম নূরুল আলম, *সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য*, কুষ্টিয়া: পেয়ারাতলা, ২০০২ খ্রি., পৃ. ১২০

প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আল্লামা আবুল হাশিম তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্রিড অব ইসলাম' বলেন, ' ইসলামী সংস্কৃতি হলো মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলোর ইসলামী নীতি, আদর্শ ও শিক্ষাসম্মত উৎকর্ষসাধন পদ্ধতি এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বাস্তব রূপ।[১৭৩]

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ জনাব ফায়যী ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর এ জীবন ব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস বুঝায়। উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রে কোন এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য। মুসলমানদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজকর্ম, ভাষার ব্যবহারও সামাজিক নিয়ম-প্রথার বিশেষ সংযোজন।

এম. জেড. সিদ্দীকী বলেন, ইসলামী সংস্কৃতির দুটি অর্থ: একটি হলো তার চিরন্তন দিক। আর অপরটি হলো সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজ সংস্থা। কিন্তু আমরা প্রথমটিকেই সংস্কৃতি মনে করি। কারণ সংস্কৃতি হলো এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে। যেমন মহান আল্লাহর একত্ব, মানুষের উচ্চ মর্যাদা এবং মানব সমাজের ঐক্য ও সাম্যসংক্রান্ত বিশ্বাস। ইসলামি জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে তাই ইসলামি সংস্কৃতি। ইসলামি সংস্কৃতিতে ইসলামি মূল্যবোধ, আকীদা-বিশ্বাস ও আচরণিক কার্যাদি সবই ইসলামি শরিয়াতের অনুকূল থাকে।[১৭৪] শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য শিল্প ইত্যাদি ইসলামি ভাবধারায় গড়ে উঠে। এক কথায়, জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামি মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়মাবলী, বিধি-বিধান পালনীয় এর সব কিছুই ইসলামি সংস্কৃতির অঙ্গ। ইসলামি জীবন বোধের বিপরীতে কোন আচার-আচরণ ও কৃষ্টি কোন মুসলমান গ্রহণ করলে তা ইসলামি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়না। বরং বিজাতীয় অনুকরণ, কুসংস্কার, বিদআত ও ক্ষেত্র বিশেষে শিরক হিসেবে আখ্যায়িত হয়। ইসলামি সংস্কৃতিতে বিজাতীয় অনুকরণ নিষিদ্ধ। মহানবী (স.) বলেন-

مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنهُم

'যে ব্যক্তি অপর জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।' [১৭৫]

২.২ ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা

আসলে মানুষের সমগ্র জীবন চর্চাই সংস্কৃতি। আর জীবন যেহেতু গতিশীল তাই সংস্কৃতিও সবসময় গতিশীল। জীবনের শুরু যেখান থেকে সংস্কৃতির সূচনা বিন্দুও সেখানেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম জীবন চর্চা যেহেতু মহান আল্লাহর হিদায়াত ও আনুগত্য দিয়েই শুরু। তাই এ প্রথম জীবন চর্চাই ছিল

---

১৭৩ ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ.৩৯

১৭৪ গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী (হযরত রসূল (স:) এর জীবনী)*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩, পৃ.৪৫

১৭৫ ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ' আস আস সিজিস্তানী (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, অনু. অধ্যাপক ইয়াকুব শরীফ ও অন্যান্য, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯০ খ্রি., অধ্যায়: পোশাক পরিচ্ছদ, পরিচ্ছেদ: খ্যাতি লাভের পোশাক পরা, হা. ৪০৩১

ইসলামী সংস্কৃতির প্রাথমিক ও মূল ভিত্তি। ইসলামি জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে তাই ইসলামি সংস্কৃতি। ইসলামি সংস্কৃতিতে ইসলামি মূল্যবোধ, আকীদা-বিশ্বাস ও আচরণিক কার্যাদি সবই ইসলামি শরিয়াতের অনুকূল থাকে। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য শিল্প ইত্যাদি ইসলামি ভাবধারায় গড়ে উঠে। এক কথায়, জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামি মৌল বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়মাবলী, বিধি-বিধান পালনীয় এর সব কিছুই ইসলামি সংস্কৃতির অঙ্গ। মূলত ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কিছু ধারাবাহিক কাঠামোকে অনুসরণ করা বুঝায়। যেমন: আল-করআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত জীবনাচার। জীবনযাপন, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণের ইসলাম নির্দেশিত প্রতিফলনই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। যে আচার, ক্রিয়া, রুচি ও চেতনা জীবনকে সুন্দর করে, সুষমামণ্ডিত করে, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে, ইসলামের মূল্যবোধলগ্ন, সেসব আচারের প্রতিফলন হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। এর মূলে আছে আল কুরআন ও মহানবীর জীবনে তার বাস্তবায়িত রূপ। শান্তি, সুখ, স্বাধীনতা ও সর্বজনীন কল্যাণই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইসলামি সংস্কৃতি প্রধানত উন্নততর ভাবধারার সেই মানকে নির্দেশ করে, যা মহানবী (স.) প্রবর্তিত ইসলামি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর আওতায় আসে সেই সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান, যার ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা নিহিত সেই আদর্শে, সেই শিক্ষায়।[১৭৬] মুসলিমদের অনুশীলিত জীবনপ্রক্রিয়া, ধর্মাচার, সামাজিক নিয়ম ও ঐতিহ্যের যা কিছু ইসলামের নির্দেশনা ও অনুমোদন পায়, সেগুলোর সুকৃত ও প্রতিফলিত রূপ হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিশ্বাসের আলোকে যত নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা সবই ইসলামী সংস্কৃতি। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় ইসলামী জীবনদর্শন ও জীবনবিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে এর পরিচয় দান করেছেন।[১৭৭]

ইসলামী চিন্তাবিদ মালিক বেন নবি'র সংজ্ঞা মতে-

مجموعة من الصفات الخلقية، والقيم الاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد فيه، والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته.

সংস্কৃতি হলো মানুষের মধ্যে জন্ম থেকে থেকে আসা নীতি, চারিত্রিক গুণাবলী ও সামাজিক মূল্যবোধের সমষ্টি। যা মানুষ তার আশে-পাশের পরিবেশ থেকে পায় এবং যা তার মন-মজ্জার সঙ্গে মিশে ব্যক্তিত্ব

---

১৭৬ সাইয়েদ আব্দুল্লাহ হাসান নদভী, *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, অনূ. আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ১২৪

১৭৭ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৬৮

ও আচরণ নির্ধারণ করে। সংস্কৃতি হল সেসব অভ্যাস ও মূল্যবাধ যার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারা ও আ-চরণ গড়ে ওঠে।[১৭৮]

ড. আজমি আল সাইদ-এর মতে-

الثقافة الإسلامية هي معرفة عملية مكتسبة، تنطوي على جانب معياري مستمد من شريعة الإسلام ومؤسس على عقيدته، وتتجلى في السلوك الواعي للإنسان (فرداً وجماعة) في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود (أي مع الخالق والمخلوقات).

ইসলামী সংস্কৃতি হলো- এমন এক জীবন্ত এবং অর্জিত জ্ঞান যা ইসলামের শাস্ত্রীয় বিধান এবং বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি কেবল ধারণাগত নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তাদের সচেতন ও নৈতিক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ইসলামিক সংস্কৃতি তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিকে তার চারপাশের সকল সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির সঙ্গে গভীর ও মর্মস্পর্শী সম্পর্ক গড়ে তুলতে শেখায়, যেখানে জীবন ও সামাজিক সম্পর্কগুলো ধর্মীয় নৈতিকতার সঙ্গে মোহিত হয়।[১৭৯]

অধ্যাপক হাসান আইয়্যুব বলেন, 'কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণই ইসলামী সংস্কৃতি।'[১৮০]

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম বলেন, 'ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে। যেমন, আল্লাহ্‌র একত্ব, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব বংশের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।'

এ. জেড সিদ্দীক বলেন, 'ইসলামী সংস্কৃতির দুটি অর্থ, এক. তার চিরন্তন দিক। দুই. সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজ সংস্থা।'

ফায়জী বলেন, 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর এ জীবনব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে তিনটি বিষয় বুঝায়। এক. উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল। দুই. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য। তিন. মুসলমানদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজকর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম প্রথার বিশেষ সংযোজন।'[১৮১]

---

১৭৮ মালিক বিন নবী, কিতাব শুরুত আন-নাহদাহ তাওযীহ আস-সাকাফাহ, অনু: আবদুস সাবুর শাহীন (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি), পৃ. ৮৩; মালিক বিন নবী, মুসকিলাহ আস-সাকাফাহ (দিমাশক: দারুল ফিকর, ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ৩০

১৭৯ প্রফেসর ড. মুস্তাফা মুসাল্লাম ও প্রফেসর ড. ফাতহী মুহাম্মাদ আয-যাগবী, *আস-সাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৯

১৮০ অধ্যাপক হাসান আইয়্যুবের মতে,

أنها السلوك الحسن والعمل الصلح والخلق الكريم القائم على التشريع الإسلامي والمنهج الرباني، والملتزم بالخط المحمدي في جميع

অর্থাৎ ইসলামী সংস্কৃতি আল্লাহপ্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামী শরীয়াতের বুনিয়াদে মানুষের জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার,সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে বুঝায় যা মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ (স)-এর পদাংক অনুসরণে নিয়ন্ত্রিত পরিচালতি হয়। (দ্র. হাসান আইয়্যুব, তাবসীতুল আকাইদ আল-ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২)

১৮১ ফাহমিদ-উর-রহমান, *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২১ খ্রি., পৃ. ১১২

আব্দুল মান্নান তালিব ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় প্রদানে বলেন, 'ইসলামী জীবনচর্চাই ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলমানরা যেভাবে তাদের জীবন গড়ে তোলে ইসলামী সংস্কৃতি ঠিক তেমনি রূপ লাভ করে। মুসলমানরা যখন পুরোপুরি ইসলাম তথা ইসলামী বিধান মেনে চলে তখন তারা পূর্ণ ইসলামী জীবন-যাপন করে।'

এ. জেড. এম শামসুল আলম বলেন, 'মানুষের জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের পর যে সমস্ত আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম, রুচি, চেতনা মানব জীবনকে সুন্দর করে এবং জীবনে আনে অনাবিল সুখ ও শান্তি সে সমস্ত আচার-আচরণকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যায়, যদি তা ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক হয়।

ইসলামী সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রতীক হলেন, হযরত মুহাম্মাদ (স.)। আর তাঁর সুন্নাহ্ই হলো ইসলামের মৌলিক সংস্কৃতি।' ঈমান তথা বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

"পবিত্র কালিমা একটি বৃক্ষের মত যার শেকড় থাকে সুগভীরে প্রতিষ্ঠিত আর তার শাখা-প্রশাখা থাকে দিগন্ত বিস্তৃত।"[১৮২]

বিশেষজ্ঞগণ সংস্কৃতির অর্থ নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করলেও, প্রতিটি জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এবং ইসলামি সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হলো: সংস্কৃতি হলো সেই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং জীবনধারা যেগুলো মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে শিখে আত্মস্থ করে। এই সংস্কৃতি তার চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ এবং জীবনযাত্রার ধরণ নির্ধারণ করে।

জীবনে যখন কেউ কোনো জ্ঞান গভীরভাবে আয়ত্ত করেন, তখন তার মন-মস্তিষ্ক সেটার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। ফলে তার ভাবনা ও কর্ম-ব্যবহার হয় সেই জ্ঞানের প্রতিফলন–যে জ্ঞান এসেছে ঐশ্বরিক ওহী ও আলোর মতো ছড়িয়ে থাকা সত্যের মাধ্যমে। যার ফলে সংস্কৃতিবান মুসলিম হয়ে ওঠে সমাজের জন্য এক সৎ ও দায়িত্ববান নজির।

৩. ইসলামি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলাম যেমন কালজয়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তেমনি ইসলামি সংস্কৃতিও কালজয়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এ সংস্কৃতি মানব রচিত কোন কিছু থেকে উৎসারিত নয়। এ সংস্কৃতির উৎস হলো আল-কুরআন ও সুন্নাহ। সকল মানুষের জন্য এ সংস্কৃতি অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা মানব

---

১৮২ আল-কুরআন, ১৪: ২৪

জাতির জন্য যে জীবন পদ্ধতি দান করেছেন তাই এই সংস্কৃতির মূল উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।"[১৮৩]

ইসলামি সংস্কৃতি বিশ্বজনীন। এটা কোন দেশ, কাল বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একজন মুসলমান যে কোন দেশের যে কোন সমাজের বা যে কোন কালের হোক না কেন ইসলামি সংস্কৃতি তাকে সুন্দর ও শালীন জীবন দান করে। ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ না করা। উচুঁ-নিচু, সাদা-কালো, আরব-অনারব এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সকলেই আদম সন্তান আর আদম মাটির তৈরি। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى

"তিনিই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃজন করেছেন, অতঃপর এক কাল নির্দিষ্ট করেছে।"[১৮৪] হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন-

الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب

"সকল মানুষ আদম (আ:) থেকে উৎসারিত আর আদম (আ:) মাটি থেকে তৈরি"।[১৮৫]

ইসলামি সংস্কৃতি সাম্যের ধারক ও বাহক। সকল মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে সমান। বর্ণবাদ, শ্রেণিবাদ ও আভিজাত্যবাদের কোন স্থান ইসলামে নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যদাসম্পন্ন যে, তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি"।[১৮৬]

ইসলামি সংস্কৃতি ইমান ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত। একজন মুসলমান যা বিশ্বাস করে তা আমলে পরিণত করা তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামে ইমান ব্যতীত আমলের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি আমল ব্যতীত ইমানের কোন মূল নেই। একজন মানুষকে ইসলামি সংস্কৃতিবান তখনই বলা হবে, যখন ইমান ও আমলের সমন্বয়ে তার জীবন পরিচালিত হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "যারা ইমান আনে ও সৎ কর্ম করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস"।[১৮৭]

ইসলামি সংস্কৃতিতে ইহকালীন জীবন ও পরকালীন জীবন একই সূত্রে গাথা। তাই ধর্ম ও সমাজ বা রাষ্ট্রকে আলাদা করে দেখানো যায় না। ইসলাম যেমন কালজয়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তেমনি ইসলামি সংস্কৃতিও কালজয়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

---

১৮৩ আল-কুর'আন, ৩: ১৯

১৮৪ আল-কুর'আন, ৬:০২

১৮৫ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ঈসা তিরমিযী, *আল-জামি' আত-তিরমিযী*, "ফাযায়েলে ওয়া মানাকিব," بيروت: দারুল গার্ব আল-ইসলামী, তাবি, হাদিস নং ৩৯৫৬

১৮৬ আল-কুর'আন, ৩৯:১৩

১৮৭ আল-কুর'আন, ১৮:১০৭

এ সংস্কৃতি মানব রচিত কোন কিছু থেকে উৎসারিত নয়। এ সংস্কৃতির উৎস হলো আল-কুরআন ও সুন্নাহ। সকল মানুষের জন্য এ সংস্কৃতি অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা মানব জাতির জন্য যে জীবন পদ্ধতি দান করেছেন তাই এই সংস্কৃতির মূল উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ

'নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।'[১৮৮] ইসলামি সংস্কৃতি বিশ্বজনীন, এটা কোন দেশ, কাল বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একজন মুসলিম সে যে কোন দেশের বা যে কোন সমাজের বা যে কোন সময়েরই হোক না কেন ইসলামি সংস্কৃতি তাকে স্বাভাবিক, সুন্দর ও শালীন জীবন দান করে। ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ না করা। সাদা-কালো, উচুঁ-নিচু, ধনী-গরীব, আরব-অনারব এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইসলামি সংস্কৃতি সাম্যের ও শান্তির ধারক ও বাহক। তাই সকল মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে সমান। ইসলামে বর্ণবাদ, শ্রেণিবাদ ও আভিজাত্যবাদের কোন স্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাসম্পন্ন যে, তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।"[১৮৯]

একজন মানুষকে সংস্কৃতিবান তখনই বলা যাবে, যখন ঈমান ও আমলের সমন্বয়ে তার সমগ্র জীবন পরিচালিত হবে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً

"যারা ইমান আনে ও সৎ কর্ম করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস"।[১৯০] ইসলামি সংস্কৃতিতে ইহকালীন জীবন ও পরকালীন জীবন একই সূত্রে গাথা। তাই ধর্ম ও সমাজ বা রাষ্ট্রকে আলাদা করে দেখানো যায় না। ইসলামি সংস্কৃতিতে বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, ধোকাবাজি করা, অশ্লীলতার কোন স্থান নাই। মার্জিত রুচিশীল ও পরিশীলিত জীবনাচার হল ইসলামি সংস্কৃতি।

৪. ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব

ইসলামী শরিয়াতের মূল দাবি অনুযায়ী একজন মানুষ চিন্তা ও কর্মের সংস্কার ও পরিশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। তাই, একজন মানুষকে ইসলামী সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিবান হতে হলে প্রথমে মুসলমান হতে হবে অর্থাৎ ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসারী হতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতি ইমানের উপর

---

১৮৮ আল-কুর'আন, ৩:১৯
১৮৯ আল-কুর'আন, ৪৯:১৩
১৯০ আল-কুর'আন, ৪১:৩৩

ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি ইমানের রক্ষাকবচ। মুসলিম জাতির পরিচিতি কেবল ইসলামী সংস্কৃতির মাধ্যমেই তুলে ধরা সম্ভব। সমাজে যদি ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা না থাকে তাহলে বিজাতীয় সংস্কৃতি সেখানে বাসা বাঁধে। বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে জাতীয় সত্তা, পরিচিতি বা জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা আবশ্যক। ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব এত ব্যাপক যে আমাদের কর্মনীতি, কার্যপদ্ধতি ও আমাদের চিন্তা-ভাবনা সবকিছুই আমাদের সংস্কৃতির ফসল। মানবীয় চেতনায় ও বোধিতে যা কিছু বিশ্লিষ্টতা থাকে স্বাভাবিকভাবে, সাংস্কৃতিক অনুভূতি ও নিজস্ব মূল্যবোধই তাকে উৎকর্ষ দান করে, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রূপে গড়ে তোলে। সংস্কৃতি যে মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে এই উপলব্ধি থেকেই মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালের সম্মেলনের একুশ সংখ্যক প্রস্তাবে বলা হয় যে,

১ একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সে দেশের ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা।

২ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আত্মিক চৈতন্যকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান।

৩ ধর্মের একটি আন্তর্জাতিক বিশিষ্টার্থক এবং সর্বমানববাদী রূপ আছে।সেই রূপকে সংরক্ষণ কর এবং তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে সমন্বিত করা।

৪ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিতে যে আত্মিক মূল্যবোধ রয়েছে আপনাপন সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে সে মূল্যবোধকে মর্যাদা দেয়া। মুসলিম উম্মাহর জাতিসত্তা, পরিচিত, অস্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, সাফল্য, স্বকীয়তা, - এসব কিছুই ইসলামী সংস্কৃতির অনুশীলন, অধ্যয়ন ও অনুকরণের ওপর নির্ভরশীল। মুসলিম জাতির সমগ্র জীবনে তাই ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব অসীম। যেমন-

৪.১. ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন

ঈমানের পূর্ণতা অর্জনে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মুহাম্মদ (সা.) কে অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে। তাই মানবজাতির জন্য আবশ্যক হলো, ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর যথাযথ অনুসরণ ও আনুগত্য করা। ইসলামের পরিভাষায় ঈমান ৩টি বিষয়ের সমন্বয়: ১. আত্মার স্বীকৃতি বা সত্যায়ন, ২. মৌখিক স্বীকৃতি এবং ৩. আত্মা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ ভালোবাসা, আল্লাহ ও রসূল যা ভালোবাসেন তাকে ভালোবাসা জরুরি করে দেয়। তাই যখন মু'মিন আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে ও ঘৃণা করে যা অন্তরের কাজ এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দেয় ও বারণ করে যা শরীরের কাজ তখন তার পূর্ণ

ঈমান ও আল্লাহর পূর্ণ ভালোবাসা প্রমাণ হয়। পারিভাষিক অর্থে, নবী করিম (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রণীত,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۝

অর্থ: 'হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের মধ্য হতে কোন দলের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে ছাড়বে ।'[১৯১]

মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকরা বলেন, ঈমানের মূল ভিত্তি যদিও বিশ্বাস স্থাপন করা। তবে মুখে স্বীকার ও আমল ছাড়া তা পূর্ণতা লাভ করে না। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'ঈমান যদিও সত্যায়নের অর্থ ব্যক্ত করে।পবিত্র কোরআনে পরকালীন সাফল্যের পথ হিসেবে ঈমান ও আমলকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ۝

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান।"[১৯২]

৪.২. ঈমান সংরক্ষণ

ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ঈমানভিত্তিক। আর তাই এই সংস্কৃতি মুমিনের ঈমান অক্ষুণ্ন রাখার রক্ষাকবচ। তাই ঈমান সংশ্লিষ্ট অনুশীলন অর্থাৎ তাওহিদ, রিসালাত, কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত প্রভৃতি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন এবং পরিপালন এ সংস্কৃতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনই হবে একজন মু'মিনের প্রকৃত জীবনাচরণ। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ۝

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর, তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে।"[১৯৩]

৪.৩. দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জন

ইসলামী সংস্কৃতিতে দুনিয়ার জীবনকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা হয়নি; বরং যথার্থ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি একই সাথে দুনিয়া ও আখিরাতমুখী। পাশাপাশি আখিরাতের জীবনকে বলা হয়েছে মূল গন্তব্য ও বিবেচ্য বিষয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যদি কিয়ামত এসে যায় আর তোমাদের কারো

---

১৯১ আল-কুর'আন, ৩:১০০
১৯২ আল-কুর'আন, ১৮: ১০৭
১৯৩ আল-কুর'আন, ৩:১৪৯

হাতে খেজুরগাছের চারা থাকে, তবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে তা রোপণ করা সম্ভব হলে সে যেন তা করে। কেননা এর বিনিময়ে সে প্রতিদান লাভ করবে।'[১৯৪]

মহানবী (সা.)-এর নির্দেশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যও অত্যন্ত গভীর। বাহ্যত নবীজি (সা.)-এর বক্তব্য ভিন্ন রকম হওয়ারই কথা ছিল। কেননা তিনি পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং পরকালীন জীবন গঠনের আহ্বান জানাবেন। তিনি আহ্বান জানাবেন মানুষ যেন কিয়ামতের ভয়াবহ দিনের প্রস্তুতিস্বরূপ অন্তর পবিত্র করে এবং নিজের কর্মপন্থা শুধরে নেয়।বিশেষত যখন কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে, তখন দ্রুত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং বিনীত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, যেন ঈমানের সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। তিনি বলবেন, তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে নাও, পার্থিব কাজকর্ম ছেড়ে আল্লাহমুখী হও, সব সম্পর্ক পেছনে ছেড়ে আল্লাহর স্মরণে মগ্ন হও। যেন আল্লাহর স্মরণ অন্তরে নিয়ে তোমার মৃত্যু হয়। আর এমনটি বলাই তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি তা বললেন না। তিনি যা বললেন, তা ছিল অপ্রত্যাশিত। তিনি বললেন, যদি তোমাদের কারো হাতে খেজুরগাছের চারা থাকে এবং তা কিয়ামতের আগে রোপণ করা সম্ভব হয়, তবে সে যেন রোপণ করে। এতে সে সওয়াব বা প্রতিদান পাবে। কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন খেজুরগাছ লাগাতে। যে গাছে কয়েক বছর পর ফল আসে। অন্যদিকে কিয়ামত কয়েক মুহূর্তে সংঘটিত হবে। সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন নির্দেশ শুধু একজন আল্লাহর নবীই দিতে পারেন, সর্বশেষ নবীর পক্ষেই এমন নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব।

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটিই প্রমাণ করে ইসলাম জীবনঘনিষ্ঠ ধর্ম। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় দুনিয়া ও আখিরাতের রাস্তা পৃথক নয়; বরং তা একই রাস্তার দুটি পার্শ্ব। ইসলামী জীবন দর্শনে পরকালের পথ ভিন্ন নয়, যার নাম হবে ইবাদত এবং দুনিয়ার পথ ভিন্ন নয়, যার নাম হবে কাজ-কর্ম ও পরিশ্রম। দুনিয়া ও আখিরাতের রাস্তা একটিই, যেখানে কাজ-কর্ম ইবাদত থেকে পৃথক নয় এবং ইবাদতও কাজ-কর্ম থেকে ভিন্ন নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়টি একই জিনিস। তারা পাশাপাশি পথ চলে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের একই নীতি। এক মুহূর্তে কিয়ামত চলে আসবে তার পরও চারা রোপণ করতে হবে, এটাই কাজের মূল্য। কত স্পষ্ট ও আলোকদীপ্ত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু কাজের মূল্য নয়, কাজের মাধ্যমেই যে পরকালের রাস্তা খুঁজে নিতে হবে এবং এটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত অধিকাংশ সময় মানবজাতি দুনিয়া ও আখিরাতকে পৃথক পৃথক রাস্তা মনে করেছে। পরকালের কাজগুলোকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা হয়। সফলতার জন্য বাহ্যিক

---

১৯৪ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তাবি, হা. ৪৭৯

আমলের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি অপরিহার্য। কুরআন হাকিমের বাণী, 'সফল হলো তারা যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, আর ব্যর্থ হলো তারা যারা নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করল।'[১৯৫] এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি অনুশীলন ও অনুকরণের মাধ্যমে ঈমানদারগণ অর্জন করতে পারেন পার্থিব সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি।

৪.৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর ভালোবাসা অর্জন

ইসলামী সংস্কৃতি মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী ও রাসূল সব বিষয়ের প্রতি মৌখিক স্বীকারোক্তি প্রদান, মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করা এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে। ইসলামী সংস্কৃতি হলো ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায়। কেননা এখানে ইসলামের নীতি ও দর্শন একাত্ব হয়ে বাস্তব রূপ লাভ করে। আর এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি ঈমানের পূর্ণতা দান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

'হে মুমিনগণ! তোমারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না।'[১৯৬] মহানবী (স) হলেন মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক। এর প্রধান উৎস হলো আল-কুরআন ও সুন্নাহ। তাই এই সংস্কৃতির অনুশীলন বলতে বোঝায় আল্লাহর নির্দেশ পালন ও রাসূল (স.)-এর জীবনাদর্শের অনুশীলন। এটি অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূল সা:-এর প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তাঁদের ভালোবাসা লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন-

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي

'আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহর ভালোবাসা চাও তাহলে আমাকে অনুসরণ করো।'[১৯৭]

৪.৫. মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষা

সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচিতির প্রতীক। ইসলামী সংস্কৃতিতে মহান আল্লাহর দেয়া বিধিবিধান ও রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে পরিচালিত জীবনব্যবস্থা অনুসারেই পরিচালিত হয়। এসব ব্যতীত কোনো মুসলিম যদি অন্য কোনো জাতির সংস্কৃতি অনুসরণ করে তাহলে সে আর মুসলিম থাকে না। রাসূল (স.) বলেন,'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।'[১৯৮] ইসলামি সংস্কৃতি ইমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি ইমানের রক্ষাকবচ। মুসলিম জাতির পরিচিতি কেবল ইসলামি সংস্কৃতির মাধ্যমেই তুলে ধরা সম্ভব। সমাজে যদি ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা না থাকে তাহলে

---

১৯৫ আল-কুর'আন, ৯১: ৯-১০

১৯৬ আল-কুর'আন, ২:২০৮

১৯৭ আল-কুর'আন, ৩:৩১

১৯৮ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সহীহ আল-জামে' আস-সাগীর*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নং ৬০২৫,

বিজাতীয় সংস্কৃতি সেখানে অতি সহজেই বাসা বাঁধে। বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে ইসলামের মৌলিক সত্ত্বা, পরিচিতি বা জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা অতি আবশ্যক।[১৯৯]

৫. ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি ও প্রেক্ষাপট

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ) -এর উপর সর্বপ্রথম এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে সুরাতুল বাকারা এর ৩০, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯ নং আয়াতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল আয়াতে কারীমা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.) এবং তাঁর সহধর্মীনি হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করে তাদেরেকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। তারা পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবন যাপন শুরু করলেন এবং তাঁদের ঔরসে সন্তান এলো। আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা সন্তানদের নামকরণ, লালন পালন করার সাথে সাথে তাদেরকে আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং আল্লাহর ইবাদাতের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য বিধিবিধান দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি জানেন মানুষের জীবন যাপনের জন্য বিধি বিধান কেমন হওয়া উচিত। তাই, তিনি মানুষের ইহকাল ও পরকালে মুক্তির জন্য বিধান দিয়েছেন। উক্ত বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে মানুষ ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করার সময়ই তাকে সেই সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, এখানেই ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ সূচিত হয় যেমন:

৫.১. তাওহীদ

ইসলামি পরিভাষায় তাওহীদ হলো সৃষ্টি ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা, সকল ইবাদাত-উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য করা, অন্য সবকিছুর উপাসনা ত্যাগ করা, আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীকে তার জন্য নির্ধারিত করা এবং দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করা।[২০০] পরিপূর্ণ গুণের সমন্বয়ে রবের একত্বতা সম্পর্কে বান্দার জ্ঞান, বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও ঈমান এবং এতে রবকে একক হিসেবে মানা, এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর পূর্ণতায় কোনো উপমা নেই, তিনি সমস্ত বান্দার জন্য ইলাহ ও মা'বুদ (ইবাদতের একমাত্র যোগ্য), অতঃপর সব ধরণের ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁকে একক রাখা (কাউকে শরীক না করা)। তাহলে উপরোক্ত সংজ্ঞায় তাওহীদের তিন প্রকারই শামিল করেছে। তা হলো:

---

১৯৯ ড. এ কে এম নূরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২০

২০০ শরীফ আল জুরজানী, *কিতাবুত তা'রীফাত*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৮ হি., পৃ. ৬৯; ড. মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দির রহমান আল খামীস, *উসূলুদ্দীন 'ইনদাল ইমাম আবী হানীফাহ*, রিয়াদ: দারুস সুমাঈ, ১৪১৬হি., পৃ. ২০৬

প্রথমত: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত: রবকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পরিচালনাকারী ও লালন পালনকারী হিসেবে স্বীকার করা।

দ্বিতীয়ত: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: আল্লাহ নিজের জন্য যেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন বা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য যেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন এবং কোনো সাদৃশ্য ও উপমা ব্যতীত, বিকৃতি ও পরিবর্তন ব্যতিরেকে যেসব গুণাবলী এগুলোর ওপর প্রমাণ করে সে গুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

তৃতীয়ত: তাওহীদুল ইবাদাত: সব ধরণের ইবাদাতের জন্য আল্লাহকে এক ও একক করা এবং তাঁর সাথে শিরক না করে ইবাদতে একনিষ্ঠ থাকা। অতঃএব, তাওহীদের উপরোক্ত প্রকারসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধারণ না করলে ও এ গুলোকে প্রতিষ্ঠা না করলে বান্দা মুয়াহহিদ তথা একত্ববাদী হতে পারবে না।

৫.২. রিসালাত

রিসালাত (الرسالة) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বার্তা, চিঠি, সংবাদ বহন বা কোনো শুভ কাজের দায়িত্ব বহন করা।[২০১] ইসলামের পরিভাষায় রিসালাত বলতে মহান আল্লাহর বাণী ও বিধিবিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে বোঝায়। আর আল্লাহ তা'আলা যাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব প্রদান করেন, তাঁকে বলা হয় রাসুল।[২০২] রিসালাত-এর প্রায় সমার্থক আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে নবু-ওয়্যাত। মানব জাতির হেদায়েত ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য রিসালাত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রিসালাতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর এককত্ব এবং পরিচয় জানতে পেরেছে। এর মাধ্যমেই সে স্রষ্টার প্রতি অন্য মানুষের প্রতি এবং জীব-জগতের প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা এসেছে রিসালাতের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের পক্ষে যা বোঝা সম্ভব নয়, নবী ও রাসুলগণ তা মানুষকে সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রিসালাতের কল্যাণেই মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়েছে। তাই নবী-রাসুলদের প্রচারিত জীবনব্যবস্থাকে ধারণ করা, তাঁদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস আনা, তাঁদের দেখানো পথে চলা এবং সমাজে তা বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করা আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। রিসালাত একটি দীর্ঘ বিষয়। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধানের আলোকে মানব ও মানবাত্মাকে এবং সমাজ সভ্যতাকে শিক্ষা- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন কল্পে মানবের মধ্যে উত্তম ও সৎগুণাবলীর বিকাশ সাধন এবং নির্মল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার্থে নবী ও রাসূলগণ এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে

---

২০১ ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারু সাদিও, তা.বি., খ.১, পৃ. ২৮৩-৮৪

২০২ ড. আহমদ বিন সা'আদ আল-গামেদী, *আক্বিদাতু খাতমুন নাবী*, রিয়াদ: দার আত-তায়্যিবাহ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি., সং-১, পৃ. ১৪-১৫

বলেন: "আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।"[২০৩]

৫.৩. আখিরাত

আখিরাত (الآخرة) আরবি শব্দ। এর অর্থ পরকাল, পরজীবন, মরণোত্তর বা শেষ জীবন। ইসলামের পরিভাষায় আখিরাত বলতে মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বোঝায়।[২০৪] আখিরাতে বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম একটি মৌলিক বিষয়। তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের সাথে সাথে আখিরাতের জীবনকেও সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করা জরুরি। আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগন এবং আখিরাত দিবসের প্রতি অবিশ্বাস করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।'[২০৫]

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের দুনিয়ার জীবনের সকল কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আখিরাতে তার সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে। তাই জবাবদিহিতার ভয়ে সে তার কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক থাকে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। আবার সে বিশ্বাস করে যে দুনিয়ার সকল ভাল কাজের পুরস্কার আখিরাতে পাওয়া যাবে। তাই সে ভাল কাজে আগ্রহী হয় এবং মন্দ কাজ পরিহার করে চলে। এ ভাবে আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলে, মানুষকে পরকালের কথা জানিয়ে দেওয়া। পরকালে পুনরুত্থানের কথা বলে তাদের উপদেশ প্রদান। মৃত্যুর পর মানুষকে যে অনিবার্যরূপে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে সে বিষয়ে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করা। আর কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে মানব ও জিন জাতি যে কঠিন অবস্থা এবং জবাবদিহির মুখোমুখি হবে সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ার লক্ষ্যে নবী ও রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। আল-কুরআনে সে মর্মে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি, যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বর্ণনা করত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করতো?"[২০৬]

৫.৪ ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার প্রেক্ষাপট

ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি হল সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে তাঁর প্রেরিত নবী রাসূলগণের আদর্শ অনুসরণ করা, যা মূলত সামঞ্জস্যপূর্ণ আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা,

---

২০৩ আল-কুর'আন, ৩: ১৬৪

২০৪ আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী, *আল-আক্বিদাতুন নাসাফী*, মিসর: ১৯৯১খ্রি., পৃ. ৯৯

২০৫ আল-কুর'আন, ৪: ১০৬

২০৬ আল-কুর'আন, ৬: ১৩০

জীবনাচার ইত্যাদি এ সবকিছুরই সমষ্টি। ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্দেশিত মুসলিম জাতির মৌলিক জীবনাদর্শ ও জীবনাচার হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। যা মূলত, স্রষ্টার প্রতি আস্থাশীল, মার্জিত, রুচিশীল, পরিশীলিত, উন্নত ধ্যানধারণা সম্বলিত মানসিকতা ও জীবনবোধকেই বুঝায়। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম জীবন চর্চা যেহেতু মহান আল্লাহর হিদায়াত ও আনুগত্য দিয়েই শুরু। তাই এ প্রথম মানবের জীবন চর্চাই ছিল ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি। সুতরাং এটা তো নিশ্চিতভাবেই বলাই যায় যে, আদম (আ.) এর দ্বারাই ইসলামী সংস্কৃতির ও চর্চা শুরু হয় ও গোড়াপত্তন হয় এবং যুগে যুগে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে শেষ নবী মুহাম্মদ স. এর যুগে এসে পূর্ণতায় পৌঁছায়। নবী করীম (স.) বলেছেন : উন্নত সংস্কৃতি জীবনধারাকে পূর্ণতাদান করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।[২০৭] কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।[২০৮]

মানুষের বিগত হাজার হাজার বছরের ইতিহাস তার সংস্কৃতিরই ইতিহাস। কারণ প্রথম থেকেই সে সভ্য ছিল। কাজেই সে ছিল একটি সুন্দর রুচিশীল সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী। একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এর যাত্রা শুরু। আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দিয়েছেন। কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে,

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا

এবং তিনি আদাম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন।[২০৯] এর অর্থ হচ্ছে সকল বস্তুর তাৎপর্য, ব্যবহার বিধি এবং অনুসঙ্গ তিনি আল্লাহর কাছ থেকে শিখেছেন। যাকে পরিপূর্ন জ্ঞান বলে তা এ ভাবে তিনি আহরণ করেছিলেন। পার্থিব কারো নির্দেশ তিনি কোন মূহুর্তেই পাননি। মহান আল্লাহর নির্দেশে চালিত হয়ে সত্যের প্রবর্তনায় তিনি পার্থিব জীবন যাপন করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতাআলা আদম (আ.) কে জ্ঞান দান করে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে এর পরিচালনা উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষমতা রেখে দিয়েছেন। যুগে যুগে দেশে দেশে তিন এর প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে সবার মর্মমূলে একটি অভিন্ন মৌল সাংস্কৃতিক কাঠামো লক্ষ্য করা যাবে।আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রেরিত পুরুষ হিসেবে হযরত আদম (আ.) এর প্রধান দায়িত্ব ছিল এ দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত (রাজত্ব) কায়েম করা এবং পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করে

---

২০৭ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *সাহীহ আল বুখারী*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হা. ৬৭৫৮

২০৮ আল-কুর'আন, ৫:৩

২০৯ আল-কুর'আন, ২:৩১

গড়ে তোলা। এ ভাবে হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দ্বীন ইসলাম তথা ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিমূল রচিত হলো।

হযরত আদম (আ.)-এর পর যে পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন হযরত নূহ (আ.)। তিনি আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামী সংস্কৃতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। মানুষের অবিশ্বাস, অবিবেচনা এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুথিবীকে অপরিচ্ছন্ন করেছিল। তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দ্বীনকে পরিশুদ্ধ ও যুযেগাপযোগী করবার। আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.) কে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের অপরিচ্ছন্ন লোকদেরকে পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃতিবান করার জন্য। কুরআনের ভাষায় হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন: তোমরা যদি ন্যায়পথে চল এবং বিশুদ্ধতা অর্জন তথা সংস্কৃতিবান হওয়ার চেষ্টা করো তা হলে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। হযরত নূহ (আ.) এর সময় ইসলামের যে রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছিল সেটি ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণরূপ নয়। আদম (আ.) থেকে অনেকটা অগ্রসর, কিন্তু পূর্ণারূপে প্রতিষ্ঠিত নয়। মানুষ তখনো পার্থিব ঐশ্বর্যকে একমাত্র কাম্য মনে করতো এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের অনুশোচনা ছিলনা। সুতরাং পয়গম্বর তাদের ধ্বংস কামনা করলেন। এখানেই নূহ (আ.) এর অসম্পূর্ণতা। তিনি অধৈর্য হয়েছিলেন এবং পাপীদের ধ্বংস চেয়েছিলেন।[২১০]

হযরত নূহ (আ.) এর পরে উল্লেখযোগ্য নবী হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধ্যানী এবং সত্য সাধক। সুস্পষ্টভাবে দ্বীনের কার্যক্রমের গণনা আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকেই করে থাকি। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পিতা আজর ছিলেন মূর্তিপূজক এবং তার ব্যবসা ছিল মূর্তি নির্মাণ। পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুরআন মজীদে বিশদভাবে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আজর নিয়মিত মূর্তি নির্মাণ করতেন এবং দক্ষ মূর্তি নির্মাতা হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হিসেবে শৈশব থেকেই ইবরাহীম আ. মূর্তিপূজার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তিনি কোন দিন মূর্তিপূজা করেননি। ইবরাহীম (আ.) বহুবিধ জিজ্ঞাসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পরে যে নবীর নাম ইতিহাসের ক্রমধারায় উল্লেখযোগ্যতা পেয়েছে, তিনি হচ্ছেন হযরত মূসা (আ.)। হযরত মূসা (আ.) কে ইহুদীরা তাদের আইন প্রণেতা হিসেবে মনে করে। যথার্থই তিনি পার্থিব জীবন ব্যবস্থাপনায় এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুশাসন প্রবর্তন করেছিলেন, যেগুলো এখনো প্রাচীনপন্থী ইহুদীরা মেনে চলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ধীরে ধীরে ইসলামী আইন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল তখন অনেক অনুশাসনের ক্ষেত্রে

---

২১০ কে আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৫ খ্রি., পৃ. ১৯-২৭

আল্লাহর রাসুল মূসা (আ.) এর আইনকে অবলম্বন করেছিলেন।[২১১] বনী কুরায়যা যখন বিশ্বাসঘাতকা করেছিল তখন তার শাস্তি দেয়া হয়েছিল ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত এর আইনানুসারে। ইসলামে খাদ্যাভাসে হারাম-হালালের যে নির্দেশাবলী আছে, সেগুলো মূসা (আ.) এর অনুশাসনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মূসা (আ.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন দেবমূর্তির উদ্দেশ্যে নিহত প্রাণী হারাম, চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে গৃহীত প্রাণীও হারাম। চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে যে প্রাণী তৃণভোজী এবং যাদের পায়ে ক্ষুর আছে এবং যে ক্ষুর দ্বিধা বিভক্ত সেই প্রাণী হালাল। কিন্তু আল্লাহর নামে জবাই না করলে তা হারাম হবে। রক্ত হারাম এবং শুকর হারাম। আমরা এ অনুশাসন ও সংস্কৃতির সবকটি গ্রহণ করেছি। তবে আমাদের মধ্যে নতুন কিছু অনুশাসন ও সংস্কৃতি এসেছে এবং খাদ্য বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু বিচার বিবেচনাও এসেছে। ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণতা এলো মহানবী (স.) এর মাধ্যমে। ইসলাম যেমন সকল দ্বীনের সর্বশেষ সংস্করণ রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন তেমনি সর্বশেষ ঐশী বাণীবাহক। তাই দেখা যায়, ইসলামই একমাত্র দ্বীন যেখানে সকল দ্বীনের সুন্দরতম গুণগুলোর পূর্ণতা বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। আর মুহাম্মদ (স.) এর চরিত্র বৈশিষ্ট্যেও সকল নবী-রাসূল ও মহাপুরষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর মধ্যে আদম (আ.) এর মহত্ত্ব, নূহ (আ.) এর প্রচারনিষ্ঠা, সালেহ আ. এর বিনীত প্রার্থনা, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর একত্ববাদ, হযরত ইসমাঈল (আ.) এর আত্মত্যাগ , হযরত মূসা (আ.) এর পৌরুষ, হযরত হারুন (আ.) এর কোমলতা, হযরত ইউসুফ (আ.) এর সৌন্দর্য, হযরত ইয়াকুব (আ.) এর ধৈর্য, হযরত আইউব (আ.) এর সহনশীলতা, হযরত দাউদ (আ.) এর সাহসিকতা, হযরত সুলায়মান (আ.) এর বিচারজ্ঞান ও ঐশ্বর্য, হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এর সরলতা, হযরত ইউনুস (আ.) এর অনুশোচনা, হযরত ঈসা (আ.) এর অমায়িকতা ইত্যাদি সকল সুমহান গুণের পূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর প্রচারিত দ্বীনে যেমন সকল দ্বীনের সার-সংস্কৃত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে, তেমনি তাঁর জীবন বিকাশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সকল প্রেরিত পুরুষের চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে। তাই বলা হয়, তাঁর প্রচারিত আদর্শই মানব জাতির জন্য পূর্ণ আদর্শ।[২১২]

আল্লাহর রাসূল সা. এমন একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ছিলেন যে, কোন ক্ষেত্রেই তাঁর খর্বতা ছিলনা। তিনি পরিচ্ছন্ন পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর পরিচ্ছন্নতা সকল কর্মে প্রকাশ পেত। তাঁর কর্মে কোন ভারসাম্যহীনতা ছিলনা। তিনি তাঁর প্রতিটি কর্ম সুনির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন মানুষের চিন্তাধারা, জীবন যাপন প্রণালী এবং আকীদাহ-বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর চিন্তাধারা ছিল স্বচ্ছ এবং সংশয়মুক্ত। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে শুদ্ধতা এবং পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সংশয়মুক্ততা প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর দৈনন্দিন জীবন ধারার মধ্যে পরিমিতিবোধ,

---

২১১ আবুল হোসেন, *ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১২৪

২১২ সায়্যিদ আব্দুল লতিফ, *ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ১২৪

বিবেচনাবোধ এবং বিচার-বুদ্ধি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। মলিন পোশাক তিনি পরিধান করতেন না, খাদ্যাভ্যাসে তিনি ছিলেন স্বল্পাহারী। অতিথি আপ্যায়নে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান। এক কথায় তিনি ছিলেন সকল কিছু নিয়ে সমাবত অথচ সকল কিছুর উর্ধে। কবি-সাহিত্যিকরা যুগ যুগ ধরে বিচিত্র শব্দ সম্ভারে তাঁর গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, কিন্তু কখনো পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি।[২১৩] তিনি ছিলেন মানুষের পরম হিতৈষী বন্ধু এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত ইনসান-ই-কামিল। তিনি যখন পৃথিবীতে এলেন সে সময় পৃথিবী অপসংস্কৃতি ও পাপ-পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি এসে পৃথিবীকে সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন করলেন।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর নির্দেশে বলেছিলেন: সত্য এসে গেছে, মিথ্যা নির্মূল হয়েছে, নি:সন্দেহে মিথ্যা নির্মূল হবারই বিষয়। মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবের জন্য এবং পরবর্তীতে গোটা বিশ্বের জন্য এমন একটি সাংস্কৃতিক ধারা প্রতিষ্ঠিত হলো যা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এভাবে হযরত আদম (আ.) এর দ্বারা ইসলামী সংস্কৃতির যে ভিত রচিত হয়েছিল যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে মহানবী (সা.) এর যুগে এস পূর্ণতা লাভ করলো।

৫.৫. ইসলামী মৌলিক জীবন দর্শনের চেতনা বাস্তবায়ন

ইসলাম প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে অশান্ত, বিশৃঙ্খল ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মরুময় আরবের জেহালত সমাজে সৌহার্দ্যময় পরিবেশ, স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসে। ঐশী নির্দেশনার আলোকে পৃথিবী এক নতুন সভ্যতার স্পর্শ পায়। মানুষ মানুষকে মানবতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও ঔদার্যের দৃষ্টিকোণ থেকে চিনতে শিখে, পরস্পর সম্মান করতে শিখে এবং অজ্ঞতা-মূর্খতা ও পাষণ্ডতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসে। ইসলামের কল্যাণে বর্বর আরব সমাজ ওহীর জ্ঞানে আলোকিত হয়; সব রকম নিষ্ঠুরতা তিরোহিত হয় এবং মানবতা পূর্ণতা পায়। রাজা-প্রজার পার্থক্য, ধনী-নির্ধনের ভেদাভেদ আর সাদা-কালোর বৈষম্য দূরীভূত হয়। মানুষের কর্ম ও কৃতিত্বের মাধ্যমে তার মর্যাদা ও অবস্থান নিশ্চিত হয় এবং সমাজের সব পঙ্কিলতা দূরীকরণে আদম সন্তানেরা নিরন্তর প্রয়াস চালায়। আল্লাহর কিছুসংখ্যক বান্দা ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট-যাতনা সয়ে ইসলামের জীবনপদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে দিবস-রজনী অক্লান্ত শ্রম দেন। তাঁদের বিরামহীম সাধনা আর অবর্ণনীয় পরিশ্রমে ইসলাম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ এক জীবনাদর্শে পরিণত হয়। ইসলামী জীবন দর্শন আল-কুরআনের আলোকে নির্ধারিত এবং পরিচালিত জীবন দর্শন। যার প্রাণসত্তা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার হলো,

---

২১৩ গোলাম মোস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আবশ্য আমিই তার সংরক্ষক।'[২১৪] এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পর থেকে মানব জীবন নানা বৈচিত্র্যময় পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। জীবন প্রবাহে নানান জঞ্জাল ও পদস্খলনের সম্ভাব্যতা মানব-জীবনকে করে তোলে দিশেহারা, দিকভ্রান্ত। এই ধরণের অ-নশ্চয়তায় আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর জন্য ও সঠিকপথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সঠিক পথনির্দেশিকা।[২১৫]তাই মানব জাতির হেদায়েতের জন্য এবং সঠিক পথে পরিচালনার জন্য পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তা ইসলামকে মনোনীত করলেন পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন হিসেবে। আর ইসলামের মশালসহ যুগে যুগে প্রেরণ করলেন অগণিত নবী-রাসূলগণকে। যাদের ধারাবাহিকতার পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, আখেরী নবী, সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) এর আগমনের মাধ্যমে। কুর'আনের উদ্ধৃত বাক্যগুলো মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবকে বিবৃত করেছে। মানুষ প্রকৃতির জগতে সবচেয়ে দুর্বল ও সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল প্রাণী।

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানবজাতি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার চরম প্রয়োজন অনুভব করে, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য অর্জন করা যায়। বিশ্ব মানবের এ সম্মিলিত প্রয়োজন মেটানোর মহান লক্ষ্যেই আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে শরিয়তসহ নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ আখেরি নবী ও সর্বশেষ রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে। তিনি ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ মানব। তাঁর জীবন ছিল জীবন্ত কুরআন। তাঁর শুভাগমনে ইসলামের পরিপূর্ণতা ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।'[২১৬]

ইসলামের নির্দেশ মতে জীবন গঠন করা মুসলিম উম্মাহর জন্য একান্ত আবশ্যক। পবিত্র কু'রআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।'[২১৭] ইসলাম এমন এক সামগ্রিক জীবনদর্শন, যা

---

২১৪ আল-কুর'আন, ১৫: ৯
২১৫ আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪
২১৬ আল-কুর'আন, ৩৩: ২১
২১৭ আল-কুর'আন, ৫৯: ৭

মানবজাতিকে সর্বকালের, সব স্থানের যাবতীয় জিজ্ঞাসা ও সমস্যার যৌক্তিক সমাধান দেয়। ইসলাম প্রচলিত অর্থে কোনো ধর্ম নয়, বরং এটি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। তাই ইসলামের বিধিবিধান, সৌন্দর্য ও এর আবেদন মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও আঙ্গিকে পরিব্যপ্ত। ইসলামি শরীয়া এ সামগ্রিকতা ও পূর্ণাঙ্গতার বিচারে পাঁচটি শাখায় বিন্যস্ত। যথা- ১. ঈমান-আকিদা (বিশ্বাসজাত বিষয়াদি), ২. ইবাদত (চর্চা ও অনুশীলনজাত ইবাদত), ৩. মোআমালা (পারস্পরিক লেনদেন), ৪. মোআশারা (সামাজিক জীবনের নীতিমালা) ৫. আখলাক (চারিত্রিক উৎকর্ষ-বিধান)। মানুষ মাত্রই উত্তম জীবনের প্রত্যাশা করে। প্রতিদিনের জীবনে আগের তুলনায় একটু বেশি সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বস্তির আশা করে সবাই। পার্থিব জীবনের এই প্রত্যাশাকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেনি; বরং মানুষের ভেতর সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছে। আল্লাহ বান্দার ওপর স্বীয় অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চান। আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস, ইসলামের প্রতি আনুগত্য, ভাগ্যে সন্তুষ্টি ও পরকালীন জীবনে জবাবদিহি ও পুরস্কার লাভের চিন্তা মুমিনের জীবনে স্থিরতা আনে এবং তাকে পার্থিব জীবনের মোহ ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়; একই সঙ্গে তা উত্তম জীবন লাভে প্রয়াসী ও আল্লাহর রহমত লাভের প্রত্যাশী করে তোলে। এ জন্য পবিত্র কু'রআনে বলা হয়েছে,

الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ

'যারা ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, পরম আনন্দ ও শুভ পরিণাম তাদের জন্য।'[২১৮] ভালো কাজ: উত্তম জীবন লাভের দ্বিতীয় পধান শর্ত ভালো বা পুণ্যের কাজ করা।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে ভালো কাজের মধ্যে মানবজাতির জন্য তৃপ্তি ও প্রশান্তি রেখেছেন। ফলে মানুষ যখন ভালো কাজ করে তখন তার হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং সবাই যখন সম্মিলিতভাবে ভালো কাজে প্রয়াসী হয় তখন সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয়। মূলত উত্তম জীবন মানুষের ভালো কাজের প্রতিফল, ভালো কাজ মানুষের জীবনকে নিশ্চিন্ত করে। অন্যদিকে দুর্যোগ ও অশান্তি তাদের পাপের শাস্তি। আল্লাহ বলেন,

مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

'যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভালো কাজ করে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।'[২১৯]

---

২১৮ আল-কুর'আন, ১৩ : ২৯

২১৯ আল-কুর'আন, ৫: ৬৯

ঈমান হলো দ্বীনের সেই ভিত্তিমূল, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলাম নামক সুরম্য প্রাসাদ। দ্বীন ইসলামে ঈমানের এ অপরিহার্যতার কথা ফুটে ওঠে কুরআনের অসংখ্য আয়াতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۝

'যে মোমিন অবস্থায় নেক আমল করল, তাকে আমি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের সৎকর্ম অনুযায়ী আমি উত্তম প্রতিদান দেব।'[২২০]

এ আয়াতে আল্লাহতায়ালা মু'মিনকে পুরস্কার প্রদান ও উত্তম প্রতিদানের বিষয়টি শর্তযুক্ত করেছেন ঈমানের সঙ্গে। অর্থাৎ যদি ঈমানের সঙ্গে নেক আমল করে, তবেই প্রতিদান পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে যদি ঈমান ছাড়া নেক আমল করে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۝

'যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের আমলগুলো মরুভূমির মরীচিকার মতো।'[২২১]

ঈমান এমন মূল্যবান, যার অনুপস্থিতিতে হাজার হাজার ইবাদতও মরীচিকায় পরিণত হয়।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা তাদের রবের কুফরি করে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত হলো ওই ছাইয়ের স্তূপের মতো, যে ছাইকে প্রচণ্ড ঝড়ের দিন তীব্র বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা উপার্জন করেছে, এর কিছুই পাবে না। বস্তুত এটা চূড়ান্ত ভ্রষ্টতা।'২২২ বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করা, মহান আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা, একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা, কুফর, বিদআত থেকে নিজেকে বিরত রাখা পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবিষ্ট হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।"[২২৩]

৬. ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন

ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল হযরত মুহাম্মদ (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে। কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্রদর্শনই ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন। মনে করা হয় যে, মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, অর্থাৎ সার্বিক মুক্তির জন্য ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের গুরুত্ব অপরিহার্য। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানগণ এককভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর সকল অমুসলিম, পৌত্তলিক, ইহুদি, খ্রিস্টানরা হালীফের মর্যাদা পেয়েছিল। তারা নিরাপত্তা ও সম অধিকারসম্পন্ন

---

২২০ আল-কুর'আন, ১৬: ৯৭
২২১ আল-কুর'আন, ২৪ : ৩৯
২২২ আল-কুর'আন, ১৪: ১৮
২২৩ আল-কুর'আন, ২০: ১৪

নাগরিকের মর্যাদা লাভ করেছিল। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তথা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থাকেই বুঝায়।[২২৪] বস্তুত আসমান-যমীন, মানুষ তথা সৃষ্টি জগতের সব কিছুর স্রষ্টাই হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র বা দিক তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে দান করেছেন ইসলাম। তাই ইসলামে যেমন ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনা বা রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্বলিত বিধি-বিধানও দান করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে রাষ্ট্রীয় জীবন তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা করে বলা হয়েছে:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "আসমান ও যমীনের মালিক বা রাজত্ব হল তাঁরই (আল্লাহরই) জন্যে।"[২২৫] মহান আল্লাহ সার্বভৌম ও একক কর্তত্বের অধিকারী হিসেবে এই বিশ্বসাম্রাজ্য পরিচালনা করেন এবং মানুষ তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফাতুল্লাহ। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহর (স.) আদর্শ। ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যুগের চাহিদা মোতাবেক কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রচনা করবেন। কাজেই দেখা যায় ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল উৎস হচ্ছে ৪টি। যথা

১। আল কুরআন;

২। রাসূলুলাহর (স.) আদর্শ তথা সুন্নাহ

৩। উম্মতের ইজমা এবং

৪। কিয়াস বা ইজতিহাদ।

পৃথিবীর বুকে যেখানেই যখন কোন শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়, তখন অবশ্যই তাঁর জন্য প্রয়োজন হয় কিছু রীতিনীতি, বিধি-বিধান। এ বিশ্বে এমন একটা সময় ছিল, যখন রাজা বাদশাহগণ তাদের ইচ্ছামতো দেশ চালাতেন। নিজেদের আরাম-আয়েশ, সুখ-সুবিধা নিশ্চিত করা ও নির্বিঘ্ন রাখার জন্য যেকোন নির্দেশ জারি করতে পারতেন। প্রজা সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া ও তাদের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য ছিলেননা, দিতেনওনা।

৬.১ কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

ইসলামি রাষ্ট্রের গঠন ও শাসনকাজ পরিচালিত হয় সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবিধানের ভিত্তিতে। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল উৎস আল কুরআন ও সুন্নাহ। রাষ্ট্রের শাসকরা ইসলামের বিধান তথা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে শাসনকাজ পরিচালনা করবেন। ইজমা, কিয়াস ইত্যাদির ভিত্তিতে যুগের প্রয়োজনে গৃহীত আইন ইসলামি রাষ্ট্রে চলবে। তবে কুরআন ও সুন্নাহর

---

২২৪ সায়্যিদ আব্দুল লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

২২৫ আল-কুর'আন, ৫৭ :২

পরিপন্থি কোনো আইন ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত নয়। এ ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করে না, তারা কাফির।" [২২৬]

৬.২ শাসনের উৎস ও কর্তৃত্ব

আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতাবান আল্লাহ তাআলা। তবে ইসলামী শরিয়তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, এ ধরনের শাসনতান্ত্রিক সমস্যায় ও পরিবর্তিত জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয়ে মানুষের আইন প্রণয়নের অধিকার আছে। কিন্তু তা হতে হবে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে, শরিয়তের প্রাণসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও কুরআন-সুন্নাহর মূল চেতনার অধীনে। ইসলামের এ গতিশীল ব্যবস্থার নাম ইজতিহাদ। বিকাশমান নিত্য-নতুন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত নতুন নতুন প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া আইনকে শাসনতান্ত্রিক রূপদান ও কার্যকর করা এবং রাষ্ট্রীয় সংকট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইসলাম মজলিসে শুরা (পরামর্শ সভা) প্রতিষ্ঠা করতে বলেছে। মজলিসে শুরার সদস্যরা ইসলামের মৌলিক নীতি সামনে রেখে বিধিবিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৬.৩ আদর্শ শাসন কাঠামো

সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষ তাদের দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র কীভাবে কোন আইন-কানুনের ভিত্তিতে চলবে, তা পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে নিতে শুরু করে এবং এই পূর্ব নির্ধারিত পূর্ব নির্ধারিত বিধি-বিধানগুলোই লিখিত আকারে রাখা হয়, সংরক্ষণ করা হয়।[২২৭] এটাকেই আমরা সংবিধান বলে জানি। মানব ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান হলো মদিনা সনদ। মূলত মদিনায় বসবাসরত সকল গোত্রের মধ্যে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.) ৪৭ ধারার একটি সনদ বা সংবিধান প্রণয়ন করেন যা ইতিহাসে মদিনার সনদ নামে পরিচিত। এটিই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত।[২২৮]

ইবনে হিশামের মতে এ সনদের ৫৩টি ধারা রয়েছে। উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াটের মতে এই সনদের ধারার সংখ্যা ৪৭টি।[২২৯] মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র আল-কুরআনের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও যাত্রা শুরু করে। নিরাপত্তা, শান্তি, আইনের চোখে সমতা, নাগরিক সমঅধিক-ার, নাগরিকদের ঐক্যের বন্ধন ও রাষ্ট্রীয় সংহতি, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার,

---

২২৬ আল-কুর'আন, ৫: ৪৪

২২৭ সায়্যিদ আব্দুল লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

২২৮ W. Montomery Watt, *Muhammad at Medina,* London: Oxford University Press, p. 221

২২৯ ড. হামীদুল্লাহ, *আহদে নববী মে নেযামে হুকুমরানী*, নিউ দিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া, ১৩৬৩হি./১৯৪৪খ্রি., পৃ. ১০৭; William Montgomery Watt, Muhammad Prophet and Statesman, London: Oxford University Press, 1961, p. 94-96

সহনশীলতা, অমুসলিমদের বৈষয়িক ও অন্যান্য স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদির লিখিত স্বীকৃতি ওসার্থক বাস্তবায়নের মাধ্যমে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র ছিল এক সুসংগঠিত ভূখন্ড ও ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিসহ একটি দায়িত্বশীল সুদৃঢ় সরকারের অধীনে এক সার্বভৌম কর্তৃত্ব নির্ভর আদর্শ রাষ্ট্র।[২৩০]

হযরত মুহাম্মদ (স.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। কুরআনের তথা শরীয়ার আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ব্যবস্থা, দৈনন্দিন সরকারি প্রশাসন পরিচালনা, সরকারী কর্মচারীদেও নিয়োগ-বদলী-পদোন্নতি-নির্দে শনা সমাধা, উৎপাদন-অর্থনীতি ও বাজার নিয়ন্ত্রণ, সুসংবদ্ধ প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা, চুক্তি স্বাক্ষর, পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ, দূত প্রেরণ, সামাজিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও সম্পর্ক উন্নয়ন, বিচার বিভাগ পরিচালনা, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, দ্বীনী দাওয়াত, জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি যাবতীয় কার্য সমাধা করেছেন।[২৩১]

রাজনীতির ক্ষেত্রে খলিফাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো পবিত্র কুরআনের কালেমার রাজনৈতিক বিধি-বিধান ও আদর্শের দ্বারা। আইনের শাসন তাঁদের কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো।

৬.৪ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

ইসলামী রাষ্ট্রনীতি এমন এক পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এই রাষ্ট্রনীতির প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো তাওহীদ আল্লাহর একত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার। আল্লাহ বলেন, "হুকুম (শাসন-কর্তৃত্ব) একমাত্র আল্লাহর, তিনি আদেশ করেছেন যেন তোমরা তাঁরই এবাদত কর"।[২৩২] ইসলাম বিশ্বাস করে, কোনো রাষ্ট্রের প্রকৃত ন্যায়ভিত্তিক শাসন কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যখন শাসনব্যবস্থা আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত হবে। দ্বিতীয়ত, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা রিসালত, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যে বিষয়েয মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও"।[২৩৩] ইসলামী রাষ্ট্রে তাই কুরআন ও সুন্নাহই হয় সর্বোচ্চ সংবিধান।

তৃতীয় ভিত্তি হলো শূরা বা পরামর্শমূলক শাসনব্যবস্থা। আল্লাহ বলেন, "তাদের সকল কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে হয়"।[২৩৪] অর্থাৎ শাসকের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিপরীতে, জনগণের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। চতুর্থত, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ন্যায়বিচার (ইনসাফ) অত্যন্ত

---

২৩০ কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬
২৩১ সায়্যিদ আব্দুল লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪
২৩২ আল-কুর'আন, ১২:৪০
২৩৩ আল-কুর'আন, ৪:৫৯
২৩৪ আল-কুর'আন, ৪২:৩৮

গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারের আদেশ দেন..."।[২৩৫] অন্য আয়াতে বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষ্য দাও..."।[২৩৬] ন্যায় প্রতিষ্ঠার এই নীতি ধর্ম, জাতি বা শ্রেণিভেদে কোনো বৈষম্য করতে দেয় না।

পঞ্চম নীতি হলো মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। কুরআনে বলা হয়েছে, "ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই"।[২৩৭] রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর 'মদিনা সনদ'-এর মাধ্যমে মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমঅধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। ষষ্ঠ নীতি হলো শাসকের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "প্রত্যেক তোমরাই একজন অভিভাবক, এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"।[২৩৮] ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক জনগণের খেদমতগার, কোনো রাজাধিরাজ নয়।

সপ্তমত, ইসলামী রাষ্ট্রনীতি দুর্নীতিবিরোধী ও নৈতিকতা-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না..."[২৩৯] । রাসূল (সা.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে দুর্নীতি করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাজির হবে"।[২৪০] রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, যাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। এজন্য ইসলাম জাকাত, সদকা, বায়তুল মাল, ওয়াকফ ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রদের অধিকার নিশ্চিত করে।

সর্বোপরি, ইসলামী রাষ্ট্রনীতি শুধুমাত্র শাসনের একটি কাঠামো নয়; এটি এক পবিত্র আমানত, যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি, ইনসাফ, নৈতিকতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "ন্যায়পরায়ণ শাসক কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে"।[২৪১] তাই ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর বিধান দ্বারা দুনিয়াতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম করা।

---

২৩৫ আল-কুর'আন, ১৬:৯০

২৩৬ আল-কুর'আন, ৪:১৩৫

২৩৭ আল-কুর'আন, ২:২৫৬

২৩৮ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *সাহীহ বুখারী*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হা. ৮৯২

২৩৯ আল-কুর'আন ২:১৮৮

২৪০ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *সাহীহ বুখারী*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হা. ৭১৫১

২৪১ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *সাহীহ বুখারী*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হা. ৬৯২

৬.৫ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও মর্যাদা

ইসলামে শাসকের দায়িত্ব একটি পবিত্র আমানত গুরুদায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি কোনো ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাহক নয়; বরং জনগণের কল্যাণ ও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য দেওয়া একটি দায়িত্ব। একজন শাসকের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা। কু-রআনে আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারা জালিম"।[২৪২] অর্থাৎ, শরীয়াহর বাইরে কোনো আইন ও শাসন ইসলাম অনুমোদন করে না। শাসকের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেন যে, তোমরা আমানত আদায় করো তার প্রাপকের নিকট এবং যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করো, তখন ইনসাফসহকারে করো"।[২৪৩] এই ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাণ।

আল্লাহ তাআলাও কুরআনে ইনসাফের গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার আদেশ দেন" [২৪৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) শাসকের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, "প্রত্যেক তোমরাই একজন রাইয়াহ (অভিভাবক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে"[২৪৫]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, একজন শাসক শুধু নেতা নন, বরং জনগণের প্রতি জবাবদিহির একজন খাদেম। শাসকের অন্যতম দায়িত্ব হলো দুর্বল, গরিব ও নিপীড়িত জনগণের হক রক্ষা করা এবং সমাজে সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকাল এ দায়িত্ববোধের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, যখন তিনি বলেন: "ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি ক্ষুধায় মরে, তবে আমি উমরকে এ বিষয়ে জবাব দিতে হবে।"

শাসকের মর্যাদা ইসলামে অত্যন্ত উচ্চ, যদি সে ইনসাফ ও আল্লাহভীতির সাথে দায়িত্ব পালন করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "সাত শ্রেণির লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে... তাদের একজন হলো ন্যায়পরায়ণ শাসক।"

অন্যদিকে, যেসব শাসক জুলুম করে, জনগণের হক নষ্ট করে, দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর সতর্কতা। عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ إِمَامٌ جَائِرٌ"

---

২৪২ আল-কুর'আন, ৫:৪৫

২৪৩ আল-কুর'আন, ৪:৫৮

২৪৪ আল-কুর'আন, ১৬:৯০

২৪৫ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *সাহীহ বুখারী*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হা. ৮৯৩

আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং তাঁর নিকটে সবচেয়ে কাছাকাছি হবে ন্যায় পরায়ণ শাসক। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত ও তাঁর থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে জালিম শাসক।"[২৪৬]

হাদীসে আরও এসেছে,

"যে নেতা জনগণের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তাদের কল্যাণ কামনা করে না, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।" [২৪৭]

সুতরাং ইসলামে শাসক হওয়া সম্মানের বিষয় হলেও, তা ক্ষমতা নয় বরং ভয়াবহ জবাবদিহির জায়গা। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক যেমন জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তেমনি একনায়ক, দুর্নীতিবাজ ও অবিচারী শাসকের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ইসলাম চায় এমন শাসক যিনি আল্লাহভীতি, জনসেবার আন্তরিকতা এবং ইনসাফ নিয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং আখিরাতে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকেন।

ইসলামে ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশেষ ফজিলতের অধিকারী। কারণ, সে একটি গোটা জাতির ভাগ্য গঠনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত বহু মানুষের কল্যাণ বা ক্ষতির কারণ হতে পারে। ইসলাম শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারকে, এবং যে শাসক আল্লাহভীতি ও ইনসাফের ভিত্তিতে জনগণকে পরিচালনা করে, সে আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়।

এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায়, দুনিয়াতে যারা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় বিশেষ নিরাপত্তা ও মর্যাদা প্রদান করবেন। কারণ, শাসকের পক্ষে চাইলেই ক্ষমতার অপব্যবহার করা সম্ভব, কিন্তু যে শাসক আল্লাহর ভয়ে নিজের ইচ্ছাকে সংযত করে ইনসাফের পথ বেছে নেয় সে প্রকৃত মুত্তাকি ও আদর্শ নেতার প্রতীক।

আর শাসকের দ্বারাই সমাজে এই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সে এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে গোটা সমাজ বিপদে পড়ে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর মত সাহাবিগণ এই ন্যায়নিষ্ঠ শাসনের উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁরা গভীরভাবে সচেতন ছিলেন যে, শাসকের প্রতিটি কাজ আখিরাতে জবাবদিহির আওতায় পড়বে। এটি শুধু দায়িত্ববোধ নয়, বরং এক মহৎ আত্মা ও গভীর আল্লাহভীতির পরিচয়। ইসলামে এমন শাসকের কথা বলা হয়েছে, যিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, দুর্নীতি ও জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন, জনগণের অধিকার রক্ষা করেন এবং সর্বোপরি আল্লাহর

---

২৪৬ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ঈসা তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নং ২০১৮

২৪৭ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী, *সাহীহ বুখারী*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নং ৭১৭৮

বিধান অনুসরণ করে শাসন করেন। এদেরকেই বলা হয়েছে "ইমামুন আ'দিল" বা ন্যায়পরায়ণ নেতা। তারা শুধু ইতিহাসে নয়, কিয়ামতের দিনও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবেন। তাই ইসলাম কেবল নেতৃত্ব চায় না; চায় আল্লাহভীতিপূর্ণ, বিচক্ষণ, দয়ালু ও ন্যায়ের ধারক নেতৃত্ব যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।[২৪৮]

৬.৬ পরামর্শ ও জাবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা

ইসলামে শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো পরামর্শমূলক শাসন ব্যবস্থা, যাকে শূরা বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ পরামর্শ গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে, যা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে একচ্ছত্র স্বেচ্ছাচারী শাসন থেকে রক্ষা করে জনগণের অংশগ্রহণমূলক একটি সুশাসনের রূপ দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের সব কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে হয় " [২৪৯]

এই আয়াতে আল্লাহ পরামর্শ বা শূরাকে মু'মিনদের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের মতামত ও অভিজ্ঞতা মূল্যবান।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও শাসক হয়েও সবসময় সাহাবীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন। বিশেষ করে বদর যুদ্ধ, উহুদ যুদ্ধ, হুদায়বিয়াহ চুক্তি এসব বড় বড় ঘটনায় তিনি সাহাবীদের মতামতকে মূল্য দিয়েছেন এবং প্রয়োজনে নিজের মতের বিপরীতে গিয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠের পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, ইসলামে নেতৃত্ব মানে একক সিদ্ধান্ত নয়; বরং সহনশীলতা, পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তুমি তাদের ব্যাপারে পরামর্শ করো, আর যখন তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো।"[২৫০]

এই শূরা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসন হয় স্বচ্ছ, গণমুখী এবং দায়িত্বশীল। হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলী (রা.) এই চার খলিফার শাসনকালেও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। তাঁদের শাসনকালই ইসলামী শূরা ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

শূরার মূলনীতি হলো: বিশ্বস্ত ও যোগ্য মানুষদের মতামত নেওয়া, জনগণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া, এবং ক্ষমতা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার করা। এটি আধুনিক গণতন্ত্রের কিছু মৌলিক উপাদান যেমন মতামতের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে ইসলামী শূরা ব্যবস্থার ভিত্তি হলো আল্লাহভীতি ও শরীয়াহর সীমারেখা। ইসলামে শাসনব্যবস্থা একটি আমানত কোনো ব্যক্তি বা দলের একচ্ছত্র মালিকানা নয়। এই শাসনব্যবস্থার মূল

---

২৪৮ শায়খ আব্দুল হাকিম হক্কানি, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ* ,দারুল আরকাম, ১ম সংস্করণ, ২০২৩,পৃ.৯০

২৪৯ আল-কুর'আন, ৪২:৩৮

২৫০ আল-কুর'আন, ৩:১৫৯

একটি স্তম্ভ হলো জবাবদিহিতা, অর্থাৎ শাসক ও প্রশাসনের প্রতি আল্লাহ ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দেন যে, তোমরা আমানত তাদের যথোপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে প্রদান করো..."[২৫১]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, শাসন একটি আমানত, যা সৎ, যোগ্য ও জবাবদিহিমূলক নেতৃত্বের মাধ্যমেই সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। জবাবদিহির এই নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থা হয় স্বচ্ছ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং জনগণের আস্থার যোগ্য।

৬.৭ ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা

রাষ্ট্রের ভারসাম্য ঐ জনপদের পরিচালক বা জনপ্রতিনিধিদের ওপর নির্ভর করে। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের ভারসাম্য হলো এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে, যিনি সমাজে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবেন, জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করবেন, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং শক্ত হাতে অন্যায় প্রতিহত করবেন। কথা, কাজ এবং দায়িত্ব পালনে জনপ্রতিনিধির ভারসাম্যহীন হলে জনপদের মানুষের দুর্ভোগের অন্ত নাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[২৫২] বিচারকার্য পরিচালনায় ন্যায়পরায়ণ হবে। ত্রাণ বিতরণ, অর্থ সহায়তা, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ সকল কাজে স্বচ্ছতার পরিচয় দেবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে দুর্নীতি, সুদ, জুয়া, মাদক, পতিতাবৃত্তির উর্বর ভূমি। নেতা হবে ওমর (রা.)-এর মতো অন্যায় প্রতিরোধে আপসহীন।

৬.৮ মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ

ইসলাম যেহেতু চিন্তা ও কর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রও কায়েম করে থাকে। তাই ইসলাম তার রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করে। মুসলিম ও অমুসলিম। উক্ত নাগরিকগণ হয়তো রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হবেন অথবা তাঁরা রাষ্ট্রের সাথে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করবেন। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হবেন এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সরকারের আনুগত্য স্বীকার করবেন।

---

২৫১ আল-কুর'আন, ৪:৫৮

২৫২ (وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا), আল-কুর'আন, ১৭:৩৪

৬.৯ বৈশ্বিক সম্প্রীতি

নবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তিনি কেবল মুসলমানদের স্বার্থ বিবেচনা করতেন না, অমুসলিমদের অধিকারের প্রতিও খেয়াল রাখতেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মপালন ও বসবাসের ক্ষেত্রে তিনি যে নিরাপত্তা দিয়েছেন, অন্য কেউ তা আজ পর্যন্ত দিতে পারেননি। নবী করিম (সা.)-এর সময়ে প্রায় সমগ্র আরব উপদ্বীপ ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে চলে এসেছিল। অমুসলিম প্রজাদের সঙ্গে তার সর্বপ্রথম মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদিত হয় নাজরানের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে। খ্রিষ্টানদের সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রেখে নবিজি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। বিশ্বময় চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম মানবভ্রাতৃত্ব তথা বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে একই পরিবারভুক্ত মনে করে। ইসলাম মনে করে, সব মানুষই এক আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি প্রত্যেক মানুষকেই মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টির সেরা করেছেন। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে সব মানুষের উৎপত্তি এক আদম ও হাওয়া থেকে। ইসলাম আরও শিক্ষা দেয়, হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে পরবর্তী সব নবী-রাসুল যেমন: হজরত নূহ (আ.), হজরত ইব্রাহিম (আ.), হজরত মুসা (আ.), হজরত ঈসা (আ.), হজরত মুহাম্মদ (সা.) প্রত্যেকেই ছিলেন ভাই ভাই এবং তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায়, তার মীমাংসা তো হয়েই যেত।"[২৫৩]

৬.১০ আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলাম

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলত পাশ্চাত্য রাজনীতিক দর্শনের প্রভাবে গঠিত, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক (secularism) করার প্রবণতা বিদ্যমান। এর বিপরীতে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিভাজন নেই। ইসলামে রাষ্ট্র হলো দ্বীনের প্রতিষ্ঠা, ইনসাফের প্রয়োগ এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত করার একটি মাধ্যম। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

"যারা যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দিই, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে..."[২৫৪]

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামী রাষ্ট্র কেবল নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য নয়; বরং এটি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। তবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলাম অনেকক্ষেত্রেই একটি "ব্যক্তিগত ধর্ম" হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে, রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় তার প্রভাব থাকে খুবই সামান্য। আইন

---

২৫৩ আল-কুর'আন, ১০: ১৯

২৫৪ আল-কুর'আন, ২২: ৪১

প্রণয়ন, শিক্ষা, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে পাশ্চাত্য মডেল অনুসরণ করা হয়, যা ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে অনেকসময় সাংঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং, নারীবাদী চেতনায় পারিবারিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, বা শিক্ষা থেকে ধর্মীয় পাঠ বাদ দেওয়া এসবই আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলামকে কোণঠাসা করে তুলেছে।

এমন বাস্তবতায় প্রশ্ন উঠে ইসলাম কি আধুনিক রাষ্ট্রে টিকে থাকতে পারে? উত্তর হলো হ্যাঁ, যদি রাষ্ট্র ইসলামের মূলনীতি যেমন ইনসাফ, জবাবদিহি, শূরা, নৈতিকতা, ধর্মীয় সহনশীলতা ইত্যাদিকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশ করে। ইসলামের এই মূল্যবোধসমূহ আজও সমকালীন, এমনকি অনেক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাও সেগুলোর প্রতি আহ্বান জানায়। উদাহরণস্বরূপ, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, কাতার ও ইরানের কিছু অংশবিশেষে ইসলামি মূল্যবোধ এবং আধুনিক রাষ্ট্রনীতি একত্রে পরিচালিত হচ্ছে।

সুতরাং, আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলামকে স্থান দিতে হলে শুধু আইন নয়; বরং সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে ইসলামের নীতিমালার বাস্তবায়ন জরুরি। ইসলাম কোনো যুগবিচ্ছিন্ন ধর্ম নয় বরং এটি এমন এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, যা আধুনিক সময়ের প্রতিটি চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে এর জন্য প্রয়োজন রয়েছে সদিচ্ছা, ইসলামি স্কলারশিপ, এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের আন্তরিকতা ও সাহস।

৬.১১ ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্যমাত্রা

ইসলামী রাষ্ট্র কেবল প্রশাসনিক কাঠামো নয়; বরং তা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা, মানবকল্যাণ এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জনের একটি সার্বিক ব্যবস্থা। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্যমাত্রা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, যার অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ ও বিচারব্যবস্থা কেবল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হবে। আল্লাহ বলেন,

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারা তো কাফের।" [২৫৫]

এ লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো তাওহীদের প্রচার, শিরক ও কুফরের মূলোচ্ছেদ, এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী সমাজ গঠন।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হলো ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সব নাগরিকের জন্য ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে। কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

"আল্লাহ ইনসাফ ও সদাচারের আদেশ দেন..." [২৫৬]

ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক সমাজব্যবস্থা গঠন করে যেখানে দুর্নীতি, জুলুম ও বৈষম্য থাকেনা।

---

২৫৫ আল-কুর'আন, ৫:৪৪

২৫৬ আল-কুর'আন, ১৬:৯০

তৃতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা। এটি কেবল মুসলমান নয়, অমুসলিমদের প্রতিও সুবিচার, নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। রাসূল (সা.) মদিনা সনদের মাধ্যমে অমুসলিমদের সঙ্গে সহাবস্থান ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

চতুর্থত, ইসলামী রাষ্ট্র আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক শুদ্ধি নিশ্চিত করে। এটি এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেখানে মানুষ আল্লাহভীতি ও আখিরাতের জবাবদিহি সামনে রেখে জীবনযাপন করে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্র ইলম, দাওয়াহ ও শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে জ্ঞানের ভিত্তিতে আলোকিত ও দ্বীনদার সমাজ গঠনের কাজ করে।

পঞ্চমত, ইসলামী রাষ্ট্রের আরেকটি লক্ষ্য হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা, যাতে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য না থাকে। এজন্য রাষ্ট্র যাকাত, বায়তুল মাল, ওয়াকফ ও ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালনা করে। কুর'আন বলে, "যেন ধন-সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে।"[২৫৭]

সর্বোপরি, ইসলামী রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা হলো "আল্লাহর জমিনে তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠা করে শান্তি, ইনসাফ ও কল্যাণপূর্ণ এক সমাজ গঠন", যা মানুষের জন্য দুনিয়াতে নিরাপত্তা ও আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম করে।

৭. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

আর কেনোই বা তিনি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক হবেন না, যখন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বোত্তম শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেন, 'আমাকে আমার প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আমাকে তিনি সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। আমার প্রভু আমাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছেন সুতরাং তিনি সর্বোত্তম শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য সর্বোত্তম শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। নিম্নে রাসূল (সা.)-এর অনুসৃত কয়েকটি শিক্ষাপদ্ধতি তুলে ধরা হলো। নবু-ওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় নিরিবিলি স্থানে অবস্থিত হযরত আরকাম (রা)-এর বাড়িকে (দারুল আরকাম) একটি শিক্ষায়তনে পরিণত করেন। দারুল আরকাম ছিল ইসলামের প্রথম পাঠশালা বা 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'। নও-মুসলিমগণ গোপনে এসে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।[২৫৮]

---

২৫৭ আল-কুর'আন, ৫৯:৭

২৫৮ মক্কার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা) বাড়িটি দারুল আরকাম নামে খ্যাত। নবু-ওয়্যতের ষষ্ঠ সালে রাসূলুল্লাহ্ (স.) সহ সাহাবীগণ দারুল আরকামে আশ্রয় নেন। নবদীক্ষিতরা এ বাড়িতে এসে কুরআনের পঠন-পাঠনের তালিম নিতেন। রাসূল (স.) এখানে বসেই মুসলমানদেরকে কুরআন, নামায, নৈতিকতার তালিম দিতেন। এটি ছিল একাধারে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস। (দ্র. ড. মুহাম্মদ আল-আজ্জাজ আল-খাতীব, *আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন*, (বৈরুত, তা.বি), পৃ. ৩৭; *The Islamic World in the Abbasid's Era* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980, 4th Edition), p. 80)

৭.১ গৃহকে শিক্ষালয় ঘোষণা

হযরত মুহাম্মাদ (স) নবুওয়্যাত লাভের পর থেকে তাঁর গৃহকে শিক্ষাগার হিসেবে প্রস্তুত করেন। নবী করীম (স) নিজে লোকদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রা.) আজীবন শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর ইনতিকালের পর মদীনায় তাঁর স্ত্রীদের গৃহ নারীদের শিক্ষা দানের জন্য ছিল উন্মুক্ত। হযরত আয়িশা (রা.), হাফসা (রা.) ও উম্মে সালমা (রা.) নারীদের মাঝে শিক্ষা দান কাজে ব্যস্ত ছিলেন।[২৫৯]

৭.২ গোত্রে গোত্রে শিক্ষায়তন

নতুন কোন গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণ করলে, তাদের শিক্ষা দানের জন্য অভিজ্ঞ সাহাবীদেরকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হত। এভাবে গোত্রে গোত্রে বিভিন্ন সাহাবীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষায়তন গড়ে উঠতে থাকে। হিজরতের পর মদীনায় মসজিদে নববী শিক্ষার মহাকেন্দ্রের রূপ লাভ করে। মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে 'সুফফা' নামে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে তোলা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মানুষ এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতেন। অনেক সাহাবী 'সুফফা' বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন আবাসিক ছাত্র-শিক্ষকের ভূমিকায় ছিলেন।[২৬০] তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা মুসলমানদের দানে ও বাইতুল মালের ভাণ্ডার থেকে দেয়া হত। কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর, রোম, পারস্য প্রভৃতি স্থান থেকে আগত শিক্ষার্থীরা মদীনায় এসে ভীড় জমাতেন।[২৬১]

৭.৩ মুক্তিপণ হিসেবে শিক্ষা

মহানবী (স.) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারে এত গুরুত্ব দিতেন যে, বদরের শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন– কয়েকজন নিরক্ষর মুসলিমকে শিক্ষা দান করার মাধ্যমে। ইসলামী ইতিহাসে মুক্তিপণ হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ একটি অনন্য, মানবিক এবং জ্ঞাননির্ভর সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত, যা প্রথম ঘটেছিল বদর যুদ্ধের পর। এই সিদ্ধান্ত ছিল শুধু একটি সাময়িক কৌশল নয়; বরং এটি ছিল ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের জ্ঞান, দয়া ও ন্যায়ের প্রতীক।

বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, যেখানে অনেক কুরাইশ কাফের বন্দী হন মুসলমানদের হাতে। সাধারণত বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে অর্থ দাবি করা হতো। তবে রাসূলুল্লাহ (স.) দয়ার্দ্রতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে নিরক্ষর মদিনার মুসলিমদের উপকারে এই বন্দীদের জ্ঞানকে মুক্তিপণের বি-কল্প হিসেবে গ্রহণ করেন।

---

২৫৯ ফাহমিদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

২৬০ ড. মো. আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৪৩

২৬১ কে আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, "যেসব মক্কাবাসী বন্দী হয়, তাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত, তাদেরকে বলা হলো তোমরা যদি মদিনার ১০ জন মুসলমান শিশুকে পড়াতে পারো, তবে মুক্তি পাবে।"

এ সিদ্ধান্তে প্রমাণ হয়, ইসলামে যুদ্ধাবস্থাতেও জ্ঞান ও শিক্ষার মর্যাদা অবিকল থাকে। যুদ্ধবন্দিকে শাস্তি না দিয়ে, বরং তাকে শিক্ষাদানকারী হিসেবে মূল্যায়ন করা ইসলামের অগ্রসর চিন্তাধারার পরিচয়।

৭.৪ উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান

শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অপরিহার্য। কোলাহলপূর্ণ বিশৃঙ্খল পরিবেশ শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষক উভয়ের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স.) শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষা করতেন। হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। 'নিশ্চয় বিদায় হজের সময় রাসূল (সা.) তাকে বলেন, মানুষকে চুপ করতে বল। অতপর তিনি বলেন, আমার পর তোমরা কুফরিতে ফিরে যেয়ো না ....।'[২৬২]

অর্থাৎ রাসূল (স.) শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে স্থির হওয়ার এবং মনোসংযোগ স্থাপনের সুযোগ দিতেন। অতপর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে শিক্ষাদান শুরু করতেন।

৭.৫ থেমে থেমে পাঠদান

রাসূলুল্লাহ (স.) পাঠদানের সময় থেমে থেমে কথা বলতেন। যেনো তা গ্রহণ করা শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হয়। খুব দ্রুত কথা বলতেন না যেনো শিক্ষার্থীরা ঠিক বুঝে উঠতে না পারে আবার এতো ধীরেও বলতেন না যাতে কথার ছন্দ হারিয়ে যায়। বরং তিনি মধ্যম গতিতে থেমে থেমে পাঠ দান করতেন। হজরত আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেন:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الخ

২৬২ সায়্যিদ আব্দুল লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

'তোমরা কী জানো- আজ কোন দিন? ...এটি কোন মাস? ...এটি কী জিলহজ নয়? ...এটি কোন শহর?' প্রতিটি প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) চুপ থাকেন এবং সাহাবারা উত্তর দেন আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন।[২৬৩]

৭.৬ ভাষা ও দেহভাষার সমন্বয়

রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো বিষয়ে আলোচনা করলে, তার দেহাবয়বেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হতো। তিনি দেহ-মনের সমন্বিত ভাষায় পাঠ দান করতেন।[২৬৪] কারণ, এতে বিষয়ের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রোতা শিক্ষার্থীগণ সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হয় এবং বিষয়টি তার অন্তরে গেঁথে যায়। যেমন, তিনি যখন জান্নাতের কথা বলতেন, তখন তার দেহে আনন্দের স্ফূরণ দেখা যেতো। জাহান্নামের কথা বললে ভয়ে চেহারার রঙ বদলে যেতো। যখন কোনো অন্যায় ও অবিচার সম্পর্কে বলতেন, তার চেহারায় ক্রোধ প্রকাশ পেতো এবং কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেতো। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) যখন বক্তব্য দিতেন- তার চোখ লাল হয়ে যেতো, আওয়াজ উঁচু হতো এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো। যেনো তিনি (শত্রু) সেনা সম্পর্কে সতর্ককারী।'[২৬৫]

গল্প-ইতিহাস জ্ঞানের সমৃদ্ধ এক ভাণ্ডার। শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষককে অনেক সময় গল্প-ইতিহাস বলতে হয়। রাসূল (সা.) ও পাঠদানের সময় গল্প বলতেন। তিনি গল্প বলতেন অত্যন্ত মিষ্টি করে। এমন মিষ্টি ভঙ্গি গল্প-ইতিহাস স্বপ্রাণ হয়ে উঠতো। জীবন্ত হয়ে উঠতো শ্রোতা-শিক্ষার্থীর সামনে।

৭.৭ শিক্ষার্থীর নিকট প্রশ্ন করা

রাসূল (স.) পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের নিকট প্রশ্ন করতেন। যেনো তারা প্রশ্ন করতে এবং তার উত্তর খুঁজতে অভ্যস্ত হয়। কেননা নিত্যনতুন প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে নিত্য-নতুন জ্ঞান অনুসন্ধানে উৎসাহী করে। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করেন,

يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

---

২৬৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা, পরিচ্ছেদ: সাত জমিন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হাদীস নং ৭০৮০

২৬৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা, পরিচ্ছেদ: সাত জমিন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হা. ১৭৪১

২৬৫ *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত ৪৩

হে মুয়াজ! তুমি কী জানো বান্দার নিকট আল্লাহর অধিকার কী? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। রাসূল (সা.) বলেন, তার ইবাদত করা এবং তার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক না করা। '[২৬৬]

৭.৮ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা

বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকলে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অনেক বেশি মনোযোগী হয়। একাগ্র হয়ে শিক্ষকের আলোচনা শোনে। রাসূল (স.) পাঠদানের সময় বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতেন।

হজরত সাঈদ ইবনে মুয়াল্লা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) তাকে বলেন,

فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللهُ ثُمَّ قَالَ لِيْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ أَعْظَمُ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ (الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ)

'মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদেরকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দেবো। তিনি বলেন, আমি যখন বের হওয়ার ইচ্ছে করলাম রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে বললেন, তোমাকে বলিনি! মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দেবো। অতপর তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।'[২৬৭]

৭.৯ আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী নির্বাচন করতেন। যেনো শেখানো বিষয়টি দ্রুত ও ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন,

مَنْ يَأْخُذُ مِنْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟" قَالَ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ:" فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّهُنَّ فِيهَا"،

আমার উম্মতের মধ্য থেকে কে পাঁচটি গুণ ধারণ করবে এবং তার ওপর আমল করবে? তিনি বলেন, আমি বলি, আমি হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং হাতে পাঁচটি বিষয় গণনা করলেন।[২৬৮]

---

২৬৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা, পরিচ্ছেদ: সাত জমিন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হা. ৭৩৭৩

২৬৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা, পরিচ্ছেদ: সাত জমিন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হা. ৪৪৭৪

২৬৮ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *কুরআনের আলোকে মানবজীবন*, ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.,পৃ.৬৫

৭.১০ উপমা দিয়ে বোঝানো

নবী করিম (স.) অনেক সময় কোনো বিষয় স্পষ্ট করার জন্য উপমা ও উদাহরণ পেশ করতেন। কেননা উপমা ও উদাহরণ দিলে যে কোনো বিষয় বোঝা সহজ হয়ে যায়। হজরত সাহাল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

"আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করবো। হজরত সাহাল (রা.) বলেন: রাসূল (স.) তার শাহাদত ও মধ্যমা আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন।"[২৬৯]

৭.১১ শিক্ষার্থীর প্রশ্নগ্রহণ এবং প্রশ্নের জন্য প্রসংশা করা

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। এসব প্রশ্নের সমাধান না পেলে অনেক সময় পুরো বিষয়টিই শিক্ষার্থীর নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়। সে পাঠের পাঠোদ্ধার করতে পারে না। আর প্রশ্নের উত্তর দিলে বিষয়টি যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনে আরো আগ্রহী হয়। রাসূল (স.) শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর প্রশ্ন গ্রহণ করতেন এবং প্রশ্ন করার জন্য কখনো কখনো প্রশ্নকারীর প্রসংশাও করতেন। হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا، عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي سَفَرٍ . فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ – أَوْ يَا مُحَمَّدُ – أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ "لَقَدْ وُفِّقَ – أَوْ لَقَدْ هُدِيَ

'এক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে প্রশ্ন করে, আমাকে বলুন! কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে এবং কোন জিনিস জাহান্নাম থেকে দূরে সড়িয়ে নিবে। নবী করিম (সা.) থামলেন এবং তার সাহাবাদের দিকে তাকালেন। অতপর বললেন, তাকে তওফিক দেওয়া হয়েছে বা তাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে।'

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, রাসূল (স.) প্রশ্নটি শুনেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেননি। বরং তিনি চুপ থাকেন এবং সাহাবীগণের দিকে তাকিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রশ্নকারীর প্রশংসা করেন। যাতে প্রশ্নটির ব্যাপারে সকলের মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং সকলেই উপকৃত হতে পারে।

৭.১২ আমলের মাধ্যমে শিক্ষাদান

শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো প্রাক্টিক্যাল বা প্রায়োগিক শিক্ষা। রাসূল (সা.) অধিকাংশ বিষয় নিজে আমল করে সাহাবিদের শেখাতেন। শেখাতেন হাতে-কলমে। এজন্য হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন। রাসূল (স.) বলেন,

---

২৬৯ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: সৃষ্টির সূচনা, পরিচ্ছেদ: সাত জমিন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হা. ৬০০৫

صلوا كما رأيتموني أصلي

'তোমরা নামাজ আদায় কর, যেমন আমাকে আদায় করতে দেখো।'[২৭০]

বিবেক মানুষের বড় রক্ষক। বিবেক জাগ্রত থাকলে মানুষ নানা অপরাধ থেকে বেঁচে যায় এবং বিবেকলুপ্ত হলে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি সহজ উপায় হলো- মানুষের বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলা।[২৭১] রাসূল (সা.) বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলার মাধ্যমেও মানুষকে শিক্ষাদান করেছেন। যেমন- এক যুবক রাসূল (স.) কে বললো। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। তার কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা মারমুখি হয়ে উঠলো এবং তিরস্কার করলো। রাসূল (স.) তাকে কাছে ডেকে নিলেন এবং বললেন, তুমি কী তোমার মায়ের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ কর? সে বললো, আল্লাহর শপথ না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। রাসূল (স.) বললেন, কেউ তার মায়ের ব্যাপারে এমন পছন্দ করে না। এরপর রাসূল (স.) একে একে তার সব নিকট নারী আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং সে না উত্তর দেয়। এভাবে রাসূল (স.) তার বিবেক জাগ্রত করে তোলেন।[২৭২]

৭.১৩ রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট করা:

কখনো কখনো কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য রাসূল (স.) রেখাচিত্র ও অঙ্কনের সাহায্য নিতেন। যেনো শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে তা রেখাপাত করে। হজরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هَذَا الإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ

'রাসূল (স.) একটি চারকোণা দাগ দিলেন। তার মাঝ বরাবর দাগ দিলেন। যা তা থেকে বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে এবং চতুষ্কোণের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দিলেন। তিনি বললেন, এটি মানুষ। চতুষ্কোণের ভেতরের অংশ তার জীবন এবং দাগের যে অংশ বের হয়ে গেছে সেটি তার আশা।'[২৭৩]

এভাবে রাসূল (সা.) রেখাচিত্রের সাহায্যে মানুষের জীবন ও জীবনের সীমাবদ্ধতার বিষয় স্পষ্ট করে তুললেন।

---

২৭০ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬০৫

২৭১ ইমাম আল গাযালী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

২৭২ জহুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮

২৭৩ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: কোমল হওয়া, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হাদীস নং ৬৪১৭

৭.১৪ বার বার পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ

রাসূলে আকরাম (সা.) শিক্ষার্থীদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর না করে বার বার পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন; বরং বার বার পাঠ করে কঠিন বিষয়কে আয়ত্ত্ব করতে বলতেন। হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন: 'তোমরা কুরআনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও। সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন তা উটের চেয়ে দ্রুত স্মৃতি থেকে পলায়ন করে।'[২৭৪]

৭.১৫ আশা ও ভয়ের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি

রাসূলে আকরাম (সা.) শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের অনাগত জীবন সম্পর্কে যেমন আশাবাদী করে তুলতেন, তেমনি তার চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেন। যেমন- হজরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا

'রাসূল (স.) একটি ভাষণ দিলেন। আমি এমন ভাষণ আর শুনিনি। তিনি বলেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে অল্প হাসতে এবং বেশি কাঁদতে '[২৭৫] হজরত আবু জর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বললো এবং তার ওপর মৃত্যুবরণ করলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? রাসূল (স.) বলেন, হ্যাঁ। যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে।'[২৭৬]

৭.১৬ মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান

মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বহু জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজ হয়ে যায় এবং উত্তম সমাধান পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও বহু বিষয় মুক্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। সমাধান বের করতেন। যেমন, হুনায়নের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন নিয়ে আনসার সাহ-াবায়ে কেরামের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিলে রাসূল (সা.) তাদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা করেন। একইভাবে বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে সাহাবিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

৭.১৭ গুরুত্বপূর্ণ কথার পুনরাবৃত্তি

রাসূল (স.) তার পাঠদানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তিন বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ

---

২৭৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: ফাজায়িলুল কুরআন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হাদীস নং. ৫০৩৩

২৭৫ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: তাফসীর, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হা.৪৬২১

২৭৬ সাইয়েদ আব্দুল্লাহ হাসান নদভী, *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

'রাসূল (স.) তার কথাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেনো তা ভালোভাবে বোঝা যায়।'

৭.১৮ ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাদান

রাসূলুল্লাহ (স.) ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। হজরত আবু মাসউদ আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট অভিযোগ করে যে,

لاَ أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি নামাজ দীর্ঘায়িত করে ফেলে। আমি উপদেশ বক্তৃতায় রাসূল (স.) কে সেদিনের তুলনায় আর কোনোদিন বেশি রাগ হতে দেখিনি। রাসূল (স.) বলেন, 'হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমরা অনীহা সৃষ্টিকারী। সুতরাং যে মানুষ নিয়ে (জামাতে) নামাজ আদায় করবে, সে তা যেনো হাল্কা করে (দীর্ঘ না করে)। কেননা তাদের মধ্যে অসুস্থ্য, দুর্বল ও জুল-হাজাহ (ব্যস্ত) মানুষ রয়েছে।[২৭৭]

৭.১৯ শাস্তিদানের মাধ্যমে সংশোধন:

গুরুতর অপরাধের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো তার শিষ্য ও শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করে সংশোধন করতেন। তবে রাসূল (সা.) অধিকাংশ সময় শারীরিক শাস্তি এড়িয়ে যেতেন। ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। যেমন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় হজরত কাব ইবনে মালেক (রা.) সহ কয়েকজনের সঙ্গে রাসূল (স.) কথা বলা বন্ধ করে দেন। যা শারীরিক শাস্তির তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ ছিল। রাসূল (স.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতির সামান্য কিছু দ্রষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের দীর্ঘ কলেবরের স্বতন্ত্র বই রয়েছে। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে রাসূল (স.)-এর সাফল্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত থেকে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"স্মরণ করো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু। অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সঞ্চার করলেন। তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাইয়ে পরিণত হলে। প্রকৃতার্থে তোমরা অবস্থান করছিলে অগ্নিকুণ্ডের প্রান্ত সীমায়। অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে

২৭৭ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *কুরআনের আলোকে মানবজীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তার নিদর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও।"[২৭৮]

অর্থাৎ রাসূল (সা.) পতনুখ একটি জাতিকে তার কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করান। তার শিক্ষা ও সাফল্য শুধু ইহকালীন সাফল্য বয়ে আনেনি; বরং তার পরিব্যপ্তি ছিলো পরকালীন জীবন পর্যন্ত। সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে যদি তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে হয় এবং উভয় জগতের সাফল্য অর্জন করতে হয়, তবে অবশ্যই রাসূল (স.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।[২৭৯]

৮. রাসুল (স.)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ

পবিত্র কুরআন একসঙ্গে নাজিল হয়নি; বরং কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে; তাই রাসুল (স.)-এর যুগে শুরু থেকেই বই আকারে একে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। আসমানি গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে এ বিশেষত্ব দান করেছেন যে কলম-কাগজের চেয়েও একে অগণিতসংখ্যক হাফেজের স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেছেন। মুসলিম শরিফে এসেছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব (স.)-কে বলেছেন, 'আমি আপনার ওপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করব, যাকে পানি ধুয়ে নিতে পারবে না।' অর্থাৎ দুনিয়ার সাধারণ গ্রন্থগুলোর অবস্থা এই যে পার্থিব বিপর্যয়ের কারণে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়; কিন্তু কুরআনকে মানুষের অন্তরে অন্তরে এভাবে সংরক্ষণ করা হবে যে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকবে না। তাই প্রথম দিকে লেখার চেয়েও কুরআন মুখস্থ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে রাসুল (স.)-এর জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় অংশ হাফেজে কুরআন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন- হজরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, সাআদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুজায়ফা বিন ইয়ামান, হজরত সালেম, আবু হুরায়রা, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ বিন আমর, মুয়াবিয়া, ইবনে জুবাইর, আবদুল্লাহ বিন আস্-সায়েব, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালমা, উম্মে ওয়ারাকা, উবাই ইবনে কাআব, মাআজ ইবনে জাবাল, আবু হুলাইমা মা'আজ, জায়েদ ইবনে সাবেত, আবুদ্ দারদা, মুজাম্মা বিন জারিয়া, মাসলামা বিন মুখাল্লিদ, আনাস ইবনে মালেক, উকবা বিন আমের, তামিম দারেমি, আবু মুসা আশআরি এবং হজরত আবু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ অন্যতম হাফেজ সাহাবি ছিলেন।[২৮০] মূলত উল্লিখিত নামগুলো সেসব সাহাবির, যাঁদের নাম হাফেজে কুরআন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। অন্যথায় আরো অগণিত সাহাবির গোটা কুরআন

---

২৭৮ আল-কুর'আন,৩: ১০৩

২৭৯ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮

২৮০ আব্দুল্লাহ আল আমিন, *বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বই বাজার, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১২৪

মুখস্থ ছিল। কেননা বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) কখনো কখনো একেক গোত্রে সত্তরজন করে কুরআনের শিক্ষক পাঠাতেন। বীরে মউনার যুদ্ধে সত্তরজন কারি সাহাবি শহীদ হওয়ার কথা বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। হাফেজ সাহাবির সংখ্যা এতই বেশি যে ইমামার যুদ্ধে প্রায় সমসংখ্যক হাফেজ, আরেক বর্ণনা মতে, পাঁচশত[২৮১] অন্য বর্ণনা মতে, সাতশত কারি/হাফেজ সাহাবি শহীদ হয়েছেন।[২৮২]

৯. রাসুল (স.)-এর যুগে কুরআন সংকলন

আরবদের দুনিয়া জুড়ে খ্যাত বিস্ময়কর স্মৃতির ওপর ভর করে কুরআন সংরক্ষণের পাশাপাশি রাসুল (সা.) লিখিতভাবে কুরআন সংকলন, সংরক্ষণ ও একত্রীকরণের ব্যবস্থা করে গেছেন। ওহির ইলম লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি চল্লিশজন 'কাতেবে ওহি' বা ওহি লেখক নিযুক্ত করেছেন। সে সময় কাগজ ছাড়াও পাথর, চামড়া, খেজুরের ডাল, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং চতুষ্পদ জন্তুর হাড্ডির ওপর কুরআন লিখে রাখা হতো।[২৮৩] এভাবেই রাসুল (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে পবিত্র করআনের একটি কপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সা)-এর আমলে যেসব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল সেগুলো পরিপূর্ণ পুস্তিকারূপে ও গ্রন্থিত আকারে ছিল না।[২৮৪] এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের কারো কারো কাছে ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ কপি বিদ্যমান ছিল। যেমনটা বুখারি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, "রাসুল (সা.) কুরআন নিয়ে (অর্থাৎ কুরআনের কপি নিয়ে) শত্রুদের ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।"

১০. শিক্ষা বিস্তারে খুলাফায়ে রাশেদীনের পদক্ষেপ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নে খুলাফায়ে রাশেদূনের চার খলীফা অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারে তাঁদের অবদান হচ্ছে:

মহানবীর (স.) যুগে কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনকে একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করে যেতে পারেননি। পবিত্র কুরআনকে একত্রে গ্রন্থাকারে সংকলনের মহান দায়িত্ব পালন করেন প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) (৬৩২-৬৩৪খ্রি.)। তিনি হযরত উমরের (রা) পরামর্শে এবং দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম এবং জীবিত হাফিজ ও ক্বারি সাহাবীগণের সম্মিলিত সহযোগিতা, শুনানি ও প্রচেষ্টায় এ মহতী কাজ সম্পাদন করেন। আর পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা) একই পঠন

---

২৮১ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র.), প্রাগুক্ত,খ. ১, ২০১৭ খ্রি ,পৃ. ২৬

২৮২ মুহাম্মদ আলী সাবূনী, *আত্-তিবইয়ান ফী উলূমিল-কুরআন*, বৈরুত: আ'লিমূল কিতাব, সং-১, ১৯৮৫খ্রি. পৃ. ৫১

২৮৩ বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল কারী*, বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি., খ.২, পৃ. ১৭; আয-যিরকানী, *মানাহিল আল-ইরফান ফি উলুম আল-কুরআন*, কায়রো: ইসা আল বাবি আল-হিলবি ওয়া শুরাকায়ুহু, খ.১, পৃ. ২৬২;

২৮৪ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *কুরআনের আলোকে মানবজীবন*, প্রাগুক্ত,,পৃ.৬৫

রীতিতে কুরআনের সংকলন করেন।[২৮৫] হযরত আবু বকরের (রা) আমলে মসজিদে নববী ছিল প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এসময় শিক্ষার শাখা-প্রশাখাগুলো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। খলিফা আবু বকর রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে তিনি সাহাবীদের তত্ত্বাবধানে বহু শিক্ষায়তন গড়ে তুলেছিলেন।[২৮৬]

খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে ইসলামের আহ্বান ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার আরবের সীমা অতিক্রম করে পরাস্য ও রোমে পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ইসলাম বিস্তৃতির সাথে সাথে নবদীক্ষিত মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিধি-বিধান শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষক প্রেরণ করা হতো।[২৮৭] খলিফাদের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তারের জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সময় কোথাও সেনাবাহিনী প্রেরণের সময় সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হত- শিক্ষিত অভিজ্ঞ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে; যারা বিজিত অঞ্চলে শিক্ষা দানে ব্যাপৃত হতেন।[২৮৮] হযরত ওমর (রা) (৬৩৪-৬৪৪খ্রি.) রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত উস্তাদ নিয়োগ করতেন এবং বাইতুলমাল থেকে তাদের বেতন-ভাতা দিতেন।[২৮৯] বাস্তুহারা অনগ্রসর বেদুইনদের জন্য হযরত ওমর (রা) কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। একাজে আবূ সুফিয়ান নামক এক সাহাবীকে নিযুক্ত করেন। কেউ কুরআন পড়তে না পারলে শাস্তি দেয়া হত। এভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

১১. হাদিস সংরক্ষণে উমাইয়া খলীফাদের পদক্ষেপ

উমাইয়া আমলে (৬৬১-৭৫০খ্রি.) সাহাবায়ে কিরামের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিস্তারের কাজ গুরুত্ব সহকারে চলতে থাকে। তাদের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয় এবং কুফা, বসরা ও পারস্যের বিভিন্ন স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। কুরআন মাজীদের পরেই হাদিসের স্থান এবং এ হিসেবে হাদিস ইসলামি শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। হাদিস হচ্ছে রাসূল (স)-এর জীবনালেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ইসলামি শরীআতে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম।[২৯০] হাদিস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনের ক্রমবিকাশের চারটি যুগ রয়েছে:

---

২৮৫ ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবাহ*, মিশর: দারুশ শা'ব, তা.বি., খ.২, পৃ. ২৮৭; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫খ্রি./১৪১৫হি.), সং-৩, পৃ. ১৩০

২৮৬ ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবাহ* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

২৮৭ ড. রাবি বিন হাদি উমায়র আল-মাদখালী, *মুযাক্কিরাতুল হাদীসিন নবুবী*, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১৮হি., পৃ. ১৪

২৮৮ আল্লামা শিবলী নোমানী, *আল-ফারুক*, অনুবাদ: মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৮০খ্রি., পৃ. ২৫০

২৮৯ Khuda Bukhsh, *Contributions to the History of Islamic Civilization*. Vol.II, Calcutta, 1930, p. 268; সায়্যিদ আব্দুল লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪; ড. মো. আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২৯০ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

প্রথম যুগঃ রাসূলের (স.) নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত।[২৯১] এ যুগে হাদিসের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজ চলছিল বিশেষভাবে চারটি উপায়ে–

(ক) মুখস্থকরণ (মৌখিকভাবে);

(খ) শিক্ষাদান;

(গ) বাস্তব আমল

(ঘ) লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে। তবে এ সময়ও বিচ্ছিন্নভাবে হাদিসের বহু লিখিত সম্পদ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগঃ হিজরি ১০০-২০০ পর্যন্ত ১০০ বছর। এ যুগ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম হতে তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত। এটা তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈন-এর যুগ। এ যুগেও হাদিস মুখস্থকরণ, ব্যাপক চর্চা ও সংকলনের বিকাশ শুরু হয় এবং হাদিস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ও সংরক্ষণের সর্বোত্তম ধারাটি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে হাদিস লিখনের ব্যাপারে উমর ইবনে আবদুল আযীয (৯৯-১০১ হি.) এক সরকারি ফরমান জারি করেন।[২৯২] এ ফরমানের ফলে হাদিস সংগ্রহ-সংকলনের যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল তা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।[২৯৩] এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই হাদিসের অসংখ্য সংকলন তৈরি হয়ে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে হাদিসের ব্যাপক চর্চা অনুশীলন ও শিক্ষা দান চলছিল। এ সময়ে অসংখ্য হাফিয-ই-হাদিস জীবিত ছিলেন। এ যুগে তিনজন বিশিষ্ট হাদিসের ইমাম ও তাঁদের সংকলিত হাদিসগ্রন্থ বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল–(১) ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯হি.) (র) ও তাঁর মুআত্তা গ্রন্থ; ২. ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর কিতাবুল মুসনাদ এবং ৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হিহ.) (র) ও তাঁর মুসনাদ।

তাছাড়াও ইমাম আবূ হানিফা (৮০-১৫০হি.) ও ইমাম মালিকের ছাত্রগণ হাদিসের বিপুল জ্ঞানসম্ভার বক্ষে ধারণ করে সমগ্র মুসলিম জাহানের কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আর এর প্রচার ও শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তৃতীয় যুগঃ হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিস চর্চা

হাদিস চর্চার স্বর্ণযুগঃ হাদিস সংগ্রহ সংকলন ও সংরক্ষণের পরিপূর্ণতার যুগ। এ যুগে এমন সকল হাফিয-ই-হাদিসের জন্ম হয়, যাঁদের নজীর নেই এ যুগে হাদিস একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

২৯১. জিয়াউল হক, *ইসলামী শাসন ব্যবস্থাঃ মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলী*, ঢাকা:মদিনা পাবলিকেশন্স,২০০৭ খ্রি., পৃ. ১২৪

২৯২ আবদুল মুনঈম আস-সাইয়্যেদ নাজম, *তাদভীনুস সুন্নাহ ওয়া-মানযিলাতুহা*, আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারাহ, ১৩৯৯হি., পৃ. ৪২; মুহাম্মদ আবু যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, রিয়াদঃ আর-রিসালাতুল 'আম্মাহ লি-ইদারাতিল বুহুস আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৪হি., সং-২, পৃ. ২৪৪।

২৯৩ খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশে ইবনে শিহার যুহরি (১২৪হি.) রাসূল (স)-এর সুন্নাহ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন। ফলে দ্বিতীয় শতাব্দীতেই প্রায় অর্ধশত হাদীসের কিতাব রচিত হয়েছে। (দ্র. ইবন আব্দিল বার আল-কুরতুবী, *জা'মিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদলিহী* (দারু ইবন হাযম, ১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.), খ.১, পৃ. ১৫০; ইবনু নাদীম, ফিহরিস্ত , বৈরুতঃ দারুল মাআরিফাহ, ১৩৯৮হি., পৃ. ৩১৪-৩২৬)

এর এক একটি শাখা এবং বিভাগসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। এ শতাব্দীর মুহাদ্দিস ও হাদিস বর্ণনাকারীগণ হাদিসের অনুসন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে হাদিসের খোঁজে তন্ন তন্ন করে বেড়িয়েছেন।[২৯৪] পূর্ণ সনদসম্পন্ন হাদিসসমূহ স্বতন্ত্রভাবে বিন্যাস করেন। সনদ ও বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা এবং এর বিশুদ্ধতার ওপর পূর্ণ মাত্রায় গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রয়োজনে আসমাউর রিজাল বা (চরিত বিজ্ঞান) সংকলিত ও বিরচিত হয়। ফলে হাদিস যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব তথা علم الجرح والتعديل এবং تنقيد الحديث এক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠে। সিহাহ সিত্তাহ তথা হাদিসের বিশুদ্ধ ছয়গ্রন্থ এ শতকেই সংকলিত হয়।

চতুর্থ যুগঃ হিজরি চতুর্থ শতাব্দী ছিল হাদিসের বিন্যাস, অলংকরণ, সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যুগ। এ চতুর্থ শতকে ইলমে হাদিস পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।[২৯৫] তৃতীয় শতকে ইলমে হাদিসের যে চর্চা ও উন্নয়ন সাধিত হয়, তা অতীত সকল কাজকে অতিক্রম করে। তৃতীয় শতকেই হাদিসের সনদকারীদের ইতিহাস, জীবন-চরিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই হয়, সর্বতোভাবে ইলমে হাদিস এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে ওঠে। আর এ চতুর্থ শতকে পূর্বের শতকের কাজ-কর্মেরই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তবে হাদিস গ্রন্থ প্রণয়নে এ শতকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু কাজও সম্পাদিত হয়েছে। এভাবে হাদিস শাস্ত্র নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়।

১২. পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার

ইসলামী সংস্কৃতি মূলত আরব ভূখণ্ড থেকেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে । মক্কার নির্জন হেরা গুহায় মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা এর ওপর অবতীর্ণ ওহী-এর মাধ্যমে যার সূচনা। তাঁর ওফাতের পর পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছন সাহাবায়ে কেরাম। তবে ব্যাপকভাবে ইসলামের বিকাশ ঘটে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রা.) এর শাসনকাল (১৩-২৪হি./৬৩৪-৬৪৪খ্রি.) থেকে। তার সময়ে সাসানীয় সাম্রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ মুসলিমদের অধীনে আসে। তার শাসনামলেই জেরুজালেম মুসলিমদের হস্তগত হয়। সাহাবাদের যুগ ও শাসন থেকে বিভিন্ন মুসলিম শাসনামল, দেশ-মহাদেশে, বর্তমান সময়কাল, এখনও বিভিন্ন ভূখণ্ড, জনপদের মানুষ নতুন করে জানছে ইসলামকে ও তার সংস্কৃতিকে। শান্তির সন্ধানে ফিরে আসছে রবের একমাত্র মনোনীত ধর্মে।[২৯৬]

---

২৯৪ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১ খ্রি., পৃ. ১২৪

২৯৫ মুহাম্মদ আবু যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১

২৯৬ মুহাম্মদ রিযা, *আল-ফারুক 'উমার ইবন খাত্তাব ছানিয়াল খুলাফায়ি রাশিদীন* (লেবানন: দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ৪১-৫০

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলাম আগমনের তথ্য তুলে ধরা হল এখানে-নবীজির যুগে ইসলাম ৬১০ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় (প্রাচীন নাম হাবশা) ইসলাম পৌঁছে প্রিয় নবী (সা.)-এর যুগে। বিখ্যাত সাহাবি উসমান (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দল হাবশায় ইসলাম পৌঁছায়।

১২.১ সাহাবিদের যুগে ইসলাম প্রচার

সিরিয়ার দামেস্ক ও হিমসে ইসলামের আগমন ঘটে দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.)-এর শাসনামলে। সাহাবি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে বিজয় হওয়ার মাধ্যমে।

রাশিয়ার দরবন্দেও ইসলাম পৌঁছে দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.)-এর শাসনামলে। মুসলিমরা আরমেনিয়া ও আজারবাইজান জয় করে দরবন্দে আগমন করেন। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, দরবন্দ বিজিত হয় সাহাবি সুরাকা ইবনে আমর (রা.)-এর নেতৃত্বে। কোনো কোনো বর্ণনায় সালমান ইবনে বারিআ (রা.)-এর নেতৃত্বে বিজিত হয়। রাশিয়ার দাগিস্তানের বেশির ভাগ এলাকা সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিজিত হয় এবং তখন থেকেই ইসলামের আওতাভুক্ত হয়।[২৯৭] আলবেনিয়ায় ইসলাম বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে প্রথম শতাব্দীতেই পৌঁছেছে।

ইরাকেও ইসলাম পৌঁছায় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.)-এর শাসনামলে সাহাবি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে বিজিত হওয়ার মাধ্যমে।

আজারবাইজানে ইসলাম আগমন করে দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.)-এর শাসনামলে উতবা ইবনে ফারকাদ আস-সালামির নেতৃত্বে। তিনি আজারবাইজানের প্রধান শহর তাবরিজ বিজয় করার মাধ্যমে ইসলামের সূচনা করেন। ইরানের তেহরান ও নিশাপুরে ওমর (রা.)-এর শাসনামলে বিজিত হয়ে ইসলাম পৌঁছে।

আলজেরিয়ায় ইসলাম পৌঁছে সাহাবি উকবা ইবনে নাফে (রা.)-এর নেতৃত্বে বিজিত হওয়ার মাধ্যমে। তিউনিসিয়ায় ইসলাম পৌঁছে সাহাবি মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে সাহাবি উকবা ইবনে নাফে (রা.)-এর নেতৃত্বে বিজিত হওয়ার মাধ্যমে। মরক্কোয় ইসলামের আগমন ঘটে সাহাবি মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে (৬৮৩ খ্রি.) সাহাবি উকবা ইবনে নাফে (রা.)-এর নেতৃত্বে বিজিত হওয়ার মাধ্যমে।

চীনে সর্বপ্রথম ইসলামের আগমন ঘটে সাহাবি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের মাধ্যমে। তাঁরা সেখানে ব্যবসা করার জন্য প্রথমে গমন করেন।

১২.২ মুসলিম বীরদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার

মুসলামানদের স্পেন শাসন গোটা ইউরোপে সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নবদিগন্তের উন্মোচন করেছিল। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ সম্রাট রডারিককে পরাজিত

---

২৯৭ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

করে স্পেন বিজয় করেন। তাঁর মাধ্যমে স্পেনে ইসলাম পৌঁছে। উত্তর আফ্রিকা অতিক্রম করে মুসলিম বিজয়ীরা স্পেনে প্রবেশ করেছিলেন।[২৯৮] দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে শেখ ইউসুফের মাধ্যমে ইসলাম পৌঁছেছে। মিয়ানমারে ৬৫০ সালে আরব ও ইয়েমেনি বণিক দলের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইসলাম পৌঁছেছে। জাপানে ১৮৯১ সালে জনৈক জাপানি মুসলিম হওয়ার মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইসলাম পৌঁছেছে। উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলেও ইসলাম পৌঁছে দ্বিতীয় শতাব্দীতে। বোখারা, সমরখন্দ, খাওয়ারিজম ও ফরগনায় ৭০৫-৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওলিদ ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিমের নেতৃত্বে বিজিত হওয়ার মাধ্যমে ইসলামের সূচনা হয়। ল্যাতিন আমেরিকার পানামায় ১৯ শতকের শেষে পানামা ক্যানেল নির্মাণের সময় বাঙ্গাল এবং আরব থেকে অনেক মুসলিম এসে বসতি স্থাপন করে। তাদের মাধ্যমেই তখন ইসলাম পৌঁছায়। আরব বণিক ও বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার রাশিয়ার ট্রান্স ককেশাসে সপ্তম শতাব্দীতেই আরব বণিকদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইসলাম পৌঁছে। আর ভগলা, উরালস ও মধ্য এশিয়ায় ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম পৌঁছে।

বুরুন্ডিতে ইসলামের আগমন ঘটে ১৮৯৫ সালে। পর্তুগিজ দস্যুরা যখন পূর্ব আফ্রিকার ইসলামী রাষ্ট্র মোমাসা ও জানজিবার আক্রমণ করে দখল করে নেয়, তখন ওই দেশের মুসলিমরা বুরুন্ডিতে অভিবাসী হিসেবে আগমন করে। ব্রিটেনে ৭৫৭ সাল থেকেই মুসলমানদের পদচারণ শুরু হয়েছে। আর king Offa (৭৫৭-৭৯৬)-এর শাসনামল ছিল মুসলিম শাসনামল। ফিলিপাইনে ইসলামের আগমন ঘটে ১৩০০ শতাব্দীর শুরুতে। নিউজিল্যান্ডে ১৯১০ সালে সর্বপ্রথম ভারতের গুজরাট থেকে Esup Musa নামে এক মুসলিম জীবিকার সন্ধানে যান। এর পর থেকেই সেখানে ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠে। আইভরি কোস্টে সপ্তম শতাব্দীতেই ইসলাম পৌঁছেছে। অন্য একদল গবেষকের মতে, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আরব বণিকদের মাধ্যমে ১৪০০ শতাব্দীতে আইভরি কোস্টে ইসলামের আগমন ঘটে।[২৯৯] ঘানায় ১৯০০ শতকের শুরুতে ভারত ও আফ্রিকা থেকে সর্বপ্রথম মুসলিমদের আগমন ঘটে। আফ্রিকা মহাদেশের তানজানিয়া রাষ্ট্রে অষ্টম শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রবেশ করে। এরপর আরব ব্যবসায়ীরা সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ইন্দোনেশিয়ায় ১২০০ শতাব্দীতে নৌযানে করে আরব বণিকদের সঙ্গে কয়েকজন দরবেশের আগমন ঘটে। তাঁদের মাধ্যমেই সেখানে ইসলাম পৌঁছে। ফ্রান্সে ইসলাম পৌঁছে ৭৩২ সালে। মুসলিমরা ফ্রান্সে আগমন করে দ্রুত Arles, Narbonne, Marsellle, Avignon প্রভৃতি শহরে প্রাধান্য বিস্তার করে।

---

২৯৮ ড. আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২খ্রি., সং-৭, পৃ. ১৭৭; S.M. Imamuddin, *A Political History of Muslim Spain* (Dhaka: 1969), p. 67-69

২৯৯ আব্দুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ১২৪

সুইজারল্যান্ডে ৯১১ সালে ইসলাম পৌঁছেছে। ইসলাম সম্পর্কে ইতিহাসে জানা যায়, মুসলিমরা ফ্রান্স, ইতালি নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে, তখন মুসলমানরা সুইজারল্যান্ডে পা রাখেন। সর্বপ্রথম তাঁরাই সেখানে ইসলাম পৌঁছান। পোল্যান্ডে ইসলামের আগমন ঘটে ১৩০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি।[৩০০]

কোরিয়ায় রাজা হাইউন জংয়ের রাজত্বকালে ১৭তম বর্ষে এবং লিরাজ বংশের রাজা ডান জংয়ের শাসনের সপ্তম বর্ষে আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে। আফ্রিকা মহাদেশের উগান্ডায় ১৮৮৪ সালে ইসলামের আগমন ঘটে। ইউরোপের কসোভো ও মোটাহিয়ায় ১৪ শতকে ইসলামের আগমন ঘটে। উজবেকিস্তানে ৫৫ হিজরিতে সাইয়েদ ইবনে ওসমানের নেতৃত্বে উজবেকিস্তান বিজয় করার মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে। ফিজিতে ইসলামের আগমন ঘটে ভারতীয় কিছু মুসলিম চাষির মাধ্যমে। ইংরেজরা তাঁদের ফিজিতে নিয়ে গিয়েছিল। যুগোস্লাভিয়ার মেসিডনিয়ায় ১৩৮১ সালে তুর্কি সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে। অন্য একদল ঐতিহাসিক বলেন, তুর্কি সেনাবাহিনীর ২০০ বছর আগে আরবীয় গবেষকদের মাধ্যমে ইসলাম পৌঁছে।

১২.৩. সূফীগণের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারে সুফীদের অবদান অনস্বীকার্য। সুফীরা কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিবর্তন করেননি, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারা মানুষের নৈতিক উন্নয়ন, সমবেদনা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়ে সমাজে ইসলামিক নৈতিকতা এবং মানবিকতার সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছেন। সুফীদের মাধ্যমে মসজিদ, দরগাহ ও মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, স্থানীয় ভাষা ও কাব্যরীতি ব্যবহার করে ইসলামী ভাবধারা সাধারণ মানুষের মাঝে পৌঁছেছে।[৩০১] এছাড়া, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে তারা ধর্মীয় সমঝোতা ও সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করেছেন। ফলে, সুফীরা কেবল আধ্যাত্মিক নেতা নয়, বরং ইসলামী সংস্কৃতির সক্রিয় প্রচারক ও সমাজ পরিবর্তনকারী হিসেবে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১৩. বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের মৌলিক অবদান

যখনই লিপির সঙ্গে মানুষ পরিচিত হয়, নিজেদের হাতে কলম বা লেখার সামগ্রী ধরে, নিজেদের চিন্তাগুলোকে লেখায় রূপান্তরিত করে ফেলে এবং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকে এসব অজানা বিষয়ে পরিচিত করা এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে সভ্যতার বিকাশ সাধন হয়। পরবর্তীতে সভ্যতার বিভিন্ন ধারণা মানুষের জীবনে বহুমুখী উন্নতি সাধনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়। সভ্যতা হলো মানব সমাজের চলমান এক রূপ, যা মূলত বস্তুবাদী ও ভাববাদী উন্নয়নের এক বিশেষ রূপ এবং পরিবর্তনশীল

---

৩০০ আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি., পৃ. ৯৫

৩০১ আ.ন.ম বজলুর রশিদ, *আমাদের সুফী সাধক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ১২৪

সমাজ, ধর্মীয় বিষয়াদি, নৈতিকতা, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্কলন, যা বিভিন্ন সময়ে বা একই সময়ে এক বা একাধিক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৩০২]

ইসলামের যখন আবির্ভাব হলো, তখন নানান সভ্যতার মাঝে এই পৃথিবীতে একটি নতুন এবং বিস্ময়কর সভ্যতা বিকাশ লাভ করলো। ইসলাম শুধু ধর্ম প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ইসলাম এবং মুসলমানদের বিশ্ব সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান ছিলো উল্লেখযোগ্য এবং অতুলনীয়। সঠিকভাবে ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায়, হজরত ঈসার (আ.) জন্মের কয়েক শতাব্দী আগেই বিশ্ব সভ্যতার গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময়ে গ্রিসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বিকশিত হয় থেলস, ডেমোক্রিটাস, হিপোক্রিটাস, অ্যারিস্টোটল প্রমুখ কালজয়ী প্রতিভার মাধ্যমে । এরপর প্রায় আশ্চর্যজনক ভাবে পাঁচ-ছয়শটি বছর ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তীব্র এক অন্ধকার যুগ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে ইসলামী সভ্যতা বিকাশের পর মধ্যযুগে মুসলমানদের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়।

রাসূলুল্লাহ (স.) ইসলামের দাওয়াতের মাধ্যমে প্রায় ৬১০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মক্কায় ইসলামী সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। ইসলামের মূল স্লোগানই হলো সভ্য হওয়া, জ্ঞানী হওয়া। যেমন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'ইলম' বা জ্ঞান শব্দটা প্রায় আশিবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'আকল' বা বুদ্ধি শব্দটা পবিত্র কুরআনে সরাসরি না এলেও 'উলিল-আলবাব' শব্দ দ্বারা কুরআনে বুদ্ধিমানদের দিকেই সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে 'হিকমাত', 'বুরহান', 'ফিকর' এবং 'ফিকহ' শব্দগুলো জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত- যা কুরআনে বহুবার এসেছে। রাসুলের (সা.) হাদিসে জ্ঞান, জ্ঞানের ফজিলত এবং ওলামা বা জ্ঞানী সম্পর্কে বহু বিবরণ বারবার দৃষ্টিআকর্ষণ করে।

যেখানে পুরুষ নারী আলাদা করে বলা হয়নি, বরং রাসুলের (সা.) হাদিসে প্রতিটি নর-নারীর ওপর জ্ঞানার্জন ফরজ এবং ঘণ্টাখানেক চিন্তায় মশগুল থাকা এক বছরের ইবাদত থেকেও উত্তম- এ বিষয়গুলোর ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান থেকে বোঝা যায়, ইসলামে জ্ঞান অর্জনের প্রতি কতটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের স্বর্ণযুগ বা জ্ঞান বিস্তারের যুগ অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। বিশেষ করে চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে খলিফাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়েই মূলত শিক্ষা, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে।[৩০৩] আরবরা তো স্বভাবজাতই কবি। ইসলামের আগমনের পর এই যুগগুলোয় কবি, লেখক, দার্শনিক, হস্তশিল্পী, গবেষক, ভূগোলবিদ, রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য শিল্পগুণের

---

৩০২ জিয়াউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

৩০৩ ড. রাগিব সারজানী, *বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান*, অনু. মুফতি মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা: মাকতাবাতুল হিজায, খ.১, ১৯৮৭ খ্রি. পৃ. ২৩৪

অধিকারী ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য পরিমানে উত্থান ঘটে এবং সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনীতি, ভূগোল, আইন, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, রসায়ন, পদার্থ, চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞানসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

১৩.১ সাহিত্যে অবদান

পবিত্র কুরআন মাজিদ বিশ্ব সভ্যতায় সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা, নির্দেশনা। পবিত্র কুরআনের ভাষার অলঙ্কার এই পৃথিবীতে বিরল এবং বিশ্ব সাহিত্যে কুরআনের অবস্থান ও কদর সবচেয়ে উঁচুতে। রাসুলের (স.) হাদিসগুলো আরবি সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধনভাণ্ডারের মতো। রাসুলের (সা.) হাদিসের ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আরবী সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর (রা.)-এর পদচারণা ছিল। তাঁর দুটি বিখ্যাত সাহিত্য গ্রন্থ 'নাহজুল বালাগা' ও 'দিওয়ানে আলী'-তে তাঁর সাহিত্যকর্ম ও কবিতা সংরক্ষিত হয়েছে।[৩০৪] খলিফা মনসুরের সাহিত্যের প্রতি ছিলো বিশেষ ঝোঁক এবং তার চেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি কবিতার সঙ্কলনের কাজ করা হয়। খলিফা হারুন-উর-রশীদ নিজেই তো ছিলেন একজন স্বভাব কবি এবং তার সময় ও শাসনামলে বিখ্যাত গ্রন্থ 'আরব্য রজনীর দেশে' রচিত হইয়েছিল। ফারসি সাহিত্য পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্য হিসেবে গণ্য ও মূল্যায়ন করা হয়। ফারসি সাহিত্য মুসলমানদের মাধ্যমেই মূলত সমৃদ্ধ হয়েছে। ইরানে আগে থেকেই সাহিত্য চর্চার রেওয়াজ ছিলো, ইসলামের আগমন ফারসি সাহিত্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ এর প্রভাবে ফারসি ভাষা আরবী বর্ণমালা দিয়ে নিজেদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করে।[৩০৫]

ইরানে ইসলামের প্রবেশের শুরুর দিকে ইরানের বিখ্যাত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসের বইগুলো সরব প্রথম আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। গবেষকরা এই কাসিদাকে প্রথম ফারসি কবিতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফারসি সাহিত্যের নিদর্শনগুলোর মধ্যে - রুমির মসনভি, ফেরদৌসীর রচিত শাহনামা, শেখ সাদির গুলিস্তাঁ বুস্তাঁ, ওমর খৈয়ামের 'রুবাঈ', হাফিযের 'দিওয়ান', আত্তারের 'মানতেকুত তায়ের', নেজামির খসরু ও শিরীন, জামির বাহারিস্তান আজও পৃথিবীজুড়ে বেশ সমাদৃত ও বিখ্যাত। পারস্যের সুফী, দরবেশ, মরমী কবির আবির্ভাব ফারসি সাহিত্যকে অভূতপূর্ব সুষমায় সমৃদ্ধশালী করেছে।

---

৩০৪ হযরত আলী (রা)-এর বক্তৃতামালা, হৃদয়গ্রাহী খুতবা, জ্ঞানগর্ভ বাণী, উচ্চাঙ্গের পত্রাদি ও মূল্যবান উপদেশামালা আরবী সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। দশম শতাব্দীতে শরীফ নামক এক ব্যক্তি আলী (রা)-এর এসকল সাহিত্য কর্ম 'নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তবে এটি বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ নয়, এতে উপদেশ, খুবতা, বিচারের রায়, স্বাক্ষ্য, আইন, বেচা-কেনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর বহু কবিতা 'দীওয়ানে আলী' গ্রন্থে রয়েছে। এটি আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন (দ্র. Dr. Amir Hasan Siddiqi, *Islamic State* ,Karachi: The Jamiyatul Falah Publications, pp. 113-115)

৩০৫ ড. রাগিব সারজানী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

১৩.২ ইতিহাসে অবদান

বিশ্বসভ্যতার একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ইতিহাস। কারণ ইতিহাস হলো অতীতের দর্পণ। ইসলামী সভ্যতা বিকাশ লাভের পর মুসলমানরা ইতিহাস পাঠ, অধ্যয়ন, সঙ্কলন ও লিপিবদ্ধকরণে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। হজরত মোহাম্মদের (সা.) জীবনী সংকলন এবং হাদিস সঙ্কলনের উৎসাহ ও আগ্রহ থেকেই মূলত মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে তীব্র আগ্রহের সৃষ্টি হয়।[৩০৬] মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআন মাজিদও ইতিহাসের অকাট্য দলিল এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কারণ কুরআনে নবী-রাসুলদের বহু জীবনী, সমাজ, জাতি ও সভ্যতার ইতিহাস এবং নানান ঘটনা,আদেশ-নিষেধ, নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন তার সম-সাময়িক বিশ্বইতিহাসের উপাদান ও সংরক্ষণ করেছে। পবিত্র কুরআনে ইতিহাস অধ্যয়ন করার জন্য মানবজাতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।[৩০৭] ফলে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অধ্যায়নই মুসলমানদের বেশি বেশি ইতিহাস সঙ্কলনে অনুপ্রেরণা জোগায়।

১৩.৩ দর্শনে অবদান

দর্শন মূলত মানুষের আভ্যন্তরীণ চেতনাকে সমৃদ্ধ করার একটি বিশেষ জ্ঞান। যার মাধ্যমে মানুষের আত্মিক সৌন্দর্য সাধিত হয়।[৩০৮] মুসলমানররা ইসলামী দর্শনের ধারণা ও চেতনা, শিক্ষা সভ্যতা বিনির্মাণে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। দর্শন শাস্ত্রের বিস্তৃত জ্ঞানের রাজ্যে মুসলমানদের সমৃদ্ধ ফসল ফলানোর ইতিহাসটিও বেশ সমৃদ্ধ। পবিত্র কুরআন এবং হাদিস হলো মুসলিম দর্শনের মূলভিত্তি। ইসলামই সংস্কৃতিও ঐ মূলভিত্তি কুরআন ও হাদিসের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এটাই তো আসলে স্বাভাবিক যে, মুসলমানদের জীবনপথের সবকিছুই কুরআন ও হাদিস থেকেই উদ্ভূত হবে। পবিত্র কু-রআন ও হাদিস যে মুসলিম দর্শনের মূল উৎস, এটা কোনো তত্ত্বকথা নয়, বরং এটা ধ্রুব সত্যর মতো ব্যবহারিক সত্যও বটে।

ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অধ্যয়ন থেকে আমরা বুঝতে পারি, এটি কেবল ধর্মীয় অনুশাসন বা আচরণের সীমাবদ্ধ নয়; বরং একটি বিস্তৃত সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাগত ও নান্দনিক কাঠামোর সমন্বয়। ইসলাম তার আদর্শ, নৈতিকতা ও জীবনপদ্ধতি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। প্রারম্ভিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামী সংস্কৃতি বিভিন্ন অঞ্চল, সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু তার মূল আদর্শ তাওহীদ, ন্যায়, সংহতি ও

---

৩০৬ Muhammad Gholam Rasul, *The origin and development of Muslim Historiography*, Dhaka: Islamic Foundation, 1984, p. 3

৩০৭ ড. মো. আখতারুজ্জামান, *মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮খ্রি., পৃ. ৪৪

৩০৮ জিয়াউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

মানবকল্যাণ অটুট রয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ প্রমাণ করে, ধর্ম ও সংস্কৃতি কখনোই পরস্পরের শত্রু নয়; বরং তারা একে অপরকে সমৃদ্ধ করে। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, আইন ও সামাজিক বিধানের মাধ্যমে সংস্কৃতি আলোকিত হয়েছে, যা মানুষকে নৈতিক, জ্ঞানচেতনা ও মানবিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ করে। সর্বশেষে বলা যায়, ইসলামী সংস্কৃতির সঠিক উপলব্ধি ও চর্চা শুধুমাত্র অতীতের ঐতিহ্য রক্ষা নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমাজে নৈতিক ও জ্ঞানমূলক ভিত্তি স্থাপন করার মাধ্যম। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সংস্কৃতি হল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক হেদায়াত ও আদর্শের প্রতিফলন।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য

সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারার প্রতিফলন। আমাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, রুচি, ব্যবহার্য বস্তুগত উপাদানসমূহ ইত্যাদিই সংস্কৃতি। সমাজের মানুষ হিসেবে আমরা প্রতিনিয়তই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে বেড়ে উঠি। সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে কৃষ্টি, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদিকে বোঝানো হলেও সমাজবিজ্ঞানে এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ জীবন ধারাকে বোঝায়। সংস্কৃতির কারণেই মানুষের ব্যক্তি জীবন এবং সমাজজীবন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্রতা পায়।পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। প্রতিটি সংস্কৃতিরই রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতা এবং এর সাথে খাপ খাওয়ানোর ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ও উপকরণের কারণে সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিজস্ব হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিও এর বাইরে নয়। এ সংস্কৃতির রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য যা এটিকে অন্য সংস্কৃতি থেকে পৃথক করেছে। তবে নানা জাতির আগমনে এদেশের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সংস্কৃতির এ সকল উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভাষা, চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ইত্যাদি। আবার বাংলাদেশের সংস্কৃতি যুগে যুগে বহির্বিশ্বের নানাবিধ সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছে।[৩০৯] বিশেষ করে পযক্রমে বিদেশী শক্তির আগামন, আগ্রাসন, ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ এবং নানা সাংস্কৃতিক উপাদান একীভূতকরণের ফলে আমাদের সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

১. বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

সংস্কৃতির নাকি একশ ষাটটি সংজ্ঞা প্রতীচ্য দেশে চালু রয়েছে। মানব প্রজাতির অর্জিত ব্যবহার বা অভ্যাস বা অনুশীলনজাত উৎকর্ষ তথা প্রকৃতিকে দাস বানানো, বশে আনা বা আপোষে অনুকূল করে কৃত্রিম ও স্বাধীন মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনাচার সৃষ্টিই যদি সংস্কৃতি হয়, তহলে মানব জাতির স্থানিক, কালিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, প্রাতিবেশিক, পারিবেশিক সংস্কৃতি তথা আচার আচরণ অবশ্যই রয়েছে। এই তাৎপর্যে সব মানুষেরই সংস্কৃতি রয়েছে। এজন্যেই উন্নত মানের, গুনের, মাপের ও মাত্রার মানসিক-ব্যবহারিক জীবনাচারকেই আমরা সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করি। অন্যসব মনুষ্যাচার হচ্ছে লৌকিক, অলৌকিক এবং অলীক পার্থিব ও আসমানী বিস্ময়-কল্পনা, ভয়-ভক্তি, ভরসা প্রসূত দেশাচার ও লোকাচার। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাই নিষ্পেষিত হচ্ছিল তাদের

---

৩০৯ আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

জীবনে।[৩১০] সামাজিক কোন মর্যাদা তাদের ছিলোনা। রাজা থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরেই তাদের ছিলো নিন্দাবাদ। নিম্ন মানের পেশা ছিল তাদের জীবন জীবিকার একমাত্র ভরসা। দীর্ঘদিনের এইসকল ভাগ্য বঞ্চিত মানুষ ধরেই নিয়েছিলো যে এটাই আমাদের নিয়তি। কোন রকম বেঁচে থাকাটাই তাদের জন্য মূখ্য বিষয় ছিলো। কিন্তু দিগন্ত আলকিত করে এ অঞ্চলে যখন ইসলামের আগমন ঘটে তখন ঘটে এক অদ্ভুত কাহিনী। তারা চোখের সামনে অবলোকন করতে থাকে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই এই তারা জীবনে প্রথম জানতে পারলো। আরও জানতে পারলো যে কেউই ইচ্ছা করলে ইসলাম গ্রহণ করে সম্মান জনক জীবন যাপন করতে পারে। তাতে কোন বাঁধা নেই।[৩১১]

১.১ বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সংস্কৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ। এটি প্রধানত ইসলামী, হিন্দু, বৌদ্ধ ও আদি লোকসংস্কৃতির প্রভাবের মিশ্রণ। এখানে ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, পোশাক ও খাবারের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক রূপের সমন্বয় দেখা যায়। এ সংস্কৃতির কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে,

১. প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত

বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়েছে। হঠাৎ কোন দৈব ঘটনার মাধ্যমে এ সংস্কৃতি চালু হয়নি। বাংলাদেশের সংস্কৃতি অনেক পুরনো। এ অঞ্চলের, মানুষ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে থাকতে টিকে যায় প্রতিকূল পরিবেশে। তাই তো যতো পালাবদলই হোক না কেন জীবনের, রাজনীতির এই অঞ্চলের মানুষের পারস্পারিক বন্ধন কখনো শিথিল হয়নি।

২. লালিত ঐতিহ্য

বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যকে বুকে ধারন করে টিকে আছে। আদিম মূল আঁকড়ে ধরে এ সংস্কৃতি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

৩. পরিবর্তনশীলতা

পরিবর্তনশীলতা যেকোন সংস্কৃতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেকোন সংস্কৃতিই পরিবর্তনশীল। সময়ের ব্যবধান এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির আচার- রেওয়াজ পরিবর্তন হয়।

---

৩১০ এম এ রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৯ খ্রি., পৃ.২৪

৩১১ জহুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

৪. মূল সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন

বাংলাদেশ যে মৌলিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তার পরিবর্তন প্রায় নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের মূল বিষয় হলো বাঙালী সংস্কৃতি।

৫. সংকর সংস্কৃতি

বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা একে অন্য সকল সংস্কৃতি থেকে আলাদা করেছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি সংকর সংস্কৃতি। প্রাচীন কাল থেকে এই ভূখণ্ডে আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক, মঙ্গল, আফনান, শিখ, পর্তুগীজ, ফরাসি ইংরেজসহ নানাজাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের আগমন ঘটেছে। এসব জাতির আগমনের ফলে এদের সংস্কৃতির অনেক কিছুই বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে। তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি হয়েছে সংকর সংস্কৃতি। বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা জানার জন্য আমাদেরকে জীবনধারণ প্রণালী সম্পর্কে জানতে হবে।[৩১২]

১.২ বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা

ক. ভাষা

বাংলাদেশের মানুষের ভাষা বাংলা। তবে এই বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ এসে এ ভাষার মৌলিকত্বকে নাড়া দিলেও ভাষাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব এবং বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দ (আরবি, ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, তুর্কি, চাইনিজ, জাপানি, বার্মিজ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, গুজরাটি, মারাঠি, ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ইত্যাদি) বাংলা ভাষাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে এবং এদেশের মানুষ এই ভাষার মাধ্যমে তাদের ভাবের আদান প্রদান করে থাকে।[৩১৩]

খ. সংকেত বা প্রতীক

সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সংকেত বা প্রতীক। বাংলা ভাষাই বাংলাদেশের মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে লাল-সবুজের এ পতাকা অর্জিত হয়।

গ. খাদ্যাভ্যাস

আমাদের অতি পরিচিত একটি প্রবাদ মাছে ভাতে বাঙালি। মাছে ভাতে বাঙালি বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে। বাংলাদেশেরর মানুষ প্রধানত ভাত, মাছ, ডাল, শাক সবজি, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। বেশির ভাগ মানুষ তিন বেলাতেই ভাত খায়। তবে অনেকে ভাতের

---

৩১২ মো. জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

৩১৩ আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

বদলে রুটিও খেয়ে থাকেন। শহর এলাকাতে মানুষ দিনের বিভিন্ন সময় নাস্তাও করে থাকেন। বর্তমানকালে শহর এলাকায় ফাস্টফুড জাতীয় নাস্তার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে মাংস, রোস্ট, পোলাও, বিরিয়ানি, জর্দা ইত্যাদির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

ঘ. পোষাক-পরিচ্ছদ

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা, পাজামা-পাঞ্জাবি, ফতুয়া পরিধান করে। শহর এলাকায় প্যান্ট, শার্ট, টি-শার্ট, ট্রাউজার, ক্যাপ, ব্লেজার পরিধান করে। মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার কামিজ, বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে। গ্রাম কিংবা শহর সবখানে গামছা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। মেয়েরা পাউডার, নেলপালিশ, টিপ, লিপস্টিক, কাচের চুড়ি, গহনা, ঝুমকা, নাকফুল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। সনাতন ধর্মের বিবাহিতা মেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা পরে।

ঙ. বাড়িঘর

মাটির দেয়ালের উপর শন বা খড়ের চালা বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির একটা অংশ। একসময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাটির দেয়ালের উপর টিনের চালার ঘর ব্যবহার করতো। তবে ইদানীং টিনের বেড়া এবং টিনের চাল এবং আধা পাকা ঘরে টিনের চাল, পাকা ভবন দেখা যায়। তবে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে অঞ্চলভেদে টিনের বেড়ার ঘর এবং মাটির দেয়ালের ঘর পরিলক্ষিত হয়। শহর অঞ্চলে মোটামুটি পাকা ঘরের আধিক্য বেশি এবং বাড়ির ভিতরে সোফাসেট, খাট-পালংক, ডাইনিং টেবিল ইত্যাদি দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে চৌকি, খাট ইত্যাদি বেশি লক্ষ্যণীয়।[৩১৪]

চ.ধর্ম

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মে অনুসারী। এছাড়াও এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ বসবাস করে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা যেমন-চাকমা, মারমা, হাজং, মণিপুরি, গারো, রাখাইন ইত্যাদি এখানে বসবাস করে এবং তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ইসলাম ধর্মের অনুসারী বাংলাদেশিরা মসজিদে, হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা মন্দিরে, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা প্যাগোডায় এবং খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা চার্চে যায় তাদের উপাসনা করার জন্য। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে দুই ঈদ, মিলাদ-উন-নবী ইত্যাদি। এছাড়া নামাজ, রোজা,

---

৩১৪ শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.,পৃ.১২৪

যাকাত তাদের প্রধান ধর্মীয় রীতি। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, কালিপূজা, লক্ষ্মীপূজা, মনসা পূজা, সরস্বতী পূজা এবং বৌদ্ধদের বৌদ্ধপূর্ণিমা ও খ্রিস্টানদের খ্রিস্টমাস, ইস্টার সানডে ইত্যাদি।

ছ. মৌলিক অর্থনীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। গত কয়েক দশকে ডেইরি, পোল্ট্রি এবং মৎস্য চার গ্রামীণ অর্থনীতি নতুন গতি সঞ্চার করেছে। সাম্প্রতিককালে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা (রেমিটেন্স) এবং তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে গ্যাস সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনসহ বনাঞ্চল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

জ. বিনোদন

বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান পালন করে। যেমন- অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ-পার্বণ, পহেলা বৈশাখ, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি। যাত্রা, জারিগান, লোকগান, লালনগীতি, মুর্শিদী, ভাটিয়ালি, নজরুলসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি এদেশের মানুষের সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, কানামাছি, গোল্লাছুট-এর পাশাপাশি ফুটবল ও ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। গ্রামাঞ্চলের মেলাগুলোতে সার্কাস, পুতুলনাচ, নাগরদোলা প্রধান আকর্ষণ। বর্ষবরণ এবং বিজয় দিবস দেশের জাতীয় উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[৩১৫]

ঝ. শিক্ষা

বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এছাড়াও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তবে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার একটা প্রচলনও লক্ষ্য করা যায়।

ঞ. ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

জমিদারী প্রথা বিলোপের পর থেকে ভূমিভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোর কর্তৃত্ব আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে রাজনৈতিক প্রভাব, নগদ অর্থ, শিক্ষা, প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক, প্রযুক্তির উপর মালিকানা প্রভৃতি উপাদানের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

২. বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে এখানকার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

বর্তমান বাংলাদেশ নামের স্বাধীন ও সার্বভৌম এ দেশটি অতীতে ভারত উপমহাদেশের একটি অংশ ছিল। ১৭৫৭ সালে এদেশে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৩১৬]

---

৩১৫ সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা:বইঘর, ১৯৬৮ খ্রি., পৃ. ১২৪

৩১৬ ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ১২৪

অতঃপর ১৯৪৭ সালে তা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান নামে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এর পর ১৯৭১ সালে তা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে জনসংখ্যার দিক থেকে এ দেশটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

এদেশটি পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে হিন্দু প্রধান দেশ ভারতের দ্বারা বেষ্টিত। এর দক্ষিণে রয়েছে মায়ানমার ও বঙ্গোপসাগর। এর আয়তন হচ্ছে ৫৫৫৯৮ বর্গ মাইল। এর জনসংখ্যার প্রায় ৯০% মুসলিম। সুদূর অতীত কাল থেকেই এ দেশের মানুষ মানব রচিত বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত ছিল। এ সব ধর্মের মধ্যে বহুল প্রচলিত ধর্ম ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম। তারা এ দু'টি ধর্মের বিভিন্ন রাজা-বাদশা এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণদের দ্বারা সর্বদাই নির্যাতিত ও শোষিত ছিল। এ ছাড়াও সাধারণ লোকেরা হিন্দু ধর্মের বর্ণ বৈষম্য ও সামাজিক বিভিন্ন নিয়ম কানুনের দ্বারা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত ছিল।

ঠিক এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণ ও পরিবেশে এদেশে ইসলামের শুভাগমন ঘটে। হিজরী প্রথম শতকে যদিও কোনো কোনো আরব বণিকদের মাধ্যমে এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে খ্রিষ্টাব্দ অষ্টম ও নবম শতকেই এদেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে বিপুল সমারোহে। বণিকগণ চট্টগ্রামের তৎকালীন সামুদ্রিক বন্দর দিয়ে সে এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানে তারা নিজেদের জন্য একটি উপনিবেশ তৈরী করে সেখান থেকেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন।[৩১৭] এমনকি ১৭২ হিজরী সনে খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে তারা নদী পথে বর্তমান রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলেও পৌঁছেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দাওয়াতে এদেশের সাধারণ জনগণ প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তবে সে সময়ে যারা এ সব এলাকায় এসে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট করে তাদের কারোরই নাম জানা সম্ভবপর হয়নি।

এরপর খ্রিষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর এ সুদীর্ঘ সময়ে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তৎকালীন ইসলামী দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষত আরব, ইয়ামন, ইরান, খুরাসান ও এশিয়া মাইনরের মধ্যাঞ্চল এবং উত্তর ভারত থেকে বহু আলিমে দ্বীন ও ওলিগণ এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে ধারাবাহিকভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে ইসলাম প্রচারের এ যুগটিকে মোট তিন যুগে বিভক্ত করা যায়,

---

৩১৭ আব্দুল্লাহ আল আমিন, *বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বই বাজার, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১২৪

ক. প্রারম্ভিক যুগ

প্রাথমিক যুগ একাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময় ইসলাম নতুনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল। নবীন সমাজে ইসলামের নীতি, মূল্যবোধ ও শাসনব্যবস্থা স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। যদিও বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা ছিল, তবুও এই যুগে ইসলামের ভিত্তি ও মূল ধারণা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয়।

খ. প্রসারণ যুগ

প্রসারণ যুগ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময় ইসলামের সম্প্রসারণ ও প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। নতুন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের প্রচার ও গ্রহণ বৃদ্ধি পায়। সাহাবাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রচেষ্টা, স্থাপিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক নীতি ইসলামের শক্তি ও স্থায়িত্বকে দৃঢ় করে। এই যুগে ইসলামের নৈতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক দিকগুলো বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে।

গ. পতনের যুগ

পতনের যুগ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময় ইসলামের প্রচার ও প্রসার বিভিন্ন কারণে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা ইসলামের শক্তি কমিয়ে দেয়। যদিও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অটুট থাকে, তবুও এই যুগে ইসলামের প্রভাব ও সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস লক্ষ্য করা যায়।

২.১ ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি

এ তিন যুগের ইসলাম প্রচারকগণ তাঁদের কর্মের পদ্ধতিগত দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের একদল 'আবেদ' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা যুদ্ধের পথ পরিহার করে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় জনগণকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের মাঝে রয়েছেন শাহ সুলতান বলখী, যিনি প্রারম্ভে ঢাকার হরিরামপুরে এবং পরে ৪৩৯ হিজরীতে বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে এসে ইসলাম প্রচার করেন। এ নীতির উল্ল্যেখযোগ্যদের মধ্যে আরো রয়েছেন শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, যিনি ৪৪৫হিঃ/১০৫০ সালে বর্তমান নেত্রকোনা জেলার 'মদনপুর' এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। মুঘল সম্রাট শাহ জাহানের আমলে ১০৮২/১৬৭১ সালে তাঁর নির্দেশে সেখানে তাঁর কবর নির্মাণ করা হয়। এঁদের মধ্যে আরো রয়েছেন শেখ জালাল উদ্দিন তবরেযী, যিনি

বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর এ দেশে আগমন করেছিলেন এবং ৬২২হিঃ/১২২৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৩১৮]

এঁদের মধ্যে আরো রয়েছেন শাহ নেয়ামত উল্লাহ (মৃত ১০৭৫হিঃ/১৬৬৪ খ্রি.) এবং শেখ ফরীদ উদ্দিন ও অন্যান্য বহু দরবেশগণ।

ইসলাম প্রচারকদের দ্বিতীয় দল 'গাযী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন :

'বাবা আদম শাহী' যিনি ১১৫৭-১১৭৯ সালের মধ্যে তৎকালীন হিন্দু রাজা 'বলরাম সেন'-এর আমলে ঢাকার 'বিক্রমপুর' এলাকায় এসে ইসলাম প্রচার করেন। সে সময়কার সাধারণ মুসলিমদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মকাণ্ড দেখলে মনে হয় তারা মুসলিম হয়েছিল ঠিকই, তবে কেনইবা তারা মুসলিম হলো, ইসলামী সংস্কৃতি আর হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতির মাঝে তফাৎটা কোথায়, তা তারা বুঝে উঠতে পারেন নি। অতীতে তারা যেমন তাদের দেব-দেবীদেরকে তাদের এবং ভগবানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এবং বিভিন্ন রকমের কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক বলে ভাবতো, মুসলিম হয়েও তেমনি তারা মুসলিম ওলি ও দরবেশদেরকে সে সব কিছুর মালিক বলে ভাবলো। এ অবস্থা শুধু যে মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং এ অবস্থা তৎকালীন সকল মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও বিস্তৃত ছিল। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

"হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতিকে এইভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করার এবং এই আদর্শের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তোলার এই প্রবণতা শুধুমাত্র কবি, সাহিত্যিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সর্বস্তরে ইহা সঞ্চারিত ও উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জলদেবতা বরুণ পীর বদরে, গৌরচন্দ্র গোরচাঁদ পীরে, ওলাই চন্দ্রী-ওলাবিবিতে, সত্যনারায়ণ সত্যপীরে, লক্ষীদেবী মা বরকতে রূপান্তরিত হন। আর এই রূপান্তরিত দেবদেবীগণ মুসলিমদের নিকট তাহাদের প্রাপ্য পূজা ও শ্রদ্ধা অব্যাহতভাবেই পাইতে থাকেন। তদুপরি এই সমস্ত রূপান্তরিত দেবতা বা পীর ছাড়াও বহু পীরের কল্পিত কবর এবং কোনো কবরের সহিত সম্পর্ক রহিত কল্পিত পীরও মুসলিমদের নিকট হইতে পূজা, উৎসর্গ, সিন্নি, মোমবাতি ইত্যাদি লাভ করতে থাকেন। অনেক খানকাহ ও দরগাহ এখানে মুসলিমদের সুখ সমৃদ্ধি এবং বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপলক্ষ্যরূপে দীর্ঘকাল তাহাদের আল্লাহর স্থান দখলকারীর ভূমিকায় এবং আংশিকভাবে অদ্যাবধি সেই স্থানই তারা দখল করিয়া আছে।" এ তো হলো সাধারণ মুসলিমদের অবস্থা।[৫৩] অপর পক্ষে যারা ইসলামকে একটু বুঝে শুনে সঠিকভাবে ঈমান এনেছিলেন, তাদের ব্যাপারে আমাদের হাতে এমন

---

৩১৮ শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

কোনো দলীল প্রমাণাদি নেই যা এ কথা প্রমাণ করে যে, তারা তাওহীদকে এর প্রকারাদিসহ এবং শির্ককে এর কারণসমূহসহ জেনেছিলেন। আমরা যদি ধরে নেই যে, তারা এ সব বিস্তারিতভাবে জেনেছিলেন, তথাপি এ কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, শয়তান তাদের কারো মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল অথচ প্রকৃত অর্থে মন্দ এমন সব ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিয়েছিল, যেমনটি সে মানব জাতির পথ ভ্রষ্টতার উষালগ্নে ওয়াদ্দ, সুয়া', ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নছর এর অনুসারীদের প্রতি এ সব ছড়িয়ে দিয়েছিল।[৩১৯]

শয়তান অত্যন্ত সন্তর্পণে তাদের মাঝে তা ছড়িয়ে না দিয়ে পারে কেমন করে? যেখানে সে তা ভারতের মুসলিম জনপদের মধ্যে এখানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই অতি সন্তর্পণে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আর সে কারণেই আমরা মুজাদ্দিদে আলফে ছানী আল্লামা শেখ আমহদ ছরহিন্দী (রহ.)-কে (১৫৬৮-১৬২৪ খ্রি.) সে সবের প্রতিবাদ করতে দেখতে পাই। তিনি তৎকালীন ভারতের মুসলিমদের মাঝে, বিশেষ করে তাদের মধ্যকার সূফীদের অনুসারী ও মোগল সরকারের দরবারী আলিমদের মাঝে যে সকল শির্ক, বেদ'আত ও ধর্মাদ্রোহী কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করেছিল, সেগুলোর বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলেছিলেন, যার জন্যে তাঁকে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের মহান সংস্কারক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর এর দরবারে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে সেজদা না করার কারণে তিনি কারাবন্দী পর্যন্ত হয়েছিলেন। কারাগারে বসে তিনি তাঁর সংস্কারমূলক কর্ম চালিয়ে যাওয়ার ফলে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব দেখে জেল কর্তৃপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট এ মর্মে রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য হয়েছিল যে, "এ ব্যক্তির সংস্কারমূলক আহ্বানের প্রভাবে জেলখানার পশুসুলভ আচরণের মানুষগুলো মানুষে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে এবং সেখানকার মানুষগুলো ফেরেশতায় পরিণত হতে শুরু করেছে।" তাঁর এবং তাঁর এ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, "সে সময়ে যদি শেখ আহমদ ছরহিন্দীর শুভাগমন না হতো, তা হলে প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বেই ভারতের মাটি থেকে ইসলামের নাম ও এর নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।"[৩২০]

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন : "শেখ আহমদ ছরহিন্দী যে সংস্কারমূলক আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন শেষ পর্যায়ে এসে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি:) ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা যে সংস্কারমূলক আন্দোলন দাঁড় করেছিলেন, সে আন্দোলনের সাথে তা একীভূত হয়ে যায়। কালের পরিক্রমায় এই দুই সংস্কারকের যাবতীয় প্রচেষ্টা 'রায়ব্রেলভী' এর প্রখ্যাত মুজাহিদ

---

৩১৯ আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

৩২০ ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

পরিবারের সাথে এসে মিলে যায়। সৈয়দ আহমদই হলেন মুজাহিদ পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারত উপমহাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমদের ভারতের মুসলিমদের স্বাধীনতা ও সংস্কারমূলক আন্দোলনের পিছনে একক লক্ষ্য ছিল মুসলিম রাজশক্তির বিনাশ এবং অমুসলিম রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র মুসলিম ভারতের জাতীয় জীবন স্বাভাবিকভাবে যে সব মারাত্মক অভিশাপে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল তাথেকে ভারতের মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করা। নওয়াব সুলায়মান জাহকে লেখা এক পত্রের মাধ্যমেও তাঁর এ উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে। সে পত্রে তিনি বলেন: ভাগ্যক্রমে এই দেশের শাসন ও রাজত্বের অবস্থা কিছুদিন হতে এরূপ হয়ে দাড়িয়েছে যে, খ্রিষ্টান ও হিন্দুগণ হিন্দুস্থানের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে এবং ঐ অঞ্চলগুলোকে অত্যাচারে, অবিচারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

ঐসব অঞ্চলে শির্ক ও কুফরের রীতিনীতি প্রবল হয়ে উঠেছে এবং ইসলামের অনুষ্ঠানগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আমার অন্তর দুঃখে ও বেদনায় অভিভুত হয়ে পড়েছে, হিজরতের আগ্রহে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠে, ঈমানের অভিমান আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলে এবং জেহাদ প্রবর্তনের আগ্রহে আমার মস্তক আলোড়িত হতে থাকে।" কুড়িগ্রাম জেলায় প্রত্নতাত্বিক খনন কাজ চালিয়ে মাটির নিচে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। যার ইটের গায়ে কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ ও হিজরী ৬৯ সালের বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিজরী প্রথম শতকেই আরব বণিকদের দ্বারা এদেশে ইসলামের শুভাগমন ঘটেছিল।

২.২ প্রাচীন বাংলার মুসলমানদের পালনীয় বিধি-বিধান

ইসলাম প্রচারকগণ তাঁদের কর্মের পদ্ধতিগত দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের একদল 'আবেদ' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা যুদ্ধের পথ পরিহার করে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় জনগণকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের মাঝে রয়েছেন শাহ সুলতান বলখী, যিনি প্রারম্ভে ঢাকার হরিরামপুরে এবং পরে ৪৩৯ হিজরীতে বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে এসে ইসলাম প্রচার করেন। এ নীতির উল্ল্যেখযোগ্যদের মধ্যে আরো রয়েছেন শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, যিনি ৪৪৫হিঃ/১০৫০ সালে বর্তমান নেত্রকোনা জেলার 'মদনপুর' এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন।[৩২১]

মুঘল সম্রাট শাহ জাহানের আমলে ১০৮২/১৬৭১ সালে তাঁর নির্দেশে সেখানে তাঁর কবর নির্মাণ করা হয়। এঁদের মধ্যে আরো রয়েছেন শেখ জালাল উদ্দিন তবরেযী, যিনি বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর এ দেশে আগমন করেছিলেন এবং ৬২২হিঃ/১২২৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের

---

৩২১ আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১২৪

মধ্যে আরো রয়েছেন শাহ নেয়ামত উল্লাহ (মৃত ১০৭৫হিঃ/১৬৬৪ খ্রি.) এবং শেখ ফরীদ উদ্দিন ও অন্যান্য বহু দরবেশগণ।[৩২২]

ইসলাম প্রচারকদের দ্বিতীয় দল 'গাযী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন :

'বাবা আদম শাহী' যিনি ১১৫৭-১১৭৯ সালের মধ্যে তৎকালীন হিন্দু রাজা 'বলরাম সেন'-এর আমলে ঢাকার 'বিক্রমপুর' এলাকায় এসে ইসলাম প্রচার করেন।

তন্মধ্যে আরো রয়েছেন : 'মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ' যিনি খ্রিষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পাবনা জেলার 'শাহজাদপুর' এলাকায় আগমন করেছিলেন।[৩২৩]

আরো রয়েছেন : 'শাহ তুরকান শহীদ' যিনি তৎকালীন বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গাযী হিসেবে বগুড়া জেলায় আগমন করেছিলেন।

আরো রয়েছেন : 'সৈয়দ আহমদ কাল্লা শহীদ', উলূগই আ'জম জা'ফর খাঁন গাযী (মৃত- ৭১৩হি), শাহ জালাল (মৃত ৯৭০হি:/১৫৬২ খ্রি.) এবং অন্যান্য গাজীগণ।

এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে আগত এ সকল 'আবিদ, যাহিদ (দুনিয়া বিরাগী) আলেম ও গাযীদের সততা, নিষ্ঠা ও চরিত্র মাধুর্যতা এবং তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত কারামতসমূহ (অলৌকিক কার্যকলাপ) পর্যবেক্ষণ করে এ দেশের সাধারণ লোকেরা প্রভাবিত হয়ে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

জনগণের ইসলাম গ্রহণের অবস্থাকে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে তাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাদের প্রথম ভাগে রয়েছেন এমন সব লোকেরা যারা ইসলামকে ভাল করে বুঝে-শুনে, অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে তা একটি সত্য ও সঠিক ধর্ম হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেই তাতে প্রবেশ করেছিলেন এবং এর সাথে সাথে তারা তাদের অতীত ধর্মের যাবতীয় শির্কী বিশ্বাস ও ধর্মীয় কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে তাওহীদী চিন্তা ও চেতনায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছেন এমন সব লোক যারা তাদের অতীত ধর্মের বিবিধ বিশ্বাসের উপর বহাল থেকে শুধুমাত্র সে-সব বিশ্বাসের নাম পরিবর্তন করে ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। তাদের পরিবর্তিত বিশ্বাসের মধ্যে ছিল- ব্রহ্মা দেবতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকৃতিতে অবতার হয়েছেন এবং বিষ্ণু দেবতা রাসূল রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

---

৩২২ আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১ খ্রি., পৃ. -১০২-১০৩

৩২৩ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১০২-১০৩

এ ধরনের মুসলিমরা নতুন জীবনের, নতুন চেতনার, নতুন সংস্কৃতির, নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোর পথে চলার পরিবর্তে শুধুমাত্র লেবাছ পরিবর্তন করেছিল। প্রার্থনার স্থান ও ভাষা পরিবর্তন করেছিল। হিন্দু নামের পরিবর্তে মুসলিম নাম রেখেছিল মাত্র। ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরেছিল, উত্তরীয় রেখে টুপি নিয়েছিল, জলের বদলে পানি বলেছিল, মন্দিরের পরিবর্তে মসজিদে এসেছিল, শশ্মানের পরিবর্তে গোরস্থানে এসেছিল। ব্যস এ পর্যন্তই। তাওহীদের মর্মকথা, আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও তাওহীদ, তার অস্তিত্ব, ক্ষমতা, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে ব্যবধান কী, এ সব তারা জানতে পারে নি। ফলে তারা আল্লাহ ও ভগবানের মধ্যে কী তফাৎ রয়েছে তা জানতে পারে নি। পার্থক্য এটুকু ছিল যে, পূর্বে তারা রাম মূর্তির কাছে ধরণা দিতো, এখন তারা মুসলিমের ম্রত ওলি আওলিয়ার কবরে হাঁটুগেড়ে মাথা লুটিয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলো। সে কালের মুসলিমরা যে ইসলামকে হিন্দু সংস্কৃতির আঁধারে ঢেলে সাজিয়েছিল, তা সে সময়কার বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীর মাঝেও প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। তারা মক্কা ও মদীনাকে ঠাকুর জগন্নাথ ও কাশীধ্যামের সাথে তুলনা করতেও দ্বিধাবোধ করে নি। তারা কর্মের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা আর শ্রীবিষ্ণু বলাকে একই মনে করতেন। এমনকি আল্লাহ, রাম ও রহীম এ দু'অংশে বিভক্ত বলেও বিশ্বাস করতেনসে সময়কার সাধারণ মুসলিমদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মকাণ্ড দেখলে মনে হয় তারা মুসলিম হয়েছিল ঠিকই, তবে কেনইবা তারা মুসলিম হলো, ইসলামী সংস্কৃতি আর হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতির মাঝে তফাৎটা কোথায়, তা তারা বুঝে উঠতে পারেন নি। অতীতে তারা যেমন তাদের দেব-দেবীদেরকে তাদের এবং ভগবানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এবং বিভিন্ন রকমের কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক বলে ভাবতো, মুসলিম হয়েও তেমনি তারা মুসলিম ওলি ও দরবেশদেরকে সে সব কিছুর মালিক বলে ভাবলো। এ অবস্থা শুধু যে মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং এ অবস্থা তৎকালীন সকল মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিস্তৃত ছিল। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

"হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতিকে এইভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করার এবং এই আদর্শের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তোলার এই প্রবণতা শুধুমাত্র কবি, সাহিত্যিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সর্বস্তরে ইহা সঞ্চারিত ও উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিগুহিসাবে জলদেবতা বরুণ পীর বদরে, গৌরচন্দ্র গোরচাঁদ পীরে, ওলাই চন্দ্রী-ওলাবিবিতে, সত্যনারায়ণ সত্যপীরে, লক্ষীদেবী মা বরকতে রূপান্তরিত হন। আর এই রূপান্তরিত দেবদেবীগণ মুসলিমদের নিকট তাহাদের প্রাপ্য পূজা ও শ্রদ্ধা অব্যাহতভাবেই পাইতে থাকেন।[৩২৪] তদুপরি এই সমস্ত রূপান্তরিত দেবতা বা পীর ছাড়াও বহু পীরের কল্পিত কবর এবং কোনো কবরের সহিত সম্পর্ক রহিত

---

৩২৪ ড. রাগিব সারজানি, *মুসলিম জাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে*, অনু. আব্দুস সাত্তার আইনী, ঢাকা: মাকতাবাতুল হাসান,খ. ১,২০২১ খ্রি. পৃ. ৮৬

কল্পিত পীরও মুসলিমদের নিকট হইতে পূজা, উৎসর্গ, সিন্নি, মোমবাতি ইত্যাদি লাভ করতে থাকেন। অনেক খানকাহ ও দরগাহ এখানে মুসলিমদের সুখ সমৃদ্ধি এবং বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপলক্ষ্যরূপে দীর্ঘকাল তাহাদের আল্লাহর স্থান দখলকারীর ভূমিকায় এবং আংশিকভাবে অদ্যাবধি সেই স্থানই তারা দখল করিয়া আছে।"

এ তো হলো সাধারণ মুসলিমদের অবস্থা। অপর পক্ষে যারা ইসলামকে একটু বুঝে শুনে সঠিকভাবে ঈমান এনেছিলেন, তাদের ব্যাপারে আমাদের হাতে এমন কোনো দলীল প্রমাণাদি নেই যা এ কথা প্রমাণ করে যে, তারা তাওহীদকে এর প্রকারাদিসহ এবং শির্ককে এর কারণসমূহসহ জেনেছিলেন। আমরা যদি ধরে নেই যে, তারা এ সব বিস্তারিতভাবে জেনেছিলেন, তথাপি এ কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, শয়তান তাদের কারো মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল অথচ প্রকৃত অর্থে মন্দ এমন সব ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিয়েছিল, যেমনটি সে মানব জাতির পথ ভ্রষ্টতার উষালগ্নে ওয়াদ্দ, সুয়া', ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নছর এর অনুসারীদের প্রতি এ সব ছড়িয়ে দিয়েছিল।[৩২৫]

যেখানে সে তা ভারতের মুসলিম জনপদের মধ্যে এখানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই অতি সন্তর্পণে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আর সে কারণেই আমরা মুজাদ্দিদে আলফে ছানী আল্লামা শেখ আমহদ ছরহিন্দী (রহ.)-কে (১৫৬৮-১৬২৪ খ্রি.) সে সবের প্রতিবাদ করতে দেখতে পাই।[৩২৬] তিনি তৎকালীন ভারতের মুসলিমদের মাঝে, বিশেষ করে তাদের মধ্যকার সূফীদের অনুসারী ও মোগল সরকারের দরবারী আলিমদের মাঝে যে সকল শির্ক, বিদ'আত ও ধর্মাদ্রোহী কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করেছিল, সেগুলোর বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলেছিলেন, যার জন্যে তাঁকে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের মহান সংস্কারক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর এর দরবারে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে সেজদা না করার কারণে তিনি কারাবন্দী পর্যন্ত হয়েছিলেন। কারাগারে বসে তিনি তাঁর সংস্কারমূলক কর্ম চালিয়ে যাওয়ার ফলে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব দেখে জেল কর্তৃপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট এ মর্মে রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য হয়েছিল যে, "এ ব্যক্তির সংস্কারমূলক আহ্বানের প্রভাবে জেলখানার পশুসুলভ আচরণের মানুষগুলো মানুষে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে এবং সেখানকার মানুষগুলো ফেরেশতায় পরিণত হতে শুরু করেছে।" তাঁর এবং তাঁর এ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, "সে সময়ে যদি শেখ আহমদ ছরহিন্দীর শুভাগমন না হতো, তা হলে প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বেই ভারতের মাটি থেকে ইসলামের নাম ও এর নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।"[৩২৭]

---

৩২৫ ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

৩২৬ ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৫

৩২৭ ড. এ কে এম নূরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন : "শেখ আহমদ ছরহিন্দী যে সংস্কারমূলক আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন শেষ পর্যায়ে এসে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি:) ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা যে সংস্কারমূলক আন্দোলন দাঁড় করেছিলেন, সে আন্দোলনের সাথে তা একীভূত হয়ে যায়। কালের পরিক্রমায় এই দুই সংস্কারকের যাবতীয় প্রচেষ্টা 'রায়ব্রেলভী' এর প্রখ্যাত মুজাহিদ পরিবারের সাথে এসে মিলে যায়। সৈয়দ আহমদই হলেন মুজাহিদ পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারত উপমহাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমদের ভারতের মুসলিমদের স্বাধীনতা ও সংস্কারমূলক আন্দোলনের পিছনে একক লক্ষ্য ছিল মুসলিম রাজশক্তির বিনাশ এবং অমুসলিম রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র মুসলিম ভারতের জাতীয় জীবন স্বাভাবিকভাবে যে সব মারাত্মক অভিশাপে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল তাথেকে ভারতের মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করা। নওয়াব সুলায়মান জাহকে লেখা এক পত্রের মাধ্যমেও তাঁর এ উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে। সে পত্রে তিনি বলেন: ভাগ্যক্রমে এই দেশের শাসন ও রাজত্বের অবস্থা কিছুদিন হতে এরূপ হয়ে দাড়িয়েছে যে, খ্রিষ্টান ও হিন্দুগণ হিন্দুস্থানের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে এবং ঐ অঞ্চলগুলোকে অত্যাচারে, অবিচারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।[৩২৮]

ঐসব অঞ্চলে শির্ক ও কুফরের রীতিনীতি প্রবল হয়ে উঠেছে এবং ইসলামের অনুষ্ঠানগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আমার অন্তর দুঃখে ও বেদনায় অভিভুত হয়ে পড়েছে, হিজরতের আগ্রহে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠে, ঈমানের অভিমান আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলে এবং জেহাদ প্রবর্তনের আগ্রহে আমার মস্তক আলোড়িত হতে থাকে।"

৭১২ খ্রিস্টাব্দে রাজা দাহিরের পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। এরপর হতে সোয়া এক সহস্রাব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসনামলের সুদীর্ঘ ইতিহাস বিবিধ উৎস হতে সংগ্রহ করা যায়। এসব উৎসর অনেক অনুদঘাটিত তথ্য প্রকাশিত হলে ভারতে মুসলমানদের আরো বিস্তারিত ইতিহাস জানা যাবে। ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস রচনার উপাদান প্রচুর। ভারতে বিভিন্ন মুসলিম রাজবংশের আমলে রচিত সমসাময়িক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সাহিত্য থেকে মুসলিম শাসনামলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাদির একটা সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি চয়ন করা সহজ।[৩২৯] ভারতে মুসলিম শাসনামলে ইতিহাস রচনায় মূলত চারটি উৎস হতে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। যথা:

---

৩২৮ আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৩২৯ ফাহমিদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

ক. রাজকীয় দলিলপত্রাদি

ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুসলিম রাজবংশ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এ দেশে মুসলমানদের আগমন-পরবর্তী বিভিন্ন রাজবংশের রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রাদি ইসলামের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এসব উৎস থেকে সে যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

খ. মুদ্রা ও স্মৃতিস্তম্ভ

মুসলিম যুগের মুদ্রা ও স্মৃতিস্তম্ভের বহু নিদর্শন আজও বিদ্যমান। সে যুগের প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে সুলতানি ও মোগল শাসনামলের বহু তথ্য পাওয়া যায়। সন-তারিখ সংবলিত মুদ্রাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন বংশের রাজত্বকাল নিরূপণ করা যায়। কখনো কখনো সেগুলো হতে সম্রাটদের নাম এবং পরোক্ষভাবে সে সময়ের ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থাদিও জানা যায়। স্মৃতিস্তম্ভসমূহ সমসাময়িক শাসনবর্গের ব্যক্তিগত রুচি ও আর্থিক সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে।

গ. বিদেশি বণিক ও পর্যটকদের বিবরণ

ভারত উপমহাদেশে মুসলিম ইতিহাসের মূল্যবান উৎস হলো বিদেশি বণিক ও পর্যটকদের বিবরণী। প্রাক-মোগল যুগে আগমন পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তসংবলিত গ্রন্থ 'রেহলা' সুলতানি আমলের ইতিহাসের এক অনন্য উপাদান। চীনা পর্যটক মা হুয়ান পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ সফর করে তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এক তথ্যবহুল বিবরণী রেখে গেছেন।[৩৩০] সুলতানি আমলে আগত পর্যটকদের মধ্যে নিকোলো কন্টি, আবদুর রাজ্জাক ও মার্কোপোলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে একাধিক ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে এসে তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। র‍্যালফ ফিচ, পার্চাস, টেরি, টেভারনিয়ার, বার্নিয়ার, মানুচি প্রমুখ পর্যটকের গ্রন্থ থেকে মোগল শাসনামলের মূল্যবান ইতিহাস পাওয়া যায়।[৩৪]

ঘ. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সাহিত্য

ভারত উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসের সমৃদ্ধ উৎস হলো অজস্র ইতিহাস গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক সাহিত্য। নিম্নে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদির বিবরণ প্রদত্ত হলো। যেমন:

চাচনামা : মূলত আরবি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটির ফারসি অনুবাদ করেন আলী ইবনে হামিদ কুফি (১২১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দ)। এ গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বাপর সিন্ধুদেশের অবস্থাদি ও সিন্ধু বিজয় কাহিনি বিধৃত হয়েছে। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বিবরণীসংবলিত প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে 'চাচনামা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [৩৩১]

---

৩৩০ আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

৩৩১ ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ১২৪

তারিখে সিন্ধ

মির মুহাম্মদ মাসুম কর্তৃক রচিত তারিখে সিন্ধ [রচনাকাল ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ] গ্রন্থেআরবদের সিন্ধু অভিযানের সময় থেকে সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ আছে।

কিতাবুল ইয়েমেনি : 'কিতাবুল ইয়েমেনি' গ্রন্থের রচয়িতা আবু নাসের ইবনে উতবি গজনির সুলতান সবুক্তগিন ও সুলতান মাহমুদের রাজত্বকাল থেকে ১০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।

তারিখুল হিন্দ

মধ্যযুগের মূল্যবান রচনা হলো আলবিরুনী [৯৭০-১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ] রচিত তারিখুল হিন্দ। আলবিরুনি সুলতান মাহমুদের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর রচিত তারিখুল হিন্দ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের সার্বিক অবস্থার এক তথ্যবহুল বিবরণও এতে লিপিবদ্ধ হয়।

তাজুল মাসির

হাসান নিজামি রচিত 'তাজুল মাসির' গ্রন্থে ১১৯২ থেকে ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলির বিবরণ আছে। এ কারণে এটিকে কুতুবুদ্দিন আইবেক ও ইলতুতমিশের রাজত্বকালের প্রথমদিকের প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩৩২]

তাবাকাতে নাসিরি

'তাবাকাতে নাসিরি' গ্রন্থের রচয়িতা মিনহাজুস সিরাজ। এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হলো, এতে মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির তুর্কি সালতানাতের ধারাবাহিক ইতিহাস বিধৃত হয়েছে এ গ্রন্থে।

খাজায়েনুল ফুতুহ

ঐতিহাসিক আমির খসরু রচিত 'খাজায়েনুল ফুতুহ' মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ গ্রন্থে আলাউদ্দিন খিলজীর দাক্ষিণাত্য, বরঙ্গল, মেবার অভিযান, তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার, মোগল আক্রমণ প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। খিলজি ও মোগল রাজবংশের ইতিহাসের জন্য এ গ্রন্থখানি খুবই মূল্যবান। তারিখে ফিরোজশাহি : উপমহাদেশের ইসলামী ইতিহাসের ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে জিয়াউদ্দিন বারানী রচিত তারিখে ফিরোজ শাহী গ্রন্থটি এক অমূল্য সম্পদ। সুলতান বলবনের সিংহাসনারোহণেরসময় হতে ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বছরের বিশদ

---

৩৩২ ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

ঘটনাবলি এ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আলাউদ্দিন খিলজী ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজস্ব সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবরণ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ফুতুহুস সালাতিন

ঐতিহাসিক খাজা আব্দুল্লাহ মালিক রচিত ফুতুহুস সালাতিন ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ গ্রন্থে গজনীর সুলতান মাহমুদের সময় থেকে মুহাম্মদবিন তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে ।

মোগল যুগে রচিত গ্রন্থাদি

মোগল শাসনমলে মুসলিম ভারতের ইতিহাসনির্ভর অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। সম্রাট বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর প্রমুখ সম্রাট তাঁদের আত্মজীবনীমূলক বহু ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৩৩] এ ছাড়াও আবুল ফজল রচিত আইনে আকবরী ও আকবরনামা, তিনজন ঐতিহাসিকের সমন্বয়ে রচিত বাদশাহনামা, নাসিরে আলমগীরী ও কাজি খাঁ রচিত মুণ্ডাখাবুল লুবাব এবং বাদায়ুনি রচিত 'মুণ্ডাখাবুত তাওয়ারিখ' ইত্যাদি মোগল আমলের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উৎস গ্রন্থ।

সাহিত্য

ভারতের মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস সমকালীন বিভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। আমির খসরু রচিত খাজায়েল ফুতুহ এবং মুহাম্মদ জায়সি রচিত পদ্মাভত (Padmavat) গ্রন্থদ্বয়েবহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।[৩৩৪]

৩. বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

সপ্তম শতাব্দীতে খলিফা ওমর আল-ফারুকের (রা.) সময় থেকেই বাংলায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুবালিগ ও আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। ১২০৪ সালে (১১৯৯-১২০৪ এর মধ্যে) বাংলায় তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির আগমনের পর এ দেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বখতিয়ার খিলজি অথবা কোনো মুসলিম শাসকই প্রত্যক্ষভাবে এ দেশে ইসলাম প্রচার করেননি। রাজ্য জয় ও রাজ্য শাসনই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তবে শাসক মুসলিম হওয়ায় ইসলাম প্রচারকদের জন্য এ দেশে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে গৌড়ে মুসলিম শাসক অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ দেশে ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে স্বভাবতই ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। ইতঃপূর্বে যেখানে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির একাধিপত্য বিরাজমান ছিল, মুসলিম শাসনামলে ক্রমেই সেখানে ইসলামী বা মুসলিম ধর্ম-সংস্কৃতির

---

৩৩৩ ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৩৯

৩৩৪ ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

আধিপত্য সৃষ্টি হয়। ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বপূর্ণ উদার মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে এ দেশের মানুষ মুসলিম হতে শুরু করে। ফলে সেন আমলের হিন্দু প্রধান একটি দেশ অচিরাৎ একটি মুসলিম প্রধান দেশে পরিণত হয়। ইসলামের উন্নত মানবিক আদর্শ, নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং মুসলমানদের জীবনাচারের ভিত্তিতে বাংলাদেশে এক নতুন প্রাণবন্ত সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। ইসলামী সংস্কৃতি প্রাণশক্তিতে অতিশয় প্রবল ও জীবনমুখী। ফলে সহস্র বছরের বিবর্তনে তা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতিসত্তার রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলাদেশে কোনো নবী রাসূল ইসলামের সুমহান বাণী নিয়ে আগমন করেছেন বলে এখন পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে ঠিক কবে থেকে মুসলিমদের বঙ্গদেশে আগমন হয়েছিল ও তারা কীভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেছিল এ নিয়ে বিশেষ কোনো গবেষণায় স্পষ্টতা আসেনি। বাঙালি গবেষক-ঐতিহাসিকদের মধ্যে মুসলিম গবেষক-ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে গবেষণা করেছেন হাতে গোনা। ইতিহাস থেকে জানা যায়, একদল সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক বিন ওয়াহাব (রহ.) এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়ে চীনে আগমন করেন।[৩৩৫] এরপর একে একে আরব উপদ্বীপ, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে পীর, দরবেশ, ওলি-আউলিয়া ও সুফি সাধকদের এ দেশে আগমন ঘটতে থাকে। তবে ১১ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ১৭ শতাব্দী পর্যন্ত এ দেশে ইসলামের সর্বাধিক প্রচার ও প্রসার হয়েছে বলে জানা যায়। উপমহাদেশে আগমনকারী মুসলমানদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

৩.১ বণিকদের ইসলাম প্রচার

এক শ্রেণীর মুসলমান ব্যবসা বানিজ্য করার উদ্দেশ্যে এসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। এ ক্ষেত্রে আরব বণিকদের কথা স্মরণীয়। ইতিহাসবিদ সত্যেন সেন তার মসলার যুদ্ধ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা- ভারতে আরব বণিকদের সমুদ্র বানিজ্যের কথা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। চট্টগ্রামে মুসলমান আগমনের ইতিহাস সন্ধানের ঝুড়িতে ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা বিগত ৪/৫ বছর ধরে নতুন তথ্য যোগ করেছেন। ইতিহাসবিদদের ধারনা মতে খ্রীষ্টীয় ৮ম, ৯ম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরবের মুসলমান বণিকদের সঙ্গে হয়তো যোগাযোগের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামে আরব ব্যবসায়ীদের আনাগোনা আরোও কয়েকগুনে বৃদ্ধি পায়। আরব বণিকেরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাজ্য গঠন না করলেও আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের জীবন যাত্রায় তাঁদের প্রভাব এখনও বেশ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভাষায়, চট্টগ্রামের ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহার হয় এখনো। এমনকি সেই প্রাচীন সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চট্টগ্রামের নামই বদল হয়েছে প্রায় ৩৭ বার। এই নাম গুলোর মধ্যে অনেক নাম আরবী ও আরবীয় সভ্যতার সাথে মিল রয়েছে। চট্টগ্রামী

---

৩৩৫ ড. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০১৯ খ্রি.,পৃ. ১৩৪

ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্বে "না" সূচক শব্দ ব্যবহার ও আরবী ভাষার প্রভাব পড়ে।[৩৩৬] অনেক চট্টগ্রামী পরিবার আবার নিজেদের আরব বংশীয় লোক বলেও দাবী করে থাকেন। চট্টগ্রামে একাধিক "কদম রসুল" এর অস্তিত্ব দেখা যায়- যেমন চট্টগ্রাম নগরীর চেরাগীপাহাড় মুমিন রোডে অবস্থিত কদম মোবারক শাহী জামে মসজিদে "কদম রসুল", সীতাকুন্ড থানায় "কদম রসুল" ও কদম রসুল এলাকা, চট্টগ্রামে শহরে শেখ ফরীদ এর চশমা, চন্দনাইশ থানার বাগিচার হাট খান মসজিদে "কদম রসুল", বাঁশখালী থানায় "কদম রসুল" গ্রাম ইত্যাদি আসলে আরবীয়দের আগমনবার্তাই বহন করে। চট্টগ্রামের লোকের মুখবয়ব আরবদের অনুরূপ বলেও অনেক নৃবৈজ্ঞানিক ও গবেষক মনে করে থাকেন। চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি এলাকা যেমন: আলকরন, শুলকবহর, (সুলক-উল-বহর), ষোলশহর (সালেহে শহর), হালিশহর (হাবেলী শহর), বাকলিয়া (বকলিয়া) ইত্যাদি নামগুলো আরবী এবং এর ব্যবহার এখনও বেশ মর্যাদাবান। ভাষাবিদদের প্রদেয় তথ্য মতে, আরবী শব্দ শৎ এর অর্থ বদ্বীপ এবং গঙ্গ যা মূলত গঙ্গা, এর থেকে চট্টগ্রামের নামের উৎপত্তি হয়েছে। এটা স্পষ্টই যে বণিকগণ বেশ নীরবেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে পবিত্র ইসলামের মর্মবাণী নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই।[৩৩৭]

যা মূলত গঙ্গা, এর থেকে চট্টগ্রামের নামের উৎপত্তি হয়েছে। এটা স্পষ্টই যে বণিকগণ বেশ নীরবেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে পবিত্র ইসলামের মর্মবাণী নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

৩.২ স্থলপথে ইসলামের আগমন

আরেক শ্রেণীর মুসলমান এসেছিলেন দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষায় বিজয়ীর বেশে। তাদের বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন। এটা ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বিজয়। তাঁর বিজয় সিন্ধু প্রদেশে থেমে থাকেনি; বরং তা বিস্তার লাভ করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত সামরিক অভিযান পরিচালনার কাজ বহু আগে থেকেই শুরু হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের আগে কয়েকবার সিন্ধু প্রদেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিজরি প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিন্ধু অভিযানের সূচনা হয়। খৃষ্টীয় নবম শতকে বাংলাদেশে আরব মুসলিমদের যাতায়াত ছিলো। রাজশাহীর পাহাড়পুরে যখন প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের জন্য বৌদ্ধ বিহার খনন করা হয় তখন একটি আরবী মুদ্রা পাওয়া

---

৩৩৬ আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*,প্রাগুক্ত পৃ. ১২৪

৩৩৭ সত্যেন সেন, *মসলার যুদ্ধ*, ঢাকা: দু প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রি.,পৃ.১৭

যায়। সেই মুদ্রাটি তৈরী হয়েছিল ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে, যখন মূলত ছিল খলিফা হারুনুর রশীদের শাসন-কাল।[৩৩৮]

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ শতকে। ইসলাম ধর্মের উদ্ভবের প্রায় ৬০০ বছর পর বাংলায় মুসলমানদের রাজত্ব শুরু হয়। এ দীর্ঘ সময় ধরে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্য মুসলমান বণিকরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। কাজেই এখানে মুসলমান বণিকদের আনাগোনা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই বর্তমান ছিল।

৩.৩ সূফী আলিম ও মুজাহিদের ইসলাম প্রচার

তাদের মধ্যে কতক পীর, দরবেশ শুধু ইসলামের বানী প্রচারের জন্যই এসেছেন এবং সারা জীবন এখানেই বসবাস করেছেন। সুফি-পীর-দরবেশ, ওলী-আউলিয়ার পদচারণায় ধন্য এই বাংলাদেশের মাটি পানি আকাশ বাতাস। হাজার বছর আগে তাঁদের আগমনের সূত্রপাত ধর্মের পবিত্র বাণী নিয়ে। তবে মূলত বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পর তুর্কি শাসনামলে তাঁদের এই দেশে এসে বসবাসের ও ধর্মকথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পীরভক্তির ফলে এইসব অজস্র সুফি-পীর-দরবেশদের আগমন, জীবনযাপন ও ধর্ম প্রচার নিয়ে কালক্রমে রচিত হয়েছে কত শত অত্যাশ্চর্য কাহিনী ও কিংবদন্তী। বাংলাদেশের মাটিতে এইসব কাহিনী-কিংবদন্তী এক সময় লৌকিক বা লোকজ ইসলামের আনুষঙ্গিক বিষয়ও হয়ে উঠেছে। নিষ্ঠাবান লেখক আলমগীর জলিল আন্তরিকতা দিয়ে এই গ্রন্থে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য পীর-দরবেশের পরিচয় তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তাঁদের সাথে জড়িত সেইসব কাহিনী-কিংবদন্তীও বলতে ভোলেননি। গ্রন্থটি ধর্মপ্রাণ ও ঐতিহ্য-সচেতন পাঠকদের বিশেষ আগ্রহের বিষয় হবে বলে আশা করা যায়।[৩৩৯]

সাধারণভাবে এ অঞ্চলের মুসলিমরা মনে করে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খলজির মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো মুসলিমরা বাংলায় পদার্পণ করেছিল। হালে সামান্য তথ্য যুক্ত হয়েছে যে বখতিয়ারের আগে কিছু কিছু সুফি-দরবেশ বাংলায় প্রবেশ করে ইসলাম প্রচার শুরু করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা ও অনুমান এর বেশি কিছু নয়। এ বিষয়ে দু-একটি উদ্ধৃতি দেখা যেতে পারে,[৩৪০]

১. বাংলায় মুসলমান দরবেশদের আগমন অতি প্রাচীন ব্যাপার। সেন রাজত্বের শেষভাগে এমনই একজন দরবেশ বা শেখ নাকি এ দেশে আসেন...।

---

৩৩৮ কাজী আবদুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ, ঢাকা: ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩খ্রি., পৃ.৯৬

৩৩৯ কাজী আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬

৩৪০ কাজী আবদুল ওদুদ; প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

২. বাংলার মুসলমানের অতীত বলতে একটা দীর্ঘকালের ব্যাপার বোঝায় মুসলমানরা এ দেশে যখন থেকে এসেছে তখন থেকে ইংরেজি শাসনের সূচনা পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামও মনে করেন,[৩৪১]

'দশম শতাব্দীতে এসেছিল মুসলমানরা, পরে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের ভেতর মিশে গিয়েছিল, আর এ উপমহাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। এক সাম্রাজ্য হটিয়ে দিয়েছিল অন্য সাম্রাজ্যকে। ধর্মীয় বিজয় অভিযান অব্যাহত ছিল। তার দাবি, মুসলিমরা এসেছিল ১০ম শতাব্দীর মধ্যে, তার আগে নয়। এসব ধারণা ও মত মোটামুটি একই রকমেরই।[৩৪২]

ড. আহমদ শরীফের অনুমান, ড. আহমদ শরীফ বাংলা ভাষায় মুসলিম সাহিত্য রচনার প্রাচীন উপাদানের অন্যতম আবিষ্কারক ও গবেষক। বাংলায় মুসলিমদের আগমন সম্পর্কে তার ধারণাটি স্মর্তব্য:

মদিনা থেকে মুলতান অবধি ইসলামের প্রসার বলতে গেলে প্রায় অবাধেই ঘটেছিল। তুর্কি বিজয়ের আগেই এখানে আরব-ইরানি বেনেদের সঙ্গে দরবেশ-প্রচারকদের আগমন শুরু। অন্তত আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। Periplus in the Erytheon -এর আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্ক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বেনেরা বছরে কয়েক মাস থেকে যেত। আমাদের মনে হয় তখনো মুসলিম সমাজে সুফি মতবাদ প্রসার লাভ করেনি।

ড. আহমদ শরীফের এ ধারণায় বেশ কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে প্রথমত যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো, 'তুর্কি বিজয়ের আগেই বাংলাদেশে আরব-ইরানি বেনেদের সঙ্গে দরবেশ-প্রচারকদের আগমন শুরু হয়।' এ মন্তব্য থেকে ইবনে বখতিয়ার খলজির আগমনের মাধ্যমেই ১২০৪ সাল থেকে বাংলায় মুসলিমদের প্রথম আগমনের এতকালের মিথটি বাতিল হয়ে যায়। একই সঙ্গে আহমদ শরীফের মুসলিম প্রবেশের কাল গণনাটিও গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তিনি বলেছেন, 'অন্তত আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়', তথাপি তার এ অনুমানও যথার্থ যে গ্রিক সাহিত্যের দলিল অনুযায়ী 'এ সম্পর্ক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব। ' এ দালিলিক ধারণা থেকে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই অথবা ওফাতের পর-পরই (৬৩২ খ্রিস্টাব্দের আগে-পরে) বাংলাদেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আরব মুসলিমরা প্রবেশ

---

৩৪১ এ পি জে আব্দুল কালাম আজাদ, *উইংস অব ফায়ার*, অনু গোলাম রহমান, ঢাকা: কারুবাক, ২০২২ খ্রি., পৃ. ১১০

৩৪২ এ পি জে আব্দুল কালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

করেছিলেন।[৩৪৩] প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা তথা ভারতবর্ষ বহিঃশক্তির নজর কেড়েছে। কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে এবং তারা এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকে মনে করেন আর্যদের পরে সবচেয়ে বেশী এবং সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে ইসলাম তথা মুসলিমগণ। মুসলিমদের আগমনের পর থেকেই বাংলার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বাংলা প্রাচীনকালে বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। এর একটি বিরাট অংশ হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের শাসন-াধীনে থাকলেও তারা নিজেদের 'বাংলার' শাসক হিসেবে পরিচয় দেয়ার চেয়ে 'গৌড়রাজ' হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশী গর্ববোধ করতেন।

বখতিয়ার খলজির আগমনে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। তাবে বাণিজ্যিক কারণে বাংলায় মুসলিমদের আগমন ঘটে তারও আগে। ইলিয়াছ শাহ্ প্রথম বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকে একত্রিত করে 'বাঙ্গালাহ' নাম দেন। এরপর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙলা নামে কোন অঞ্চলের যাত্রা শুরু হয়। মুসলিম শাসকদেও অধীনে ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা, বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা পরিতুষ্টি অর্জন করে। বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলিমগণ বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে অন্যতম একটি অংশে পরিণত হয়।[৩৪৪]

এর পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল-

এক. মুসলমানগণ এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং এখানকার সমাজ সংস্কৃতির সাথে মিশে এদেশীয় হয়ে ওঠে। ইংরেজদের মত সাময়িক মুনাফা সংগ্রহের নিমিত্তে তারা আসেনি।

Khaleda Manzoor-e-Khuda বলেছেন,-

"It is a most noteworthy fact that both the Muslim conquerors and the traders who arrived to settle in India severed ties with their original homelands. In spite of their monotheistic faith and different mores, those immigrant Muslims became part of Indian society."[345]

দুই. বিজয় সেনের কৌলীন্য প্রথা ও আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্পেষণে বাংলার নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মুক্তির পথ খুঁজছিল। ইসলামের শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা, সহজ-সরল মতবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধকে তারা স্বাদরে গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মত বাংলায়ও ইসলাম নিরবে নিভৃতে গণজোয়ার এনেছিল।[৩৪৬] তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু তারানাথ ও কবি রামাই পন্ডিতের বর্ণনায় সেন

---

৩৪৩ আহমদ শরীফ, *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৮ খ্রি., পৃ. -১০২-১০৩

৩৪৪ আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, ১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ১৩২

৩৪৫ Khaleda Manzoor-e-Khuda, *Islam-The Formative Background of Bangladesh,* Dhaka: Academic Press and Publishers Library, p.9

৩৪৬ ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

রাজাদের অত্যাচার ও মুসলমানদেরকে মুক্তিদূত হিসেবে গ্রহণের বিষয়টি উঠে এসেছে। কবি রামাই পণ্ডিত আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন,

"এমন কি দেবতারাও ব্রাহ্মণদের এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মুসলমান পয়গম্বর, সাধুপুরুষ, উলেমা ও ধর্মযোদ্ধা ইত্যাদিরূপে আগমন করলেন এবং ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ধূলিসাৎ করে দিলেন। অতঃপর, মুসলমানগণ নির্যাতিত মানুষদের উদ্ধার করলেন এবং তাদের এই উদ্ধার কার্যে সাধুপুরুষ ও উলেমাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।"[৩৪৭]

তিন. বাংলায় বাণিজ্যিক ও সামরিক কারণে মুসলমানদের আগমন ঘটলেও এখানে ইসলামের প্রসার ঘটেছে সুফী সাধকের মাধ্যমে। মুসলিম শাসকগণ ইসলাম প্রচারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা তেমন রাখেননি, তাদের ভূমিকা ছিল সহায়ক। মূলত: সুফি-সাধক, পীর, মাশায়েখ, ফকির দরবেশ প্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণের দ্বারাই ভারতে ইসলামের প্রসার ঘটেছে।[৩৪৮]

পীর মাশায়িখের দেশ বাংলাদেশ। শত শত পীর মাশায়িখের পদচারণায় ধন্য এ বাংলাদেশ। এদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে পীর মাশায়িখের নাম অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু সর্বপ্রথম বাংলাদেশে পীর মাশায়িখের আগমন কখন ঘটেছিল তার সন তারিখ নির্ধারিত জানা না থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশ তথা হিমালয়ান উপমহাদেশে ওলী আওলিয়ার মাধ্যমেই ইসলামের আগমন এবং প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। আরব, ইয়ামেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্যএশিয়া ও ভারত থেকে এসব সূফী-দরবেশ, পীর-মাশায়িখ ও আলিমগণ, বাংলায় এসেছেন এবং বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তারা এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন।[৩৪৯] মূলত তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে এদেশের সর্বত্রই ইসলামের আলো পৌছেছে। তাঁদের কর্মতৎপরতার ফলেই এদেশে ইসলামী আমল আখলাক, তাহযীব তামাদ্দুনের ভীত গড়ে উঠেছে। আরএ ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে আরবের মুসলিম বনিকরাও তাঁদের তাবলীগি দায়িত্ব পালন করতেন।

তাইতো আরব বনিক ও প্রচারকদের চেষ্টায় হিজরী প্রথম শতকেই (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকুলীয় বন্দর সমূহের সাথে সাথে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ উপকূলীয় অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয়-বন্দরসমূহে ইসলামী ভাবধারার আগমন ঘটে। কারণ প্রথম যুগে আরবরা এদেশে এসেছেন সমুদ্রে পথে। সমুদ্রপথ তাদের কাছে অধিক পরিচিত থাকার ফলে বাংলার সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকার সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মূলত: ভৌগোলিক বা অবস্থানগত কারণেই বাংলার সাথে আরবদের বানিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সুদূর অতীত কালে। মরুময় আর-

---

৩৪৭ সৈয়দ আব্দুল হালিম, *বাঙ্গালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙ্গালী জাতির বিকাশের ধারা*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০ খ্রি., পৃ. ১৯০

৩৪৮ কাজী আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬

৩৪৯ সৈয়দ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, ২০১০ খ্রি., পৃ. ১৯৮

ববাসীগণ জীবন ধারণের জন্য খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবহমান কাল থেকেই ব্যবসা বানিজ্য করতো। এ কারনে আবিসিনিয়াহতে সুদূর চীন পর্যন্ত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল।

স্থলপথ জলপথ উভয় পথেই-আরবগণ তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতো। উটের সাহায্যে স্থলপথে এবং নৌযানের সাহায্যে তারা বানিজ্যের উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করতো।[৩৫০] প্রাক ইসলামী যুগেই তারা একদিকে সমুদ্র পথে আবিসিনিয়া এবং অপর দিকে সুদূর প্রাচ্য চীন পর্যন্ত তাদের ব্যবসার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করেছিল। আরবরা ভারতের মালাবার ও চট্টগ্রাম থেকে প্রধানত কাঠ, গরম মসলা, সুগন্ধী দ্রব্য, হাতীর দাঁতও নানাবিধ রত্ন ইউরোপে রপ্তানী করতো। গরম মসলা উৎপন্ন হতো ভারতের দক্ষিণ এলাকায় এবং সরন্ধীপ বা সিংহলে। আর প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশ হাতীর দাঁতের জন্য বিখ্যাত ছিল। এতেই প্রমাণিত হয় যে, আরব দেশীয় মুসলিম বনিকদের চট্টগ্রাম বন্দরে আসা-যাওয়া ছিল নিয়মিত। ইবনে খুরদাবা, (জন্মঃ ৭০৩ হিজরী মৃত্যুঃ ৭৭৮ হিজরী) মাসউদী, আল ইদ্রিসী (মৃত্যুঃ ৫৪৯ হিজরী) প্রমুখ ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের বিবরণ থেকেও অনেক তথ্য জানা যায়। ইবনে খুরদাবা তাঁর'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক' নামক গ্রন্থে লিখেছেন : কামরুত (কামরুপ) থেকে মিঠা পানির মাধ্যমে (নদীর মাধ্যমে) পনের বিশ দিনের মধ্যে সমন্দরে (চট্টগ্রাম) সন্দল বা চন্দন কাঠ নিয়ে আসা হয়। অনেকেই সমন্দরকে চট্টগ্রাম মনে করেন।[৩৫১] জালালুদ্দীন তাব্রিজি, শাহ্ মাহীসওয়ার, শাহ্ মাখদুম, হযরত বদর শাহ্, শাহ্ জালাল এবং অন্যান্য সাধকেরা বাং লায় এসেছেন ইসলামের আলো নিয়ে এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। তাঁদের শিক্ষা ও সান্নিধ্যে স্থানীয়দের মধ্যে বড় একটি অংশ ধর্মান্তরিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের ভাষায়- "একদিকে মুসলিম সেনাপতি ও সৈন্যরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছেন, অন্যদিকে ঔলিয়া (আউলিয়া), দরবেশ ও আলিমগণ দলে দলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন।" [৩৫২] এ সময়ে বাংলায় যে সমস্ত দরবেশ ও আলিম প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গৌড়ের আখী সিরাজুদ্দীন (মৃত-১৩৫৭), পান্ডুয়ার শেখ আলাউল হক (মৃত-১৩৯৮) নূর কুতুব-উল-আলম (মৃত-১৪১৬), হুগলীর ফুরফুরাহর শাহ্ আনওয়ার কুলী হলবী (মৃত-১৩৭৫), রংপুরের শাহ্ ইসমাঈল গাজী (হত্যা-১৪৭৪), খুলনার খান জাহান (মৃত-১৪৫৮), সোনার গাঁয়ের হাজী বাবা সালিহ (মৃত- ১৫০৬), শ্রী হট্টের শাহজালাল (মৃত-১০৯৬), চট্টগ্রামের শাহ্ মুহসীন আউলিয়া (মৃত-১৩৯৭) এবং পীর বদর (ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন), ত্রিপুরার রাস্তী শাহ্ (১৩৫১ হতে ১৩৮৮),

---

৩৫০ কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার মুসলমানের কথা: শাশ্বত বঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৬

৩৫১ সত্যেন সেন, *মসলার যুদ্ধ*, ঢাকা: দ্যু প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রি.,পৃ.১৭

৩৫২ সত্যেন সেন, *মসলার যুদ্ধ*, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৬

গৌড়ে মৌলানা বরখুরদার (মৃত-১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে), দেবকোটের দরবেশ প্রমুখ ধর্মপ্রচারকগণের দ্বারাই ভারতে ইসলামের প্রসার ঘটেছে।

জালালুদ্দীন তাব্রিজি, শাহ্ মাহীসওয়ার, শাহ্ মাখদুম, হযরত বদর শাহ্, শাহ্ জালাল এবং অন্যান্য সাধকেরা বাং লায় এসেছেন ইসলামের আলো নিয়ে এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। তাঁদের শিক্ষা ও সান্নিধ্যে স্থানীয়দের মধ্যে বড় একটি অংশ ধর্মান্তরিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের ভাষায়- "একদিকে মুসলিম সেনাপতি ও সৈন্যরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছেন, অন্যদিকে ঔলিয়া (আউলিয়া), দরবেশ ও আলিমগণ দলে দলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন।"[৩৫৩] এ সময়ে বাংলায় যে সমস্ত দরবেশ ও আলিম প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গৌড়ের আখী সিরাজুদ্দীন (মৃত- ১৩৫৭), পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হক (মৃত-১৩৯৮) নূর কুতুব-উল-আলম (মৃত-১৪১৬), হুগলীর ফুরফুরাহর শাহ্ আনওয়ার কুলী হলবী (মৃত-১৩৭৫), রংপুরের শাহ্ ইসমাঈল গাজী (হত্যা-১৪৭৪), খুলনার খান জাহান (মৃত-১৪৫৮), সোনার গাঁয়ের হাজী বাবা সালিহ (মৃত-১৫০৬), শ্রী হট্টের শাহজালাল(মৃত-১০৯৬), চট্টগ্রামের শাহ্ মুহসীন আউলিয়া (মৃত-১৩৯৭) এবং পীর বদর (ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন), গৌড়ে মৌলানা বরখুরদার ত্রিপুরার রাস্তী শাহ্ (১৩৫১ হতে ১৩৮৮), (মৃত-১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে), দেবকোটের মৌলানা আতা (১৩৫৫), রাজশাহীর মৌলানা শাহ্ দৌলা (জীবিত-১৫১৯), মুর্শিদাবাদে শাহ্ চাঁদ প্রকাশ দাদা পীর (১৪৯৩-১৫১৯), সপ্তগ্রামের সৈয়দ আমূলী (১৫৩১) প্রমুখ প্রধান।

চার. একদিকে ইসলামের উদারনৈতিক মনোভাব অন্যদিকে মুসলিম শাসকদের অসাম্প্রদায়িক নীতি বাংলা তথা ভারতে ইসলামকে ব্যাপক প্রসারতা দান করেছে। মুসলিম শাসকগণ উপমহাদেশে এসে বৈষয়িক জাহানদারী কায়েম করেছিলেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রজা পালনের মানসিকতা তাদের শাসনকালকে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ (১২০৪-১৭৫৭) বছরব্যাপী স্থায়ীত্ব দান করেছিল।

মুসলিমগণ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও বাংলায় দ্রুত বিস্তার লাভ করে, বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত আর্থিক নিগ্রহের স্বীকার পূর্ব বাংলায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই দ্রুত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পেছনে অনেকে ব্যাপক হারে ধর্মান্তরকরণকে দায়ী করলেও অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বাংলার মুসলমানদের দ্রুত জন্মহার। পশ্চিম বাংলায় মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলেও দ্বিতীয় প্রধান জনগোষ্ঠীর মর্যাদা অর্জন করে।[৩৫৪] বাঙালী, তুর্কি, আফগান, ইরানি, আরবি প্রভৃতি নানা জাতির নানা দেশের মুসলিমগণ মিলে বাংলায় এক অভিনব সংস্কৃতির জন্ম দেয়-এ সংস্কৃতি সম্প্রীতির, উদারতার, বৈচিত্রের ও স্বাতন্ত্রের।

---

৩৫৩ ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

৩৫৪ ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২

প্রথমত, বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে সম্প্রীতি ও উদারতার নিদর্শন স্বরূপ বলা যায়- বখতিয়ারের বাংলা বিজয় (১২০৪ খ্রী.) থেকে শুরু করে পলাশীর বিপর্যয় (১৭৫৭ খ্রী.) পর্যন্ত দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে শাসকের আসনে থেকেও এই জাতি বাংলার অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সাথে সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের অনন্য নজীর স্থাপন করেছিল। মাঝখানে বৃটিশদের ২০০ বছরের শাসনকালে Divide and Rule policy এর কারণে বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হলেও বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্ন পর্যায়ে মিলন প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বৃটিশরা চলে যাবার পর পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে ৪৭ ও ৭১ এর দূর্যোগময় পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনা ছাড়া বড় আকারে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা তেমন একটা হয় নি। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতেও বাংলদেশে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় ছিল। **দ্বিতীয়ত,** সম্প্রীতি ও উদারতার পাশাপাশি বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতির উল্লেযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈচিত্র্য।[৩৫৫] বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতি বাঙালী, ইরানী, তুর্কী, আরবীয়, আফগান প্রভৃতি নানা জাতির সংস্কৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় মিশ্র এক সংস্কৃতি। বাঙালী মুসলিমের পানাহার, বস্ত্র পরিধান, অতিথি আপ্যায়ন, আচার ব্যবহারের মধ্যে এ বিচিত্রতার প্রমাণ মেলে।

তৃতীয়ত, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলা ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করায় 'বাংলা' সুলতানী ও মোগল আমলের অধীনতা স্বীকার করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। সুলতান বা সম্রাট পূত্র থেকে শুরু করে যে প্রশাসকই বাংলায় এসেছেন তারা বাংলার এই ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বা প্রায় স্বাধীনভাবেই বাংলা শাসন করেছেন। বাংলার শাসকদের কেন্দ্রের প্রতি এই বিদ্রোহী মনোভাবের জন্যেই বাংলা 'বলগাকপুর' নামে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ হিসেবে ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী। আবহমানকাল থেকে এ দেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করে চলেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার সহাবস্থানের অপরূপ চিত্র আমাদের সমাজ জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।[৩৫৬] সুফি-সাধক, পীর-অলি ও গাউস-কুতুবদের পদভারে ধন্য হয়েছে এ ভূখণ্ড। জীবন সম্পর্কে তাঁদের নির্দেশনা, উপদেশ ও শিক্ষা এতদঞ্চলের মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত। সুফি-সাধক ও ইসলাম প্রচারকদের মূল শিক্ষাই ছিল উদারতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা,

---

৩৫৫ গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী সাধক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৩

৩৫৬ প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দীন, *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬ খ্রি, পৃ ১০৯

সর্বজনীন ভালোবাসা ও ত্যাগের মহিমা। বাংলার সমাজজীবনে সুফি ধর্মপ্রচারকদের এহেন শিক্ষার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এদেশের সবুজ-শ্যামল ও উর্বর ভূমিতে বসবাসরত জনমানুষ সুফি-সাধকদের ত্যাগ ও উদারতার আদর্শে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে আরও মায়াবী ও মানবিক হয়ে ওঠে।

৪. বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা

বাংলাদেশে ইসলাম চর্চার ইতিহাস একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ধারার ফল। অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীর দিকে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রাথমিক প্রচার শুরু হয়। তারা কেবল বাণিজ্যই করতেন না, বরং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন, সততা ও ন্যায্যতার মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামের মূল্যবোধ উপস্থাপন করতেন। পরবর্তীতে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সুফি সাধক ও আ-উলিয়ার আগমন ইসলামের প্রসারকে আরও বেগবান করে। তাদের ত্যাগ, ভক্তি, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং মানবপ্রেম স্থানীয় জনগণকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। বিশেষত হজরত শাহজালাল (রহ.), হজরত শাহ পরান (রহ.), খান জাহান আলী (রহ.) প্রমুখ আউলিয়া বাংলার সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেন। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে ইসলাম শিক্ষা, সাহিত্য, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির বি-কাশ ঘটে এবং একটি সুসংহত মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসনামলেও ইসলাম চর্চা থেমে থাকেনি; বরং মাদ্রাসা শিক্ষা, ওলামা ও সুফিদের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুশীলন চলতে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশের পর ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি পায় এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এভাবে বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আজও মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ, এদেশের সার্বিক কর্মকাণ্ড মুসলিমদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত। ইসলাম ধর্ম এদেশের সমাজ জীবনে অন্যতম প্রভাবক উপাদান হিসেবে কাজ করছে। ব্যক্তিজীবনে হতে শুরু করে একেবারে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও এদেশে ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আলোচ্য পাঠে বাংলাদেশের মানুষের নানা পর্যায়ে ইসলাম চর্চা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

৪.১ সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চা

সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চা বাংলাদেশি মুসলমানদের সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই ইসলামের নির্দেশনা ও প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। পরিবারিক জীবনে বিয়ে, দাম্পত্য সম্পর্ক, সন্তান লালন-পালন ও উত্তরাধিকার সব কিছুই ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সামাজিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সালাম বিনিময়, দুঃখ-সুখে সহযোগিতা, যাকাত, সদকা ও কুরবানি সমাজে পারস্পরিক সহানুভূতি ও

সমতার চর্চা গড়ে তোলে। ইসলাম মানুষকে সততা, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব, দয়া, করুণা ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়, যা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সহায়তা করে। ধর্মীয় উৎসব যেমন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা কেবল ধর্মীয় নয়, বরং সামাজিক সংহতি, পারিবারিক বন্ধন ও মানবিক মূল্যবোধকে আরও দৃঢ় করে। গ্রামীণ সমাজে মসজিদ শুধু নামাজের স্থান নয়, বরং শিক্ষাদান, পরামর্শ ও সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। শহুরে জীবনেও ইসলামি নৈতিকতা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দানশীলতার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এভাবে সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চা বাংলাদেশের মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে দৃঢ় করে তোলে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে তাই মানুষকে সকলের সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে হয়। এ সমাজ জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চাই সহযোগিতা ও সহাবস্থান। ইসলাম মানুষকে সামাজিক বিধি বিধান শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামের মতে, প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং সমাজে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে নিজ ভাইয়ের মত মনে করবে। তাঁর সাথে ভাল আচরণ করবে। তাঁকে কোনরূপ কষ্ট দেবে না। হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

'প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যা হাত ও মুখ (কথা ও কাজ) হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে'।[৩৫৭] অন্যদিকে ইসলাম অমুসলিমদের সাথেও সৌজন্যমূক ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। পারস্পরিক বিশ্বাস, সহাযোগিতা, কল্যাণ কামনা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থান ইসলাম ধর্মেরই মৌলিক শিক্ষা। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাই। এদেশের সমাজ নানা জাতি বর্ণ ও ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সুপ্রাচীন কাল হতেই এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান।[৩৫৮] সমাজের প্রতিটি মানুষ এখানে পরস্পরের সহযোগী। একের আনন্দ যেমন সকলে মিলে উপভোগ করে, তেমনি একের দুঃখ বেদনাও সকলে ভাগ করে নেয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সামাজিক সহাবস্থানের এরূপ বহু নজীর বিদ্যমান। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদাহরণ এদেশের ইতিহাসে বিরল। ইসলামের অনুপম আদর্শও তাই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা বাংলাদেশের অর্থনীতি সুদমুক্ত অর্থনীতি নয়। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আদর্শের অনুসারী তা বলা যায় না। তবে আধুনিক অর্থব্যবস্থার পাশাপাশি এদেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগও লক্ষণীয়। বিশেষ করে, ব্যাংক ও বীমা ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের অনুশীলনের চেষ্টা চলছে। আলিমগণের দ্বারা গঠিত শরী'আ বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ইসলামী

---

৩৫৭ ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-ঈমান (অধ্যায়: ঈমান), অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, হাদীস নং. ৯

৩৫৮ আহমদ শরীফ, *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

ব্যাংকিং ও বীমা প্রতিষ্ঠান বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে না হলেও ব্যাক্তি পর্যায়ে এদেশের ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার বাস্তবায়ণ দেখা যায়।[৩৫৯] যাকাত, উশর, দান-খয়রাত, ফিতরা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের অনুশীলন এদেশে লক্ষ্যনীয়। তাছাড়া মজুদদারী, কালোবাজারী, ওজনে কম দেয়া, প্রতারণা করা ইত্যাদি আর্থিক বিষয়াদিতেও মুসলিমগণ ইসলামী বিধান অনুসরণ করে থাকেন।

৪.২ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা একটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাস্তবতা। ইসলাম এ অঞ্চলের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার শুরু করে মুসলিম শাসনামল থেকেই, যখন শাসকেরা ন্যায়বিচার, দানশীলতা ও জনকল্যাণের নীতি অনুসারে প্রশাসন পরিচালনা করার চেষ্টা করতেন। মুঘল আমলে ইসলামি আইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার রাজনৈতিক শাসনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে মুসলিম পরিচয় রক্ষার আন্দোলন যেমন ফরায়েজি আন্দোলন, তৎকালীন রাজনৈতিক চেতনায় ইসলামের ভূমিকা সুদৃঢ় করে। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় ইসলাম একটি শক্তিশালী প্রেরণা হয়ে উঠেছিল, কারণ মুসলমানরা পৃথক রাজনৈতিক সত্ত্বার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথমে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি প্রাধান্য পেলেও পরবর্তী সময়ে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আধুনিক বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামি আইন, নৈতিকতা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের প্রয়োগের দাবি তোলে, অন্যদিকে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোও ভোটারদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলাম কেবল একটি ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং সামাজিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত একটি শক্তি হিসেবে চর্চা হয়ে আসছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অনেকটাই সুস্পষ্ট। অসংখ্য ইসলামী দলের অস্তিত্ব এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অন্যন্য রাজনৈতিক দলগুলোও ধর্ম বিশেষ করে ইসলামকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ইসলাম ধর্মবিরোধী কোন বিধি বিধান এদেশে প্রণীত হয়নি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা বহু মাত্রিক ও জটিল একটি বিষয়। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, পাকিস্তান আমলে ধর্মনির্ভর রাজনীতি প্রবল ছিল, তবে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসেবে স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ইসলামপন্থী দল যেমন জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন

---

৩৫৯ ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস প্রভৃতি সক্রিয় রয়েছে। এই দলগুলো ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, নৈতিক সমাজ ও ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম হওয়ায় সমাজ ও নৈতিক জীবনে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, ফলে রাজনৈতিক দলগুলোও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণাপত্রে ইসলামী মূল্যবোধ, মাদরাসা ও ওয়াকফ ব্যবস্থার সংস্কার, হজ ও জাকাত সংক্রান্ত কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয়ভাবে হজ ব্যবস্থাপনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জাকাত বোর্ড ইত্যাদির মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের প্রয়োগ সবসময় ইতিবাচক নয়; কখনো কখনো এটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয় যা "ইসলামের অপপ্রয়োগ" হিসেবে সমালোচিত। ইসলামপন্থী দলগুলোর মধ্যে মতভেদ ও ভাঙনের কারণে একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামী রাজনৈতিক শক্তি গড়ে ওঠেনি। নারীর অধিকার, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদ বিষয়ক বিরোধও লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া রাজনীতিতে ইসলামের উপস্থিতি কখনো নৈতিকতা, সততা ও জবাবদিহিতার দিকে জনগণকে আহ্বান জানায়। ইসলামী অর্থনীতি, হালাল শিল্প ও জাকাতভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনের মতো কার্যক্রমও রাজনৈতিক আলোচনায় এসেছে। সুতরাং, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিদ্যমান; এটি কখনো আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যও। তবে রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহারে এদেশে ইসলামের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করছে বলে মনে করা হয়।

৪.৩ শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা

বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা একটি প্রাচীন ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ইসলাম আগমনের পর থেকেই এ অঞ্চলে মসজিদ ও মক্তব শিক্ষার সূচনা হয়, যেখানে শিশুদের কোরআন তিলাওয়াত, হাদিস, ফিকহ ও প্রাথমিক ইসলামী জ্ঞান শেখানো হতো। মধ্যযুগে মাদ্রাসা শিক্ষা বিকশিত হয়ে ইসলামি দর্শন, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করে। ঔপনিবেশিক যুগে আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামি শিক্ষার সমন্বয় ঘটায়। বর্তমানে বাংলাদেশে দুটি মূল ধারার ইসলামি শিক্ষা চালু রয়েছে, কওমি ও আলিয়া। কওমি মাদ্রাসাগুলো ঐতিহ্যবাহী দারস-ই-নিজামী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, আর আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামি শিক্ষা ও আধুনিক সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় থাকে। পাশাপাশি সাধারণ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও ইসলাম শিক্ষা একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতিতে সহায়তা করে। ইসলামি শিক্ষা বাংলাদেশের মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে, যা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

আসছে। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা অর্জনের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ রয়েছে। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই একাধিক মাধ্যমের শিক্ষা প্রচলিত। যেমন- সাধারণ মাধ্যম, মাদ্রাসা মাধ্যম, ইংরেজী মাধ্যম, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি। ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে এদেশের সাধারণ শিক্ষা মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি শ্রেণীতেই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি স্নাতক স্নাতকোত্তর ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা অর্জনের অবাধ সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলোর ন্যায় ইসলাম বিষয়েও এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকতর শিক্ষা প্রদান করা হয়। [৩৬০]

ইসলামী শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মাদ্রাসা মাধ্যমে শিক্ষার ভূমিকা অতুলনীয়। কওমী মাদ্রাসা মূলত সমাজের মানুষের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত শিক্ষা পদ্ধতি। এখানে বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামী নানা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। পবিত্র কুর'আনের হিফয বা মুখস্থকরণ বিদ্যা এ শিক্ষা মাধ্যমের প্রধানতম আবদান। এছাড়া কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদির উপর এ মাধ্যমে বিশেষ দৃষ্টি দেয় হয়। বর্তমানে এগুলোর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদিও এ মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। মাদ্রাসা পদ্ধতির অন্যতম একটি শিক্ষা মাধ্যম হলো আলিয়া মাদ্রাসা। এটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং নির্ধারিত সিলেবাস ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত। এ শিক্ষা মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি পার্থিব নানা বিষয় যথা- অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও জোর দেয়া হয়। মূলত এ শিক্ষা পদ্ধতিতে বর্তমান কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীগণ সহজেই বর্তমানের নানা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং সাথে সাথে পূর্ণাঙ্গ দীন ইসলামে প্রদত্ত সমাধান সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে পারে। এতদ্ব্যতীত বর্তমানে বাংলাদেশে ক্যাডেট মাদ্রাসা, ইংরেজী মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাদিও চালু রয়েছে। ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামী জ্ঞানের অনুশীলনও এদেশে সম্ভবপর হচ্ছে।

৪.৪ সুফী দর্শনের প্রভাব

বাংলাদেশে সুফী দর্শনের প্রভাব বহুমাত্রিক এবং সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মচর্চা ও রাজনৈতিক চেতনায় গভীরভাবে প্রতিফলিত। ইসলামের প্রারম্ভিক বিস্তারে সুফী সাধক ও আউলিয়াদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা কঠোর জ্ঞান বিতরণকারী হিসেবে নয়, বরং ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও মানবকল্যাণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেন। হজরত শাহজালাল (রহ.), হজরত শাহ পরান (রহ.), খান জাহান আলী (রহ.) প্রমুখ সুফি সাধক কেবল ধর্মীয় প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং কৃষি উন্নয়ন, বসতি স্থাপন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাদের

---

৩৬০ গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩

জীবনাদর্শে ত্যাগ, ধৈর্য, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

সুফী দর্শনের ফলে বাংলার সমাজে সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, আন্তঃসম্পর্কের উন্নতি ও আধ্যাত্মিক চর্চার প্রসার ঘটে। কবিতা, সঙ্গীত ও সাহিত্যেও সুফী চিন্তার প্রভাব সুস্পষ্ট; লালন শাহ, হাছন রাজা প্রমুখ বাউল-সাধকরা সুফি ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানবপ্রেম ও বিশ্বজনীনতার বার্তা প্রচার করেছেন। রাজনৈতিক দিক থেকেও সুফিদের প্রভাব ছিল; তারা সাধারণ মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগ্রত করতে এবং সামাজিক সংস্কার গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করেছেন।[৩৬১]

আজও সুফী খানকাহ, দরগাহ ও আধ্যাত্মিক আসরসমূহে মানুষ আত্মশুদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতির সন্ধান করে। এভাবে সুফী দর্শন বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে মানবিকতা, সহনশীলতা ও আল্লাহভক্তির এক গভীর ভিত্তি স্থাপন করেছে। ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশে আবহমান কাল থেকে সূফী ঐতিহ্য ধারনকৃত এক পুতঃপবিত্র দেশ। বাংলাদেশে যত সূফী দরবেশদের আগমন হয়েছে বিশ্বের ইতিহাসে অন্য কোন দেশ নেই। সূফী গবেষকদের মতে বহিরাগত সূফী সাধক ছারাও আমাদের দেশে অনেক আগথেকেই সূফী সাধনা শুরু হয়। ইখতিয়ার মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বংঙ্গ বিজয় এর পরে পশ্চিমা দেশ থেকে বহু সূফী দরবেশ এর আগমন ঘটে। মুসলিম বনিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ইসলামের সূচনা হয় এবং প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে হক্কানী আউলিয়া ও সুফি সাধকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে।[৩৬২] আরব, ইয়েমেন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে আলেম ও সুফীগণ বাংলায় আগমন করেন। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তারা এক অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। তাঁদের চারিত্রিক মাধুর্যে উজ্জীবিত হয়ে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। সূফী সাধক হক্কানী আউলিয়াকেরামগনই বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের ও তৌহিদের বানী নয়ে আসেন। স্বাভাবিক কারণেই তৎকালীন হিন্দু ও অন্য শাসকবর্গ ইসলাম প্রচারকদের উপর ক্ষেপে উঠেন এবং সুফীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকেন। কাজেই প্রচার কাজে নিয়োজিত সুফীগণ ও তাদের শিষ্যদের সমভিব্যাহারে সমস্ত রাজাদের বিরুদ্ধে অসি চালনা করতে হয়েছিল। এ ময়দানে অনেকে শহীদ গাজী হয়েছেন। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পূর্বে যে সকল সুফীগণ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন-

---

৩৬১ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৯,পৃ. ১৩,২৪

৩৬২ গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী

বাঙ্গালার সুবাদার শাহসুজার সনদপত্রে উল্লেখিত হয়েছে যে, শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী ১০৫৩ সালে তাঁর মুর্শিদ সৈয়দ শাহ সুখখুল আনাতিয়াসহ ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে আসেন। মদনপুরেই তাঁর মাজার বিদ্যমান।

শাহ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ার

তিনি প্রথমে ঢাকার হরিরামপুর নগর এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে ইসলাম প্রচার করেন। মৎস্যাকৃতি নৌকায় সমুদ্রপথে বাংলায় আগমন করার কারণে তিনি মাহী সাওয়ার ওলী নামে খ্যাত।

বাবা আদম শহীদ

রাজা বল্লাল সেনের শাসনামলে (১১৫৮-৭৯) তিনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার আব্দুল্লাহপুর গ্রামে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। যুদ্ধে তিনি শহীদ হন এবং এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত।

মাখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ

ইয়ামেনের অধিবাসী মাখদুম শাহ দৌলা এক বোন, তিন ভাগিনা ও বহু শিষ্যসহ পাবনা জেলার শাহজাদপুর অঞ্চলে আগমন করেন। ইসলাম প্রচারের এক পর্যায়ে স্থানীয় হিন্দু রাজার সাথে এ দরবেশের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মাখদুম শাহসহ ২১ জন মুজাহিদ শহীদ হন। [৩৬৩] এরপর সমগ্র বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

সৈয়দ নাসিরউদ্দীন শাহ্ আউলিয়া

তিনি দিনাজপুর জেলার প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক। ওই অঞ্চলে তিনি সৈয়দ নেকমদ'বা নেকবাবা বলে পরিচিত।

জালালুদ্দীন তাবরিজী

পারস্যের তাবরিজ নগরে জন্মগ্রহণকারী জালালুদ্দীন তাবরিজী সুলতান গিয়াস উদ্দীন খিলজীর শাসনামলে তৎকালীন বাংলার রাজধানী মালদহ জেলার লাখনৌতি নগরে উপনীত হন এবং রাজধানী থেকে ১৭ মাইল দূরে পান্ডুয়ায় আস্তানা স্থাপন করেন। বাংলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধসমাজ তাঁর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।[৩৬৪]

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে আরো যে সকল সুফী এদেশে আগমন করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মাখদুম শাহ, গজনবী, বায়েজীদ বোস্তামী, শায়খ ফরিদ উদ্দীন শকরগঞ্জ প্রমুখ।

---

৩৬৩ গোলাম সাকলায়েন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

৩৬৪ কাজী আবদুল ওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৬

মুসলিম বিজয়ের পর যে সকল সুফী-আলেমগণ ইসলাম প্রচারের জন্য এদেশে আগমন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা

বুখারার অধিবাসী সুফী শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বিহারের মানের হয়ে বাংলার সোনারগাঁও আসেন সুলতান বুগরাখান ও সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউসের শাসনামলে। তিনিই প্রথম এদেশে বোখারী শরীফ নিয়ে আসেন। সোনারগাঁও-এ তিনি ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৩০০ সালে ইন্তেকালের পর সোনারগাঁও-এ তিনি সমাধিস্থ হন।

হজরত শাহাজালাল ইয়ামেনী (রহ.)

পূর্ববাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রধান পথিকৃত এই সনামধন্য সুফী দরবেশ ১৩০৩ সালে রাজা গৌড়গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অধিকার করেন। এই যুদ্ধে তাঁর সিপাহসালার ছিলেন সৈয়দ নাসির উদ্দীন। হজরত শাহাজালাল ইয়ামেনী (রহ.)- আনুমানিক ১৩৪৭ সালে সিলেটেই ইন্তেকাল করেন। বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতা বলেন, বাংলার অধিকাংশ লোক তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সিলেটে তাঁর মাজার অবস্থিত।

হযরত শাহ আলী বাগদাদী শাহআলী বাগদাদী (রহ.)

তিনি বাংলায় আসেন ১৪৮৯ সালে। দিল্লী হয়ে প্রথমে তিনি ফরিদপুর আসেন। পরে তিনি ঢাকার আশে-পাশে ইসলাম প্রচার করেন। ঢাকার মিরপুরে তাঁর মাজার রয়েছে।[৩৬৫]

হযরত শাহ্ আহসান উল্লাহ্ (রহ.)- ঢাকা জিলার নারিন্দায় এই সূফী সাধকের দরবার ও মাজার। হযরতের পূর্ব পুরুষ আরব থেকে দিল্লিতে আসেন এবং একটি গোত্র বাংলাদেশের সোনারগাও এ বসতী স্থাপন করেন। হযরত শাহ্ আহসান উল্লাহ্ (রহ.) ১২১১ বাংলা ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত খাজা লশকর (রহ.), কালিম শাহ্ বোহদাদী (রহ.)এর কাছ থেকে বেলায়েতের সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাসাউফ শিক্ষার পাশাপাশি একজন সমাজ সেবক ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত আহ্সানিয়া মিশন আজ পর্যন্ত দেশ বিদেশে বহু সুনাম অর্জন করেছে। আহসানিয়া মিশন দেশে- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, মাদরাসা, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল সহ বিভিন্ন সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে।

শেখ নূর কুতুবুল আলম

তিনি ছিলেন বাংলার ইলিয়াছশাহী বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজমশাহের সহপাঠী। তিনি তৎকালীন অবৈধ,কুখ্যাত রাজা গণেশের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন।[৩৬৬]

---

৩৬৫ আ.ন.ম বজলুর রশিদ, *আমাদের সুফী সাধক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ১২৪

খাজা খানজাহান আলী

সর্বজনমান্য দরবেশ হিসেবে সুপরিচিত খানজাহান আলীই দক্ষিণ বঙ্গজয়ের কৃতিত্বের অধিকারী। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামলে তিনি দক্ষিণবঙ্গ জয় করেন। এই দরবেশ শাসনকর্তা বাগেরহাট শহর নির্মাণ করেন, এবং ঐ অঞ্চলের নামকরণ করেন খলিফতাবাদ, বহু রাস্তা, দীঘি, মসজিদ, শিক্ষালয় এবং বাগেরহাটের ষাট গুম্বুজ মসজিদ তিনিই নির্মাণ করেন।

মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক ১৮৪১ সালে কলকাতার হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সুফী ফতেহ আলীর নিকট তিনি বয়াত গ্রহণ করেন। মাওলানা আবুবকরের সংস্কার ছিল বহুমুখী ও গঠনমূলক।

মাওলানা নেছার উদ্দীন

বরিশালের বর্তমান পিরোজপুর জেলার ছারছীনা গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি ফুরফুরার আবু বকর সিদ্দিকের শিষ্য ছিলেন। বাংলায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৬৭]

হযরত ফকির আদু শাহ্ আউলিয়া (রহ.)

নেছারাবাদ থানার পাটিকেলবাড়ী গ্রামে ২০০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। সাধনার জগতে সকল স্তরএ উত্তীর্ন এই সাধক আবদাল শ্রেণীর আউলীয়া ছিলেন। তিনি দয়াল নবী (স.) সত্য তরিকত এর শিক্ষা দেয়ার জন্য পাটিকেলবাড়ী গ্রামে একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন যা আজ পাটিকেলবাড়ী দরগাহ্ শরীফ ইসলামীক কমপ্লেক্স।[৩৯]

এখানে আছে সেচ্ছা সেবক সংগঠন, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও স্থায়ী পুলিশ ফারি। ফকির সাহেবের পঞ্চম বংশধর ফকির মোঃ নাসির উদ্দিন সাহেব বর্তমান দরবার এর মোতাওয়াল্লী এবং তিনি ১৯৭৭ ইং সন থেকে দরবার সংস্কার কার্য শুরু করেন। দরবাবেরর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ফকির নাসির সাহেব এর প্রতিষ্ঠত। হযরত খাজা ইউনুস আলী নক্শবন্দী মোজাদ্দাদী (রহ.) এনায়েতপুরী- বাংলাদেশের অন্যতম সূফী সাধক এই পীর সাহেব বাংলা ১২৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হক্কানী সহী সূফী সাধক নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ আউলিয়াছিলেন। বাংলাদেশের বড় ধরনের প্রায় সকল দরবারের সূফী গন তার মূরীদ ছিলেন এবং তার দরবার থেকে সূফী সাধনা করতেন। পাবনা জেলার বিশ্ব শান্তির মঞ্জিল (এনায়েতপুর দরবার শরীফ) তার প্রতিষ্ঠিত দেশের অন্য তম বৃহৎ ইসলামীক কম্পেক্স।

---

৩৬৬ আব্দুল্লাহ আল আমিন, *বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বই বাজার, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১২৪

৩৬৭ শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১২৪

হযরত খাজা হাসমত উল্লাহ্ নক্শবন্দী মোজাদ্দদী (রহ.) ফরিদপুরী- আধুনিক কালের জজ্বুল কলব্ কামেল আউলিয়াদের মধ্যে হযরত শাহ্ সূফী খাজা ফরিদপুরী (রহ.) সাহেবর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেযোগ্য। হযরত খাজা এনায়েতপুরী (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ সাধনার পরে কামালিয়াতের সর্বোচ্চ স্তর হাসিল করেন এবং ফরিদপুরের আটরশীতে বিশ্ব জাকের মঞ্জিল- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামিক কম্প্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোটি কোটি মুরিদ সন্তান কে সঠিক ইসলাম ও দয়াল নবী (স.) এর সত্য তরীকা প্রচার করতেন। তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক ১৮৪১ সালে কলকাতার হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সুফী ফতেহ আলীর নিকট তিনি বয়াত গ্রহণ করেন। মাওলানা আবুবকরের সংস্কার ছিল বহুমুখী ও গঠনমূলক।

মাওলানা সৈয়দ এছহাক বরিশালের চরমোনাইতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চরমোনাইতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত চরমোনাইতে বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী সম্মেলন অুনষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া আরো রয়েছেন, সৈয়দ জালালুদ্দীন বুখারী, তিনি ইসলাম প্রচার করেন রংপুর জেলার মাহীগঞ্জে। ৪০ জন ইসলাম প্রচারকের একটি দল দিনাজপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন, যাদেরকে চিহিল গাজী বলা হতো।

সায়্যিদ আব্বাস আলী মক্কী, শাহ সুফী শহীদ, শায়খ আব্দুল্লাহ কিরমানী, মাওলানা তাকিউদ্দীন আরাবী, শাহতুর্কান শহীদ, পীর বদর আলম, শেখ রোজা বিয়াবানী, আখি সিরাজউদ্দীন উসমান, শেখ আলাউল হক, শাহ আফজল মাহম্মুদ শায়খ জালাল হালবী, শাহ সুলতান আনসারী, শাহ চাঁদ আওলিয়া।[৩৬৮] মাওলানা সামছুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, মাও. আতাহার আলী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মাও. তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

৪.৫ ইসলামী শাসকদের প্রভাব

বাংলাদেশে ইসলামী শাসকদের প্রভাব রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে পতিফলিত হয়েছে। মুসলিম শাসনামলে বিশেষ করে সুলতানি যুগ (১৩শ থেকে ১৬শ শতক) ও মুঘল যুগে (১৬শ থেকে ১৮শ শতক) ইসলামি সভ্যতা ও ঐতিহ্যের গভীর ছাপ রয়ে গেছে। শাসকেরা শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থাই গড়ে তোলেননি, বরং মসজিদ, মাদ্রাসা, সড়ক, সেতু ও নগরায়ণের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও তাঁদের ব্যক্তিগত অবদানের স্মৃতি ধরে রাখতেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নামকরণ হয়েছে। যেমন, ঢাকার ইতিহাস মুঘল সুবাদার ইসলাম

---

৩৬৮ আব্দুল্লাহ আল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

খান চিশতীর (শাসনকাল: ১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি সুবাদার হিসেবে রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং শহরের নামকরণ করেন "জাহাঙ্গীরনগর" (মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে), যা পরবর্তীতে ঢাকা নামে পরিচিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের নামেও মুসলিম শাসকদের প্রভাব রয়েছে। যেমন, যশোর নামকরণ করা হয় মুঘল আমলের প্রশাসনিক কেন্দ্র "যশোহর" থেকে; মুন্সীগঞ্জ নামকরণ করা হয় স্থানীয় মুসলিম মুন্সিদের নামানুসারে; বগুড়া জেলার নাম-করণ হয় দিল্লির সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের শাসনকালে গভর্নর নাসিরউদ্দীন বুগরা খানের নাম থেকে।[৩৬৯] এছাড়া সোনারগাঁও সুলতানি আমলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল, যার নামকরণ ইসলামী শাসনামলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। এসব নামকরণ শুধু ভৌগোলিক পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং ইসলামি শাসকদের রাজনৈতিক প্রভাব, সাংস্কৃতিক অবদান এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিকে আজও জীবন্ত করে রেখেছে। শাসকেরা তাদের শাসনকে সুসংহত করতে শহর ও অঞ্চল গড়ে তোলেন, যেগুলোর নাম অনেক সময় তাঁদের নিজের নাম, উপাধি বা কোনো ধর্মীয় প্রতীক অনুসারে রাখা হয়। এর ফলে আজও বাংলাদেশের ভৌগোলিক নামকরণে ইসলামী ইতিহাসের ছাপ বিদ্যমান।

ক. ঢাকা ও তার আশপাশ

ইতিহাসবিদদের মতে, ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিশতী ঢাকা শহরকে রাজধানী করার পর এটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। ঢাকার নামকরণের পেছনে বিভিন্ন তত্ত্ব আছে; কেউ বলেন ঢাকেশ্বরী মন্দির ও ঢাক বাজানোর প্রথা থেকে এসেছে, আবার কেউ বলেন, ইসলাম খান চিশতীর নামের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ইসলামপুর

ইসলাম খান চিশতীর আমলকালে শহরের অংশ হিসেবে উন্নত এলাকা। ইসলামপুর ঢাকার একটি ঐতিহাসিক এলাকা, যার নামকরণ সরাসরি মুসলিম শাসক ইসলাম খান চিশতী-এর নামানুসারে। ইসলাম খান চিশতী ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল আমলে ঢাকার সুবাহ বাংলার সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হন। তার শাসনামলে ঢাকা শহর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বি-কশিত হয়। ইসলামপুর মূলত তখনকার সময়ে সুবাদার ও তার প্রশাসনের জন্য গড়ে তোলা একটি আবাসিক ও প্রশাসনিক এলাকা ছিল।

---

৩৬৯ আবুল কালাম মো. যাকারিয়া, *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ১৭৬

মোহাম্মদপুর

মুঘল আমলে কোনো মুসলিম জমিদার বা প্রশাসক মোহাম্মদ কাত্তলার নামে নামকরণ। ঢাকার মোহাম্মাদপুর এলাকার রোডের নামকরণ মূলত ইসলামী শাসক, সুফি সাধক এবং মুসলিম ইতিহাসের ব্যক্তিত্বদের স্মরণে করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, তাজমহল রোড মূলত মুঘল স্থাপত্য ও ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে, যদিও সরাসরি ভারতের তাজমহলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বাবর রোড নামকরণ করা হয়েছে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের নামে, যিনি ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আকবর রোড আযম মুঘল সম্রাট আকবর (র.)-এর নামানুসারে, যিনি ন্যায়পরায়ণ শাসন ও ধর্মীয় সহনশীলতার জন্য বিখ্যাত।[৩৭০] এছাড়া, শেরশাহসুরি রোড শের শাহ সুরির নামে নামকরণ, যিনি দক্ষ প্রশাসন ও সড়ক নির্মাণের জন্য পরিচিত ছিলেন। এই নামকরণগুলো মোহাম্মাদপুরে ইসলামী শাসন ও ইতিহাসের স্মৃতি ধরে রাখার পাশাপাশি স্থানীয়দের মধ্যে ঐতিহাসিক সচেতনতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ভূমিকা রাখে। ফলে, মোহাম্মাদপুরের রোডের নামগুলো কেবল নির্দেশিকা বা ঠিকানার অংশ নয়, বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে মানুষের সংযোগের প্রতীক।

লালবাগ

মুঘল সুবাদার মুহাম্মদ আজম শাহ নির্মিত অসমাপ্ত লালবাগ কেল্লার নামে এলাকা পরিচিত। লালবাগ ঢাকার একটি ঐতিহাসিক এলাকা, যা মূলত মুঘল আমলের সুবাদার মুহাম্মদ আজম শাহ-এর সময় গড়ে উঠেছিল। এলাকা ও এর কেন্দ্রে নির্মিত লালবাগ কেল্লা ১৭শ শতাব্দীর মুঘল স্থাপত্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। কেল্লাটি মূলত প্রশাসনিক কেন্দ্র ও দুর্গ হিসেবে পরিকল্পিত হলেও অসমাপ্ত থাকার কারণে আজ এটি শুধু ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবেই পরিচিত।

লালবাগ কেল্লার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থাপত্য যেমন মসজিদ, দরবারহল, পানিধার ব্যবস্থা ইত্যাদি এলাকা ও শহরের প্রশাসনিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এলাকা নামকরণের কারণের মধ্যে লালবাগ কেল্লার লাল রঙের ইট ব্যবহারকে অন্যতম হিসেবে ধরা হয়।

বর্তমানে লালবাগ এলাকা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নয়, বরং আবাসিক ও বাণিজ্যিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, হাসপাতাল এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো বসবাস ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। লালবাগের নামকরণ ও ইতিহাস ঢাকার মুঘল আমলের প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও ইসলামী প্রভাবের এক স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে আজও সমৃদ্ধ।

---

৩৭০ আবুল কালাম মো. যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১২৩

হোসেনি দালান

শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাসনালয়ের জন্য নির্মিত, ইমাম হোসেন (রা.)-এর স্মরণে নামকরণ। ঢাকার হোসেনি দালান একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি স্থাপত্য, যা মূলত শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। এটি ইমাম হোসেন (রা.)-এর স্মরণে নির্মিত হয় এবং বিশেষত মহররমের সময় শিয়া সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, জুলুস ও মজলিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। হোসেনি দালানের স্থাপত্যে মুঘল যুগের ছাপ দেখা যায়; প্রাচীর ও গম্বুজের নকশা, বারান্দা ও প্রবেশপথগুলো ঐতিহাসিক সৌন্দর্যের সাথে ধর্মীয় গুরুত্বকে মিলিত করে। এটি কেবল ধর্মীয় স্থান নয়, বরং ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও একটি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। হোসেনি দালান এলাকায় মানুষকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সুযোগ দেয়, সামাজিক ঐক্য দৃঢ় করে এবং ধর্মীয় অনুশীলনের সঙ্গে ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। এইভাবে হোসেনি দালান ঢাকার ইতিহাসে শিয়া মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপস্থিতির এক সুস্পষ্ট নিদর্শন।

মীরপুর

স্থানীয় মীর পরিবার বা প্রশাসক মীরের নামানুসারে। ঢাকার মীরপুর এলাকা একটি পুরোনো ও পরিচিত আবাসিক ও বাণিজ্যিক অঞ্চল, যার নামকরণ সম্ভবত স্থানীয় মীর পরিবার বা কোনো মুসলিম প্রশাসক/জমিদার-এর নামে করা হয়েছে। মীরপুরের ইতিহাস মূলত মুঘল আমল থেকে শুরু, যখন ঢাকা শহর প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হচ্ছিল। মীরপুর এলাকা কেবল আবাসিক নয়, বরং ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্র ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এখানে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থাকার কারণে স্থানীয় জনগণ ধর্মীয় চর্চা ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। আধুনিক সময়ে মীরপুর ঢাকা শহরের সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও সরকারি অফিস স্থাপনের জন্য পরিচিত। মীরপুরের নাম ও ইতিহাস ঢাকার ইসলামী শাসনামল এবং স্থানীয় মুসলিম সমাজের প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

খ. সিলেট অঞ্চলে

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শাহজালাল এলাকা: সুফি সাধক হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামে। ১৪শ শতাব্দীতে তিনি সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। সিলেট বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক ও ইসলামী ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে ইসলামের প্রসার মূলত সুফি সাধক হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাধ্যমে ১৪শ শতাব্দীতে শুরু হয়। তিনি স্থানীয় জনগণকে শান্তিপূর্ণ জীবন, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তার প্রচেষ্টার ফলে সিলেট ও আশপাশের অঞ্চল ধর্মীয়ভাবে সমৃদ্ধ ও ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সিলেটের নামকরণ ও স্থানীয় এলাকা অনেকাংশে এই সুফি ও ইসলামিক শাসকদের স্মরণে করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শহরের শাহজালাল এলাকা হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, শাহপরান এলাকা তার ভ্রাতৃসুলভ ও শিষ্য সুফি শাহপরান (রহ.)-এর নামে পরিচিত। মৌলভীবাজারের কিছু এলাকা ও মসজিদ-খানকাহও স্থানীয় সুফি সাধক ও মুসলিম শাসকদের নামে নামকৃত।

সিলেটের সুফি স্থাপত্য যেমন মাজার, খানকাহ ও মসজিদ কেবল আধ্যাত্মিক কেন্দ্র নয়, বরং স্থানীয় সমাজে শিক্ষা, সহমর্মিতা, মানবিকতা ও সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুফিদের আধ্যাত্মিক আদর্শ ভ্রাতৃত্ব, ধৈর্য, সহনশীলতা ও আল্লাহভক্তি এখানকার মানুষকে সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে প্রভাবিত করেছে।[৩৭১] আজও সিলেট অঞ্চলের জনগণ আধ্যাত্মিক চর্চা, ধর্মীয় উৎসব এবং ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে, যা স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

গ. বাগেরহাট ও খুলনা অঞ্চলে

বাগেরহাট ও খুলনা অঞ্চল বাংলাদেশের ইসলামী ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বিশেষত বাগেরহাট তার সুপরিচিত স্থাপত্য, মসজিদ ও সুফি প্রভাবের জন্য পরিচিত। ১৫শ শতাব্দীতে সুফি সাধক ও মুসলিম শাসক খানজাহান আলী (রহ.) এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি স্থানীয় জনগণকে ন্যায়পরায়ণতা, মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাগেরহাটে বিভিন্ন শহর, নদী বাঁধ, মসজিদ ও সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে। আজও খানজাহান আলী মাজার এবং সংলগ্ন এলাকা মুসলমানদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

খুলনা অঞ্চলেও মুসলিম শাসক ও সুফিদের প্রভাব দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানীয় মসজিদ, মাদ্রাসা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ইসলামী শাসকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া বাগেরহাট ও খুলনার অনেক গ্রাম ও এলাকা সুফি সাধক বা ইসলামী শাসকদের নামে নামকরণ করা হয়েছে, যা স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই অঞ্চলগুলোতে ইসলাম চর্চা কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, শিক্ষার প্রসার, মানবিক মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে বাগেরহাট ও খুলনা অঞ্চলের নামকরণ ও ইসলামিক স্থাপত্য স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

---

৩৭১ আব্দুল্লাহ আল আমিন, *প্রাগুক্ত*, ঢাকা: বই বাজার, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১৫৬

ঘ. বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও স্থানে ইসলামী প্রভাব ও নামকরণ

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা ও স্থানে ইসলামী শাসক, সুফি সাধক এবং মুসলিম প্রশাসকদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, সেতু ও রাস্তার নাম ইসলামী ঐতিহ্য ও শাসকদের স্মরণে রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রাজশাহী অঞ্চলে মুঘল আমলের সুফি ও প্রশাসকের নামানুসারে স্থানীয় গ্রাম ও বাজারের নামকরণ হয়েছে। যশোরে সুফি সাধক ও স্থানীয় ইসলামী নেতাদের নামে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ দেখা যায়। দিনাজপুর, নওগাঁ ও বগুড়া অঞ্চলেও মুসলিম শাসকদের নাম অনুসারে স্থানীয় এলাকা ও রোডের নামকরণ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে, মুঘল আমল এবং স্থানীয় মুসলিম শাসকদের প্রশাসনিক কার্যক্রম এলাকার ভৌগোলিক ও সামাজিক বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন গ্রাম, চর, বাজার ও নদীপথ সুফি ও ইসলামি শাসকদের নাম অনুসারে পরিচিত হয়েছে। এছাড়া, মাদ্রাসা, মসজিদ ও দরবারের নামকরণ স্থানীয় জনগণকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছে। ফলে দেশের প্রত্যেক জেলার স্থানীয় নামকরণ কেবল ভৌগোলিক নির্দেশনা নয়, বরং ইসলামের সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের এই বিস্তৃত নামকরণ ও স্থাপত্যিক ঐতিহ্য প্রমাণ করে যে, ইসলামী শাসন ও সুফি চর্চা কেবল ধর্মীয় দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও প্রশাসনের উন্নয়নে এটি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

এসব নামকরণের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়: শাসক বা প্রশাসকের নামানুসারে: ইসলামপুর, মোহাম্মদপুর, মীরপুর। সুফি বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তির নামে: শাহজালাল, শাহপরান, খানজাহান আলী এলাকা। ইসলামী উপাধি বা ধর্মীয় প্রতীক অনুসারে: হোসেনি দালান, জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকা। এই নামকরণ কেবল ভূগোল নয়, স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সমাজে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসকেও চিহ্নিত করে।

৪.৬ মুসলিমদের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে সূফী আলিমগণ কোনো রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেননি। বরং তাঁদের ইসলাম প্রচার পরবর্তীকালে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠায় সহজোগী শক্তির কাজ করেছিল। শাহ সুলতান বলখী মাহীসওয়ার, যার আসল নাম মীর সাইয়্যেদ সুলতান মাহমুদ মাহিসওয়ার প্রথমে ঢাকা জেলার হরিরাম নগরে এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে ইসলাম প্রচার করেন। একাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ দেশে আগমনকারী ইসলাম প্রচারকগণের মধ্যে সূফীগণ প্রত্যক্ষভাবে আদর্শ ইসলামী চরিত্রের অধিকারী

ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাদের চারিত্রিক মাধুর্য্যতায় আকৃষ্ট হয়ে বহু বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ষোড়শ শতকে লিখিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে সূফীগণ ও শাসক সমাজের সহায়তায় বাংলায় যে মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে তার বৈশিষ্ট্যের একটি চিত্র পাওয়া যায়,[৩৭২]

ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নামাজ।
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁঝ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিত কেতাব কোরান ।
কেহবা বসিয়া হাটে পীরের শীরিনি বাটে
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান ॥
বড়ই দানিশ বন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।
যার দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া চেলার মারে বাড়ি॥
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দৃঢ় করি॥
আপন টোপর নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত॥[৩৭৩]

---

৩৭২ ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রগুক্ত, পৃ. ১২৪

৩৭৩ কবি তাঁর কাব্যে কালকেতুর রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের যে মুসলমান বসতির কথা বর্ণনা করেছিলেন, সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল-'হাসন হাটি'। কাব্যটিতে গভীর কৌতূহলী দৃষ্টিতে তিনি তাঁদের জীবনযাত্রার চমৎকার চিত্র বিস্তৃত পরিসরে এঁকে গিয়েছেন। কাব্যেফজরে মুসলমানদের গাত্রোত্থান, পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ পড়ন, সোলেমানি তছবিহ জপ করা, পীরনবীর উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো, মাজারে নিশান ওড়ানো, বাতি জ্বালানো, সিরনি পাক করে সাধারণ লোকদের খাওয়ানো - এসব বর্ণনা তো কবি দিয়েছেনই, উপরন্তু তাঁদের দাড়ি-টুপি ও বসন-ভূষণের কথা, খাওয়া-দাওয়ার কথা, রোজা রাখবার কথা, বিবাহের কথা, মুরগি-বকরি জবাইয়ের কথা, শিশুদের মক্তবে কোরান পড়ানোর কথা প্রভৃতিও কবি যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। তখনকার শ্রমজীবী মুসলমানদের তথ্যও কবি বিস্তারিতভাবে তাঁর কাব্যে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন বলে দেখা যায়। তৎকালীন বাংলার মুসলমান সমাজে অশিক্ষিত বেনামাজিরা কবির কাব্যে হয়েছেন-'গোলা', সুতোর মাজনন্দাররা হয়েছেন-'জোলা', গরুর গাড়িতে ধান বহনকারীরা হয়েছেন-'মুগরি', পিঠাবিক্রয়কারীরা হয়েছেন-'পিঠাহারি', মৎস্যবিক্রয়কারীরা হয়েছেন-'কাবাড়ি', ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা হয়েছেন-'গরসাল' বা 'সানা', বা তাঁতযন্ত্রের ব্যবসায়ীরা হয়েছেন-'সানাকর', তীর নির্মাণকারীরা হয়েছেন-'তীরকর', কাগজ প্রস্তুতকারীরা

ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায় ত্রয়োদশ শতকের শেষ থেকে চতুর্দশ শতকের শেষ অবধি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায় পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু হয়ে সপ্তদশ শতকের শেষ অবধি পর্যন্ত তিনশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। ইসলাম প্রচারের পর মুসলমানদের মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা তাদের জীবনধারা, আচার-আচরণ এবং সামাজিক সম্পর্ককে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। মুসলমানরা পাঁচটি মূল ইবাদত-নামাজ, রোজা, জাকাত এবং হজ মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের অনুগত্য প্রকাশ করে। তারা সত্যনিষ্ঠা, সততা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং সামাজিকভাবে দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হয়, বিশেষ করে দুর্বল ও অভাবী মানুষের প্রতি। পোশাক ও সাজ-সজ্জায় শালীনতা বজায় রাখে, যা তাদের আত্মসংযম এবং মর্যাদার প্রতিফলন। এছাড়াও মুসলমানরা পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে গুরুত্ব দেয় এবং পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের বোধ রাখে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়ে মুসলমান সমাজকে একটি সুসংগঠিত, নৈতিক ও ধর্মানুগামী সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিফলিত করে। উপমহাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে নৈতিক নিয়ম, পবিত্রতা এবং ধর্মীয় দৃঢ়তা শ্রদ্ধার জন্ম দিত। বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রা এবং ব্যবসায়িক সততার কারণে তাদের প্রশংসা করা হতো। তবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বের কারণে কখনও কখনও পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতিবাচক ধারণাও তৈরি হতো।

৪.৭ বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা

বখতিয়ার খিলজির আগমনের বহু আগেই নতুন চেতনা, বিশ্বাস ও সংস্কৃতি নিয়ে ইসলামের আগমন ঘটে। মুসলমানদের আগমনের ফলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে সংযোজিত হয় নতুন মাত্রা। যা এই অঞ্চলের অন্যান্য সংস্কৃতির স্থালাভিসিক্ত হয়। মসজিদ,খানকাহ নির্মাণের মাধ্যমে শুরু হয় নতুন স্থাপত্যরীতি। প্রার্থনার ক্ষেত্রে প্রচলন হয় নতুন ভাষার ও রীতি-নীতির, পরিবর্তিত হয় শিক্ষা রীতি ও সামাজিক নিয়ম-কানুন। এই অঞ্চলের মানুষের কাছে ইসলামী সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতার কারণসমূহ । ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা একাধিক কারণে বিশেষভাবে উচ্চ। প্রথমত, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ৭ম শতকের পর থেকে মুসলিম শাসকদের আগমন ও স্থায়ী বসতি ভারতীয় সমাজে ইসলামী নীতি ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করায়। মুঘল সম্রাজ্যের সময় ইসলামিক প্রশাসন, স্থাপত্য, শিল্প ও সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

হয়েছেন-'কাগতি', ভবঘুরে ফকিরেরা হয়েছেন-'কলন্দরিয়া', আর সেযুগে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ভিক্ষা করে খেতেন, তাঁরা হয়েছেন-'ফকির'। এটাই হচ্ছে কালকেতুর রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের পরিচয়। এই পরিচয়, একদিকে যেমন সত্যানুগ, অন্য দিকে তেমনি সহৃদয়। (দ্র.*কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, প্রথম ভাগ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃ.১১৫-১১৬)

দ্বিতীয়ত, ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য যেমন ন্যায়, সামাজিক সমতা, দানশীলতা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান স্থানীয় সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে দরিদ্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য জাকাত, খয়রাত এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি একটি আকর্ষণীয় দিক হিসেবে কাজ করেছে।

তৃতীয়ত, সংস্কৃতির স্থায়ী প্রভাব এবং স্থানীয় রীতিনীতি ও উপকৃতির সঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতির মিলনও গ্রহণযোগ্যতার একটি কারণ। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা, দিল্লি, দাক্ষিণ ভারত ও রাজস্থান অঞ্চলে স্থাপত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য ও পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামি ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটেছে।

চতুর্থত, বানিজ্যিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মুসলিম বণিক ও শিক্ষাবিদরা নগর ও গ্রামীণ জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ, শিক্ষাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নীতি ছড়িয়ে দিয়েছেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

ইসলামী সংস্কৃতির মননশীলতা ও নৈতিক দিক যেমন মানবিকতা, ধৈর্য্য, কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার সহজ ও সুসংহত ধারণা স্থানীয় জনগণের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই সমস্ত কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

প্রথমত, জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটা এ অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং তারা ইসলামকে স্বাগত জানায়।

দ্বিতীয়ত, সেন আমলে দেশি সংস্কৃত ভাষা চর্চার প্রতি কঠোর নির্দেশ ছিল, মুসলমানদের শাসনামলে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চায় কোন নিষেধাজ্ঞা ছিলোনা।

তৃতীয়ত, সেন আমলে রাজ দরবারের ভাষা ছিলো সংস্কৃত এবং উচ্চ বর্ণে জন্মগ্রহণকারীরাই কেবল এই ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে পারতেন। সাধারণ মানুষ এ সুযোগ পেতেন না।

চতুর্থত, কুলীন ব্রাহ্মণদের নিয়ে পরিকল্পিত নগরায়নে নিম্নবর্ণের মানুষের কোন স্থান ছিলোনা।[৩৭৪]

পঞ্চমত, মুসলমান শাসনামলে ধর্মীয় ভাষা আরবী এবং দাপ্তরিক ভাষা ফারসি হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ফারসি ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

৪.৮ দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

দুই বাংলার (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের) ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক একটি গভীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মূলত প্রাচীন বঙ্গভূমি ও এর পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে মুসলিম শাসন এবং সমাজের উপস্থিতি থেকে এই সম্পর্কের সূত্রপাত।

---

৩৭৪ কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার মুসলমানের কথা: শাশ্বত বঙ্গ*, প্রগুক্ত, পৃ.৯৬

উভয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী মুসলিম হওয়ায় নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

দুই বাংলার মধ্যে ইসলামী স্থাপত্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একাধিক মিল লক্ষ্য করা যায়। মসজিদ, খতিব, মাদরাসা এবং ধর্মীয় বিদ্যালয় এই অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়, যেমন মুসলিম কবিতা, গজল, মোরল ভক্তি ও ধর্মীয় আখ্যান, দুই বাংলার মুসলিম সমাজকে সংযুক্ত করেছে। এছাড়া, লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামী অনুষ্ঠান ও আচার-অনুষ্ঠান (যেমন হিজরি বর্ষ, মাওলুদ উদযাপন) মিশে গেছে, যা দুই বাংলার মুসলিম জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলন ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে।

অর্থাৎ, দুই বাংলার ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক শুধুমাত্র ধর্মীয় দিক নয়, সামাজিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক জীবনের মাধ্যমে গভীরভাবে বিন্যস্ত এবং পারস্পরিক প্রভাবশালী। আহমেদ ছফা বলেছেন, সমগ্র ভারতের সমগ্র জাতিগুলোর মাঝে বাঙালী সবথেকে বেশি প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক। এর পিছনে ছফা খুব ভাল একটি যুক্তি দিয়েছন। একমাত্র বাংলা বাদে হিন্দু মুসলমানের অনেকটা সময় ধরে পাশাপাশি অবস্থানের গৌরব আর কোন জাতির মাঝে ততটা দেখা যায় না। ১৯৪৬ সালের মত দাঙ্গার হবার পরেও এই বাংলার হিন্দু মুসলিম আবার একে অপরের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক নিয়ে বাস করতে পেরেছিলো সেটা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে যেকোনো জাতিদের কাছে দৃষ্টান্ত।

৪.৯ মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক বিপর্যয়

ইসলামের আগমনকালে পৌত্তলিক ধর্ম ও সংস্কৃতিই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়। মুসলমানগণ এ সমস্ত ধর্ম ও দর্শনকে হিন্দু ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন। যেহেতু এই দেশে পৌত্তলিকদের আদি দর্শন দীর্ঘদিন যাবত প্রচলিত ছিল, তাই তাদের দর্শন ও সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় মূলত নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অভ্যন্তরীণ সংকটের ফল। এটি একদিকে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার ধ্বংস, ধর্মীয় জ্ঞানহীনতা ও সঠিক মননশীলতার অভাবের কারণে দেখা দেয়। সামাজিক দিক থেকে অনৈতিক আচরণ, অস-হিষ্ণুতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, দারিদ্র্য ও শোষণও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এছাড়া, বৈচিত্র্যময় মুসলিম সমাজে পশ্চিমা প্রভাব ও আধুনিকতার অন্ধনিষ্ঠ গ্রহণের কারণে প্রচলিত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ক্ষুণ্ন হয়। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ যেমন সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও আচার-অনুষ্ঠানেও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব এবং ভ্রান্ত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার অভাব, সামাজিক

বিভাজন ও নেতৃত্বের অসঙ্গতি সমাজে ইসলামের মূলনীতির বিকৃতি ঘটায়, যা সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে।

৫. ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব

ভারতে প্রবেশের পর থেকে, ইসলাম ভারতীয় ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয়, শৈল্পিক, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবদান রেখেছে। ভারতীয় ধর্ম এবং রাজনৈতিক জীবনে ইসলামি ভাবধারা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয় এবং অনেক লোক এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। ইসলাম ধর্মের এই প্রচারের ফলে সনাতন ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। অধ্যাপক খালিক আহমদ নিজামীর মতে, 'ঈশ্বরের একত্ব এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এই যে দুই মৌলনীতির উপর মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তা হিন্দুমনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।' ভারতের ধর্ম জগতে ভক্তি আন্দোলন বহুলাংশ ইসলামিক দর্শনের প্রভাবের ফল। মুসলমান সুফীগণ যেমন ভারতীয় দর্শনের মূল মন্ত্রে অনেকটা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি মধ্যযুগের রামানন্দ, কবির, নানা, শ্রীচৈতন্য এবং শঙ্করদেব প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনের সংস্কারকগণ ইসলামের একত্ববাদের মন্ত্রের মধ্যে বৈদিক ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল সুরটি আবার খুঁজে পেয়েছিলেন। এমন কি পরবর্তী কালে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মীয় আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের আখড়া পদ্ধতির সৃষ্টি হয়।

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডে একই সভ্যতা থাকলেও রাজনীতি, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির বিভিন্নতা ভারতকে অনেকগুলো ভৌগোলিক খণ্ডে বিভক্ত করে রেখেছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রচারের ফলে আসমুদ্র হিমাচলে একাত্ববোধের চেতনা দেখা দিল।[৩৭৫] মুসলমান শাসকগণের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতাকে অনেকটা দূরীভূত করেছিল। সুলতানী আমলে বিজিতদের ধর্ম এবং আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শাসকদের মনে ঘৃণা থাকলেও ইসলাম একাত্ববোধ এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের দ্বারা এক ইসলামি রাজ্য কায়েম করার চেষ্টার ফলে সর্বভারতীয় কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিতে একাত্ববোধের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানদের প্রতিমা বিনাশী প্রবণতা রাজনৈতিক প্রয়োজনে অনেকটা দূর হয়েছিল এবং তারা ইসলামি গোঁড়ামি অনেকটা ক্ষুণ্ন করে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে অনেকটা সফলকাম হয়েছিল।

এই 'দিবে আর নিবে, মিলবে মিলাবে' নীতির ফলে সর্বভারতীয় কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিতে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। ইসলামি কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে একটা যোগসূত্র।

---

৩৭৫ ড. রাগিব সারজানি, *মুসলিম জাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের সময়ে ভারতে প্রাচীন বিদ্যা ও দর্শনের প্রচলন ছিল। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণে সভ্য ও উন্নত বিশ্ব থেকে ছিল বেশ পিছিয়ে। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাহিরের জগতের সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বহির্বিশ্বের চিন্তাচেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নিয়মকানুন সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ। মুসলমানদের আগমনের পরেই ভারতীয়রা পায় বাস্তব ও পরিপক্ব জ্ঞান। ফলে বিশ্বে ভারতীয়রা আরো সমৃদ্ধশালী ও সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে পরিচিত হয়।[৩৭৬]

ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের ওউপর ইসলামের অপ্রতিহত উল্লেখ করতে গিয়ে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ ড. এ কে এম পানিকর বলেন,

'One Thing is Clear; Islam had a profound effect on Hinduism durning this period. Medieval theism is in some ways a reply to the attack of islam; and the doctrines of medieval teachers by whatever names their gods are known are essentially theistic. It is the one Supreme God that is the object of the devotees adoration and it is to His grace that we are asked to look for redemption.'[৩৭৭]

অর্থাৎ মুসলমানদের বদৌলতে হিন্দুদের মধ্যে স্রষ্টার উপাসনার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের সাম্যের ধারণা ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা ছিল ভারতের সমাজ জীবনের মূল্যবান বস্তু। ফলে মধ্যযুগের ভারতীয় বর্ণপ্রথার সমাজ শৈথিল্য লাভ করে। ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে ইসলাম ও মুসলমানদের অপ্রতিহত উন্নত প্রভাব নিয়ে জওহরলাল নেহরু বলেন, 'The impact of the invaders from the northwest and of Islam on India had been considerable. It had pointed out and shone up the abuses that had crept into Hindu society Í the petrification of caste, untouchability, and exclusiveness carried to fantastic lengths. The idea of brotherhood of Islam and theoretical equality of its adherents made of a powerful appeal especially to those in the Hindu fold who were denied any semblance of equal treatment[378] অর্থাৎ মুসলমানরা হিন্দু সমাজে কুসংস্কার দূরীকরণে ভূমিকা রাখে। মুসলমানরা ভারতে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক শাখার প্রবর্তন করেন; যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইতিহাস। মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পূর্বে ভারতবর্ষ ইতিহাস লিখন ও চর্চায় অপরিচিত ছিল। ধর্মীয়ও যুদ্ধের কাহিনি ব্যতীত ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থ

---

৩৭৬ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. - ১০২-১০৩

৩৭৭ Satish Chandra, *History of Medieval India,* India:Orient Blackswan.2018,p.113

৩৭৮ Satish Chandra, Ibid,p.124

ভারতে ছিল না। মুসলমানদের ভারতে সেনা অভিযানের পর মুসলমানরাই ভারতের প্রথম ইতিহাসবিদ। ফলে ইতিহাসচর্চাকে বেগবান করতে মুসলিমরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পুরো ভারতবর্ষে পাঠাগারকে ছড়িয়ে দেয়। তাছাড়া সর্বপ্রথম মুসলমানরা ভারতে ইউনানী চিকিৎসা নামক এক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আসেন। যা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে রোগ নিরাময়ে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ছিল। পরিবেশ ও আবহাওয়ার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, উন্নত, অধিকতর সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য হওয়ায় ভারতে দ্রুতই ইউনানী চিকিৎসার প্রসার ঘটে। এখনো পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে এ চিকিৎসা পদ্ধতি বহুল প্রচলিত ও জনসমর্থিত হয়ে আছে।[৩৭৯]

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে ভারতের কৃষিকাজে তেমন উন্নতি ছিল না। মাটির উর্বরতা থাকা সত্ত্বেও কম ফলমূল পাওয়া যেত। মুসলমানরা কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি যোগ করে এবং ফল চাষে দ্রুত অগ্রগতি দেখায়। মুঘলরাই সর্বপ্রথম বিভিন্ন প্রজাতির আমের পরাগায়ন ও কলমের মাধ্যমে সুস্বাদু ও সুমিষ্ট আমের উদ্ভাবন ঘটায়। ফলে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে আমের বৈচিত্র্য ঘটে। ১৫১১ সালে সুলতান মাহমুদ গুজরাটে বস্ত্রের কারখানা স্থাপন করেন। সেচ সুবিধার জন্য বিশাল খাল ও কূপ খননও তার জনহিতকর কাজের মধ্যে ছিল। সম্রাট আকবরের সময়ে পুরো ভারতবর্ষ কাপড় তৈরির কারখানা হিসেবে পরিচিতি পায়। মুঘল সম্রাটরা ভূমি জরিপ, রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের মাধ্যমে কৃষিতে সংস্কার সাধন করে। অসংখ্য হাসপাতাল, পর্যটনকেন্দ্র নির্মাণ, গণপার্ক তৈরিতেও মুসলমানদের অবদান ছিল। তাছাড়া পরিচ্ছনতা ও উন্নত জীবনধারার সঙ্গে ভারতীয় আদিবাসীদের পরিচয় করিয়ে দেয় মুসলমানরা। ভারতীয়রা রুচিবোধ, সংস্কৃতিপ্রীতি, খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্যবিধি, পানি নিষ্কাশন, গৃহ নির্মাণ কৌশল ও তৈজসপত্রের ব্যবহারও মুসলমানদের কাছ থেকে শিখেছে। এককথায় মুসলমানরা ভারতের সামাজিক রীতি, জীবনাচার ও গৃহসজ্জায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায়।

ভারতে মুসলমান আমলে মুসলমানরা শুধু সংগীতচর্চা করেননি, চিত্রচর্চাও করে। তাদের চিত্রচর্চার রীতি, মোটামুটিভাবে ইরানি রীতি; এটি ভারতীয় রীতি হতে পৃথক। ভারতের চিত্রজগতে মুসলমানদের এই রীতি ভারতীয় রীতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে 'মোগলাই রীতি' মানে একটি পৃথক ভারতীয় অঙ্কন-শিল্পের সূচনা করে। ভারতীয় মুসলমানরা সংগীতচর্চার জন্য চিরখ্যাত। তাদের সংগীতবিদ্যা ও যন্ত্র ভারতীয় এ অংশের সংশ্রবে এসে নতুন রূপ গ্রহণ করে। ফলে ধ্রুপদ, ভৈরব, মেঘমল্লার, গান্ধার প্রভৃতি ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সঙ্গে মুসলমানদের গজল, কাওয়ালি, দাদরা, খেয়াল একীভূত হয়ে নতুন মূর্ছনার জন্ম দেয়। বীণা, মুরলী, ঢাকঢোল প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র জগতে মুসলমানদের তবলা,

---

৩৭৯ আহমদ শরীফ, *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

রবার, সেতার, নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও স্থান করে নেয়। ধীরে ধীরে ঠুমরী, টপ্পা, জৌনপুরী, আশাবরী প্রভৃতি নানা মিশ্র রাগিণীর উদ্ভবে ভারতীয় সংগীতে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

আঞ্চলিক ভাষার উৎকর্ষ সাধন এবং নৌবহরের উন্নতি সবকিছুই ঘটেছে মুসলমানদের হাত ধরে। মূলত ইসলাম ভারতবর্ষে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে এসেছিল। যার প্রভাব এখনো ভারতীয় সভ্যতায় বিরাজমান। ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের আগমন ইতিহাসে এমন এক নতুন যুগের সূচনা করেছে; যা শিক্ষা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[৩৮০]

ফলে ভারতের সভ্যতা বিকাশে মুসলিমদের এই অবদান ইতিহাস হয়ে থাকবে। মোদ্দাকথা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি; বরং লাভবানই হয়েছে।[৩৮১] ইসলামের আবির্ভাবের সময় এ অঞ্চলটি বঙ্গ বা বাংলা নামে পরিচিত ছিল। সে সময় বাংলা বা বঙ্গ অঞ্চলের সীমানা শুধু বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিল না। বরং তৎকালীন বঙ্গদেশের সীমানা ছিল বেশ বিস্তৃত।

ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন যুগে বাংলা ছিল প্রায় ৮০ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত এক বিশাল সমভূমি। বস্তুত এ বিশাল বাংলা অঞ্চলে কবে ইসলামের আগমন ঘটে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু বিজয় গোটা ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও বহু মুসলিম মুবাল্লিগ ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন। এ সময় মাহমুদ ও মুহায়মিনের নেতৃত্বে একদল ধর্মপ্রচারক এ দেশে আগমন করেন বলে জানা যায়। পরে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এ দেশে ধর্ম প্রচারকদের ব্যাপকহারে আগমন ঘটে। বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে শির্কের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়টি অনেকটা এ দেশে ইসলাম প্রবেশকালীন সময়ে এখানকার মানুষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং জনগণ কর্তৃক তা গ্রহণ করার ধরণ ও প্রকৃতি অবগত হওয়ার উপরে নির্ভরশীল। সে জন্য নিম্নে উপর্যুক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করা হলো।

৫.১ আরবের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক বিনিময়

ইসলাম আগমনের বহু পূর্বে আরব ভূখণ্ডের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আরব বণিকরা ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে ব্যাবসায়িক পণ্য সংগ্রহ করত। ইসলাম আগমনের পর এই যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পায়। সুপ্রাচীন এই যোগাযোগের ফলে আরবরা যেমন ভারতীয়দের দ্বারা

---

৩৮০ কাজী আবদুল ওদুদ, *প্রাগুক্ত*, ঢাকা: ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩খ্রি., পৃ.৯৬

৩৮১ সৈয়দ আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, ২০১০ খ্রি., পৃ. ২১০

প্রভাবিত হয়েছিল, তেমনি ভারতীয়রাও আরবদের কাছ থেকে বহু বিষয় গ্রহণ করেছিল। আরব ও ভারতীয় নাগরিকরা পরস্পরকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখত। আরবরা ভারতীদের সম্মানের চোখে দেখত তারা দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পে এগিয়ে থাকার কারণে। আরবদের চোখে ভারতীয়রা ছিল মেধাবী ও বুদ্ধিমান জাতি। যারা মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। যদিও আরব ভারতীয় সামাজিক বিভক্তি, জাতিগত অনৈক্য, বর্ণপ্রথা ও ধর্মীয় অধঃপতনকে অপছন্দ করত।

অন্যদিকে আরবদের চিন্তার উদারতা, ধর্মীয় সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ভারতীয়দের অন্তরে তাদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি করেছিল।[৩৮২]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরব বাহিনীর হামলাগুলো বাদ দিলে ভারতের সঙ্গে আরবদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সুসংহত। যেসব আরব ভারতে বসবাস শুরু করেছিল তারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করত। এমন কোনো ভারতীয় শাসক তাদের প্রাশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। যেসব আরব বণিক দক্ষিণ ভারত ও উপকূলীয় অঞ্চলে যাতায়াত করত তাদেরও সম্মানের চোখে দেখা হতো। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ এবং ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ভোগ করত। সুপ্রাচীন বাণিজ্যিক যোগাযোগ, ইসলাম প্রচারকদের প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক সাফল্যের কারণে ভারতে ইসলামের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। বিশেষত ভারতীয় সমাজে ইসলামের ধর্মীয় প্রভাব ছিল দৃশ্যমান মুসলমানরা ভারতীয়দের জন্য বহু মূল্যবান উপহার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার ছিল নিষ্কলুষ একত্ববাদের বিশ্বাস। যে বিশ্বাস বান্দা ও তার প্রতিপালকের ভেতর সব ধরনের মাধ্যম অস্বীকার করে। বান্দার ইবাদত ও প্রার্থনা কোনো মাধ্যম ছাড়াই মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। এ বিশ্বাস ভারতবাসীকে হাজার বছরের দাসত্বের শেকল থেকে মুক্তি দেয়। কেননা মানুষরই একটি শ্রেণি তাদের ও মহান প্রতিপালকের মাঝে এমন অভেদ্য দেয়াল তুলে দিয়েছিল যে তারা বিশ্বাস করত প্রভুর কাছ থেকে তাদের চাওয়া ও পাওয়ার কিছুই নেই। ভারতবাসীর প্রতি মুসলমানের অনুগ্রহ হলো, তারাই ভারতীয় সমাজে মানবিক সাম্যের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কেননা ইসলামে বর্ণবৈষম্য ও বর্ণপ্রথার কোনো স্থান নেই। কোনো মানুষই জন্মসূত্রে অস্পৃশ্য নয়, কেউ জন্ম থেকে নাপাক নয়। কোনো মূর্খ ব্যক্তির জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়। পেশার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বৈষম্য ইসলাম সমর্থন করে না। সব মানুষ ভাই ভাই। তারা একসঙ্গে বসবাস করা, পানাহার গ্রহণ করা, শিক্ষা গ্রহণ করাসহ সব সামাজিক কাজ করার অধিকার

---

৩৮২ আব্দুল্লাহ আল আমিন, *বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বই বাজার, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১২৪

রাখে। ইসলাম ভারতীয় সমাজের কঠোর সামাজিক বৈষম্য ও বর্ণপ্রথাকে শিথিল করতে জোরাল ভূমিকা রেখেছিল।[৩৮৩]

অস্পৃশ্যতার দেয়াল ভেঙে সমাজসংস্কারের সূচনা করেছিল। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু ঐতিহাসিক এই সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে যেসব যোদ্ধাদের ভারতে প্রবেশ এবং ভারতে মুসলিম আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সমাজে যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল তারা তা দূর করেছে। তারা প্রকাশ করে দিয়েছে বর্ণপ্রথা, অস্পৃশ্যতার রীতি এবং পৃথিবীতে বিচ্ছিন্নতার নানাদিক ভারতবাসী যার ভেতর বসবাস করত। নিশ্চয়ই ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের নীতি মুসলিমরা যা বিশ্বাস করত এবং জীবনে ধারণ করত ভারতীয় চিন্তাধারায় তা গভীর প্রভাব ফেলে। এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল শূদ্ররা (হিন্দু সমাজ কাঠামোর চতুর্থ শ্রেণি)। ভারতীয় সমাজ যাদের সাম্য ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।' মুসলিম ভারতে বহু নতুন বিদ্যা ও জ্ঞান বয়ে এনেছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ইতিহাস। ভারতবর্ষ ইতিহাসচর্চায় অনেক পিছিয়ে ছিল। ভারতীয় পাঠাগারগুলোতে সঠিকার্থে কোনো ইতিহাস গ্রন্থ ছিল না। ভারতে যা ছিল তা হলো ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা ও উপাখ্যান যেখানে বিভিন্ন যুদ্ধ ও চুক্তির বিবরণ রয়েছে। যেমন মহাভারত, রামায়ণ। মুসলিমরা এখানে ইতিহাস শাস্ত্রের ওপর এমন সুবিশাল গ্রন্থাগার গড়ে তোলে, পৃথিবীতে যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার। গুস্তাভ লে বন তাঁর 'হাদারাতুল হিন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'প্রাচীন ভারতের কোনো ইতিহাস নেই। তাদের গ্রন্থগুলোতে অতীতের গ্রহণযোগ্য কোনো সূত্রও পাওয়া যায় না। একাদশ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম অভিযানের আগে ভারতে ইতিহাসচর্চা শুরু হয়নি। মুসলিম আগমনের পর মুসলিমদের অবদানে তার সূচনা হয়।'

ভারতবর্ষ মুসলিমদের কাছ থেকে চিন্তার উদারতা ও চিন্তার শক্তি লাভ করেছে। অর্জন করেছে সাহিত্য ও কবিতার নতুন অর্থ। যদি তারা তা অর্জন করতে না পরত তবে ভারতীয়দের মন ও মননে গবেষণা, বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহিত্যের উন্নয়নের এই ধারা সৃষ্টি হতো না। ভারতবর্ষের জীবনযাত্রা, শিল্প ও নগরায়ণে মুসলিম প্রভাব ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রজ্জ্বল। তারা ভারতীয় সমাজে এমন এক নতুন জীবনধারা সূচনা করেছিল, যা প্রাচীন ধারাগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন ইউরোপের মধ্যযুগীয় জীবনধারার তুলনায় ভিন্ন বর্তমান জীবনধারা।

৫.২ আরবসমাজে ভারতের প্রভাব

আরব সমাজে ভারতের প্রভাব বিশেষত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারত ও আরবের মধ্যে স্থায়ী বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতীয়

---

৩৮৩ ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৩৯।

মসলা, রেশম, মণি এবং বিভিন্ন শিল্পপণ্য আরব দেশে পৌঁছাতো, যা আরব সমাজের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ও জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলেছিল। এছাড়া, বাণিজ্যিক ও শিক্ষাগত আদানপ্রদানের মাধ্যমে ভারতীয় গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং দার্শনিক চিন্তাভাবনা আরব সমাজে পৌঁছেছিল, যা ইসলামি স্বর্ণযুগে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ভূমিকা রাখে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সুফি সাধক ও তাদের ভাবধারার সঙ্গে আরবের সুফি আন্দোলন এবং ধর্মীয় সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় পারস্পরিক বিনিময় ঘটেছিল। খাদ্য, পোশাক, সঙ্গীত ও আচার-অনুষ্ঠানেও ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ আরব সমাজে ফুটে উঠেছে। সুতরাং, আরব সমাজে ভারতের প্রভাব শুধু বাণিজ্যিক সীমাবদ্ধতায় সীমিত ছিল না, এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক দিকেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। আরব মুসলিমরা যেমন ভারতীয় সমাজ সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি তারা ভারতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি দ্বারা উপকৃত হয়েছে। ড. সাইয়েদ মাকবুল আহমদ বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আরবদের সঙ্গে ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিমাণ বেশি।[৩৮৪] আরবরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষত আরবি ভারতীয় সাহিত্য থেকে রশদ গ্রহণ করেছে। বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সাহিত্য আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আরবি কাব্যসাহিত্য ও সংগীত ভারতীয় ভাববাদ ও আধ্যাত্মবাদ দ্বারা প্রভাবিত। বহু ভারতীয় খাদ্য আরবদের দস্তরখানে স্থান করে নিয়েছে। ভারতীয় দর্শন বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান, ভারতীয় স্থাপত্যরীতি, সূক্ষ্ম শৈল্পিক কারুকাজ আরবদের প্রভাবিত করেছে।

৫.৩ বাংলা ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব

বাংলা ভাষা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা। এর শিকড় প্রাচীন মধ্য-ভারতীয় প্রাকৃত ভাষায় হলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এটি আরবি, ফারসি ও উর্দুসহ বহু ভাষার প্রভাব গ্রহণ করেছে। ১৩শ শতাব্দী থেকে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনার পর ইসলামী সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার অন্তরে প্রবাহিত হয়। ইসলামী সংস্কৃতির মূল উপাদান তাওহীদ, ন্যায়, মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার শুধু সমাজব্যবস্থায় নয়, ভাষা ও সাহিত্যের ভেতরেও প্রোথিত হয়। এর ফলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, বাক্যগঠন, সাহিত্যিক রীতি, এমনকি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভাষাও বদলে যায়। বাংলা ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব গভীর ও বহুমাত্রিক। মুসলমান শাসকদের আগমন এবং সুফি-দরবেশদের কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। এর ফলে বাংলা ভাষায় আরবি ও ফারসি উৎস থেকে বহু শব্দ সংযোজিত হয়েছে, যা দৈনন্দিন কথোপকথন ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ইসলামী ধর্মীয় ভাবধারা যেমন তওহীদ, আল্লাহভীতি, আখিরাতচিন্তা, নৈতিকতা ও

---

৩৮৪ ড. মুহাম্মাদ এনামুল হক, *মনীষা-মঞ্জূষা*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯০খ্রি., পৃ. ৭৮

দানশীলতার ধারণা কবিতা, গান, পুঁথি সাহিত্য ও গজলে প্রতিফলিত হয়েছে। সুফি কবি ও গীতিকাররা ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সহজ ভাষায় প্রকাশ করে গ্রামীণ সমাজে জনপ্রিয় করে তোলেন। এছাড়া, ঈদ, মিলাদ, মহররম ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ইসলামী প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং, ভাষা, সাহিত্য, গান, আচার-অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন জীবনধ-ারায় ইসলামী সংস্কৃতি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং একে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে আলোকিত করেছে।

৫.৩.১ ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে ইসলামের আগমন প্রথমে আরব বণিকদের মাধ্যমে হয় (৭ম-৮ম শতাব্দী)। তবে ইসলামী সংস্কৃতির গভীর প্রভাব শুরু হয় মুসলিম শাসনের সময়, বিশেষ করে দিল্লি সালতানাত (১২০৪-১৩৫২ খ্রিঃ) ও সুলতানি আমলে। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করে এবং আরবি-ফারসি শব্দ বিপুল হারে বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করে। সুফি দরবেশ ও আলেমগণ ইসলামের শিক্ষা স্থানীয় ভাষায় প্রচার করেন, ফলে বাংলা ভাষা ইসলামী ভাবধারায় রঙিন হয়।বাংলা ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পটভূমি মূলত মুসলিম শাসন ও সুফি-দরবেশদের আগমনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সপ্তম-অষ্টম শতক থেকেই আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলায় ইসলামের পরিচয় ঘটে। পরবর্তীতে ১৩শ শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামী শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসকরা প্রশাসন, শিক্ষা, সাহিত্য ও স্থাপত্যের পাশাপাশি বাংলার সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ বিস্তার করেন। একই সঙ্গে সুফি ও দরবেশরা গ্রামীণ জনপদে গিয়ে তওহীদ, আধ্যাত্মিকতা, মানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা প্রচার করেন, যা স্থানীয় মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করে। এ সময় থেকেই বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ যুক্ত হতে থাকে এবং ইসলামী ধর্মীয় ভাবধারা কবিতা, গান, গজল ও পুঁথি সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। ফলে বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিতে এক অনন্য ইসলামী ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, যা আজও বহমান।

৫.৩.২. শব্দভাণ্ডারে ইসলামী প্রভাব

ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি ও ফারসি শব্দ এসেছে। বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার প্রভাব এবং ব্যবহার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ধারার অংশ। মুসলিম শাসন, বাণিজ্য ও সুফি দরবেশদের আগমনের ফলে এ তিন ভাষার বহু শব্দ ও অভিব্যক্তি বাংলা ভাষায় মিশে গেছে, যা আজও প্রচলিত। বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। ইসলামের প্রচার ও মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আরবি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে। মুসলমান শাসক, সুফি-দরবেশ, আলেম-ওলামা এবং ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের

কারণে আরবি শব্দ কেবল ধর্মীয় সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং লোকজ জীবন, দৈনন্দিন ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও গভীরভাবে প্রবেশ করেছে।

বাংলা ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরবি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে এবং সময়ের সঙ্গে তা স্থায়ীভাবে গৃহীত হয়। যেমন-আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, কুরআন, হাদিস, সলাত, সাওম, হজ্ব, জাকাত, জান্নাত, দু'আ, আখিরাত ইত্যাদি শব্দ সরাসরি আরবি থেকে এসেছে এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব শব্দ কেবল ধর্মীয় অনুষঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও গভীরভাবে মিশে গেছে। ফলে বাংলার লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য, পুঁথি, কবিতা ও গানেও আরবি শব্দের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। বলা যায়, আরবি ভাষার প্রভাবে বাংলা শুধু শব্দভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হয়নি, বরং ইসলামী মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়ায় এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব অত্যন্ত গভীর এবং বহুমাত্রিক। মুসলিম শাসনামলে ফারসি ছিল প্রশাসন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান ভাষা। ফলে বাংলায় অসংখ্য ফারসি শব্দ প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। যেমন- দরবার, নবাব, বেগম, খাজনা, মোকদ্দমা, আদালত, দিওয়ান, দস্তুর, মজলিস, খাতুন ইত্যাদি শব্দ প্রশাসনিক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়। ফারসি প্রভাব শুধু শব্দভাণ্ডারে সীমাবদ্ধ ছিল না; সাহিত্য, কবিতা, গজল, স্থাপত্য ও শিল্পকলাতেও এর প্রতিফলন ঘটে।[৩৮৫] বাংলার মুসলিম কবি ও লেখকরা ফারসি ছন্দ, কাব্যরীতি এবং ভাবধারা গ্রহণ করে নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এমনকি বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতেও ফারসি শব্দ মিশে গিয়ে সহজ ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের অংশ হয়ে উঠেছে। ফলে বলা যায়, ফারসি ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ এক ঐতিহ্য লাভ করেছে।

বাংলা ভাষায় উর্দু ভাষার প্রভাব মূলত আধুনিক যুগে, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনামল এবং পরবর্তী কালে মুসলিম সমাজে বেশি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু-মুসলিম সামাজিক বিভাজন ও মুসলিম নবজাগরণের সময় উর্দু ভাষা মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এর বহু শব্দ বাংলায় মিশে যায়। যেমন-জনাব, সাহেব, দোস্ত, আশিক, মজনু, খোদা হাফেজ, তকদির, দুনিয়া, বারাদরি, মহব্বত, খুশি ইত্যাদি। এসব শব্দ সামাজিক সম্পর্ক, আবেগ-অনুভূতি ও দৈনন্দিন কথোপকথনে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু কথ্যভাষা নয়, সাহিত্য, নাটক, গান ও চলচ্চিত্রেও উর্দুর প্রভাব স্পষ্ট। বিশেষ করে গজল, প্রেমকাব্য ও মুসলিম সমাজকেন্দ্রিক রচনায় উর্দু শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি বাংলাকে আবেগপূর্ণ ও

---

৩৮৫ মুহম্মদ আবদুর রসুল, *আধুনিক বাংলা ভাষায় আরবি ও ফারসি শব্দমালার ব্যবহার*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বি.আই.আই.টি),২০২২,পৃ.২৩৪-২৬৫

রোমান্টিক ধারা দিয়েছে। ফলে বলা যায়, উর্দু ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষা আবেগপ্রকাশে এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

৫.৩.৩ সাহিত্যিক রচনায় ইসলামী প্রভাব

বাংলা সাহিত্যিক রচনায় ইসলামী প্রভাব গভীর ও বহুমাত্রিক। ইসলাম ধর্মের নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, মানবিকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ কবিতা, গদ্য, পুঁথি, গজল ও কাব্য সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকরা কোরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে রচনায় অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বিশেষ করে সুফি সাহিত্য যেমন শাহ জালাল, লালন শাহ ও অন্যান্য সুফি কবিদের রচনায় আল্লাহর প্রতি প্রেম, আত্মসমর্পণ, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং নফস নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মুসলিম প্রশাসন, ইতিহাস ও সামাজিক জীবন সম্পর্কিত রচনায় আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার বাংলার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে বলা যায়, ইসলামী চিন্তা ও মূল্যবোধ বাংলা সাহিত্যকে একটি নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে।

ক. সুফি সাহিত্য

সুফি কবিরা বাংলা ভাষায় ইসলামের ভাবধারা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ, সৈয়দ আলাওল, শাহ মুহম্মদ সগীর প্রমুখ কবি ইসলামী ভাবধারার কাব্য রচনা করেন। সুফি সাহিত্য বলতে এমন সাহিত্যকে বোঝায় যেখানে ইসলামী আধ্যাত্মিকতা, প্রেম, মানবতাবোধ ও নৈতিকতা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। বাংলায় সুফি সাধক ও দরবেশরা সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের শিক্ষা ও তাওহিদের বার্তা পৌঁছে দিতে সহজ ও লোকজ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সুফি সাহিত্য মূলত কাব্য, পদ, পুঁথি, গজল ও ধর্মীয় গান আকারে রচিত হয়, যা গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলা সুফি সাহিত্যে প্রেম (ইশক), ভক্তি, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, নফস দমন, মানবপ্রেম ও সামাজিক সমতার শিক্ষা প্রধান বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। শাহ জালাল, শাহ মখদুম, লালন শাহ, শাহ আবদুল করিম, দুদ্দু শাহ প্রমুখ সুফি সাধক-প্রাণিত কবি ও গীতিকাররা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজভাবে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের রচনায় আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং নৈতিক জীবনযাপনের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়।[৩৮৬] সুফি সাহিত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি লোকসংস্কৃতি ও ইসলামী আধ্যাত্মিকতাকে একত্রিত করেছে। স্থানীয়

৩৮৬ আতাউর রহমান, *বাংলা ভাষায় ইসলামী প্রভাব*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল*, খণ্ড ১২, সংখ্যা ৩, ২০১৮, পৃ. ৪৫-৬৭

উপমা, রূপক, গ্রামীণ জীবনের চিত্র এবং আরবি-ফারসি শব্দের সমন্বয়ে সুফি কবিরা এমন সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, যা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারতো।

সুফি সাহিত্য বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়, যা ইসলামের আধ্যাত্মিক চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধকে ভাষা ও গানের মাধ্যমে চিরস্থায়ী করে তুলেছে।

খ. মঙ্গলকাব্য ও ইসলামী প্রভাব

যদিও মঙ্গলকাব্য হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি কেন্দ্রিক, মুসলিম কবিরা এতে ইসলামী আখ্যান ও দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করেন। বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে ইসলামী প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে মুসলিম শাসন ও সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে। মঙ্গলকাব্য মূলত দেবদেবী বা ঐতিহাসিক কাহিনি কেন্দ্রিক হলেও, মুসলিম সমাজ ও ইসলামী নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ এতে স্থান পেয়েছে।[৩৮৭] উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম শাসক, সেনাপতি বা দরবেশদের চরিত্রায়ন কাব্যগুলিতে দেখা যায়; পাশাপাশি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, ন্যায়, মানবিকতা ও সামাজিক দায়িত্বের শিক্ষা প্রাধান্য পায়। কিছু মঙ্গলকাব্যে ইসলামি আধ্যাত্মিক ধারণা যেমন দুনিয়ার অনাসক্তি, আল্লাহর প্রতি ভক্তি এবং নৈতিক জীবনযাপনও প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া, আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে কাব্যগুলিকে মুসলিম পাঠকের জন্য গ্রহণযোগ্য ও সমৃদ্ধ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, মঙ্গলকাব্য শুধু হিন্দু ধর্মীয় ও আঞ্চলিক রীতি-নীতি প্রদর্শনই নয়, বাংলার ইসলামি সংস্কৃতি ও নৈতিক চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি বিশেষ সাহিত্যিক রূপ পেয়েছে।

গ. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রভাব

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা, গান ও প্রবন্ধে ইসলামী মূল্যবোধ, কুরআনের শিক্ষা ও নবীজির জীবনচরিত তুলে ধরেন। তাঁর "Bidrohi" কবিতায় যেমন ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, তেমনি "Muhammad" কবিতায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনী গাথা করা হয়েছে।[৩৮৮]আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইসলামী প্রভাব লক্ষ্য করা যা নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক ন্যায় এবং মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে। মুসলিম কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিকরা কোরআন, হাদিস ও সুফি চিন্তাধারার প্রভাব নিয়ে রচনা করেছেন, যা চরিত্র, কাহিনী এবং সমাজবোধে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে লালন শাহ, কুদরত-এ-খুদা, সেলিনা হোসেন, হুমায়ুন আহমেদ ও অন্যান্য সাহিত্যিকরা মানবপ্রেম, ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও আল্লাহর প্রতি ভক্তি কেন্দ্রিক ভাবনাকে আধুনিক রচনায় প্রকাশ করেছেন। এছাড়া মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবন, ঐতিহ্য, সামাজিক অনুষ্ঠান ও নৈতিকতা আধুনিক গল্প, নাটক ও

---

৩৮৭ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩০

৩৮৮ মুহম্মদ এনামুল হক চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান*. ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫, পৃ.৪৫

কবিতায় স্থান পেয়েছে।[৩৮৯] ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইসলামী চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধকে সংহত করে পাঠককে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

৬. শিক্ষা ও জ্ঞানে প্রভাব

মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলায় ইসলামী জ্ঞানচর্চার অন্যতম উৎস। মুসলিম শাসকেরা বাংলা অঞ্চলে কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে আরবি-ফারসি ভাষা ও ইসলামী শাস্ত্র চর্চা হতো। এর ফলে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় পরিভাষা ও প্রবাদ-প্রবচনের সংখ্যা বেড়ে যায়। বাংলা সমাজে ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রভাব গভীর ও বহুমাত্রিক। মুসলিম শাসন, সুফি দরবেশ ও মাদরাসা ব্যবস্থার মাধ্যমে কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। মাদরাসা ও দরগাহ কেন্দ্রিক শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ একসঙ্গে শিক্ষিত হয়েছে। এছাড়া আরবি ও ফারসি ভাষার জ্ঞান বাংলার সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত ও প্রশাসনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। সুফি সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ধর্মীয় জ্ঞানসহ নৈতিক ও মানবিক শিক্ষাও গ্রহণ করেছে। ফলে বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রভাব বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে।[৩৯০]

৭. শিল্প ও স্থাপত্যের মাধ্যমে ভাষায় প্রভাব

বাংলাদেশে আরবি ভাষার প্রয়োগ শুধু ধর্মীয় অনুশীলনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং শিল্প ও স্থাপত্যের মাধ্যমেও এর একটি সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম আগমনের পর থেকেই মসজিদ, মাদ্রাসা ও দরগাহ নির্মাণে আরবি ক্যালিগ্রাফি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্থাপত্যের দেয়াল, প্রবেশদ্বার, মিহরাব ও গম্বুজে কুরআনের আয়াত, দু'আ ও আল্লাহর নাম আরবি লিপিতে খোদাই করা হয়, যা শুধু নান্দনিক সৌন্দর্যই নয়, বরং আধ্যাত্মিক বার্তাও বহন করে।[৩৯১] ঢাকার সাত গম্বুজ মসজিদ, ষাট গম্বুজ মসজিদ কিংবা চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক মসজিদগুলোতে আরবি শিলালিপি ও অলঙ্করণের মাধ্যমে ইসলামী শিল্পকলা ও ভাষার সমন্বয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরবি ক্যালিগ্রাফির এই প্রভাব আধুনিক ইসলামিক স্থাপত্যেও বজায় রয়েছে, যেমন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সজ্জায়। এভাবে আরবি ভাষা কেবল ধর্মীয় চর্চার অংশ হিসেবেই নয়, বরং বাংলাদেশের শিল্পকলা ও স্থাপত্য ঐতিহ্যেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে। মসজিদ, মাদ্রাসা, দরগাহের দেয়ালে খোদাই করা আরবি আয়াত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মাঝে কুরআন-হাদিসের শব্দ পরিচিতি বাড়িয়েছে।

---

৩৮৯ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩,৪৫

৩৯০ সৈয়দ নজরুল আলী, *বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি প্রভাব*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১০,পৃ. ৩৭

৩৯১ আবুল হোসেন, *ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১২৪

"বিসমিল্লাহ", "আলহামদুলিল্লাহ" ইত্যাদি শব্দ দৈনন্দিন শুভেচ্ছা বিনিময়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব শিল্প ও স্থাপত্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মসজিদ, দরগাহ, মাদরাসা ও মহলীর স্থাপত্যে আরবি ও ফারসি শিলালিপি, কুরআনিক ছন্দ, প্রবাদ ও নৈতিক বাণী ব্যবহৃত হয়েছে, যা বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পুঁথি, কবিতা, গজল ও লোকসাহিত্যে এসব স্থাপত্য ও শিল্পকর্মের অনুপ্রেরণায় বহু আরবি-ফারসি শব্দ, রূপক এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা প্রবেশ করেছে। এছাড়া ইসলামী শিল্পকলার নকশা, রূপক ও অলঙ্করণ বাংলার লোকজ সাহিত্য ও গানের ভাষাকে সৌন্দর্যপূর্ণ ও বর্ণনামূলক করেছে। ফলে বলা যায়, শিল্প ও স্থাপত্যের মাধ্যমে ইসলামী প্রভাব শুধু ভৌত নয়, বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রকাশকেও সমৃদ্ধ করেছে।

৮. লোকসংস্কৃতি ও প্রবাদ-প্রবচন

বাংলা লোকসংস্কৃতি ও প্রবাদ-প্রবচনে ইসলামের প্রভাব গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবন, নৈতিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলার লোকগীতি, কাব্য, ধারা ও আচার-অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সুফি সাধক ও দরবেশদের প্রচারের মাধ্যমে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষামূলক উপদেশ লোকসংগীত ও গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে।[৩৯২] উদাহরণস্বরূপ, "ধৈর্য ধরলে ফল মধুর হয়", "ভালো কাজ করলে ভালো ফল আসে" ইত্যাদি নৈতিক প্রবাদ-প্রবচন ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত। এছাড়া ঈদ, মিলাদ, মহররমের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আচার-অনুষ্ঠানও বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ইসলামী ছাপ রেখেছে।[৩৯৩] ফলে বলা যায়, ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বাংলার লোকসংস্কৃতি ও প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে সহজভাবে প্রবেশ করেছে। সাবর আছে আল্লাহর সাথে, আল্লাহ চাইলে সব হয়, দুআ করলে আল্লাহ সাহায্য করেন, যে আল্লাহর পথে চলে, সে হারবে না, সত্য বলিলে নিরাপদে চলা যায়, যে আল্লাহর ভরসা রাখে, সে কখনও নিঃস্ব হয় না, দুআ কর, তাওবার সঙ্গে চেষ্টা কর, সচেতন থাকলে আল্লাহ সাহায্য করবেন, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না, আল্লাহর দিকে ফিরে চলো, শান্তি পাবে। বাংলা ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব গভীর হওয়ায় অনেক প্রবাদ-প্রবচনে ইসলামী শিক্ষার ছাপ পাওয়া যায়। এগুলো মূলত নৈতিকতা, ধৈর্য, পরকালে জবাবদিহি, সৎকর্ম ও আল্লাহর উপর ভরসার শিক্ষা দেয়।

---

৩৯২ আবুল হোসেন, *ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৩৯৩ রফিকুল ইসলাম আহমেদ, *বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫

৯. সামাজিক জীবনে ভাষার প্রভাব

বাংলা ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতির ফলে মানুষ পরস্পরের প্রতি সালাম দিয়ে অভিবাদন জানায়। খাদ্যগ্রহণের আগে-পরে দোয়া, নামকরণে ইসলামী নাম, চিঠি ও বক্তৃতায় "আসসালামু আলাইকুম" এর ব্যবহার এসব ইসলামী সংস্কৃতির ভাষাগত রূপ।[৩৯৪] বাংলা ভাষা এক বহুমাত্রিক ইতিহাসের ধারক। এর ভেতরে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব কেবল শব্দ বা বাক্যগঠনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি ভাষার অন্তর্নিহিত দার্শনিক ও নৈতিক মানদণ্ডেও প্রোথিত। ইসলামী মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এসবই বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের মর্মে গেঁথে আছে। তাই বলা যায়, ইসলামী সংস্কৃতি বাংলা ভাষাকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি, বরং এর নৈতিক ও মানবিক ভিত্তিকেও সুদৃঢ় করেছে।

১০. বাংলাদেশ ও ভারতের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ

বাংলাদেশ ও ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক ও সংযোগ রয়েছে, কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের জীবনধারা, উৎসব, ভাষা ও সামাজিক প্রথা একে অপরের সঙ্গে মিশেছে। তবে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংমিশ্রণ ও সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে। নিচে বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া হলো:

ক. সংস্কৃতির সংমিশ্রণ

বাংলাদেশ ও ভারতের সংস্কৃতি দীর্ঘ ইতিহাসের ধারায় একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছে। মুসলিম শাসনকাল থেকে শুরু করে স্থানীয় সমাজ ও ইসলামী প্রথার সংমিশ্রণ ঘটেছে, যা ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, খাদ্য ও পোশাকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলায় ফার্সি ও আরবি শব্দের ব্যবহার, নজরুল গীতি, কীর্তন ও লোকসঙ্গীতে স্থানীয় ও ইসলামিক প্রভাবের মিলন লক্ষ্য করা যায়।[৩৯৫] পোশাক ও খাদ্যাভ্যাসেও স্থানীয় ঐতিহ্য ও ইসলামী নীতি সংমিশ্রিত হয়েছে; যেমন বাঙালি শাড়ির বদলে সেলোয়ার কামিজ,লুঙ্গির বদলে পায়জামা-পাঞ্জাবী ও হালাল খাবারের প্রচলন। এইভাবে দুই দেশের সংস্কৃতি একে অপরকে সমৃদ্ধ করেছে, তবে সবসময় ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. ঐতিহাসিক সংমিশণ

মুসলিম শাসনাবলীর সময় (মুঘল, দিল্লি সালতানাত ইত্যাদি) ভারতীয় স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ইসলামের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ

---

৩৯৪ কাজী নজরুল ইসলাম, *নির্বাচিত কবিতা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০, পৃ.১৩৪

৩৯৫ আবুল হোসেন, *ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

মূলত ঐতিহাসিক কারণে ঘটেছে। মুঘল, দিল্লি সালতানাতসহ বিভিন্ন মুসলিম শাসনকাল স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ইসলামের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথাগুলো একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও খাদ্যাভ্যাসে উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায়; যেমন বাংলায় ফার্সি ও আরবি শব্দের প্রবেশ, স্থাপত্য ও শিল্পকলায় ইসলামিক নকশার সংমিশ্রণ। এই ঐতিহাসিক সংমিশ্রণ শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক বিনিময় নয়, বরং সমাজের নৈতিক ও আচার-ব্যবহারের ওপরও প্রভাব ফেলেছে, যা ইসলামের নীতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটি সৃজনশীল সমন্বয় তৈরি করেছে। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত, এবং বাংলাদেশের ফোক ও কীর্তন সাংস্কৃতিক মিলন সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ: কীর্তন, ভাটিয়ালি, নজরুল গীতি ইত্যাদিতে স্থানীয় ও ইসলামিক প্রভাব মিশ্রিত। ইসলামের আলোকে সংগীতকে নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে সংগীত তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা মানুষের মনকে প্রশান্ত করে, আল্লাহর স্মরণ বা নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং অশ্লীলতা, অপ্রয়োজনীয় প্রলুব্ধি বা ধর্মবিরোধী বিষয় এড়ায়। তবে অতিরিক্ত ভোগ, যৌনপ্রলুব্ধি বা নৈতিকতার বিপরীত প্রভাবযুক্ত সংগীত ইসলামের নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে সংগীতকে সীমাবদ্ধ ও সৎ উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে গ্রহণ করা উচিত, যা চরিত্রের উন্নয়ন ও হৃদয়ের শুদ্ধি সাধনে সাহায্য করে।

গ. ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার দ্বন্দ্ব

হিন্দু উৎসব, পূজা-পার্বণ এবং কুসংস্কার ইসলামী নীতি ও শান্তির সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের আদি সংস্কৃতির মধ্যে পহেলা বৈশাখ, হিন্দুদের বিভিন্ন শির্কপূর্ণ অনুষ্ঠান, মঙ্গল শোভাযাত্রা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদযাপন হলেও অনেক ক্ষেত্রে মাদক, আবোল-তাবোল আয়োজন বা অশ্লীল রীতিনীতি দেখা যায়, যা ইসলামের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।[৩৯৬] হিন্দু ধর্মীয় উৎসব ও পূজায় মূর্তি পূজা, দেবতার উপাসনা ও শির্কমূলক আচরণ প্রাধান্য পায়, যা ইসলামে সরাসরি নিষিদ্ধ। মঙ্গল শোভাযাত্রা ও লোকানুষ্ঠানগুলোও ইসলামী নৈতিকতার সীমার বাইরে। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব অনুষ্ঠানকে শুধুমাত্র সামাজিক মিলন বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দিক দিয়ে সীমিতভাবে গ্রহণযোগ্য করা যায়, কিন্তু শির্ক, অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য।

ঘ. ধর্ম ও নৈতিকতার ধারা

ভারতীয় সামাজিক প্রথায় নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ, কাস্ট বা সামাজিক বৈষম্য, এবং অনৈতিক প্রথা বিদ্যমান। ইসলামের নৈতিক নির্দেশনার সঙ্গে এগুলো সাংঘর্ষিক। ইসলামে নারী অধিকার, ন্যায় ও

---

৩৯৬ ড. এ কে এম নূরুল আলম, *সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য*, কুষ্টিয়া: পেয়ারাতলা, ২০০২ খ্রি., পৃ. ১২০

সমতার গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, সামাজিক রীতিনীতিতে কখনও কখনও এদের উপেক্ষা করা হয়। টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া ও সিনেমা থেকে প্রাপ্ত পশ্চিমী ও স্থানীয় অবৈধ প্রভাব ইসলামিক নৈতিকতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে।[৩৯৭] বাংলাদেশের সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিকতা প্রায়শই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে গাঁথা থাকে, যেখানে ইসলামি মূল্যবোধ ও স্থানীয় ধর্মীয় ও নৈতিক মানের মধ্যে কিছু বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী সংস্কৃতি যেখানে সততা, ন্যায়, উদারতা, দয়া ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেয়, সেখানে বাংলাদেশের প্রচলিত কিছু সামাজিক রীতি যেমন কুসংস্কার, ধর্মীয় অলীক প্রথা, জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ সংক্রান্ত অযৌক্তিক বিশ্বাস, ও তদনুসারে হওয়া অনৈতিক আচরণ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।[৩৯৮] উদাহরণস্বরূপ, কালের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে পিতৃতান্ত্রিক কুসংস্কার পালন, নির্দিষ্ট ধর্মীয় কাজকে অলীক কুসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করা, এবং সামাজিক মর্যাদাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা ইসলামী নৈতিক শিক্ষার ক্ষতি করে। এর প্রভাব সমাজে ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিকতার অভাব তৈরি করে, মানুষকে কেবল আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখে, এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে, ইসলামের সঠিক চেতনা ও সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে যায়, যা সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের দেশের সমাজ, জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। প্রাচীন যুগ থেকে মুসলিম শাসনকাল, স্থানীয় জনগণের গ্রহণযোগ্যতা ও ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে দেশটি একটি সমৃদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতির ধারায় গঠিত হয়েছে। এই সংস্কৃতি কেবল ধর্মীয় আনুগত্যের প্রকাশ নয়, বরং নৈতিকতা, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সামাজিক মূল্যবোধকে প্রভাবিত করেছে।

---

৩৯৭ ফাহমিদ-উর-রহমান, *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২১ খ্রি., পৃ. ১১২

৩৯৮ মো. জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত, *আমাদের সংস্কৃতি বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০১ খ্রি., পৃ. ১৪৩

চতুর্থ অধ্যায়
মানব জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রায়োগিক ক্ষেত্র

চতুর্থ অধ্যায়

মানব জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রায়োগিক ক্ষেত্র

ইসালাম এমনই এক জীবন বিধানের নাম যাতে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলাম আগমনের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) মদিনা রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব প্রয়োগগুলো দেখিয়েছেন। মানুষ ইসলামী সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়েছে, আকৃষ্ট হয়েছে। দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে । এভাবে এক সময় ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক, রাষ্ট্র পরিচালনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন এমন কোন বিষয় নেই যেখানে ইসলামী সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন হয়নি। যা মানব জাতির জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হল কালের স্রোতে সেই ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সোনালী সংস্কৃতি মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে আজ ঠাঁই নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। অথচ কুরআন- সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা হওয়া উচিত প্রতিটি মুসলমানের জন্য কাঙ্ক্ষিত ও পালনকৃত একমাত্র পদ্ধতি। তাই ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সচেতন হওয়া উচিত, মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধনে পালন করা উচিত ইসলামী সংস্কৃতির দিকনির্দেশনা।

১. মৌলিক ভিত্তিসমূহ

ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে। এই বিষয়গুলো বিশ্বাস করা ও আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। এগুলোর যেকোন একটিকে অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। এই সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পৃথিবীতে মানবজাতি সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহর ইবাদত করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কাজকর্মে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলা।[৩৯৯] আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনের নির্ধারিত জীবন বিধান ও ব্যবস্থাপনাকেই বলা হয় ইসলাম এবং এর ব্যবহারিক রূপই হল ইসলামিক সংস্কৃতি। 'ইসলাম' আরবি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হল আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য জীবনবিধানের নাম হল ইসলাম। এই জীবন বিধান পালনের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম-আহকামের সামনে যারা আত্মসমর্পণ করে তাদেরকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের মৌলিক ভিত্তি বা স্তম্ভ হলো পাঁচটি। এটাই মূলত ইসলামের মৌলিক সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এই পাঁচটি বিষয় জানা এবং এসবের ওপর বিশ্বাস রাখা ও আমল

---

৩৯৯ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *কুরআনের আলোকে মানবজীবন*, ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.,পৃ.৬৫

করা আবশ্যক। একজন মুসলমানের জন্য এই পঞ্চস্তম্ভের কোনও একটিও অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। অনথ্যায় তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে না।[৪০০]

বিখ্যাত সাহাবী হজরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (স.) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এভাবে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, সলাত প্রতিষ্ঠা করা, জাকাত আদায় করা, হজ পালন করা এবং রমজান মাসের সিয়াম সাধনা করা।

১.১ কালিমা

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের কয়েকটি বাক্য ও বিষয়বস্তু হলো কালিমা। ঈমান ও বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো কালিমা। ইসলামে প্রবেশের প্রধান ও প্রথম ধাপহল "কালিমা তায়্যিবা" যার অর্থ হল পবিত্র বাক্য। এটি তাওহিদ, ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি। কালিমা-ই তায়্যিবা আরবিতে-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল।"ইসলামের প্রথম স্তম্ভ হল ঈমান। প্রতিটি মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব ঈমান আনা। ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। প্রতিটি মুসলমানকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ একমাত্র উপাস্য এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। তবে হাদিসে ঈমানের বিস্তারিত পরিচয় বর্ণিত হয়েছে এভাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিবরাইল (আ.) একবার ছদ্মবেশে এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈমান কাকে বলে?' জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'ঈমান হচ্ছে- আপনি বিশ্বাস স্থাপন করবেন আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানি কিতাবগুলোর প্রতি, আল্লাহর নবী-রাসুলদের প্রতি, কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং তকদিরের ভালো ও মন্দের প্রতি। এই হলো ঈমান।'[৪০১]

ঈমানের এই ছয়টি বিষয়কে ইসলামের পরিভাষায় 'ঈমানে মুফাসসাল' অর্থাৎ 'ঈমানের বিস্তারিত পরিচয়' বলা হয়। নবী-রাসুলদেরটি ছাড়া ইমানের অন্য সব কয়টি রোকন অদৃশ্য। আর নবী-রাসুলগণকেও এই যুগে এখন আর চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং ইমানের সার্বিক বিষ-য়াবলি গায়েব বা অদৃশ্য। পবিত্র কুরআনে মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এরশাদ হয়েছে, 'যারা অদৃশ্য বা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।'[৪০২]

---

৪০০ ইমাম আবু হানিফা, *আল-ফিকহুল আকবর: ইসলামী বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ*, অনুবাদ: ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০২, পৃ. ৭৮

৪০১ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হাদীস নং ৪৮

৪০২ আল- কুর'আন, ২: ৩

ইসলামের মৌলিক পরিভাষা হিসেবে ঈমান পরিভাষাটির মর্ম হলো- মহাবিশ্বের স্রস্টা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, অধিকার, ক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট বুঝ, জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করে তাঁর কাছে নিজেকে নিরঙ্কুশভাবে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ততা, স্বস্তি ও প্রশান্তি অর্জন করা এবং অন্যসব কিছু থেকে নির্ভয় ও নির্ভীক হয়ে যাওয়া। ইসলামের পরিভাষায় এমন ব্যক্তিকেই বলা হয় মু'মিন। যার অর্থ হলো স্থাপনকারী, গ্রহণকারী, অর্জনকারী। অপরদিকে মহান আল্লাহ নিজেও নিজেকে মু'মিন বলে পরিচয় দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে, তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।[৪০৩] আল্লাহর মু'মিন হবার অর্থ হলো তিনি আশ্রয়, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, নিশ্চিন্ততা, নির্ভয়,স্বস্তি ও প্রশান্তি প্রদানকারী।

আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো ঈমান। আল্লাহর প্রতি ঈমান ছাড়া আত্মার প্রশান্তি অর্জন অসম্ভব, আর ঈমানহীন আত্মা সদাসন্ত্রস্ত, হীন ও দূর্বল থাকে, সে আত্মায় থাকেনা কোন স্থিরতা ও প্রশান্তি। আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো নাজাত ও মুক্তির মূলমন্ত্র। ঈমানদারকে তার ঈমান আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ থেকে বিরত রাখে। খাঁটি ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমলে বরকত দান করেন এবং দু'আ সমূহ কবুল করেন।

১.২ সলাত

হিজরতের পূর্বে মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। এর পূর্বে দু' ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল। একজন মুমিনের জন্য ঈমান আনার পর মুসলমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হচ্ছে সলাত বা নামাজ। কুর'আন মাজীদ ও হাদীস শরীফের যত জায়গায় ঈমানের আলোচনা হয়েছে, তার প্রায় সকল জায়গাতেই ঈমানের পরেই সালাতের আলোচনা হয়েছে। সূরা বাকারার শুরুতেই ইরশাদ হয়েছে- এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা ঈমান রাখে গায়বের প্রতি, নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।[৪০৪] প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মুসলমানকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হয়। ভোরে ফজরের দুই রাকাত, দুপুরে জোহরের চার রাকাত, বিকালে আসরের চার রাকাত, সন্ধ্যায় মাগরিবের তিন রাকাত ও রাতে এশার চার রাকাত- এই সতেরো রাকাত নামাজ পড়া ফরজ। এ ছাড়া ওয়াজিব, সুন্নত, নফল নামাজ রয়েছে। সেগুলোও নিয়মিত আদায় করা উচিত। সালাত শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ইবাদত সম্পাদন করা। পবিত্র কোরআনে

৪০৩ আল- কুর'আন, ৫৯: ২৩

৪০৪ আল- কুর'আন, ২: ২-৩

বর্ণিত হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরজ করা হয়েছে।'[৪০৫] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? রাসুল (স.) বললেন, 'নামাজ'। আরও বলেন, 'যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে নেন।' নবুয়্যতের দশম বছর পবিত্র মেরাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়। ইচ্ছাকৃত নামাজ ত্যাগ করা কবিরা গুনাহ, অস্বীকার করা কুফুরি।[৪০৬] সলাত সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা দিয়ে, দায়িত্বপরায়ণতার দীক্ষা দিয়ে, পবিত্র অনুভব ও আবেগের এমন এক স্বর্ণালি শৃঙ্খল রচনা করে, যা আপাতদৃষ্টিতে মানুষকে কেবল শৃঙ্খলিতই করে না; উপরন্তু তা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পবিত্র দাসত্বের বন্ধনের মাধ্যমে অপরাপর সব বন্দিত্ব থেকেও মুক্তি দেয়। সালাতের প্রতিষ্ঠা দীন ও অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা।

সলাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) অনেক কথা বলেছেন । আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, তিনি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছেন, "বলতো যদি তোমাদের বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে?" তারা উত্তর দিলেন, তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসুল (স.) বললেন, "এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহ সমুহ মিটিয়ে দেন।"[৪০৭] সালাত আদায় স্রষ্টার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এমন এক ইবাদত যা বালেগ-বালেগা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এ সালাত আদায়ে আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণের পাশাপাশি দুনিয়াবী নগদ কল্যাণও আছে। সালাতের অন্যতম শিক্ষা হলো বিনয় ও নম্রতা। সালাতের মনস্তাত্বিক ব্যবহার হচ্ছে বিনয় নম্রতা অর্জন করা। বিনয় নম্রতার মাধ্যমে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। একাগ্রতাই সালাতকে প্রাণবন্ত করে তুলে। সালাত কবিরা গুনাহ ব্যতীত সকল পাপ মোচন করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমা থেকে অপর জুমা মধ্যবর্তী সময়ে কৃত গুনাসমূহের কাফ্ফারা। যাবৎ সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।'[৪০৮] সলাতের গুণগত মানের ভিত্তিতেই পরকালের সফলতা ও জান্নাতের সম্মানিত স্থান নির্ধারিত হবে।

---

৪০৫ আল- কুর'আন, ৪ : ১০৩

৪০৬ ড. ইউসুফ আল-কারযাবী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৭৮

৪০৭ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ". قَالُوا لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ " فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا "।মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারি, *সহীহ আল-বুখারি*, খণ্ড. ১, কিতাব মাওয়াকিত আস-সালাত, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি, হাদিস নং ৫২৮

৪০৮ (الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرَ), মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ. *সহীহ মুসলিম*. খণ্ড. ১, কিতাবুত তাহারাহ, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০ খ্রি, হাদিস নং ৫৫২

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত।'[৪০৯]অতঃপর বলেন, 'আর যারা নিজদের সালাত হিফাজত করে তারাই হবে ওয়ারিশ– যারা ফেরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।'[৪১০] এ সালাতের মাধ্যমেই জনৈক সাহাবি তার অপর শহিদ ভাইয়ের আগে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফিক লাভ করেছেন। সালাতের মাধ্যমেই মুমিন ব্যক্তি কখনো কখনো সিদ্দিক ও শহিদদের স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। সালাত আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন। ইসরা ও মেরাজের সফরে তথা আসমানে সালাত ফরজ করা হয়েছে, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত সালাত আসমান ও জমিনের মাঝে সেতু বন্ধন হয়ে থাকে, দুনিয়ার পঙ্কিলতা ও পার্থিব নিচুতা থেকে রূহানি উর্ধ্ব জগতে আরোহণের দরজা বান্দার জন্য সর্বদা উম্মুক্ত থাকে। যদিও আসমান দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জিনিস নয়। তবে অনেক দূরে। সালাত এক মেরাজ, এতে রূহসমূহ বিনীত ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দরবারে ফিরে যায়। সালাতের মাধ্যমে মুমিনগণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) নৈকট্য অর্জন করেছিলেন মেরাজের মাধ্যমে। সালাত বোরাক স্বরূপ। এর মাধ্যমে বান্দা খুব দ্রুত তার ও আল্লাহর মাঝখানের দূরত্ব অতিক্রম করে। সেজদা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্ব শেষ স্থান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সেজদা কর এবং নিকটবর্তী হও।'[৪১১]

১.৩ যাকাত

ইসলাম-পূর্ব সমাজে দুর্বল ও দরিদ্রদের সাথে ধনীদের পার্থক্য ছিল উল্লেখ করার মতো। ঐ সময়ের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, তখন মানুষ মূলত দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত। হয় ধনী, নয়তো দরিদ্র। এ দু'য়ের মাঝে তৃতীয় শ্রেণির কোনও অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন মিশর ছিল পৃথিবীর বুকে আল্লাহ'র জান্নাত। কারণ সেখানে এত বেশি ফসল ও খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হত, যা সেখানকার অধিবাসীদের কয়েকগুণ বেশি লোকের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তবুও সেখানকার দরিদ্র শ্রেণি খাবার থেকে বঞ্চিত হতো। মিশরের ধনীরা গরীবদের জন্য উচ্ছিষ্ট বা তলানি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখতো না। কিন্তু ঐ উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন ধারণ করা সেখানকার অধিবাসীদের জন্য অসম্ভব ছিল। ব্যাবিলনেও দরিদ্রদের অবস্থা মিশরের মতো ছিল। ধনীদের উন্নতি, অগ্রগতি, ধন-সম্পদের কোনও ছিঁটেফোঁটা সেখানকার গরীব মানুষের ভাগ্যে জুটতো না।

প্রাচীন গ্রিক সমাজের অবস্থাও মিশর বা ব্যাবিলনের চাইতে খুব বেশি আলাদা ছিল না। সেখানে গরীবদের দিয়ে অত্যন্ত হীন কাজ করানো হতো এবং সামান্য কারণে গরীবদেরকে জবাই বা কতল পর্যন্ত করতো। তাই ইসলামে যাকাতকে এতটা গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়েছে, যাতে মানুষের মধ্যকার

---

৪০৯ আল- কুর'আন, ২৩: ০১-০২

৪১০ আল- কুর'আন, ২৩: ০৯-১১

৪১১ (كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب), আল- কুর'আন, ৯৬:১৯

এই দূরত্ব ঘুচে যায়। হিজরি দ্বিতীয় বর্ষ, অর্থাৎ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইসলামে যাকাতকে বাধ্যতামূলক করা হয়। কুর'আনের ৩২টি আয়াতে 'যাকাত' শব্দটি এসেছে। এর মাঝে ২৭টি আয়াতে এটি নামাজের সাথে একত্র করে এসেছে। যাকাত ইসলামের অন্যতম ফরয ইবাদত। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হলো নামাজ ও যাকাত। পবিত্র কোরআনে যত জায়গায় নামাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে পাশাপাশি শব্দে যাকাতের আদেশও দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা সালাত আদায় করো এবং জাকাত প্রদান করো। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য আগে পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখছেন।'[৪১২] যাকাত দাতার মনকে ধনসম্পদের প্রতি লোভ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে। ধনীদের ধনসম্পদে যে দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে, এই সত্যকেও প্রতিষ্ঠিত করে। যাকাত শব্দের অর্থ পরিশুদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি। যাকাতের মাধ্যমে মুসলমানদের সম্পদ পরিশুদ্ধ হয় এবং বরকত অবতীর্ণ হয়। যাকাত অস্বীকার করা কুফুরি। কারও কাছে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা থাকলে এবং তা এক বছর পূর্ণ হলে জাকাত ফরজ হয়। যাকাত গরিবের হক। কুর'আনে যাকাতের হকদার আট শ্রেণির কথা বলা হয়েছে। যাকাত না দিলে কঠিন শাস্তি হবে পরকালে। কিন্তু যাকাত কীভাবে কতটুকু দিতে হবে সে বিষয়ে অনেকের মধ্যেই আছে নানা প্রশ্ন। 'যাকাত শরীয়তের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। যাকাতের ফরযিয়তকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।'[৪১৩]

চার ধরণের সম্পদের ওপর যাকাত ফরয। সেগুলো হলো: মূল্যবান সম্পদ, পশু, জমিন থেকে উৎপাদিত ফসল ও ব্যবসায়িক সম্পদ। যাকাত প্রকৃত পুণ্যশীলের পরিচয়, মুমিনের বন্ধু, সৎকর্মপরায়ণদের বৈশিষ্ট্য, মসজিদ আবাদকারী, কুরআন মাজীদে যাদের জন্য রয়েছে শুভসংবাদ, যাদেরকে বলা হয়েছে হেদায়েতপ্রাপ্ত, ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভকারী মুমিনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিসহ দ্বীনের মৌলিক পরিচয়ের ক্ষেত্রেও সালাত-যাকাতের বিষয়টি অবধারিতভাবেই আসে।

১.৪ সাওম

মানব জীবনের আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সাওম । এটি একজন মানুষকে তার ব্যক্তিগত দোষত্রুটি দমনের মাধ্যমে তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে যেমন সর্বজন শ্রদ্ধেয় করে তোলে, তেমনি মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়ে তাকে চিরকালীন সফলতা দান করে।

---

৪১২ (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ), আল- কুর'আন, ২:১১০

৪১৩ ইমাম আয্ যাহাবী, *কবীরা গুনাহ*, অনুবাদ: মাওলানা আকরাম ফারুক ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৭৮

সাওম পালনের মূল উদ্দেশ্যেই তাকওয়া অর্জন। রমজান মাসে সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে সহজেই তাকওয়া অর্জনের রুদ্ধদ্বার সবার জন্য উন্মোচিত হয়। তাই সাওম পালন অতীব জরুরি। কারণ আল্লাহকে খুশি করতে এই ইবাদতের ও আমলের কোন বিকল্প নেই। এইজন্য সিয়াম সাধনা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে। যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ ছিলো। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো'।[৪১৪] সকল প্রকার অবৈধ কার্যাবলী থেকে মুক্ত থাকতেই সাওম বা সিয়াম সাধনা। সিয়ামের মৌলিক শিক্ষা হলো, সারাবছরের কৃত পাপ চর্চার কু-অভ্যাস বর্জন করে ইবাদত ও বেশি বেশি আমলের অভ্যাস গড়ে তোলা। সিয়াম পালন ঈমানদারের অন্তরে ধৈর্যের প্রাচীর তৈরি করে। তা এক আল্লাহর ওপরেই ভরসা রাখার সাহস জোগায় বালা-মুসিবতে। এছাড়া রমজান অতিক্রম করলেও ধৈর্যের কারণে অন্য সকল মাসে যাবতীয় ইবাদত পালন অধিকতর সহজ হয়ে যায়। সিয়াম পালন করলে যেহেতু মুসলমানদের মাঝে আত্মসংযমের অভ্যাস গড়ে উঠে তাই একে অপরের সাথে আচার ব্যবহারেও ঘটে এর প্রতিফলন। খেয়াল করলে দেখা যায় সমাজে বিশৃংখলা অনেকাংশে হ্রাস পায়।[৪১৫] কমে যায় শান্তি ভঙ্গের আশংকাও। পরস্পরের মাঝে ধৈর্য, ক্ষমা, সহানূভূতি ও সহমর্মিতার চর্চার ফলে সমাজ জীবন হয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে হয় উদ্ভাসিত। বেশি বেশি দান সদকার মাধ্যমে ধনি-গরীবের মাঝে এক বন্ধনের সূত্রপাত হয়।মানুষের মাঝে পাস্পারিক দূরত্ব কমে। সিয়াম সাধনায় কেবল ধর্মীয় বিধিবিধানের উদ্দেশ্য সাধিত হয় তেমন নয়; বরং এটি বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনীতিরও একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এর রয়েছে শারীরিক ও মানসিক উপকারিতাও। রমজানে নিয়মিত সিয়াম সাধনার ফলে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: উচ্চ কোলেস্টেরল, হৃদ্‌রোগ ও স্থূলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। পাওয়া যায় মানসিক প্রশান্তি। যেমন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এ সময় স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়, যা ব্রেইনের কর্মক্ষমতাকে অনেকটাই বাড়িয়ে তোলে। তাই শুধু ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বিধান হিসেবেই নয় বরং দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও ইতিবাচক জীবনদর্শনের জন্য সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.৫ হজ্ব

ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহের পঞ্চমটি হল হজ্বে বায়তুল্লাহ। হজ্ব মূলত কায়িক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বিত একটি ইবাদত। তাই উভয় দিক থেকে সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর হজ্ব পালন করা ফরয। অর্থাৎ হজ্ব আদায়ে সক্ষম এমন শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচাপাতি ও আসবাবপত্রের

---

৪১৪ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ),আল- কুর'আন, ২: ১৮৩

৪১৫ ইমাম আবু হানিফা, *আল-ফিকহুল আকবর: ইসলামী বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

অতিরিক্ত হজ্বে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং হজ্ব আদায়কালীন সাংসারিক ব্যয় নির্বাহে সক্ষম এমন সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্ব আদায় করা ফরয। হজ্ব প্রত্যেক মুসলমানের উপর সারা জীবনে একবারই ফরয হয়। একবার ফরয হজ্ব আদায়ের পর পরবর্তী হজ্বগুলো নফল হিসেবে গণ্য হবে। হজের আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা, দৃঢ় সংকল্প করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করাকে হজ বলে। হজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত; ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি; যা স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও পূর্ণ আনুগত্যের প্রতীক। স্রষ্টার সঙ্গে বান্দার ভালোবাসার পরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপ হলো হজ। জিয়ারতে বাইতুল্লাহর মাধ্যমে খোদাপ্রেমিক মুমিন বান্দা তার মালিকের বাড়িতে বেড়াতে যায়, অনুভব করে দিদারে ইলাহির এক জান্নাতি আবেশ। মহান আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেন, আর এই ঘরের হজ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য; যার সামর্থ্য রয়েছে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে এটা অস্বীকার করবে আল্লাহ বিশ্বজগতের সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।[৪১৬] মহান আল্লাহ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে আরো ইরশাদ করেন, আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করুন। তারা আপনার কাছে আসবে দূর-দূরান্ত থেকে পদযোগে ও সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে আরোহণ করে।[৪১৭] হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন-'তোমরা হজ্ব ও ওমরাহর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখ (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে কর)। কেননা এ দুটি মুমিনের দরিদ্রতা ও গোনাহগুলো দূর করে দেয়, যেমন (কামারের আগুনের) হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূর করে দেয়। আর কবুল হজ্বের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়'।[৪১৮] হজ্ব একটি ইবাদত, যা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিশেষ মর্যাদা লাভ করা যায়। তাই প্রত্যেকের হজ্ব পালন করা উচিত। আয়েশা (রা.) হজ্বের বিধান জানার পর কখনো হজ্ব ত্যাগ করেননি। হজ্বের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে এর কার্যাবলী সম্পাদন করে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে পৃথক পৃথক ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে। রাসূল (স.) আয়েশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন- 'তোমার কষ্ট ও খরচের পরিমাণের ওপর তোমার সওয়াব প্রাপ্তি নির্ভর করবে'। সুতরাং আমাদের উচিত হজ্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি সম্পন্ন করা।

---

৪১৬ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ), আল-কুরআন, ৩: ৯৭

৪১৭ (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ), আল-কুরআন, ২২: ২৭

৪১৮ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: কিতাবুল হাজ্জ, অনুবাদ. ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., হাদীস নং ১৬৫৮

২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

ইসলামে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঈমানদার নর-নারীর গুণাবলি বর্ণনায় প্রথমেই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার গুণটি উল্লেখ করেছেন। কল্যাণকামী সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ জরুরি বিষয়। কেননা মানুষের মধ্যে যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার মনমানসিকতা তৈরী হয়, তখন সমাজে অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন বাসা বাঁধতে পারে না। শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করা সহজ থেকে সহজতর হয়। মানুষের মধ্যে ভালোবাসা- সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন: আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।[৪১৯]

তিনি আরো বলেন, তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে।[৪২০] দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে। অসৎকাজে নিষেধ করা মুমিনের অন্যতম গুণ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তারা হচ্ছে আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাগমনকারী, তার ইবাদাতকারী, তা প্রশংসাবাণী উচ্চারণকারী, তা জন্য জমিনে বিচরণকারী, তার সামনে রুকু ও সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধা দানকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী।[৪২১] সমাজে এই ইবাদতের চর্চা বন্ধ হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবুঝ ও গাফেল ব্যক্তিরা আল্লাহর পথ চিনতে পারে না। ফলে অন্যায় কাজে ডুবে থাকে মানুষ। তখন মহান আল্লাহর ক্রোধ বেড়ে যায়। ওই সমাজে আজাব নেমে আসে এবং তাদের কোনো দোয়াও কবুল করা হয় না। তাই মুমিন মুসলমানের জন্য বাঞ্ছনীয় সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা। প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী এ কর্তব্য পালন করা উচিত। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, তারা হচ্ছে তাওবাহকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও

---

৪১৯ (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ), আল-কুর'আন, ৩: ১০৪

৪২০ (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ), আল-কুরআন, ৩: ১১০

৪২১ (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ), আল-কুর'আন, ৯: ৭১

সাজদাহকারী, সৎ বিষয় শিক্ষা পদানকারী এবং মন্দ বিষয়ে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহর সীমাসমূহের (অর্থাৎ আহকামের) সংরক্ষণকারী; আর তুমি এমন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।[৪২২]

৩. পারিবারিক ব্যবস্থাপনা

পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব মানুষ আজীবন বহন করে এবং তা দ্বারা পরিচালিত হয়। পরিবার থেকে সুশিক্ষা পেলে ভালো মানুষ হওয়া সহজ হয়। পক্ষান্তরে পরিবার থেকে সুশিক্ষা না পেলে বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ভালো মানুষ হওয়া কষ্টকর হয়। কাজেই পরিবার অনন্য এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শৈশব, কৈশোরসহ জীবনের বড় অংশ নিজ পরিবারেই কাটাতে হয়। মানবজীবনে পরিবারের প্রভাব অপরিসীম। সে ক্ষেত্রে পরিবারে শিক্ষাদীক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে পরিবারের সদস্যরা সহজে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে পরিবার পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠন হিসেবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নীতিমালা অনুসরণ করে আসছে। গৃহই হল পরিবারের একমাত্র আশ্রয়স্থল। পরিবারের সদস্যদের চাহিদা ও সক্ষমতা অনুসারে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গৃহের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সঠিক ব্যবস্থাপনার। গৃহ ব্যবস্থাপনা পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান, মেধা, কর্মদক্ষতা ও আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রচলিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তার বাস্তব রূপ দেয়। জীবনযাপনের গুণগত মান বৃদ্ধির মাঝেই ব্যবস্থাপনার যথার্থতা প্রকাশ পায়। ইসলামী গৃহ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হল পারিবারিক জীবনে জৈবিক তৃপ্তি অর্জন, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুতকরণ, পবিত্রতা বজায় রাখা, নৈতিকতার শিক্ষা বাস্তবায়ন করা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সন্তানদের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার আলোকে গড়ে তোলা। পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য আল্লাহ রাববুল আলামীন প্রথমে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁর পাজর থেকে জুড়ি হিসেবে হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। তাঁদের উভয়ের দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে প্রথিবীতে পরিবারের সূচনা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।"[৪২৩] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার..।"[৪২৪] আর এভাবেই

---

৪২২ (اَلَّذِينَ تُبْدِيٓءُ وُجُوهَهُمْ قَبِلَ اَلنَّارِ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ اَلْخِزْيُ اَلْعَظِيمُ), আল-কুর'আন, ৯: ১১২

৪২৩ আল-কুর'আন, ৪: ১

মানুষের সামাজিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়। মানুষ সকল যুগ ও কালে কোন না কোনভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীন কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর আদি সংস্থা। ইসলাম পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করার জন্য নানা বিধিবিধান প্রবর্তন করেছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবের মাধ্যমে এসব বিধান মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইসলাম পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে।

৩.১ পারস্পরিক দায়িত্ববোধ

বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন বিশ্ব প্রকৃতির এক স্বভাব সম্মত বিধান। এটা এক চিরন্তন ও শাশ্বত ব্যবস্থা– যা কার্যকর রয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির পরতে পরতে প্রতিটি জীব ও জড়বস্তুর মধ্যেও। কুর'আনের ঘোষণা,

وَ مِنۡ كُلِّ شَیۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَیۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ

"প্রত্যেকটি বস্তুকেই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।"[৪২৫] মুসলিম পরিবার তাই এ বিশ্বনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আপন ও প্রিয়জন নিয়ে মিলেমিশে বসবাস করার মধ্যেই রয়েছে শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও আনন্দ। এ কারণেই মানুষ আদিকাল হতেই সমাজভুক্ত পারিবারিক জীবনে অভ্যস্ত। ইসলামী পরিবার কুরআন সুন্নাহর নীতির ভিত্তিতে তথা ইসলামী জীবন বিধান মত গড়া। আল্লাহর বিধানের আওতায়ই স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সন্তান জন্মদান করে। আর এ বিধান মতই একে অন্যের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

মুসলিম পরিবারের প্রত্যেক সদস্যেরই যথারীতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। একে অপরকে সৎ কাজে উপদেশ ও উৎসাহ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অভিভাবক ইসলামী ভাবধারায় পরিব-ার পরিচালনা করবে। বড়রা ছোটদেরউত্তম বিষয়গুলো শিক্ষা দেবে। জীবনে চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরস্পর পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এমনকি, মহান প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইসলামসম্মত সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। ইসলামী পারিবারিক জীবনে পুরুষকে পরিবারের কর্তা বা অি-ভভাবক নিযুক্ত করে তার উপর ভরণ-পোষণ, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যেমন– মহান আল্লাহর ঘোষণা, اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ "পুরুষ নারীর কর্তা।"[৪২৬] ইসলামী পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, ইসলামী পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। এ পরিবারের কর্তা থাকেন পিতা। পিতার অনুপস্থিতিতে মাতা বা বড় ভাই।

---

৪২৪ আল-কুর'আন, ৪৯: ১৩

৪২৫ আল-কুর'আন, ৫১: ৪৯

৪২৬ আল-কুর'আন, ৪: ৩৪

ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহায়ক ও সম্পূরক। এরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। একে অন্যের পরিপূরক ও পরিপোষক। একে অন্যের সম্মান ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ, আর তোমরা তাদের ভূষণ।"[৪২৭]

ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্বের ক্ষেত্র ভিন্ন। পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাইরের অঙ্গন। আর পরিবারের অভ্যন্তরের দায়িত্বে থাকবে নারী। আল্লাহ্‌র রাসূল (স) বলেছেন: 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকে একজন রক্ষক এবং তিনি তার রক্ষিতদের জন্য দায়ী। নেতা তার প্রজাদের রক্ষক ও দায়ী; পুরুষ তার পরিবারে রক্ষক ও দায়িত্বশীল; নারী তার স্বামীর সংসার ও সন্তানদের রক্ষক এবং তাদের সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত।[৪২৮]

৩.২ ভক্তি-সম্মান ও স্নেহ-মমতার উৎস স্থল

মুসলিম পরিবার ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল সদস্যের প্রতি দাবী করে শ্রেণীমত ভক্তি-সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং আদর-স্নেহ, মমতামাখা আচরণ। বড়রা ছোটদের স্নেহের পরশ দিয়ে মানুষরূপে গড়ে তুলবে। আর ছোটরা বড়দের সাথে সম্মান দিয়ে তাদের মেনে চলবে। মহানবী (স.) এ প্রসঙ্গে বলেন : "যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করে না সে আমাদেও দলভুক্ত নয়।"[৪২৯] মুসলিম পরিবারের প্রকৃতি হলো পারস্পরিক প্রীতি-ভালবাসা, দয়া-সহানুভূতি ও প্রেমই মুসলিম পরিবারে এনে দেয় স্বর্গ-সুখ। ইসলামী পরিবার একটি শান্তির নীড়। ইসলামী পরিবার একটি অনন্ত শান্তি নিকেতন, তৃপ্তি আর প্রশান্তির আবাসভূমি। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম, ভালবাসা ও করুণার সঞ্চার করে দিয়েছেন।"[৪৩০] ইসলাম পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করার জন্য নানাবিধ বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে, যেগুলো পরিবারের প্রতি ইসলামের সীমাহীন গুরুত্বারোপের প্রমাণবাহী। পারিবারিক সম্পর্ক অটুট থাকলে মানুষ বহু ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। কেননা তারা পরস্পরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, لنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

---

৪২৭ (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ), আল-কুর'আন, ২: ১৮৭

৪২৮ (وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا), সহীহ বুখারী, কিতাবুল নিকাহ, হাদীস নং-৫২০০

৪২৯ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا), আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআশ, *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, كتاب الأدب হা. ৪৯৪৩

৪৩০ আল-কুর'আন, ৩০: ২১

'আল্লাহর বিধানে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পর পরস্পরের নিকট অগ্রগণ্য। আল্লাহ সকল বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অবগত।'[৪৩১] পারিবারিক জীবনে কোনো সংকট দেখা দিলে তা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। পবিত্র কুর'আনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَابۡعَثُوۡا حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهٖ ۚ وَ حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهَا ۚ اِنۡ يُّرِيۡدَاۤ اِصۡلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيۡنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا خَبِيۡرًا ۝

'তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার পরিবার থেকে একজন ও তার পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ের নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।'[৪৩২]

৩.৩ পারস্পারিক দায়িত্ববোধ

পারিবারিক জীবনকে প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র বলা হয। কেননা, একটি শিশু আশৈশব মানবীয় গুণাবলী, সৌজন্যবোধ, আচার-আচরণ, বিনয়, পরোপকার, ত্যাগ, নিষ্ঠা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি পারিবারিক পরিবেশেই শিক্ষা লাভ করে থাকে। যা পরবর্তীতে জীবন চলার দিশারী হয়। ইসলামি পারিবারিক ব্যবস্থায় এর সদস্যদের বিশেষ করে সন্তান- সন্ততিদেরকে শৈশব হতে ইসলামের শিক্ষায় প্রশিক্ষণ এবং তা জীবনে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করাও পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য। পরিবার আমাদের আর্থ-সামাজিক ও দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তা এনে দেয়। পরিবারবিহীন মহা শূন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতা মানুষকে নোঙরবিহীন নৌকার মতো স্থিতিহীন করে দেয়। পারিবারিক জীবনের মধ্যেই মানুষের সামাজিক জীবনের সূচনা হয়।[৪৩৩] সমাজ-সভ্যতা ও মানবতার অগ্রগতি পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং সমাজ-সভ্যতার ও মানবতার ভিত্তি স্তর হচ্ছে এ পরিবার। ইসলামী পরিবারে সবাই বৈধ উপার্জন করে কিনা, পরিবারের কর্তা সেদিকে খেয়াল রাখেন। ইসলামী পরিবার একটি জবাবদিহিমূলক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। পরিবারের সকলের কাজ কর্মের এবং অধিকার ও কর্তব্যের যেমন পরিবারে জবাবদিহি করতে হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারেও জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামী পরিবারে শিশুদের স্নেহ, মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সমবেদনা, উদারতা, ত্যাগ ইত্যাদি সামাজিক মানবীয় গুণাবলির প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। পারিবারিক জীবনে ছোট-বড় সকল সদস্যের নৈতিক চরিত্র গঠন ও উৎকর্ষ সাধনের এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে। সন্তানকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার এটাই হলো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইসলাম মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কেননা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আবশ্যক হলো সমাজের প্রতিটি সদস্যের জীবনের নিরাপত্তা ও কল্যাণ

---

৪৩১ আল-কুর'আন, ৮: ৭৫

৪৩২ আল-কুর'আন, ৪: ৩৫

৪৩৩ মুহাম্মাদ মতিউর রহমান, *মানবাধিকার ও ইসলাম*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৬, ২০০২

নিশ্চিত করা। আবার সামাজিক শৃঙ্খলা ছাড়া মানুষের ব্যক্তি জীবনের অগ্রগতি ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। মানুষের মনুষ্যত্বও তত দিন পূর্ণতা লাভ করে না, যত দিন না সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। ইসলাম সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এমন কিছু সামাজিক মূলনীতি দাঁড় করিয়েছে, যেখানে একদিকে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও জীবনধারাকে আল্লাহর আনুগত্য এবং ধর্মের অনুসরণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে মানুষের জন্য সার্বজনীন কল্যাণ, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা, সাম্য ও সমতা নিশ্চিত করেছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা একান্ত প্রয়োজন। সুরা বাকারার ১২৬ নং আয়াতে হজরত ইব্রাহিম (আ.) নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের মিলেমিশে বসবাস করার প্রবণতা প্রাচীন। আধুনিক যুগে মানুষ বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করলেও রাষ্ট্রীয় ওসমাজিক জীবনেরপ্রাথমিক সোপান হল পরিবার। একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য সুষ্ঠু, পূত-পবিত্র পারিবারিক জীবন অত্যন্ত জরুরি। নৈতিকতা-মানবিকতা ইত্যাদি গুনাবলী অর্জনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা, ব্যক্তি জীবনে যেসব দোষ-গুণ মানুষ অর্জন করে তার বেশির ভাগই পারিবারিক জীবনের পরিচর্যার ফসল। আবার ব্যক্তি জীবন ভালো না হলে ভালো পরিবার গঠিত হয় না, ভালো পরিবার গঠিত না হলে সুন্দর সমাজ গঠিত হয় না। তাই নৈতিক মানবিক জীবন গঠনে পারিবারের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৪. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামী অর্থনীতি সেই ইসলামী জীবনব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ। ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানব কল্যাণময়, বৈজ্ঞানিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী যে কোন অর্থব্যবস্থার তুলনায় প্রগতিশীল এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর। ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী আদর্শ, জীবন দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িতইসলামী সংস্কৃতির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ খুবই জরুরী। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের বাস্তব উদাহরণ মদিনা রাষ্ট্র এবং পরবর্তী সময়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দেখা যায়। জীবিকা মানুষের মৌলিক চাহিদা। আবার হালাল জীবিকা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। তাই ইসলাম জীবিকার্জনে সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রদান করে। মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

'হে মানুষ! তোমরা খাও যমীনে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে। আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৪৩৪] হালাল-হারাম ইসলামের এক অনন্য অলঙ্ঘনীয় বিষয়। জীবিকা উপার্জনের ইসলাম অনুমোদিত মাধ্যমগুলোর অন্যতম হলো ব্যবসা। পবিত্র আল কুর'আনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য যাবতীয় খরচ নিখুঁত, পবিত্র, সৎ অর্থের মাধ্যমে উপার্জিত হতে হবে। বৈধভাবে উপার্জনের নির্দেশ প্রত্যেক নবীর জন্যও ছিল। মানুষ জীবনে যা যা ভোগ বা উপভোগ করে, সবই তার রিজিক। হালাল রিজিক ইবাদত কবুলের অন্যতম প্রধান শর্ত। রিজিক হালাল বা পবিত্র এবং বৈধ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত, ব্যবহার্য, ভোগ্য বা উপভোগ্য বস্তু বা বিষয়টি হালাল তথা পবিত্র ও অনুমোদিত হতে হবে। দ্বিতীয়ত, তা পাপ্তি বা অর্জনের পথ বা মাধ্যম হালাল বা বৈধ হতে হবে। এ দুইয়ের কোনো একটির ব্যত্যয় ঘটলে ওই রিজিক হালাল বা পবিত্র হবে না। নবী রাসুলগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁরা নিষ্পাপ। তবু আল্লাহ তা'আলা কুর'আন মাজিদে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ۝

'হে রাসুলগণ! তোমরা হালাল পবিত্র উত্তম রিজিক খাও আর সৎকর্ম করো।'[৪৩৫] অতঃপর সকল বিশ্ববাসীর উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۝

'হে মুমিনগণ! তোমরা হালাল উত্তম রিজিক আহার করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি।'[৪৩৬]

৪.১ সম্পদের মালিকানা

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের চূড়ান্ত মালিক মহান আল্লাহ। তবে মানুষ আনুগত্য ও বিধান মানার শর্তে সম্পদের মালিক হতে পারে। মানুষের পারস্পরিক লেনদেনে এই ব্যক্তিগত মালিকানা নিরঙ্কুশ। প্রতিটি মানুষের উপার্জন কেবল তার। মানবজীবনের প্রয়োজনে সম্পদ সুরক্ষায় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পবিত্র কুরআনে সম্পদকে কখনো কল্যাণের উৎস, কখনো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং কখনো ফিতনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধন-সম্পদ মানব জীবনের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান। ইসলাম এ সম্পদ রক্ষারও প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করেছে। যেমন-

৪৩৪ আল-কুর'আন, ২:১৬৮
৪৩৫ আল-কুর'আন, ২৩: ৫১
৪৩৬ আল-কুর'আন, ২: ১৭২

৪.১.১ রিযিকদাতা আল্লাহ

আল্লাহ মহান ও পবিত্র। তিনিই একমাত্র প্রতিপালক। তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও রিজিকদাতা। তিনি সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপক। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীকে উত্তম রিজিক দেন। এমনকি কখনও কখনও মানুষের চেয়ে জীবকে উৎকষ্ট রিজিকই দিয়ে থাকেন। আল্লাহ পাকই সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং রিজিকদাতা। সুতরাং রিযিকের জন্য অন্যের ধন-সম্পদে লোভী না হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করাই ইসলামের মৌলিক বিধান।

৪.১.২ সম্পদের সুষম বণ্টন সম্পদের সুষম বণ্টন

পবিত্র কোরআনে সুরা নিসার মধ্যে উত্তরাধিকার ও সম্পদ বণ্টনের বিধানাবলি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি ও স্বামী-স্ত্রীর বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে পৃথক পৃথক মূলনীতি। যাতে স্বজনদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়। জাতীয় পর্যায়ে আয়ের উৎস ও বণ্টননীতিতে ইসলাম অসাধারণ নীতি প্রণয়ন করেছে। প্রচলিত অর্থনীতিতে বণ্টন নীতির বিপরীতে ইসলাম বাস্তব এবং কার্যকর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। ইসলামের এই সুষম বণ্টননীতি ইসলামী অর্থনীতিতে অনন্য ও যুগোপযোগী নীতিগুলোর অন্যতম। ইসলামী অর্থনীতি স্বচ্ছ, সাবলীল এবং বাস্তবধর্মী।[৪৩৭] এ জন্য মহান আল্লাহ তাআলা সুরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেন, 'সম্পদ যেন তোমাদের কতিপয় ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। মহানবী (স.)-এর প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সাম্যনীতি বহাল ছিল। পরবর্তী মুসলিম শাসনামলেও ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সম্পদকে সাধারণত চারটি প্রধান ভাগে ভাগ বরা যায়। যথা-১. ব্যক্তিগত সম্পদ, ২. সমষ্টিগত সম্পদ, ৩.জাতীয় সম্পদ এবং ৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ।[৪৩৮]

ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ প্রথম পর্যায়ে তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে যারা সরাসরি উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণ করে বা য়াদের উৎপাদন কাজে অংশ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, "পুরুষ যা অর্জন করে সে তার অংশ পাবে এবং নারী যা অর্জন করে সে তার অংশ পাবে।" [৪৩৯]এ অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদকের সংখ্যা ও পরিভাষা পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রের মত নয় বরং এর চেয়ে ভিন্ন, যা নিম্নরূপ,

ক. মূলধন

ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে মূলধন হল ঐসব সামগ্রী যা ব্যয় বা পরিবর্তন ছাড়া উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না। যেমন- নগদ টাকা পয়সা, খাদ্য ইত্যাদি। আর মূলধনের বিনিময় হবে মুনাফা সুদ নয়।

---

৪৩৭ বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *ইসলামী জীবন ব্যবস্থা*, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৭৮

৪৩৮ ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৩৯ (لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۖ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ), আল-কুর'আন, ৪: ৩২

মূলধনদাতাকে অবশ্যই উৎপাদনের লাভ-ক্ষতির ঝুকি বহন করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও যৌবন বয়সে ব্যবসা করেছেন। মক্কার সাহাবিগণ অধিকাংশই ব্যবসায়ী ছিলেন। তারা বছরে দু বার শীত ও গ্রীষ্মকালে শাম ও ইয়েমেন দেশ থেকে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করতেন-যা সূরা কুরায়শে বর্ণিত হয়েছে।

বড় বড় সম্পদশালী ব্যবসায়ী সাহাবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু বকর সিদ্দিক (রা.), উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), উসমান বিন আফফান (রা.), আব্দুর রহমান বিন আউফ, তালহা বিন উবাইদিল্লাহ, তালহা বিন যুবাইর, যুবাইর ইবনুল আওয়াম প্রমুখ সাহাবিগণ।

আমাদের পূর্বসূরি মহামতি ইমামগণও ব্যবসা করতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক বিন আনাস রহ., ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ., ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক রহ. প্রমুখ।

তৎকালীন জাহেলি যুগ থেকে আরবে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাণ কেন্দ্র ছিলে উকাজ, মিজান্না, যুল মাজায, বনু কাইনুকা প্রভৃতি। সেখানে সাহাবিগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে গুনাহের কারণ মনে করলে আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাজিল করে তাদের সেই সংকোচ উঠিয়ে নিয়ে সেগুলো ব্যবসা করতে উৎসাহ দিলেন। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাজিল হল,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم

"তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন গুনাহ নেই।"[৪৪০]

খ. ভৌত সম্পত্তি

কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও ব্যয় ছাড়া যে সব সামগ্রী পুনঃ পুনঃ উৎপাদন কাজে ব্যবহার্য হয় তাকে ভৌত সম্পত্তি বলা হয়। যেমন- ভূমি, ঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এসব সম্পত্তির বিনিময় হিসেবে তার মালিককে ভাড়া প্রদান করা হবে মজুরী। ইজারা মূলত মানুষের মাঝে পরস্পর সুবিধা বিনিময়। শ্রমিকদের কাজের প্রয়োজন, থাকার জন্য ঘরের দরকার, মালামাল বহন, মানুষের আরোহণ ও সুবিধার জন্য পশু, গাড়ি ও যন্ত্রের দরকার। আর ইজারা তথা ভাড়ায় খাটানো বৈধ হওয়ায় মানুষের জন্য অনেক কিছু সহজ হয়েছে ও তারা তাদের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হচ্ছে। আবার শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাড়াকৃত ভবন/ফ্ল্যাট ভাড়াটিয়ার হাতে আমানত। এর যথাযথ ব্যবহার না করলে বা এক্ষেত্রে অবহেলা করলে সেটি খেয়ানত হবে। তাই বাড়ির সবকিছু যত্ন সহকারে ব্যবহার করতে হবে। সজাগ থাকতে হবে যেন ব্যবহারের ত্রুটির কারণে কোনো জিনিস নষ্ট না হয়।

৪৪০ আল-কুর'আন, ২: ১৯৮

গ. শ্রম

উৎপাদনে মুনাফা সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করা হয় তাই-ই শ্রম। দৈহিক শ্রম যেমন- কৃষি,দিনমজুরী, বুদ্ধিভিত্তিক শ্রম যেমন- শিক্ষক, ডাক্তার আইনগত শ্রম বা ওকালতি সব প্রকার শ্রমই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক পাবে। ইসলাম শ্রমকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। ইসলাম শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনা দিয়েছে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, 'অতঃপর যখন নামাজ পূর্ণ করা হবে, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়ো; আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হবে।'[৪৪১]

হাদিস শরিফে রয়েছে, 'ফরজ ইবাদতগুলোর পরেই হালাল উপার্জন করা একটি ফরজ ইবাদত।' (তিরমিজি) 'হালাল উপার্জনগুলোর মধ্যে তা সর্বোত্তম, যা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।' (মুসলিম) শ্রমিকের পারিশ্রমিকের পরিমাণ অন্তত এমন হতে হবে, যাতে তাঁর খোরপোশ ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত ভালোভাবে হয়ে যায় এবং তাঁর নিজের ও পরিবারের জীবনধারণে কোনো কষ্ট না হয়। হজরত শুআইব (আ.) হজরত মুসা (আ.) কে কাজে নিয়োগ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'আর আমি আপনাকে কষ্টে ফেলতে চাই না; ইনশা আল্লাহ! আপনি আমাকে কল্যাণকামী রূপে পাবেন।'[৪৪২]

ঘ. উদ্যোক্তা

ইসলামি অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা পদ্ধতি অন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। অন্যান্য ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা উৎপাদনের সকল দায়-দায়িত্ব বহন করে। কিন্তু ইসলামি অর্থনীতিতে ব্যবসার প্রকারভেদ অনুযায়ী উদ্যোক্তার দায়িত্ব বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- মুদারাবা ব্যবসায় উদ্যোক্তা শুধু পরিচালনাগত শ্রম প্রয়োগের জন্য মজুরী পেয়ে থাকে, এখানে উৎপাদনের লাভ-ক্ষতির সম্পূর্ণ ঝুকি মূলধনদাতা (ব্যক্তি/ব্যাংক/সংস্থা)-কে বহন করতে হয়। আবার মুশারাকা পদ্ধতিতে উদ্যোক্তাও মূলধনের যোগান দেয় বিধায় সে মুনাফা পায়। এ ক্ষেত্রে সে পরিচালনাগত শ্রম ব্যয় করার কারণে মজুরী এবং মূলধন যোগান দেয়ার কারণে মুনাফা দু'টোই পেতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল, ইসলাম দূর্বলকে সবল করা, বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য এক সুচিন্তিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে উৎপাদকের সম্পদে সমাজের অক্ষম ও অসহায়দের অংশ নির্ধারণ করেছে।

---

৪৪১ (فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ), আল-কুর'আন,৬২: ১০

৪৪২ (وَ مَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ), আল-কুর'আন, ২৮: ২৭

৪.১.৩ যাকাত ও দান-সাদকাহ

ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অন্যতম রক্ষাকবজ হলো যাকাত। এটি ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ। মূলত এর উপরই ইসলামী অর্থনীতির অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত। যাকাত প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- "(যাকাত) তোমাদের ধনীদের নিকট হতে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে"। যাকাত হলো গরীবের হক। এর যথাযথ আদায়ের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যা ধন-সম্পদের নিরাপত্তায় বিশাল ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও নফল দান- সাদকাহ সমাজে অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনার মাধ্যমে সকলের সম্পদের নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের মধ্যে যাকাতকে আবশ্যক করেছে। যথা: স্বর্ণ, রৌপ্য, ফসল, ফল-ফলাদি, ব্যবসার পণ্য এবং গবাদিপশু তথা উট, গরু ও ছাগল-ভেড়া। আর সদকা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুতে আবশ্যক নয়। বরং এটার ক্ষেত্রে মানুষ নির্দিষ্ট না করে যা খুশি দান করতে পারে। ইসলামে যাকাত ও সদকা প্রদানের প্রচুর সওয়াাব রয়েছে। কুরআনের আয়াত এবং নবী (স.) এর হাদিস এই সত্যকে প্রমাণ করে যে দান করা কেবল প্রাপকদের প্রতি দয়ার কাজই নয় বরং যারা এটি দেয় তাদের জন্য এটি প্রচুর উপকারিতা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে জীবনের চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যাগুলি থেকে রক্ষা করা এবং ফলস্বরূপ বৃদ্ধি। কুরআনে আমাদের বলা হয়েছে যে আমরা যখন পৃথিবীতে বসবাস করছি এবং বসবাস করছি, আমাদের উচিত আমাদের সম্পদ থেকে গরীবদের দান করা। আমরা যে প্রতিটি পয়সা ব্যয় করি তা আমাদের ভাল কাজের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এটি পরকালে আমাদের বিচার করার জন্য ব্যবহার করা হবে। ইসলাম দুস্থ মানবতা, নিঃস্ব-গরিবের স্বার্থ সংরক্ষণের ন্যায়সংগত অধিকার বা হকগুলো ফরজ করে দিয়েছে।

৪.১.৪ উত্তরাধিকার আইন

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার ব্যক্তির নিজ জীবন পর্যন্ত সীমিত নয়। বরং তা উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। ব্যক্তির নিজের জীবনে যেসব লোকের সাথে তার বৈষয়িক কিংবা আত্মিক অথবা রক্তের নিকটতম সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং যে সব লোক তার লাভ- লোকসানকে নিজের লাভ লোকসান বলে মনে করেছে, তার মালিকানা ধন-সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর ঐসব লোকদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বণ্টন করা হবে। এই উত্তরাধিকার আইন কেবলব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যেও উপরই প্রবর্তিত হবে না বরং উৎপাদনের উপকরণের উপরও কার্যকর হবে। অর্থনৈতিক বৈষম্য মানবজীবনে নানা সমস্যার জন্ম দেয়।[৪৪৩] সেজন্য ইসলামে যেমন প্রয়োজনের

---

৪৪৩ ড. ইউসুফ আল-কারযাবী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৮

অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনের অনুমতি রয়েছে। সাথে সাথে গরীব ও দুঃস্থ লোকদের উন্নয়নের দায়িত্বও প্রদান করেছে। একজন সম্পদের পাহাড় গড়বে আর অন্যজন না খেয়ে মারা যাবে এমন অর্থনীতি ইসলাম সমর্থন করে না। উত্তরাধিকার ধন-সম্পদ বণ্টন নানা সময় মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। এ লক্ষ্যে ইসলাম উত্তরাধিকার সম্পদেও -নির্ধারিত আইন প্রদান করেছে। আল কুর'আনে আল্লাহ পাক সমস্ত উত্তরাধিকারী এবং তাদের প্রাপ্য সম্পদের বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিধান প্রদান করেছেন। ফলে সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদ হতে সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

৪.১.৫ আর্থিক অনাচার নিষিদ্ধ

ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন সবধরনের কাজই ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জুয়া, লটারী, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, লুটতরাজ, জবরদখল, প্রতারণা, ফটকাবাজী, হারাম পণ্যের ব্যবসা ইত্যাদি সবকিছু ইসলাম অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে এর ভূমিকা অসামান্য। যে কাজগুলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন ঘটায় তা ইসলামের দৃষ্টিতে যেমন অন্যায় তেমনি দেশের প্রচলিত আইনে তা অপরাধের। গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায় সেজন্য যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছে । এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মওজুদদারী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল ইত্যাদি উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোনোরূপ যুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই।

৪.১.৬ মিতব্যয়িতার শিক্ষা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য অফুরন্ত নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁর দেওয়া নিয়ামতগুলো যথাযথভাবে ভোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিজের ও পরিবারের খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হলো শরিয়তের নির্দেশ। অতিরঞ্জন ও অপব্যয় নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা আহার করো ও পান করো, কিন্তু অপব্যয় করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।'[৪৪৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমাদের অর্থ-সম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে খরচ করবে না। জেনে রেখো, যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই, আর শয়তান নিজ প্রতিপালকের ঘোর অকৃতজ্ঞ।'[৪৪৫] ইসলাম মানুষকে বিভিন্নভাবে অপচয় ও অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে। অজ্ঞতার বশবর্তী হয়েই মূলত মানুষ অপচয় করে থাকে। বৈধ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাকে অপচয় এবং অবৈধ কাজে কোনো কিছু ব্যয় করাকে অপব্যয় বলে। শুধু টাকা-পয়সা নয় খাদ্য-পানীয়, গ্যাস,

---

৪৪৪ (خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ), আল-কুর'আন, ৭: ৩১

৪৪৫ (وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ), আল-কুর'আন, ৩: ১৩১

বিদ্যুৎ, সময় ও মেধার ব্যবহারেও আমাদের মিতব্যয়ী হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পৃথিবীকে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ধারা সুশোভিত করেছেন। তিনি অপচয় ও অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করে প্রতিটি বস্তুর সঠিক ও পরিমিত ব্যবহার করতে বলেছেন। ইসলামে সকল কিছুর ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: আর তোমাদের অর্থ-সম্পদ অপ্রোয়জনীয় কাজে খরচ করবে না। জেনে রেখো, যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই, আর শয়তান নিজ প্রতিপালকের ঘোর অকৃতজ্ঞ।[৪৪৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে ধন-সম্পদ হচ্ছে মানুষের কাছে আল্লাহর আমানত। হযরত আলী (আ.) এ সম্পর্কে বলেছেন, সম্পদ হচ্ছে আমানত'। এজন্য কোনভাবেই আমানতের খিয়ানাত করা যাবেনা এবং তা সঠিক কাজে সর্বোত্তম পন্থায় ব্যবহার করতে হবে। এখন কেউ যদি এই সম্পদকে সঠিক পথে কাজে না লাগিয়ে তা অপচয় ও অপব্যয় করে তাহলে সে পাপী হিসেবে গন্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আহার করো ও পান করো; কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।'[৪৪৭] এথেকে বুঝা যায় আল্লাহ তাআ'লার অসংখ্য নেয়ামত হতে মানুষের জন্য বৈধ বস্তু ভক্ষণ করা যাবে, তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না।

হাদিসে এসেছে, 'যা ইচ্ছা পানাহার করো এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। এক, তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশি না হওয়া চাই এবং দুই, গর্ব ও অহংকার না থাকা চাই। তবে এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বাভাবিক সীমা দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর নবী (স.) বলেছেন, 'আদম সন্তান যে সমস্ত ভার পূর্ণ করে, তন্মধ্যে পেট হল সবচেয়ে খারাপ। আদম সন্তানের জন্য স্বল্প কিছু লোকমাই যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার পিঠ সোজা রাখতে পারে। এর বেশি করতে চাইলে এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য যেন নির্দিষ্ট করে।'[৪৪৮]

তবে এর মানে এই নয় যে, অপচয় রোধ করতে গিয়ে কৃপণতা অবলম্বন করবে। মহান আল্লাহ কৃপণদের পছন্দ করেন না। অপচয় ত্যাগ করার অর্থ হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

---

৪৪৬ (وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا), আল-কুর'আন, ১৭: ২৬, ২৭

৪৪৭ (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ), আল-কুর'আন, ৭:৩১

৪৪৮ (مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ), সুলাইমান ইবনে আল-আশআস আবু দাউদ, *সুনান আবু দাউদ*, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২০ হি, কিতাব আল-আতিমাহ, হাদিস নং ৩৭৮৬

'তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না, আর একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।'[৪৪৯] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর পছন্দের বান্দাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

'আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।'[৪৫০] যেহেতু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাই অপচয়, সেহেতু সবধরনের বিলাসিতাই অপচয়। তাই দামি খাবার, দামি পোশাক, অট্টালিকা, অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন অপচয়ের শামিল। এজন্যই আমাদের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসূল (স.) এর জীবনাদর্শ দৃষ্টান্তমূলক ও অনুসরণীয় হওয়া চাই।

৪.২ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা

পরিবার ও পারিবারিক জীবন হচ্ছে সমাজ জীবনের মূলভিত্তি। পারিবারিক জীবনে ভরণ-পোষণ ও ব্যয় নির্বাহ নিয়ে সমাজে স্বামী-স্ত্রী, বাবা-ছেলে কিংবা মেয়ে, ভাই-বোনের মধ্যে কলহ দেখা যায়। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন কিংবা পরিবারের ব্যয়ভার বহন, ভরণ-পোষণ দেয়া বাধ্যতামূলক।

ইসলামে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব। দুনিয়া ও পরকালের সব বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের প্রতি যত্ন নিতে কিংবা অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখতে কুরআন সুন্নায় সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। সন্তান-সন্ততি ও অধস্তন আত্মীয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের বাপ-দাদার ওপর বর্তাবে।[৪৫১] তবে এ ক্ষেত্রেও দুই শর্তে সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে **এক.** যদি সন্তানরা এমন দরিদ্র হয় যে তারা নিজের মালিকানার সম্পদের সাহায্যে চলতে অক্ষম এবং তারা ছোট বা অসুস্থ অথবা প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে উপার্জনে অক্ষম হয়। অতএব, নাবালেগ বা অসুস্থ অথবা প্রতিবন্ধী ছেলের খরচ বাবার ওপর বর্তাবে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বালেগা হওয়ার পরও বিবাহের আগ পর্যন্ত ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বাবার ওপর বর্তাবে। **দুই.** বাপ-দাদা সামর্থ্যবান বা উপার্জনে সক্ষম হতে হবে। তাদের সামর্থ্যবান হওয়ার পরিমাণ হলো, তাদের মালিকানার সম্পত্তি বা উপার্জনের আয় দ্বারা নিজের ও স্ত্রীর স্বাভাবিক ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত সম্পদ থাকতে হবে। অতএব, কোনো সামর্থ্যহীন বাবা যদি এমন দুর্বল বা অসুস্থ হন যে উপার্জনে অক্ষম, তাহলে তার ওপর সন্তানের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব নয়;

---

৪৪৯ আল-কুর'আন, ১৭: ২৯

৪৫০ আল-কুর'আন, ২৫ : ৬৭

৪৫১ আল-কুর'আন, ২: ২৩৩,(এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর (রহ.) আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পিতা-মাতা ও অ-ভভাবকদের মধ্যে ন্যায্যতা ও সহানুভূতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী স্তন্যদান ও খোরপোষের দায়িত্ব পালন করা উচিত, এবং কোনো পক্ষের ওপর অন্যায় চাপানো উচিত নয়।)

বরং এ ক্ষেত্র ওই সন্তানের দায়িত্ব বাবার পরবর্তী নিকটাত্মীয় যথা মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোন, মামা-চাচাদের ওপর সামর্থ্য অনুসারে বর্তাবে।[৪৫২]

হালাল পথের খরচ হলো- ১. নিজের প্রয়োজনে খরচ করা ২. সন্তানের জন্যে খরচ করা,৩. স্ত্রীর জন্যে খরচ করা ৪. পিতামাতার জন্যে খরচ করা, ৫. আত্মীয়-স্বজনের জন্যে খরচ করা,৬. আল্লাহর পথে খরচ করা, ৭. গরীব-দুঃখীর জন্যে খরচ করা এবং ৮. অন্যান্য বৈধ কাজে খরচ করা

খরচের ক্ষেত্রে নিষেধ হলো- ১. হারাম কাজে খরচ করা,২. খরচের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা, ৩. অপচয় করা কিংবা অপব্যয় করা, ৪. কৃপণতা করা। প্রয়োজনে খরচ না করা, ৫. লোক দেখানোর জন্যে, কিংবা প্রশংসা পাওয়ার জন্যে দান করা।[৪৫৩]

৪.৩ সৎ উপার্জন ও হালাল জীবিকা

পবিত্র কুর'আনে অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে দখলের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছেন।

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

'হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করো না; কেবল পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করো তা বৈধ'[৪৫৪] সম্পদ যেন কোনোভাবেই অবৈধ পন্থায় উপার্জিত না হয় এবং তা যেন শোষণের কোনো হাতিয়ার না হয় সে দিকে খেয়াল রেখে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে 'আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে করছেন হালাল আর সুদকে করছেন হারাম।'[৪৫৫] সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতেও ইসলাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন। কারণ অর্থই যত প্রকার বিশৃঙ্খলার মূল। 'আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে তাদের হাত কেটে ফেল, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়।'[৪৫৬] হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্রের মাঝে সুষম ভারসাম্য ফিরে আসে; কৃষক দিন মজুর, ক্রেতা-বিক্রেতা, শ্রমিক-মালিক এবং অধস্তনদের সাথে উর্ধ্বতনদের সুদৃঢ় ও সংগতিপূণ সর্ম্পক তৈরী হয়। ফলে সকল শ্রেণীর নাগরিকই তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় এবং সমাজ সংসারে নেমে আসে শান্তির সুবাতাস। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম হিসেবে গন্য করা হয়েছে:

- সুদ খাওয়া (আল-কুর'আন,২ : ২৭৫, ২৭৮-২৮০ এবং আল-কুরআন, ৩ : ১৩০ আয়াত)

---

৪৫২ ড. ইউসুফ আল-কারযাবী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৫৩ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামের অর্থদর্শন ও বন্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা: পাথেয় পাবলিকেশন, ১৯৭১ খ্রি. পৃ. ১০৩

৪৫৪ আল-কুর'আন, ৭: ৩১

৪৫৫ (وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا), আল-কুর'আন, ২: ২৭৫

৪৫৬ আল-কুর'আন, ৫: ৩৮

- উৎকোচ গ্রহণ (আল-কুর'আন, ২ : ১৮৮)
- চুরি করা (আল-কুর'আন, ২ : ৩৮)
- এতিমের অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ (আল-কুর'আন, ৪ : ১০)
- ওজনে কম করা (আল-কুর'আন, ৮৩ : ৩)
- ব্যক্তি সমষ্টি নির্বিশেষে সবার সম্পদ আত্মসাৎ (আল-কুর'আন,২ : ২৮৩ ও আল-কুর'আন, ৩ : ১৬১)
- চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসা (আল-কুর'আন,২৪: ১৯ আয়াত)
- বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয় লব্ধ অর্থ (আল-কুর'আন,২৪ : ২,৩৩)
- মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসায় ও মদ পরিবহন (আল-কুর'আন, ৫ : ৯)
- জুয়া ও এমন সব উপায় উপকরণ যেগুলোর মাধ্যমে নিছক ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যক্রমে একদল লোকের সম্পদ অন্য একদল লোকের নিকট স্থানান্তরিত হয় (আল-কুর'আন, ৫:৯০)
- মূর্তিগড়া, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবা (আল-কুর'আন, ৫:৯০)
- ভাগ্য গননা ও জ্যোতিষীর ব্যবসায় (আল-কুর'আন, ৫:৯০)

৪.৩.১ ব্যবসা বাণিজ্য

উপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য সব চেয়ে বড় সেক্টর। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মহৎ পেশা। সমাজ জীবনে যার ক্রিয়াশীলতা ও প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে শুধু বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এ ব্যাপারে সবিশেষ উৎসাহ ও গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেন মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর বুকে একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন:

"তিনি (আল্লাহ) ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।[৪৫৭] তাছাড়া সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়নতা, ধোঁকামুক্ত, কল্যাণমুখী মানসিকতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের প্রশংসায় রাসূল (স.) এর অনেক হাদীস বিদ্যমান। দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল রোজগার ও হালাল ভক্ষণ। যে হারাম কামাই করে তার দান-সদকাও আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তার দোয়াও আল্লাহ কবুল করেন না। উপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য সব চেয়ে বড় খাত। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে শুধু বৈধ বলেই ক্ষান্তহয়নি, বরং এ ব্যাপারে সবিশেষ উৎসাহ ও গুরুত্ব দিয়েছে।' মানুষকে বেঁচে থাকতে

৪৫৭ আল-কুর'আন, ২: ২৭৫

হলে অর্থ উপার্জন করতে হয়। ইসলামী বিধান মেনে উপার্জন করলে তাতে বরকত আসে। পরকালের হিসেব- নিকাশ সহজ হয়।[৪৫৮]

ব্যবসা-বাণিজ্যে মহানবী (স.) পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। ৪০ বছর বয়সে নবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করার আগেও তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। ঈমানদারের ব্যবসা-বাণিজ্যও ইবাদত।

৪.৩.২ চাকরি

বর্তমানে চাকরি জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, ব্যাংক-বীমা, এনজিও ও ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। এসব চাকরির ক্ষেত্রে ইসলামের মূল দর্শন হলো প্রত্যেক চাকুরে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পালন করবে। মানুষের ওপর আল্লাহ বেশ কতগুলো মানবিক ও আদর্শিক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন অসংখ্য খাবার ও পানীয়।বে এসব পেতে হলে মানুষকে বেছে নিতে হয় হালাল ও উত্তম জীবিকার পথ। ঈমানদার মানুষ মাত্রই হালাল রুজি উপার্জন করার কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর মানুষের একটি অংশ চাকরিজীবী। এদের আমরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। সরকারি চাকরিজীবী ও বেসরকারি চাকরিজীবী। উভয় ক্ষেত্রে জীবিকা হালাল হতে হলে বেশ কতগুলো বিষয় শরিয়াহসম্মত হতে হবে। প্রথমত, প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ইসলামী নীতির মধ্যে আছে কি না। কোনো অবৈধ বা অনৈসলামিক বিষয় নিয়ে ওই প্রতিষ্ঠান কায়-কারবার করে কি না। সুদ বা জুলুমের অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক আছে কি না। সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। জনগণের কল্যাণ ও সেবার কাজে জড়িত। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকরিজীবীর বেলায় বেতন হালাল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যিনি চাকরি করবেন, তাঁকে অবশ্যই সৎভাবে, ঘুষ ও প্রতারণা ছাড়া তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। সততা ও দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে তাঁকে নিষ্ঠাবান হতে হবে। তা হলেই ওই ব্যক্তির উপার্জন বা বেতন হালাল হবে।

৪.৩.৩ কৃষিকর্ম

পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল-নির্বিশেষে সব দেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান, শিল্পের কাঁচামাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যও বেশির ভাগ কৃষি থেকে আসে। ইসলামে কৃষিকাজের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। নিয়ত ও পদ্ধতি সঠিক হলে কৃষি কাজও নেকি অর্জনের মাধ্যম হতে পারে। পৃথিবীর সূচনা থেকেই কৃষিকাজ বা চাষাবাদের সঙ্গে

---

৪৫৮ ড. রাগিব সারজানি, *মুসলিম জাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

মানুষের সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) কৃষিকাজ করেছেন, হযরত ইবরাহিম (আ.) কৃষিকাজ করেছেন।[৪৫৯] সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)- এর চাষাবাদ করারও প্রমাণ পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

'তিনিই (আল্লাহ) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে আমি সব ধরনের উদ্ভিদেও চারা উদগম করি; অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উদগত করি, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত থোকা নির্গত করি আর আঙুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং জায়তুন ও আনারও। এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ্য করো তার ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য এগুলোর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন আছে।'[৪৬০] কৃষিকর্ম জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপার্জনের মাধ্যম। ইসলাম এটিকে মহৎ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। চাষাবাদের উপযোগী করে মহান আল্লাহ এই জমিনকে বহু আগে সাজিয়ে রেখেছেন। আল-কুর'আন বলছে, 'তুমি ভূমিকে দেখবে শুষ্ক। পরে আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্যশ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং তা উদগত করে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।'[৪৬১]

এ সম্পর্কে নবী করিম (স.) বলেন, যার জমি আছে সে নিজেই চাষাবাদ করবে।[৪৬২]

৪.৩.৪ শিল্পকর্ম

ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি শিল্পকর্মও মানুষের অন্যতম পেশা। এই মহতী পেশায় জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োজিত রয়েছে। এই কর্ম সম্পর্কে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসুলরা শুধু উৎসাহের বাণী দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং শিল্প ও ব্যবসার ময়দানে তাঁদের বিশাল অবদান আছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : 'আমি (আল্লাহ) তাকে [দাউদ (আ.)] বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করে।'[৪৬৩]

ইসলামী শিল্পকলা ইসলামী সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাসের নিদর্শন বহন করে থাকে। ইসলামের আর্বিভাবের পর প্রথম দিকে তার শিল্পকলার মধ্যে কিছু বাইজান্টাইন ও পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা

---

৪৫৯ হাফিজ আবু শায়খই সফাহানী (র), *আখলাকুন নবী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৭৮

৪৬০ আল-কুর'আন, ৬:৯৯

৪৬১ আল-কুর'আন, ২২:৫

৪৬২ হাফিজ আবু শায়খই সফাহানী (র), *আখলাকুন নবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৪৬৩ আল-কুর'আন, ২১:৮০

যায়। পরবর্তীতে এই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী শিল্পকলা সম্পূর্ণ নতুন একধারার উদ্ভাবন করে।[৪৬৪] উমাইয়া খেলাফতকে বিবেচনা করা হয় শরীয়ত সম্মত ইসলামী শিল্পকলার প্রারম্ভিক যুগ।

ক. ক্যালিওগ্রাফি

ইসলামী শিল্পকলায় ক্যালিওগ্রাফির বহুল ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য সকল শিল্পীদের মধ্যে ক্যালিওগ্রাফারদের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হতো। কেননা কুরআনের লিখনশৈলীর সাথে এই শিল্পটি জড়িত ছিল। অবশ্য শুধু কুরআনের আয়াতই ক্যালিওগ্রাফির বিষয়বস্তু ছিলোনা, কুরআনের আয়াত ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন উক্তি, কবিতার পংক্তি প্রভৃতি ক্যালিওগ্রাফির বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিভিন্ন ভবনের অলঙ্করণে ক্যালিওগ্রাফির বিপুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। টাইলসে অলঙ্করণ, কাঠ খোদাই অথবা কাপড়ের ব্যবহারের মাধ্যমে ক্যালিওগ্রাফি অঙ্কনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভবনে অলঙ্করণ করা হতো।

খ. জ্যামিতিক নকশা

শিল্পকলায় প্রথম জ্যামিতিক নকশার প্রচলন মুসলমানদের হাতেই সূচিত হয়। ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আট কোণাকার তারকা এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। দেওয়ালে মোজাইক বা কাঠের কাজের মাধ্যমে এই নকশা অঙ্কিত হতো। আরব গণিতবিদদের কাছে জ্যামিতি ছিল চরম আগ্রহের বিষয় এবং তারাই ইসলামী শিল্পকলায় জ্যামিতিক নকশার বহুল প্রচলন করেন। ইসলামী বিশ্বের সর্বত্রই বিভিন্ন স্থাপনার অলঙ্করণে জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গ. ফুল-পাতার নকশা

জ্যামিতিক নকশার মতই বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও ফুল-পাতার নকশাও ইসলামী শিল্পকলায় খুবই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ইসলামী শিল্পকলায় এরূপ নকশার এক নতুনতর ধারার উদ্ভব ঘটে, যেটি 'আরাবেস্ক' নামে পরিচিত। বিবিধ বস্ত্রখন্ড যথা পোশাক, মাদুর, কার্পেট, গালিচা প্রভৃতিতে এই প্রকার নকশার বহুল ব্যবহার হতে থাকে।[৪৬৫] শিল্প এক ধরনের কর্মপ্রচেষ্টা, যা প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ করে তার উন্নত রূপান্তর ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামে শিল্পায়নের প্রতি সবিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। শিল্প-বাণিজ্যে জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োজিত আছে। যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসুলরা শুধু ধর্মের বাণী দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং শিল্প ও ব্যবসার ময়দানে তাঁদের বিশাল অবদান আছে।

---

৪৬৪ হাফিজ আবু শায়খই সফাহানী (র), *আখলাকুন নবী*, প্রাগুক্ত,২০০৬ খ্রি., পৃ. ৭৮

৪৬৫ ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৫. সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায়ও ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মোটা দাগে যদি আমরা চিন্তা করি, সামাজিক নিরাপত্তার যে বিষয়গুলো সব থেকে বেশি ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সেগুলো হলো– অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে জবরদখল করা, নারীর অনিরাপত্তা অর্থাৎ ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি, মানুষের প্রাণনাশের হুমকি, সম্পদ চুরি, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি। ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের সুন্দর সমাধান দিয়েছে। মানবতা ও নৈতিকতার কোনো স্তরেই নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ও অহেতুক রক্তপাতকে সমর্থন করা হয় না। মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পবিত্র কুরআনে আরো সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, 'আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাকে হত্যা করো না'[৪৬৬] ইসলাম চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনের ব্যাপারেও তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে। উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ঝগড়া ফ্যাসাদের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

বর্তমানে দেখা যায় অতি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যায় এবং হতাহতের ঘটনা ঘটে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'আমরা আল্লাহরই রঙে রঞ্জিত, আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতম রঞ্জনকারী? এবং আমরা তাঁরই বান্দা'[৪৬৭]

আমরা যদি সত্য সুন্দর ইসলামকে ধারণ করে জীবনযাপন করি তাহলে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুন্দরভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে যেকোনো প্রকার সমস্যা এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারব।

৫.১ আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য

পরিবারের সদস্যদের বাইরে মানুষের অনেক আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষী বিদ্যমান। সমাজে তাদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বলেন- অর্থ: (হে রাসূল!) আপনি বলুন, কল্যাণকর যে জিনিস তোমরা ব্যয় কর তা পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করবে।[৪৬৮] সমাজ জীবনে আত্মীয় পরিজনের প্রতি কর্তব্য হলো- তাদের সাথে সদাচরণ করা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা, হক আদায় করা, বিপদে আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাঁদের সেবা যত্ন করা, বিরক্ত না করা ইত্যাদি। বস্তুত আত্মীয়তার সম্পর্ক ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই মহনবী (স.) বলেছেন- অর্থ: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৪৬৯]

---

৪৬৬ আল-কুর'আন, ১৭ :৩৩

৪৬৭ আল-কুর'আন, ২: ১৩৮

৪৬৮ আল-কুর'আন, ২: ২১৫

৪৬৯ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, *সহিহ আল-বুখারী*. অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অধ্যায় : আল-বির্ ওয়া আস-সিলাহ ওয়া আল-আদাব, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১, হা. ৫৯৮৪

৫.২ প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব

প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল আচরণের মধ্য দিয়ে তাকে বাঁচতে হয়। এ জন্য প্রতিবেশীর অধিকার ও মর্যাদার প্রতি ইসলামে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ অর্থে প্রতিবেশী হলো যারা আশেপাশে বসবাস করেন। ইসলামে প্রতিবেশীর পরিচয় সুনির্দিষ্ট করে বলা রয়েছে। হাদীসে এসেছে, 'আশেপাশের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশী'।

এ হিসেবে ইমাম যুহরী বলেন- নিজ বাড়ির সামনে- পিছনে, ডানে বামে প্রতিদিকেই চল্লিশ বাড়ির সকল লোকই প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামে পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ বলেন- অর্থ: আর সদাচরণ কর নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ব প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচরের সাথে।[৪৭০] হাদীস শরীফে বহু স্থানে প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। যেমন, মহানবী (স.) বলেন- -'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যে ঈমান রাখে, সে যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।'[৪৭১] সুতরাং, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া প্রতিবেশীর হক সংরক্ষণ করা, নিরাপত্তা দান করা, কষ্ট না দেয়া, উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা, বিপদে সাহায্য সহযোগিতা করা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি একজন মুমিন ব্যক্তির অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত। অন্য মুসলিমের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাজে বসবাসরত অন্যান্য মুসলিম নাগরিকের প্রতিও প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিরই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- অর্থ: নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।[৪৭২]

হাদীস শরীফে এসেছে- অর্থ: 'মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অত্যাচারীর হাতে সোপর্দ করবে না। যে তার ভাইয়ের -অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূরকরবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্য হতে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন রাখবে। আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।'

ক. অভাবগ্রস্তের প্রতি দায়িত্ব

ইসলামে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপর দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করার দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামিক শিক্ষা অনুযায়ী, এটি একটি মৌলিক দায়িত্ব, যা মানবসম্প্রদায়ের সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। আল্লাহ বলেন: আর তাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক রয়েছে,

---

৪৭০ (وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ), আল-কুর'আন, ৪: ৩৬

৪৭১ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ) মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব আল-আদব, রিয়াদ: দাস সালাম, ১৪২০ হি,হাদিস নং ৬০১৬

৪৭২ (إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ), আল-কুর'আন, ৪৯: ৯

ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য।[৪৭৩] এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি মুসলিমের উপর সমাজের দরিদ্র এবং অসহায়দের অধিকার রয়েছে। ইসলামে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যাকাত, সদকা, ফিতরা ইত্যাদি দানের ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখা হয়েছে। ইয়াতিমদের প্রতি দায়িত্ব শৈশবে মাতাপিতা হারা অসহায় শিশুরা ইয়াতিম হিসেবে পরিচিত। সাধারণত তারা অসহায় ও অভিভাবকত্বহীন হয় বলে তাদের সেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ইয়াতিমদের সাথে সদাচারণ কর।[৪৭৪]

তাদের অভাব দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (স.) বলেন- যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন,[৪৭৫] অন্য হাদীসে এসেছে অর্থ: সব মুসলিম এক ব্যক্তির ন্যায়। যদি তার চোখ অসুস্থ হয় তবে তার সারা দেহেই তার বেদনা ছড়িয়ে পড়ে; আর যদি তার মাথা অসুস্থ হয় তবে তার সারা দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে।[৪৭৬] বস্তুত সমাজে বসবাসকারী সমস্ত মুসলিম পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং মুসলিমদের পারস্পরিক আচরণ হবে ভ্রাতৃসুলভ। একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসবে, অসুস্থ হলে সেবা করবে, আহ্বান করলে সাড়া দেবে, মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে। মুসলিমগণ পরস্পর সদাচরণ করবে, সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, কারো কোনরূপ অনিষ্ট করবে না; জীবন সম্পদ ও সম্ভ্রমের হানি করবে না, অত্যাচার নিপীড়ন করবে না। বরং নিজের উপর অন্য মুসলিম ভাইয়ের অধিকারকে প্রাধান্য দবে।

খ. হক্কে শুফ্আ

এটি প্রতিবেশীর গুরুত্বপূর্ণ একটি হক। নিজের জমি বা বাড়ি যদি কেউ বিক্রি করতে চায় তাহলে সে ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর হক সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ তাকে আগে জানাতে হবে যে, আমি আমার বাড়ি বা জমি বিক্রি করতে চাই তুমি তা কিনবে কি না। যদি সে কিনতে না চায় তাহলে অন্যের কাছে বিক্রি করা যাবে। তাকে না জানিয়ে কারো কাছে বিক্রি করা যাবে না। করলে সে দাবি করতে পারবে যে, আমি এই জমি ক্রয় করব। এটা তার হক। কারণ, হতে পারে এ জমিটি তার প্রয়োজন বা এমন ব্যক্তি তা ক্রয় করল যার কারণে সে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে ইত্যাদি। আর একেই শরীয়তের পরিভাষায় 'হক্কে শুফ্আ' বলে।

---

৪৭৩ (إِنَّمَا الْمُنَافِقُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا), আল-কুর'আন, ৫১: ১৯

৪৭৪ (وَآتُوا الْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا), আল-কুর'আন, ৪: ২

৪৭৫ (مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ), ইবনে আল-হাজ্জাজ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুদ দয়া, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২০ হিজরি, হা.২৭৩৪

৪৭৬ (المسلمون كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى), মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আদাব, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২০ হিজরি, হা. ৫৬০৬

হাদীস শরীফে প্রতিবেশীর এ হকটিকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যদি কেউ তার জমি বিক্রি করতে চায় তাহলে সে যেন তার প্রতিবেশীকে জানায়।[৪৭৭]

আরেক হাদীসে হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'শুফ্আ'-র বিষয়ে প্রতিবেশীর হক সবচেয়ে বেশি। প্রতিবেশি উপস্থিত না থাকলেও তার অপেক্ষা করতে হবে। এটা তখন যখন তাদের উভয়ের চলাচলের পথ এক হয়।[৪৭৮] এ ধরনের আরো অনেক হাদীসে হক্কে শুফ্আর বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

গ. প্রতিবেশীর জন্য কষ্টদায়ক না হওয়া

প্রতিবেশীর হক নষ্ট করা বা তাকে কষ্ট দেওয়া অনেক বড় অন্যায়। কখনো দুনিয়াতেই এর সাজা পেতে হয় আর আখেরাতের পাকড়াও তো আছেই। আমার অর্থবল বা জনবল আছে বলে আমি প্রতিবেশীর হক নষ্ট করে পার পেয়ে যাব এমনটি নয়। হাঁ, দুনিয়ার আদালত থেকে হয়ত পার পেয়ে যাব, কিন্তু আখেরাতের আদালত থেকে আমাকে কে বাঁচাবে? আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (স.) বলেছেন:"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিন বিশ্বাস রাখে, সে তার প্রতিবেশীকে সম্মান করবে।"[৪৭৯]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়টিকে নবী (স.) ঈমানের দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করেছেন। কোনো ব্যক্তি মু'মিন আবার প্রতিবেশীকে কষ্টও দেয় তা ভাবা যায় না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহর শপথ সে মু'মিন নয়! আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়!! আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়!!! সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, সে কে হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।[৪৮০]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (স.) বলেছেন: "তোমাদের কেউই পূর্ণ ঈমানী হবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সে ভালোবাসে যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে।"[৪৮১]

---

৪৭৭ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ جَارَ), ইবনে মাজাহ, সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাব আল-বায়ে, হা. ২২৪৭

৪৭৮ (لِلْجَارِ أَحَقِّيَّةٌ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا تَطَالَبَا فِي الطَّرِيقِ وَاحِدٍ) ,আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-তিরমিজি, *সুনান আত-তিরমিজি*, কিতাবুল বিকা', রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১ হি., হা. ১২৯২

৪৭৯ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ), ইমাম আহমাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, অনুবাদ: মাওলানা আব্দুর রহমান, দারুস সালাম, ১৪২১ হি., হাদিস নং ১৭৩৭২

৪৮০ والذي نفسي بيده لا يؤمنُ، والذي نفسي بيده لا يؤمنُ، والذي نفسي بيده لا يؤمنُ، قالوا من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه" মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অনুবাদ: মুহাম্মাদ মুহসিন খান, দারুস সালাম প্রকাশন, ১৪২০ হিজরী, কিতাবুল ইমান, হা. ৬৫১০

৪৮১ (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ), মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অনুবাদ: মুহাম্মাদ মুহসিন খান, দারুস সালাম প্রকাশন, ১৪২০ হিজরী, কিতাব আল-ইমান, হা. ১৩

কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন রূপ হতে পারে। যেমন, জানালা দিয়ে উঁকি দেয়া, চলা ফেরার ক্ষেত্রে দৃষ্টি অবনত না রাখা, প্রতিবেশীর বাসার সামনে ময়লা ফেলা, জোরে ক্যাসেট বাজানো, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় প্রতিবেশীর ঘুম বা বিশ্রামের ক্ষতি করা, প্রতিবেশীর চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া, গৃহপালিত পশুর মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি। নিজের গৃহপালিত পশু ছেড়ে দিলাম আর তা প্রতিবেশীর ফসলের ক্ষতি করল কিংবা প্রতিবেশীর অবলা পশু এসে কিছু নষ্ট করেছে বলে আমি পশুটির কোনো ক্ষতি করলাম বা পশুর মালিককে গালি দিলাম। এসকল ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া ও ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত। আল্লাহ এর প্রতিদান দিবেন।

ঘ. মন্দ প্রতিবেশী থেকে বেঁচে থাকা

মন্দ প্রতিবেশী থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। কারণ একজন মন্দ প্রতিবেশী সাধারণ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করবে বা আমাকেও মন্দের দিকে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমরা মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।[৪৮২]

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (স.) এর একটি দোয়া-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি (আমার) আবাসস্থলে তোমার কাছে দুষ্ট প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাই।'কেননা দুনিয়ার প্রতিবেশী তো বদল হতে থাকে।' হতে পারে আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয় তাই বলে কি আমিও প্রতিবেশীকে কষ্ট দিব? তা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যে সবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে, তো এটা বড় হিম্মতের কাজ।[৪৮৩]হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন, তাদের একজন ঐ ব্যক্তি, যার একজন মন্দ প্রতিবেশী রয়েছে, সে তাকে কষ্ট দেয়। তখন ঐ ব্যক্তি সবর করে এবং আল্লাহর সওয়াবের আশা রাখে। একপর্যায়ে ঐ প্রতিবেশীর ইন্তেকাল বা চলে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে মুক্তি দেন।[৪৮৪]

৫.৩ অমুসলিমদের প্রতি কর্তব্য

সমাজে মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিমগণও বসবাস করে থাকেন। ইসলাম ধর্মে তাদের প্রতিও সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বিপদে আপদে সাহায্য করা, সহানুভূতি জানানো ইসলামের অন্যতম আদর্শ। রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের জীবনে এরূপ অসংখ্য নজীর

---

৪৮২ (اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَوَارِ السُّوءِ), মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অনুবাদ: মুহাম্মাদ মুহসিন খান, দারুস সালাম প্রকাশন, ১৪২০ হিজরী, কিতাবুল আদাব, হা. ৬১৬৩

৪৮৩ মাওলানা আবদুল্লাহ শাহি, সম্পাদনা, *আল-আজহার: দোয়া ও ইবাদতের সংকলন*, অনুবাদ: মুহাম্মাদ আমিন, দারুস সালাম, ২০১০, পৃ.১৫৬

৪৮৪ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ثَلَاثَةً: مَنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ، وَقَدْرُهُ، وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يُؤْذِيهِ مِنَ النَّاسِ), আল-হুযায়মী, মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-তাহাউয়ী, সম্পাদক, *সুনান আত-তিরমিযি*, দারুস সালাম, ১৪২২,হিজরী, হা. ২৭৭১

স্থাপন করে গেছেন। অমুসলিমদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে, তাদেও উপর কোনরূপ অত্যাচার করা যাবে না, তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনে কোন বাঁধা দেয়া যাবে না, ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদের উপর জোর জবরদস্তি -করা যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন- অর্থ: দীন গ্রহণে কোন জোর জবরদস্তি নেই।[৪৮৫] প্রকৃতপক্ষে অমুসলিমদের সাথে উদার ও মানবিক ব্যবহার করতে হবে। সহনশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমা, পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সহাবস্থান ইত্যাদি আদর্শ বাস্তবায়ন করা ইসলামী সমাজ জীবনের অন্যতম আদর্শ।মুসলিম দেশে অমুসলিম নাগরিকের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মুসলমানদের কর্তব্য। অমুসলিম নাগরিকের সম্পদ ও সম্পত্তি দখল করার অধিকার কারো নেই।

ক. মদিনা সনদে ধর্মীয় সহাবস্থান

সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা, পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাসের স্বীকৃতি ইসলামের বিঘোষিত অঙ্গীকার। হঠকারিতা, বৈষম্য, বঞ্চনা ইসলামের শিক্ষা নয়; বরং একটি Submissive সমাজ বিনির্মাণ ইসলামের প্রাত্যহিক চেতনা। এ জন্যই হিজরতের পর প্রিয় নবী (স.) সম্প্রীতিমূলক ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন। প্রিয় নবী (স.) যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন তিনি (স.) পাঁচ ধরনের মানুষের সংশ্লেষের এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হন। তারা হলো : মুহাজির, আনসার, ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক। তখন নবী (স.)-এর প্রথম ও প্রধান অগ্রাধিকার হয় ভ্রাতৃবিরোধ, বিদ্বেষ-বিগ্রহের অবসান ঘটান। এ লক্ষ্যই ছিল মদিনা সনদের প্রধান অর্জন।

খ. অমুসলিমদের সামাজিক অধিকার

মুসলিম দেশে সংখ্যালঘুরা মুসলমানের মতোই সামাজিক অধিকার ভোগ করে থাকে। সমাজে তাদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করার কোনো সুযোগ নেই। সমাজে সংখ্যালঘুদের সামাজিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ইসলাম বদ্ধপরিকর। আল্লাহ তাআলা অমুসলিমদের সঙ্গে সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও ইনসাফ (সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা) করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।'[৪৮৬]

গ. অন্যায়ভাবে অমুসলিমের ক্ষতি সাধনের শাস্তি

যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা ও জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কেউ অন্যায়ভাবে অমুসলিম

---

৪৮৫ (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ), আল-কুর'আন,২: ২৫৬

৪৮৬ (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ), আল-কুর'আন,৬০: ৮

নাগরিকের ক্ষতি সাধন করলে দেশীয় আইনে তার শাস্তি হবে। পাশাপাশি পরকালে সে জাহান্নামে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।'[৪৮৭]

৬. জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম

ন্যায়বিচার হলো মানব সমাজের ভিত্তিমূল, যা সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হয়, কোনো বৈষম্য বা পক্ষপাতহীনভাবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়বিচার এমন একটি মূল্যবোধ, যা কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণি, ধর্ম, লিঙ্গ বা জাতির জন্য নয়, বরং সারা মানবজাতির জন্য সর্বজনীন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেনড় "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি।"[৪৮৮] নবী করিম (স.)এর জীবনেও দেখা যায়, তিনি সকল মানুষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত বিচার করেছেন, এমনকি শত্রুদের ক্ষেত্রেও পক্ষপাত দেখাননি। সমকালীন সমাজে ন্যায়বিচারের সার্বজনীনতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন কার্যকর আইন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ, ও জনগণের সচেতনতা। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রগুলোতে ন্যায়বিচারের সার্বজনীনতা রক্ষা করা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তির জন্য অপরিহার্য। ফলে ন্যায়বিচার শুধু একটি অধিকার নয়, বরং সকলের জন্য অধিকার ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।ইসলামী ন্যায়বিচার কেবল মুসলমানদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; অমুসলিম নাগরিকদেরও সমান অধিকার প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর মদিনা সনদে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়েছিল। এই নীতি গ্রহণ করলে বাংলাদেশে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

মানবজীবন খুবই মূল্যবান। এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নি'আমত। এজন্য ইসলাম মানব জীবনকে সবধরণের ঝুঁকি, ক্ষতি ও বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য বিশেষ বিধান প্রদান করেছে।[৪৮৯] ইসলামের এসব বিধানের অনুসরণের মাধ্যমে মানব জীবন সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। জীবনের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

৬.১ মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। ইসলাম মানুষের এসব অবশ্য প্রয়োজনীয় অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করতে বদ্ধপরিকর।

---

৪৮৭ (مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا فَلَنْ يَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَلَوْ أَنْفَسَهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, অনুবাদ: মুহাম্মাদ মুহসিন খান, দারুস সালাম প্রকাশন, ১৪২০ হিজরী, কিতাবুল জামাহির, হাদিস নং ৬৫৭১।

৪৮৮ আল-কুর'আন, ১১: ১১৬

৪৮৯ বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *ইসলামী জীবন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ও শরী'আতে প্রত্যেক মানুষই এসব অধিকার পূরণের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। কেউ যদি অক্ষম হয় তবে এসব মৌলিক অধিকার পূরণের জন্য ইসলামী সরকার বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ দায়ী থাকবেন।

৬.২ হত্যা নিষিদ্ধ

ইসলাম সমস্ত মানুষকে জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করেছে। যখন কোনো ব্যক্তি বিধি-বিধানের বাইরে অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন নিয়ে নেয় তখন তাকে হত্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৪৯০] ইসলাম ধর্মে কুরআন ও হাদীসে এ জাতীয় হত্যাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাই কারণে বা অকারণে কেউ কাউকে হত্যা করতে পারবেনা।

৬.৩ শান্তিপূর্ণ জীবন পরিচালনা

ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত। ইসলামের মূল মর্মবাণী হলো মানুষের সর্বস্ব আল্লাহতায়ালার কাছে সোপর্দ করে দেওয়া। ইসলাম শব্দটির অর্থের মধ্যে বিশেষ গুণের পরিচয় পরিস্ফুটিত। ইসলামের তুলনা ইসলাম কেবল নিজেই। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন ব্যক্তিবিশেষের আবিষ্কার নয়, কোন জাতির নামানুসারেও এ মতাদর্শের নাম হয়নি। ইসলাম নামটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রদত্ত। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়নের বি-কল্প নেই।

৬.৪ অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ

মানব সামজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম সর্বপ্রকার অপরাধমূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছে। যেমন মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাসবাদ, মিথ্যাচার, প্রতারণা, খুন-খারাবি, মারামারি ইত্যাদি। বস্তুত এ সমস্ত কাজ নানাভাবে জীবনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে।[৪৯১] এগুলো অবৈধ ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম মানব জীবনকে পাপ পঙ্কিলতামুক্ত, পবিত্র ও নিরাপদ করে তুলতে প্রয়াসী হয়। সর্বোপরি ইসলামী অর্থনীতি মানব কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানব জাতির অকল্যাণ হয় এমন লাভজনক কাজও এ অর্থনীতি অনুমোদন করে না। বরং মানব কল্যাণের লক্ষ্যে শরী'আত সম্মত যে কোন কাজই এ অর্থনীতির প্রধান উপজীব্য। কথা ও আচরণের ক্ষেত্রে বিনম্রতা, প্রফুল্ল চিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সত্য পরায়ণতা, কম কথা বলা ও বেশি শোনা। কোনো কারণে রাগান্বিত হলে সে সময়ও গালি গালাজ, অভিশাপ ও সীমালঙ্ঘণ করা থেকে বিরত থাকা।ক্ষমা করার গুণ থাকা। বিশেষত

---

৪৯০ অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান, *কুর'আন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন*, প্রাগুক্ত, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৭৮

৪৯১ ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র.), প্রাগুক্ত, খ. ৩, ২০১৭ খ্রি ,পৃ. ৩২২

কোনো কারণে প্রতিশোধ নেওয়া বা প্রতিউত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমা করে দেওয়া মানসিকতা পোষণ করা।

৭. দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলাম

দুর্নীতি শব্দের আভিধানিক অর্থ : রীতি বা নীতিবিরূদ্ধ আচরণ, কুনীতি, অসদাচরণ ও নীতিহীনতা ইত্যাদি। এর আরবি প্রতি শব্দ আল ফাসাদ এবং ইংরেজি প্রতি শব্দ corruption। দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। দুর্নীতি দমনে মহানবী (স.) শান্তি ও সুনীতির যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন- ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়ন করতে পারলে বিদ্যমান দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, অবৈধ সিন্ডিকেট, ব্যবসায়িক দুষ্টচক্র, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য, চিকিৎসা, ওষুধ, নির্মাণসামগ্রীসহ নানা ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সব ভোগ্যপণ্যে ভেজাল। চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অথবা সরকারি-বেসরকারি অফিসে কোনো সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেন এখন অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষায় নকল, ভোট কারচুপি, দলিল দস্তাবেজে জালিয়াতি, শিক্ষাকে বাণিজ্য বানানো, অবৈধ দখলদারি, অযোগ্য লোককে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান, আর্থিক অনিয়ম ইত্যাদি সব ধরনের দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। ইসলাম এসব কিছুকেই হারাম ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ আল কোরআনে বহুবার অন্যের অধিকার নষ্ট করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সহজ ও সঠিক পথ অনুসরণ করার হুকুম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা-[৪৯২] ' মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না।'[৪৯৩]

৭.১ নৈতিকতা

ইসলাম মানুষের সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কথা বলে। তবে তা সৃষ্টিগত নয় বরং মানুষের গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে তার অধিকারী হতে হয়। মানুষ যখন নিজেকে সঠিক ও যথার্থভাবে জানতে, চিনতে পারে এবং জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, নিজেকে গড়ে তুলতে পারে তখনই মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অন্যথা দেহ সর্বস্ব মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তুর মতই থেকে যায়। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ দায়বদ্ধ। ব্যক্তি তার প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজের অঙ্গ বা সদস্য মনে করে। একাকী সে যা

---

৪৯২ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا), আল-কুর'আন, ৪: ৫৮

৪৯৩ (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ), আল-কুর'আন, ২:৪২

খুশি তা করে বেড়াতে পারে না।[৪৯৪] পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। এ দায়িত্ব পালনের ফলে মানুষ অন্যান্য সৃষ্টিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ওমর্যাদাবান।

আল্লাহর ঘোষণা, "আমি আদম সন্তানকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছি, তাদেরকে যানবাহন দিয়েছি স্থল ও জলভাগে চলাচলের জন্য এবং তাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি জীবিকা হিসেবে দিয়েছি এবং আমাদের সৃষ্টিসমূহের অনেকেরই ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছি।[৪৯৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলমীন মানুষকে এত বেশি মর্যাদা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অসৎ পথকে গ্রহণ না করে সৎ পথকে বেছে নিল তার মর্যাদা ফেরেশতার চেয়েও বেশি। কেননা একজন ফেরেশতার কাজই হল আল্লাহর তাসবীহ করা আল্লাহর হুকুম পালন করা কিন্তু মানুষের সামনে আল্লাহ ভাল ও মন্দ যে কোন একটি পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

মানুষ যে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে অনেক বেশি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তার কারণ হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে নৈতিকতার মানদ- দিয়ে দিয়েছেন যা অন্য কোন প্রাণীর নেই। ইসলামে নীতি ও নৈতিকতা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নীতিবান মানুষের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে বিশেষ পুরস্কার। নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। নীতি-নৈতিকতা, ধর্মীয় অনুশাসন না থাকায় বেড়ে গেছে দুর্নীতি। দুর্নীতি মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। পদে পদে দুর্নীতি থাকায় দেশের মানুষ সফল হতে পারছে না। উন্নতিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দুর্নীতি। অবৈধ সম্পদের মোহই মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্থ করছে। ধর্মীয় অনুশাসনের পাশাপাশি মানবকল্যাণের বিষ-য়টি মাথায় থাকলে দুর্নীতির হাত থেকে মুক্তি পাবে সমাজ, মুক্ত হবে দেশ।

৭.২ পার্থিব শাস্তির বিধান

ইসলাম অপরাধী, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে পার্থিব শাস্তি প্রদানে স্বচ্ছ আইন এবং তা দ্রুত কার্যকর করার বিধান প্রণয়ন করেছে। ইসলামে কোনো অপরাধী, দুর্নীতিবাজ, এমনকি খুনির শাস্তি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ক্ষমা করার বিধান রাখা হয়নি। কারণ এতে অপরাধীদের ভবিষ্যতে আরো বড় ধরনের অপকর্ম করার সুযোগে করে দেয়া হয়। এ জন্য মহানবী (স.) বলেছেন, চোরের হাত আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিধি অনুযায়ী কাটা হয়।[৪৯৬]

---

৪৯৪ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুবায়রী, *ইসলামী সমাজবিজ্ঞান: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ২০১৫, পৃ. ৩৪

৪৯৫ (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا), আল-কুর'আন, ১৭: ৭০

৪৯৬ (السَّارِقُ تُقْطَعُ يَدُهُ خَالِفًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ), মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, দারুস সালাম, ১৪২০ হিজরী, কিতাবুল হুদু হাদিস নং ৬৫০২

ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদগুলো বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি'[৪৯৭]

৭.৩ আখিরাতের জবাবদিহিতা

দুনিয়াতে অপরাধের শাস্তি হোক বা না হোক আখিরাতে সব শাস্তির বিচার হবে, জনসাধারণের মাঝে এই মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে ও আল্লাহর ভয় এবং আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে সচেতন করে অপরাধ দমন করা যায়। দুনিয়াতে মানুষের চোখকে ফাঁকি দেয়া গেলেও আখিরাতে আল্লাহর দরবারে সব কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। সেখানে কোনো বিষয়ে দুর্নীতি, ব্যক্তি বা জাতির হক আত্মসাৎ প্রমাণিত হলে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং পরিণামে জাহান্নামের মারাত্মক আজাবের সম্মুখীন হতে হবে, যা থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। সে দিন হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে'[৪৯৮] । আল্লাহর সামনে হিসাব দিতেই হবে, এই মানসিকতা জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হলে দুর্নীতি ও অপরাধ বন্ধ হবে।

৭.৪ আত্মশুদ্ধি

ইসলাম ব্যক্তি মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, নৈতিকতা, বিবেক, মানবিকতা ও আত্মার পরিশুদ্ধতার কথা বলে। ব্যক্তি মানুষের পরিশুদ্ধির উপরই ব্যক্তি মানুষের জীবনের সফলতা এবং সমাজ-সভ্যতার সুষ্ঠুতা নির্ভর করে। এজন্য ইসলামী জীবন দর্শনে ব্যক্তি মানুষের আত্মশুদ্ধির উপর জোর তাগিদ দেয়।[৪৯৯]

আত্মশুদ্ধি মানে নিজেকে সংশোধন, পরিশোধন করা এবং যাবতীয় কলুষতা-কালিমা, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পূত-পবিত্র ও মুক্ত রাখা। সব রকমের পাপ চিন্তা, অন্যায় অশ্লীলতা, অনৈতিক ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা থেকে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখাই আত্মশুদ্ধি। আত্ম কথায় নিজেকে সংশোধন ও পরিশোধনই আত্মশুদ্ধি। যাকে "তাযকিয়ায়ে নাফস" বলা হয়। এ আত্মপরিশুদ্ধি ছাড়া মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করতে পারে না। মুমিনের অন্তর যখন পরিশুদ্ধ ও আলোকিত হয়

---

৪৯৭ (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ), আল-কুর'আন, ৫: ৩৩

৪৯৮ (وَاللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَٰهِهِمْ وَيُلْتِمُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَيَكْسِبُهُمْ ٱلْعَذَابَ دُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ), আল-কুর'আন, ২৪:৬০

৪৯৯ শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া, *হৃদয়ের ব্যাধি ও প্রতিকার*, মুহাম্মদ শামীম আখতার, আবু রুমাইসা, ২০২১ খ্রি., ঢাকা: দারুস সালাম বাংলাদেশ, পৃ. ১৩৪

এবং নিজ আখলাক-চরিত্র সংশোধন হয়, তখন তার জন্য আল্লাহ তাআলার রেযা-সন্তুষ্টি অর্জন সহজ হয়ে যায়। আর যে মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি পায়, সে যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতর মানুষ তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ জন্যই আমাদের প্রিয় নবী (স.) এর অন্যতম জিম্মাদারী ছিল সাহাবায়ে কিরামের তাযকিয়া বা আত্মশদ্ধি। পবিত্র কুরআনে প্রিয় নবী (স.) এর দায়িত্ব ও জিম্মাদারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলাই নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই স্বগোত্রীয় একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেন তাদের আত্মাকে এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।'[৫০০]

৮. সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ দুর্বল প্রকৃতির অধিকারী। তার কথা, কাজ, আচার-আচরণে মানবিক এই দুর্বলতা নানাভাবে প্রকাশ পায়। শরিয়তে মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রমহানি নিষিদ্ধ। জীবন-সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষায় শুধু উপদেশ ও উৎসাহই নয় বরং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান প্রবর্তন করে এগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। ইসলামের এ আদর্শ অনুসরণ করলে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হবে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? তোমরা তো এটা ঘৃণা করো।[৫০১]মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র দিক নির্দেশক ইসলাম। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি একজন মু'মিনের গোপন লুকায়, আল্লাহ তাআলা তাকে এই দুনিয়া ও আখেরাতে আড়াল করবেন।[৫০২] এতে মানব জাতির পার্থিব কল্যাণ ও সফলতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে। মান-সম্মান ও ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষায় ইসলামের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গুলো হলো-

৮.১ সম্ভ্রমহানি নিষিদ্ধ

অপরের ইজ্জত ও মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের দীনী কর্তব্য। কোনভাবেই অপরের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স.) ঘোষণা করেছেন- 'মনে রেখো! আজকের এ দিন,

---

৫০০ (وَأَرْسَلَ فِي أُمَّةٍ مِّنْهُمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ), আল-কুর'আন, ৩৯: ৭৮

৫০১ আল-কুর'আন, ৪৯: ১২

৫০২ (من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة), ইমাম মুসলিম. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আদব, হাদিস নং ২৬০৫. দারুস সালাম, ১৪২০ হিজরী।

এ শহর ও এ মাস যেমন তোমাদের নিকট সম্মানিত; তেমনি তোমাদের পরস্পরের রক্ত, সম্পদ এবং ইজ্জতও আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ঘোষণা করেছেন।' অর্থাৎ অপরের সম্ভ্রমের হানি করা পবিত্র ও সম্মানিত বিষয়কে নষ্ট করার সমতুল্য অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য। ইসলাম মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করে। কারণ মান-সম্ভ্রম মানুষের জীবন ও সম্পদের চেয়েও বেশি প্রিয় বলে প্রতীয়মান হয়। মানুষ তার ইজ্জত, সম্মান রক্ষার জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয় করে, জীবন উৎসর্গ করে।[৫০৩]

প্রতিটি ধর্মে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, অহংকার করা, মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা, ছোট করা বা অসম্মান করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা, মিথ্যা দোষারোপ, চোগলখুরি, কু-ধারণা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, কারো সম্মানে আঘাত লাগে এমন কথা বলা বা কাজ করা ইত্যাদিকে সব ইসলামে পরিহার করতে বলা হয়েছে।

৮.২ পর্দার বিধান

নর-নারীর ইজ্জত সম্মান রক্ষার জন্য ইসলাম পর্দার বিধান প্রবর্তন করেছে। মানবজীবনে পোশাক একটি অপরিহার্য বিষয়। ইসলামেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। পোশাক লজ্জা নিবারণের উপকরণ হলেও মানবজীবনে পোশাকের ভূমিকা খুব পরিব্যপ্ত। সাজ-সজ্জা বা সৌন্দর্য বর্ধনের উপকরণ থেকে শুরু করে আর্থিক মুনাফা অর্জনের এক অন্যতম মাধ্যম হলো পোশাক-পরিচ্ছদ। ইসলাম নারী এবং পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা পোশাকের বিধান দিয়েছে। আমাদের চারপাশে অসংখ্য মানুষ আছে, যারা পর্দা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখে না।

পুরুষরা মনে করে পর্দা শুধু নারীর জন্য, আর নারীরা মনে করে পর্দা তাকে পিছিয়ে দিচ্ছে অথবা পর্দা করার যৌক্তিকতা তারা খুঁজে পায় না। অথচ পর্দা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি বিধান। মূলত 'হিজাব বা পর্দা' নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক। নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ। নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়। এ বিধান অনুসরণের মাধ্যমে হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।'[৫০৪] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ'।[৫০৫] পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কোরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলীর মতো সুস্পষ্ট এক ফরয বিধান। আল্লাহ তায়ালাই এ বিধানের প্রবর্তক।

---

৫০৩ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, *কুরআনের আলোকে মানবজীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ.৬৫

৫০৪ (وَهُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ), আল-কুর'আন, ৩৩: ৫৩

৫০৫ (فَاسْأَلُوهُنَّ مَا شِئْتُم مِّنْهُ وَاسْتَخْفُوا فِي أَنفُسِكُمْ مَا أَرْدْتُمْ وَذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ), আল-কুর'আন, ৩৩: ৫৩

এ বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকাই ঈমানের দাবি। এ বিধানকে হালকা মনে করা কিংবা এ বিধানকে অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহান সাফল্য অর্জন করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে, সে স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হয়েছে।'[৫০৬] মূলত পর্দাহীন নারীরা হচ্ছে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট নারী। এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করা হয়। আর এ অবাধ্যতার কারণে আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

৮.৩ গীবত-অপবাদ নিষিদ্ধ

মানুষের মানসম্মানের হানিকর গীবত-অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণ করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এগুলো কবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

অর্থ: আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং গীবত করো না (একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।) তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে। বস্তুত তোমরা তো একে অপছন্দই করে থাক।[৫০৭] পবিত্র হাদীসে এ প্রসঙ্গে এসেছে, 'তোমাদের কেউই তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার গীবত করবে না।'[৫০৮]

ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম পরস্পর ঠাট্টা, উপহাস, তিরস্কার করা, দোষারোপ করা, মন্দ নামে ডাকা ইত্যাদি বিষয়ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেন-

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

অর্থ: তোমাদের কেউ যেন অন্যকে উপহাস না করে। হতে পারে, যারা উপহাসের শিকার, তারা তাদের চেয়ে উত্তম। নারীদের ক্ষেত্রেও একইভাবে। এবং একে অপরকে খারাপ ডাক নাম দিয়ে অ-

---

৫০৬ আল-কুর'আন, ৬: ১৪০

৫০৭ আল-কুর'আন, ৪৯: ১২

৫০৮ (لَا يَغْتَبْ أَحَدُكُم أَخَاهُ فِي غَيْبَتِهِ), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বুখারী (রহঃ). *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আদাব, দারুস সালাম, ১৪২০ হিজরী, হাদিস নং ৬২৯০

ভশাপ করো না। বিশ্বাসের পর পাপময় নাম প্রয়োগ করা বড়ই দোষ।[৫০৯] সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম ব্যক্তি পর্যায় হতে শুরু করে রষ্ট্রীয় পর্যায়ে আরো বহু বিধান প্রবর্তন করেছে।

যেমন- -অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা, নাচ-গান, মেলা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছে। এছাড়াও ইসলাম বিনা অনুমতিতে অন্যেও ঘরে প্রবেশ করা, কাউকে মন্দ নামে ডাকা, উপহাস করা, গিবত করা ইত্যাদিও নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম মানব জীবনের সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য লাভের প্রয়াসী। এ প্রেক্ষিতে পার্থিব জীবনে ইসলাম যেমন নর-নারী সকলের মর্যাদা ও সম্মানের স্বীকৃতি প্রদান করেছে তেমনি সকলের অধিকার রক্ষারও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিকের আলোচনা ইসলামে রয়েছে।

৯. ইসলামী সংস্কৃতিতে বিনোদন

সংস্কৃতি হলো মানুষের আচরণের সমষ্টি। ইসলামের মূলনীতির উপর ভিত্তি কওে মানুষ তার আচার-ব্যবহার, দেহ, মন ও আত্মাকে যেভাবে সংস্কার ও সংশোধন করে, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত কোন সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। ইসলামী সংস্কৃতি নৈতিকতা সমৃদ্ধ এবং মানুষের ধর্ম কর্মের সমন্বয় সমর্থন করে; কিন্তু অশ্লীলতাকে মোটেও প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম মানুষের সুকুমার বৃত্তির ইতিবাচক বিকাশ ও কল্যাণকর প্রকাশ চায়, যা তার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য সহায়ক। যার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাওহীদ। ইসলামী সংস্কৃতি এক সর্বজনীন সংস্কৃতি, যা বিশেষ কোন গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, বংশ, কাল বা অঞ্চলের উত্তরাধিকার নয়। মানব সমাজের সার্বিক ঐক্য তাদের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই গৃহকেই করতে হবে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। বিনোদনের নামে, উৎসবের নামে, পার্বণের চর্চার নামে যেন কোন ভাবেই কদাকার রুচিহীন সংস্কৃতির প্রয়োগ না ঘটে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।[৫১০] ইসলামী বিনোদন দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। এমন কোনো আনন্দ বা বিনোদন বিধেয় নয়, যা ভবিষ্যতে তার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য অমঙ্গলের কারণ হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে কাফিররা দেশে বিদেশে বিচরণ করে অতি সন্তর্পণে বিনোদনের নামে তাদের সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে চায়। বিনোদনের ক্ষেত্রেও হালাল-হারাম বিবেচ্য। নবী (স.) তাঁর পরিবারকে নিয়ে আনন্দ করেছেন, রসিকতা করে কথা বলেছেন, সাহাবীরাও নবী (স.) কে হালাল বিনোদনে অনুসরণ করেছেন। ইসলামে বিনোদন ও সংস্কৃতিকে পবিত্রতা, নৈতিকতা ও মানবিক মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত করার নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানবকে আনন্দ ও বিশ্রামের অধিকার দিয়েছেন, তবে তা

---

৫০৯ আল-কুর'আন, ৪৯: ১১

৫১০ আব্দুর রহিম, *বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৬, পৃ.৪৫

অবশ্যই হালাল ও হারাম সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। বিনোদন যখন মনের প্রশান্তি ও শরীরের সুস্থতার জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তা ইসলামে গ্রহণযোগ্য; যেমন খেলাধুলা, পবিত্র সঙ্গীত বা নাশিদ, এবং ধর্মীয় বিষয়ক সাহিত্য ও নাটক। তবে হারাম ও অশ্লীল বিষয়বস্তু যেমন মদ, জুয়া, অবৈধ নাচ-গান বা অপমানজনক ভাষা ইসলামী নীতির পরিপন্থী এবং তা মানব জীবনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করে কলা, সাহিত্য ও স্থাপত্যে নৈতিকতা বজায় রাখা জরুরি।

ক. হালাল বিনোদনের উৎসাহ

ইসলাম মানুষকে মন এবং শরীরের সুস্থতার জন্য বিনোদনের অনুমতি দেয়, তবে তা অবশ্যই শালীনতা, নৈতিকতা ও হালালতার সীমার মধ্যে থাকতে হবে। হালাল বিনোদন যেমন খেলাধুলা, ইসলামি নাশিদ, ধর্মীয় আলোচনা, সাহিত্যচর্চা এবং সামাজিক মিলন সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। নবী করীম (স.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের মাঝে এমন কিছু সময় রাখো, যাতে তোমরা বিশ্রাম ও বিনোদন করতে পারো"[৫১১]। এই বিনোদন কেবল ক্লান্তি দূর করে না, বরং আত্মিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে। তাই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য নিরাপদ ও শিক্ষামূলক বিনোদনের সুযোগ তৈরি করা ইসলামি দায়িত্ব। বর্তমান সময়ে সামাজিক ও ডিজিটাল মাধ্যমের মাধ্যমে তরুণদের মাঝে হালাল বিনোদনের প্রচার ও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা হারাম ও অবৈধ বিনোদন থেকে বিরত থাকে এবং ইসলামিক মূল্যবোধের সঙ্গে মিল রেখে জীবন যাপন করে।উদাহরণ: হালাল খেলাধুলা (তীর-ধনুক, সাঁতার, ঘোড়সওয়ারি), কবিতা, ইসলামি নাশিদ। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "তোমাদের অন্তরের জন্য কিছু সময় রাখো, যাতে তা আনন্দ পায়।"[৫১২]

তবে বিনোদনের মাত্রাও নির্দিষ্ট। বিনোদনের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

পার্থিব জীবন তো কেবল খেলা ও বিনোদন মাত্র; আর পরকালের আবাসই তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না?[৫১৩]

খ. সংস্কৃতিতে নৈতিকতা বজায় রাখা

ইসলাম সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যেমন গান, নাটক, কবিতা বা শিল্পকলায়, ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করে অশ্লীলতা, মিথ্যা, গীবত, হিংসা ও অনৈতিক আচরণ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "অবিশ্বাসীদের

---

৫১১ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি, *সহিহ আল-বুখারি*, খণ্ড ৩, দার ইবনে কাসির, ১৯৮৭, হা. ৬৯৭৫

৫১২ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি, *সহিহ আল-বুখারি*, খণ্ড ৩, দার ইবনে কাসির, ১৯৮৭, হা. ১৯৬৮

৫১৩ আল-কুর'আন, ৬:৩২

মতো না হও যা বলে তারা তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে; আর যারা নিষ্ঠুরতা করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।"[৫১৪] । তাই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেন মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করে, সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে সেই দিকেই মনোযোগ দেওয়া উচিত। বর্তমানে বাংলা চলচ্চিত্র, নাটক ও গান শিল্পে অনেক সময় অশ্লীলতা ও অবৈধ বিষয়বস্তু প্রবেশ করায় সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংস্কৃতির নৈতিকতা রক্ষা করাই প্রয়োজন, যাতে কলা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর স্মরণ ও সৃষ্টির প্রশংসা করতে পারে। উদাহরণ: ইসলামি নাটক, শিশুতোষ শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম, ধর্মীয় বিষয়ক চলচ্চিত্র।

গ. ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ

ইসলামী ঐতিহ্য হলো মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বিস্তৃত হয়ে এসেছে। এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা মানে কেবল পুজো-পাঠ, মসজিদের স্থাপত্য বা ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ রক্ষাই নয়, বরং ইসলামি মূল্যবোধ, নৈতিকতা, ভাষা, সাহিত্য ও কলাকুশলাকে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ এবং প্রবর্তন করা। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের কীর্তি ইতিহাসগুলো তোমাদের জন্য পাঠ করেছি, যেন তোমরা স্মরণ করো।"[৫১৫] বাংলাদেশে ইসলামি ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে যেমন লালবাগ কেল্লা, কাওরানবাজারের পুরাতন মসজিদ, ওয়াল্লাম মসজিদের স্থাপত্য রয়েছে, তেমনি লোকসংস্কৃতিতে ইসলামী প্রভাবও গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। আধুনিকায়নের ঢেউয়ে এই ঐতিহ্য বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায়, সরকার, সংস্কৃতি কর্মী ও সমাজের প্রতিটি স্তরকে ঐতিহ্যের যথাযথ সংরক্ষণে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। এ জন্য ঐতিহাসিক স্থান রক্ষণাবেক্ষণ, ইসলামি সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রচার এবং ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসরণ অত্যন্ত জরুরি। মুসলিম ঐতিহ্য যেমন-মসজিদের স্থাপত্য, ইসলামি ক্যালিগ্রাফি, লোকসঙ্গীতে ধর্মীয় উপাদান, ঈদ সংস্কৃতি এসব রক্ষা ও প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে হালাল করা

ইসলামে পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, জন্মদিন, জন্মান্তর, ঈদগিফট আদানপ্রদান, এবং অন্যান্য উৎসব উদযাপন করার ব্যাপারে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আয়োজন যেন ইসলামের আদর্শ ও নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং হারাম উপকরণ যেমন মদ, জুয়া, অশ্লীল গানের ব্যবহার, অপব্যবহার ও অপমানজনক আচরণ থেকে দূরে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স.)

---

৫১৪ আল-কুর'আন, ৩: ১১৮

৫১৫ আল-কুর'আন, ৬: ৯৭

বলেছেন, " যে কিছু অধিক পরিমাণে মাতাল করে, তার সামান্যও হারাম।"[৫১৬] তাই পারিবারিক অনুষ্ঠানকে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও আল্লাহভীরু পরিবেশে সম্পন্ন করার মাধ্যমে মুসলিম পরিবার ও সমাজের ঐক্য ও সুস্থতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত খরচ, বিলাসিতা ও অবৈধ আয়োজন পরিহার করে সহজ ও সাদাসিধে উপায়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাই ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে খাপ খায়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ওয়ালিমা করো, যদিও তা একটি মাত্র ছাগল দিয়েই হয়।[৫১৭] বাংলাদেশে সামাজিক অনুষ্ঠানে ইসলামি অনুশাসন অনুসরণ করলে মিথ্যা খরচ কমে, সম্পর্ক সুগভীর হয় এবং সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ঠেকানো যায়। বিয়ে, জন্মদিন, মজলিস, মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হারাম উপাদান যেমন মদ, গান-বাজনা, অশ্লীল নাচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে ইসলামী অনুশাসন মেনে আয়োজন। উদাহরণ: ওয়ালিমা সুন্নাহ অনুযায়ী করা, ইসলামি কুইজ বা হাদিস প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত করা।

ঙ. শিল্পকলায় ইসলামী মানদণ্ড

ইসলামী সংস্কৃতিতে শিল্পকলাকে নৈতিকতার আলোকে মূল্যায়ন করা হয়, যেখানে শিল্পীর উদ্দেশ্য ও সৃষ্টির বিষয়বস্তুকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করা জরুরি। শিল্পকর্ম যেন অশ্লীলতা, অহংকার, বেদরকারী বা অবৈধ বিষয়বস্তু প্রকাশ না করে, বরং মানুষের চরিত্র নির্মাণে ও আল্লাহর কৃপা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তোমরা সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং জাগরূক হও।" [৫১৮] যা শিল্পীকে সৃষ্টির মহিমা তুলে ধরার প্রেরণা দেয়। ইসলামি ক্যালিগ্রাফি, স্থাপত্য, কবিতা, ও সংগীতের মধ্যে যেমন আল্লাহর মহিমা ও নৈতিকতা ফুটে ওঠে, তেমনি এসব শিল্পকলায় মানুষের মনের প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নও লক্ষ্য করা হয়। বাংলাদেশে শিল্পকলায় ইসলামী মানদণ্ড রক্ষা করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা ও ইসলামী দর্শনের সঙ্গে কলা শিক্ষা সংযুক্ত করতে হবে, যা শিল্পীদের সৃষ্টিশীলতাকে ইসলামী আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করবে। চিত্রকলা, হস্তশিল্প, স্থাপত্য, কবিতা, সাহিত্য সবক্ষেত্রে আল্লাহর মহিমা, নৈতিকতা ও শিক্ষামূলক বিষয় তুলে ধরা। উদাহরণ: প্রাকৃতিক দৃশ্য, ক্যালিগ্রাফি, কবিতায় আল্লাহর সৃষ্টির প্রশংসা।

চ. প্রযুক্তিভিত্তিক বিনোদন

বর্তমান ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তিভিত্তিক বিনোদন মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও গেম, অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি মাধ্যমে মানুষ বিনোদন গ্রহণ করে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রযুক্তিভিত্তিক বিনোদনকে নিয়ন্ত্রণ ও

---

৫১৬ (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ), মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, *সহীহ বুখারী*. খণ্ড.৭, দার ইবন কাছির, ১৯৮৭, বাংলা অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হা. ৫১৫৫

৫১৭ (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ),ইবনে আল-হাজ্জাজ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*. খণ্ড ২, দার আল-ফিকর, ১৯৯১, বাংলা অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, হা. ২০০১

৫১৮ আল-কুর'আন, ৮০: ৩০

পরিচালনা করা জরুরি, যাতে তা হালাল ও নৈতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামি নৈতিকতা অনুসারে গেম, ভিডিও, ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কনটেন্ট হালাল হওয়া উচিত, যেখানে অশ্লীলতা, জুয়া, সহিংসতা, গীবত ও মিথ্যার কোনও স্থান নেই। বাংলাদেশে তরুণ সমাজের মধ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক বিনোদনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও প্রচার করা প্রয়োজন। এতে তরুণরা বিনোদনের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষাও পাবে এবং হারাম ও অবৈধ বিনোদন থেকে বিরত থাকবে। এছাড়া পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচেতন করে নিরাপদ ডিজিটাল বিনোদনের পরিবেশ সৃষ্টি করাও অপরিহার্য। সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, গেম, ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম এসব জায়গায় ইসলামি কন্টেন্ট তৈরি ও প্রচার করা, যাতে তরুণরা হালাল বিনোদনের দিকে আকৃষ্ট হয়। যেমন: ইসলামি শর্ট ফিল্ম, গেমে ইতিহাসভিত্তিক কনটেন্ট, অনলাইন কুরআন প্রতিযোগিতা।

১০. নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ইসলাম নারীকে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্মান, অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। কুরআন ও হাদিসে নারী-পুরুষ উভয়কেই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় কেবল তাকওয়া ও সৎকর্মের মাধ্যমে।[৫১৯] নারীর অধিকার শুধু পারিবারিক জীবনে সীমাবদ্ধ নয়; শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ও আইনি ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা ও সুরক্ষা ইসলাম নিশ্চিত করেছে। নিম্নে নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো

ক. শিক্ষা অর্জনের অধিকার

ইসলাম মানবজাতির জন্য জ্ঞান অর্জনকে অপরিহার্য ও ফরজ ঘোষণা করেছে, যা নারীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। নবী করিম (স.) বলেছেন, " যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে চলবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে পথ সুগম করবেন ।"[৫২০] এই নির্দেশনার মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে। নারী শিক্ষিত হলে সে কেবল নিজের ব্যক্তিগত উন্নয়নই সাধন করে না, বরং পরিবার ও সমাজের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষিত মা সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী ইতিহাসেও অনেক সাহাবিরা শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী ছিলেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে নার-

---

৫১৯ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ), অনুবাদ:"হে মানুষগণ!আমরা আপনাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আপনাদের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতে ভাগ করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চেনাশোনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি হলো যে ব্যক্তি সবথেকে বেশি তাকওয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবকিছুর প্রতি সুপরিচিত।" আল-কুর'আন, ৪৯: ১৩

৫২০ (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, খণ্ড ১, দার ইবন কাছির, ১৯৮৭, হাদীস নং ৭৫, বাংলা অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ীর শিক্ষার প্রসার সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার পথ প্রশস্ত করেছে। তাই ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে নারীর শিক্ষা অর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তা সর্বাত্মক উৎসাহিত করা বর্তমান সমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সৃষ্টিগত মর্যাদা ইসলাম নারীকে পুরুষের সমানভাবে আল্লাহর সৃষ্টিজগতে সম্মানিত করেছে। কুরআন: "আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি..."[৫২১]

খ. সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় সমান গুরুত্ব দেয়। নারীরা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করা আল্লাহর আদেশ। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীরা, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীরা, পরস্পরকে সাহায্যকারী, পরস্পরকে সদাচরণকারী, পরস্পরকে সৎ পথ দেখানো তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও বিশাল প্রতিদান রয়েছে।"[৫২২] ইসলামে নারীর প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা বা অন্যায় আ-চরণ কঠোরভাবে নিষেধ। একজন মুসলিম নারীর সামাজিক মর্যাদা রক্ষা পেলে সে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা বিকাশে উৎসাহিত হয়, যা সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত।

গ.অর্থনৈতিক অধিকার ও সম্পত্তি স্বত্ব

ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও সম্পত্তির সুরক্ষায় ব্যাপক গুরুত্ব দেয়। নারীরা তাদের নিজের নামেই সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, জমি-জমাদান, ব্যবসা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক লেনদেনে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তাদের উপার্জিত অর্থে পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "পুরুষদের জন্য তাদের অর্জিত কর্মের অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও তাদের অর্জিত কর্মের অংশ রয়েছে।"[৫২৩] এই আয়াত নারীদের সম্পত্তির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার নির্দেশনা দেয়। অর্থাৎ নারীরা তাদের সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া, বিবাহ বা তালাকের সময় নারীর উপার্জন ও সম্পত্তির অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা ইসলামি বিধান। ইসলামে নারীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তার সামাজিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রধান দিক। বাংলাদেশসহ বিশ্বের মুসলিম সমাজে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সামগ্রিক উন্নয়ন ও নারী শক্তিকরণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

---

৫২১ আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

৫২২ আল-কুর'আন, ৯: ৭১

৫২৩ (وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ), আল-কুর'আন, ৪: ৩২

ঘ.পারিবারিক জীবনে মর্যাদা ও অধিকার

ইসলামে পারিবারিক জীবনে নারীর মর্যাদা ও অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে। স্ত্রী হিসেবে তার সম্মান, স্বামী হিসেবে তার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা স্বাভাবিক দায়িত্ব। নবী করিম (স.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হলো যে তার স্ত্রীদের প্রতি সবচেয়ে ভালো আচরণ করে, এবং আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারে সবচেয়ে ভালো আচরণ করি।"[৫২৪]পরিবারে পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা হয়। স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকারের মধ্যে রয়েছে সৎ উপার্জন, নিরাপদ পরিবেশ, খাদ্য-বাসস্থান ও মানসিক স্নেহ। স্বামী স্ত্রী উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমন্বয়ে পরিবারের বন্ধন দৃঢ় হয়। এছাড়া, সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষায় নারীর অবদান অপরিসীম, যা পরিবারের সুখ-শান্তি ও সমাজের উন্নয়নে ভিত্তি তৈরি করে। বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারগুলোতে এই ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করলে পারিবারিক কল্যাণ ও সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব।

ঙ. রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণ

ইসলাম নারীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অনুমতি ও উৎসাহ প্রদান করেছে, যদি তা ইসলামী নৈতিকতা ও শালীনতার সীমার মধ্যে থাকে। কুরআনে নারীদের পরামর্শ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার উদাহরণ পাওয়া যায়, যেমন সূরা আল-মুজাদালায় এক নারীর বক্তব্য সরাসরি আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁর জন্য বিশেষ বিধান নাজিল হয়। ইতিহাসে সাহাবিয়া নারীরা সমাজসেবা, যুদ্ধক্ষেত্রে সেবাদান, শিক্ষা, এবং প্রশাসনিক পরামর্শে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। রাজনৈতিক অংশ-গ্রহণের মাধ্যমে নারীরা ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে, আইন প্রণয়নে অবদান রাখতে এবং সামাজিক সংস্কার কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিতে পারে। বর্তমান বাংলাদেশে নারী সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্বে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন, যা ইসলামী নীতির সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণ সমাজ উন্নয়ন ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

চ. নারীদের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের অধিকার সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, " নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়ের আদেশ দেন, কল্যাণকামিতা প্রচার করতে বলেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে উপকার করতে বলেন। তিনি অসভ্যতা, অন্যায় ও প্রভুত্ব বিস্তার থেকে

---

৫২৪ (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي), মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল নিকাহ, বাংলা অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা, হা. ৫৬১৯

বিরত থাকতে বলেন। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন, যাতে তোমরা স্মরণ কর।"[৫২৫] নারীর প্রতি যেকোনো ধরনের অন্যায়, নির্যাতন বা অবিচার ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিবাহ, উত্তরাধিকার, আর্থিক লেনদেন, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারীর অধিকার লঙ্ঘিত হলে ইসলাম আইনি প্রতিকার ও বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। রাসূলুল্লাহ (স.) নারীর অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিক বিচার দিতেন, যা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,"সবচেয়ে পূর্ণ বিশ্বাসসম্পন্ন মুসলিম হলো যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। তোমাদের মধ্যে সেরা হলো যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি সবচেয়ে ভালো আচরণ করে।"[৫২৬] বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন ব্যবস্থায়ও নারীর সুরক্ষার জন্য বিশেষ আইন রয়েছে, যেমন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। তবে ইসলামী নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে নারীরা শুধু আইনি সুরক্ষাই পাবেন না, বরং ন্যায়বিচারের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারবেন।

১১. শরীয়াহ আইন ও বিচারব্যবস্থা

ইসলামী আইন ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, শরিয়াহর প্রতিটি বিধান মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন অপরিহার্য, আবার আইন বাস্তবায়নের জন্য ন্যায়বিচারই হলো মূল চালিকা শক্তি।

ক. আইন প্রণয়নের উৎস ও ভিত্তি

আইন হলো রাষ্ট্র ও সমাজে শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূল হাতিয়ার। কোনো রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, আদর্শ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আইন প্রণয়নের প্রধান উৎস হলো আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কুরআন মানবজীবনের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধানসমূহের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে; আর সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগের উদাহরণ উপস্থাপন করে। এর পাশাপাশি ইজমা (যোগ্য আলেমদের সর্বসম্মত মত) ও কিয়াস (তুলনামূলক বিশ্লেষণ) আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষত নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যার সমাধানে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধান হলো আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ভিত্তি, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচারের নীতি সংরক্ষণ করে। এছাড়া প্রচলিত রীতি-নীতি, যা শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলোকেও আইন প্রণয়নে বিবেচনা করা

---

৫২৫ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ), আল-কুর'আন, ১৬: ৯০

৫২৬ (إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ), ইমাম তিরমিজি, *সুনান আত-তিরমিজি*, কিতাবুল নিকাহ, দারুস সালাম, ১৪২০ হিজর, হাদিস নং ১১৬২,

হয়। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিও আইন প্রণয়নের একটি উৎস, তবে ইসলামে তা গ্রহণযোগ্য তখনই, যখন তা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এভাবে ধর্মীয় নির্দেশনা, সংবিধানিক কাঠামো, প্রথাগত রীতি এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব একত্রে আইন প্রণয়নের ভিত্তি তৈরি করে, যা ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে। ইসলামে আইন প্রণয়নের মূল ভিত্তি হলো কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা (আলেমদের সর্বসম্মত মত) এবং কিয়াস (যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্ত)। কুরআন স্পষ্টভাবে বলে,

"যে কেউ আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, সে অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[৫২৭]

খ. বিচার ব্যবস্থায় সমতা

বিচার ব্যবস্থায় সমতা বলতে বোঝায় আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা, যেখানে বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, সামাজিক মর্যাদা বা অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা হয় না। ইসলামে ন্যায়বিচার ও সমতার নীতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা ন্যায়বিচার করবে, যদিও তা তোমাদের নিজের বা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।"[৫২৮] রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জীবনে বিচারকার্যে কখনো পক্ষপাত দেখাননি; এমনকি এক মহিলার চুরির ঘটনায় তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "আল্লাহর শপথ! যদি আমার কন্যা ফাতিমা চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।"[৫২৯] আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থায় সমতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন স্বাধীন বিচার বিভাগ, নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আর্থিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা, এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ন্যায়বিচার। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় প্রাপ্য।" অর্থাৎ, বিচার ব্যবস্থার সমতা শুধু নৈতিক বা ধর্মীয় নির্দেশই নয়, এটি সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারও বটে। এই নীতি বাস্তবায়নেই সমাজে ন্যায়, শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলামী আইনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ধনী-গরিব, শাসক-প্রজার মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়ায় কোনো ভেদাভেদ নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: "অতীতের জাতিগুলো ধনীদের শাস্তি দিত না, কিন্তু গরিবদের শাস্তি দিত।"[৫৩০] তাই বিচারের ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ (স.) এর নির্দেশনা হল, "তোমরা বিচার

---

৫২৭ আল-কুর'আন, ৫:৪৫

৫২৮ আল-কুর'আন, ৪: ১৩৫

৫২৯ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল হুদুদ, দারুস সালাম, ১৪২০ হিজরী, হা. ৫১৫৫

৫৩০ (مَا كَانَ أَحَدٌ يُعَاقَبُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، وَالْفُقَرَاءُ يُعَاقَبُونَ), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল হুদুদ, দারুস সালাম, ১৪২০ হিজরী, হা. ৫১৫৭

করলে তোমার নিজস্ব প্রবৃত্তি অনুসরণ করো না; গরিব ও ক্ষমতাশালী সকলের প্রতি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো।"[৫৩১] এই নীতি বাস্তবায়ন করলে সমাজে আস্থা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

গ. অপরাধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

অপরাধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় সমাজে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা রোধ করার জন্য গৃহীত আইনগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক পদক্ষেপসমূহ। ইসলামে অপরাধ প্রতিরোধকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ পৃতিটি অপরাধ মানুষের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার ওপর আঘাত হানে। কুর'আনে আল্লাহ বলেন "তোমরা সৎকাজে একে অপরকে সাহায্য করো এবং অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না।"[৫৩২] অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী পদ্ধতিতে রয়েছে নৈতিক শিক্ষা প্রদান, পরিবার ও সমাজে ইসলামী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ, মাদক ও অশ্লীলতা নিয়ন্ত্রণ, এবং সামাজিক নজরদারি বৃদ্ধি। এছাড়া শরীয়াহতে কঠোর শাস্তির বিধান যেমন চুরি, ডাকাতি বা হত্যা প্রতিরোধে একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে। আধুনিক রাষ্ট্রে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর পুলিশিং, প্রযুক্তি-নির্ভর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, কমিউনিটি পুলিশিং, সিসিটিভি নজরদারি, আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং অপরাধপ্রবণ এলাকার জন্য বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে অপরাধ প্রতিরোধে এ সকল ব্যবস্থা সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন হলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ইসলামী ন্যায়বিচার কেবল শাস্তি প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অপরাধ প্রতিরোধের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক পরিবেশ তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ যাকাত, সৎকর্মে উৎসাহ, নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা অপরাধ হ্রাসে ভূমিকা রাখে।

ঘ. সাক্ষ্য ও প্রমাণের গুরুত্ব

বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য ও প্রমাণের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ ন্যায়বিচারের ভিত্তি মূলত সঠিক তথ্য ও সত্য ঘটনাপ্রবাহের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ইসলামে সাক্ষ্য (শাহাদাহ) দেওয়া একটি গুরুতর দায়িত্ব এবং তা সৎ ও নিরপেক্ষভাবে প্রদান করা ফরজ। আল-কুরআনে বলা হয়েছে "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না; যে কেউ তা গোপন করবে, তার হৃদয় পাপী।"[৫৩৩] রাসূলুল্লাহ(স.) মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূলুল্লাহ(স.) বলেন, তুমি জানো সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনগুলো? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শরীক

---

৫৩১ (لَا تَأْخُذُوا فِي الْحُكْمِ أَهْوَاءَكُمْ وَأَدُّوا الْحَقَّ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَقْوِيَاءِ),ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আদাব, দারুস সালাম, ১৪২০ হিজরী,হাদিস নং ৫৬০৬,

৫৩২ (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ), আল-কুর'আন, ৫: ২

৫৩৩ (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ),আল-কুর'আন,২: ২৮৩

স্থাপন করা, পিতামাতার প্রতি অবাধ্য হওয়া, এবং সাক্ষ্যে মিথ্যা বলা। [৫৩৪] ইসলামী আইনে সাক্ষ্য অবশ্যই বিশ্বস্ত, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক ও নৈতিকভাবে সৎ ব্যক্তির হতে হবে। নারী, পুরুষ, অমুসলিম ও বিশেষজ্ঞ সাক্ষীর ক্ষেত্রেও শরীয়াহতে আলাদা বিধান রয়েছে। আধুনিক আইনে সাক্ষ্যের পাশাপাশি পদার্থগত প্রমাণ, ফরেনসিক রিপোর্ট, ডিজিটাল তথ্য, ভিডিও ফুটেজ ইত্যাদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের প্রমাণ আইন (Evidence Act, 1872) অনুযায়ী, আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণের ধরন ও মানদণ্ড নির্ধারিত রয়েছে। সঠিক সাক্ষ্য ও প্রমাণ না থাকলে বিচার প্রক্রিয়া ভ্রান্ত হতে পারে, অপরাধী মুক্তি পেতে পারে এবং নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পেতে পারে। তাই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সত্যনিষ্ঠ সাক্ষ্য ও নির্ভুল প্রমাণ অপরিহার্য। ন্যায়বিচারে সাক্ষ্য প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম সাক্ষ্যদানকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করে এবং মিথ্যা সাক্ষ্যকে বড় গুনাহ ঘোষণা করেছে। কু-রআনে বলা হয়েছে:

"সত্য সাক্ষ্য লুকিও না, যে তা লুকায়, তার অন্তর পাপী।"[৫৩৫]

বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় যদি সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ও যাচাইয়ে ইসলামী মানদণ্ড প্রয়োগ হয়, তাহলে ভুয়া মামলা ও অন্যায় রায় কমবে।

ঙ. শাস্তি প্রদানে মানবিকতা

শাস্তি প্রদানে মানবিকতা বলতে বোঝায় অপরাধীর প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ আচরণ না করে, ন্যায়বিচার ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে শাস্তি প্রয়োগ করা। ইসলামে শাস্তির মূল লক্ষ্য কেবল অপরাধ দমন নয়, বরং অপরাধীকে সংশোধন ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে তোমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ, তেমন শাস্তিই দাও; আর যদি ধৈর্য ধরো, তবে তা অবশ্যই উত্তম।"[৫৩৬] রাসূলুল্লাহ (স.)এর জীবনে দেখা যায়, তিনি শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়, দয়া ও ক্ষমাশীলতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; যেমন, বহুবার অপরাধীদের অনুতপ্ত হলে ক্ষমা করেছেন। ইসলামী আইন অনুযায়ী, শাস্তি কার্যকর করার আগে অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে দৃঢ় প্রমাণ ও বিশ্বস্ত সাক্ষ্যের মাধ্যমে, এবং কোনো নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তির শিকার না হয়। আধুনিক বিচার ব্যবস্থায়ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা জরুরি, যেমন, অপরাধীর বয়স, মানসিক অবস্থা, সামাজিক প্রেক্ষাপট, এবং পুনর্বাসনের সুযোগ বিবেচনা করা। মৃত্যুদণ্ড বা কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রেও ইসলামী ও আধুনিক আইনে নির্দিষ্ট শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যা শাস্তিকে মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত রাখতে সহায়তা

---

৫৩৪ (أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আ বুখারী (রহ.), *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আমানাহ, হাদিস নং ৬৬৫৭, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০।

৫৩৫ আল-কুর'আন, ২:২৮৩

৫৩৬ আল-কুর'আন, ১৬: ১২৬

করে। এই নীতি মানলে বিচারব্যবস্থা শুধু কঠোর নয়, ন্যায় ও করুণার সমন্বয়ে গঠিত হবে। ইসলামে শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়, বরং অপরাধীকে সংশোধন ও সমাজকে সুরক্ষা দেওয়া। যেমন, চুরি, হত্যা, ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত শাস্তি কঠোর হলেও তা ন্যায়বিচারের জন্যই প্রযোজ্য হয় এবং অভিযুক্তের সকল অধিকার রক্ষা করা হয়।

১২.রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম

সাধারণত মনে করা হয় ইসলাম একটি ধর্ম মাত্র এবং ইসলামী শরিয়ত কেবলমাত্র নৈতিক চরিত্র ও আল্লাহর সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম-বিধানই পেশ করে। এ ছাড়া মানবজীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলামের কিছুই বলার নেই। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলাম একেবারেই নীরব এবং শরিয়তের বিধানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়েই আইন-বিধান দেয়া হয়েছে। সে পর্যায়ে মুসলমানরা যেকোনো নীতি বা আদর্শ গ্রহণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বস্তুত ইসলামী শরিয়তের বিধান আল্লাহর এ দাবির সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তার পরামর্শভিত্তিক তথা গণতান্ত্রিক হওয়া, শাসন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলতা, ন্যায়সঙ্গত কাজে তাদের আনুগত্য, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে অকাট্য বিধান রয়েছে ইসলামী শরিয়তে। আর তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাই নয়, রাসূলে করিম (স.)-এর সুন্নতেও রয়েছে তার ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপসংক্রান্ত বিধান। কুরআন-হাদিসে আমির, ইমাম ও সুলতান প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলো বারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩. আন্তর্জাতিক

আন্তর্জাতিক সাধারণ আইন হলো, এমন কতিপয় সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির সমষ্টি যা যুদ্ধ কিংবা শান্তি যে কোনো অবস্থায় আন্তর্জাতিক আইন সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। অতীতকাল থেকেই আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের মূলনীতির প্রধান উৎসগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ, প্রচলিত প্রথা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক স্বীকৃত সাধারণ আইনের ভিত্তিসমূহ।

আর ইসলামে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি করেছেন, তাদের সাথে লেনদেন করেছেন এবং এভাবে তাদের মাঝে একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্কগুলোর অবশ্যই কিছু মূলনীতি ছিল যা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতো। আর এই মূলনীতিগুলোই ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সাধারণ আইনের প্রতিনিধিত্ব করে। আন্তর্জাতিক ইসলামি সাধারণ আইন হলো ইসলামি শরীয়াহ'র এমন কিছু মূলনীতি যা কোনো ইসলামি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করে থাকে।

১৩.১ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

ইসলামের শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশনে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হল এই উখওয়াত। কেননা ভাইদের মাঝে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে বিশ্ব মানবকে যদি সে সম্পর্কে আবদ্ধ করা যায় তাহলে সহজেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকার ভ্রাতৃত্বই ফলপ্রসু হতে পারে এবং মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে- ১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, ২. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম ধর্ম সবার ক্ষেত্রে উদার। উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় উপযোগী ও অনুকূল। ইসলাম পূর্ববর্তী সব নবী-রাসুলকে বিশ্বাস করে এবং সম্মানের চোখে দেখে। ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অন্যতম লক্ষ্য হলো বিশ্বমানবতার ঐক্য। কোরআন-হাদিসে ঐক্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৫৩৭] আল্লাহ বলেন,' তোমরা আমার রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়ো না।[৫৩৮] ইসলামি দর্শনে অনুপম ভ্রাতৃত্বে আরব-অনারব, ধনী-গরিব তথা সব মানুষ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। রাসুল (স.) বলেন, 'অনারবদের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবদের ওপর অনারবদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' ভ্রাতৃত্বের প্রতিবন্ধক হলো স্বার্থপরতা।

ইসলাম সবাইকে স্নেহ-ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বাঁধনে আবদ্ধ রাখতে চায়। আবদ্ধ রাখতে চায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধে। ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে, দুনিয়ার সব মানুষ এক আদমের সন্তান। অতএব, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অনুসারে কারও ওপর কারও প্রাধান্য নেই।

১৩.২ দাওয়াহ

ইসলামে দাওয়াহ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামকে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে দাওয়ার কোন বিকল্প নেই। তবে এ ক্ষেত্রে উপস্থাপনাটা একটা মূল এবং মুখ্য বিষয়। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যকে উপস্থাপন না করেত পারলে দাওয়ার সঠিক উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। আরব্য জীবনাচারে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মহানবী (স.)-এর ঐশীবাণী প্রচারের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যেমন প্রয়োজন ছিল পারিবারিক, গোত্রীয় ও স্বদেশীয় প্রচেষ্টা, তেমনি প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নেরও। এই লক্ষ্যে তিনি হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারায় দাওয়াতি কার্যক্রম ও বিভিন্ন স্থানে দাঈ ও দাওয়াতি কাফেলা প্রেরণ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। তাঁর এই শিক্ষা বর্তমানেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের কাছে সুপ্রশংসিত।

---

৫৩৭ সায়্যিদ আব্দুল লতিফ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

৫৩৮ (فَتَمَسَّكُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا), আল-কুর'আন, ৩: ১০৩

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি ইসলামের দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন, এক. ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম প্রচার, দুই. ইসলাম প্রচারের জন্য দূরবর্তী এলাকায় সফর, তিন. সন্ধিচুক্তি স্থাপন, চার. ইসলাম প্রচারের জন্য দূত নিয়োগ, পাঁচ. ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ, ছয়. ইসলাম প্রচারের জন্য চিঠিপত্র প্রেরণ। উল্লিখিত সব পদ্ধতিই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত কার্যকর ছিল।

১৩.৩ খিদমতে খল্‌ক

মহান আল্লাহ এই সৃষ্টি জগতের সবকিছুই একটি ছকে বেঁধে দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বজগত নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় মানুষের কল্যাণে এবং প্রয়োজনে প্রকৃতি প্রতি নিয়ত তার স্বাভাবিক গতিশীল অবস্থায় বিচরণ করছে। অথচ যাদের কল্যাণে এত আয়োজন সেই মানব সন্তানই জীবনের প্রবাহমান গতিকে বারংবার বাধাগ্রস্ত করছে। প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা আছে, কারণ সৃষ্টিকর্তা কোন কিছুই অকারণে সৃষ্টি করেননি। আমাদেরকে যা দিয়েছেন আমানত স্বরূপ এবং এসব বিষয়ে অবশ্যই মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষ আল্লাহ তায়ালার সেরা সৃষ্টি।[৫৩৯] পৃথিবীতে তারা আল্লাহ তায়ালার খলিফা। পৃথিবীর সব কিছু মানুষের ব্যবহারের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষ এ সব সৃষ্টির সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য করবে। সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি ও পরিচর্যা দিয়ে তাদের অসুবিধা দূর করবে। খিদমতে খল্‌ক মূলত মানুষের এমন সহমর্মী আচরণের নাম। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের উপর হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক এবং হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক বলে দুই রকম হক আদায়ের দায়িত্ব রয়েছে। মহানবী (স.) খিদমাতে খালক এর গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন- তোমরা পৃথিবী বাসীর উপর দয়া প্রদর্শণ করো, তাহলে আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর রহমত করবেন।

১৩.৪ মানবাধিকার সংরক্ষণ

মানবাধিকারের বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বত্র সমান। মানবজাতিকে ইসলাম গৌরব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম মানুষকে সমান অধিকার, একতা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ইসলামে বংশ মর্যাদা, শ্রেণিবিভেদ, জাতিগত বিভেদ ও বর্ণবিভেদ থেকে সতর্ক করেছে। দাস-দাসী ও অধীনস্তদের প্রতি সুন্দর ও ন্যায়ানুগ ব্যবহার করতে শিক্ষা দিয়েছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ হিসাবে সবাই সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। মৌলিক অধিকার সবার সমান। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকারও সবার ক্ষেত্রে সমান। ব্যক্তি স্বাধীনতাও সবার ক্ষেত্রে সমান। মর্যাদার দিক দিয়ে ইসলামে ধনী গরিব সবাই সমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক,

---

৫৩৯ فضل بن عبد الله مراد, *القرآن وصناعة الإنسان والحياه :: قراءة فقهية جديدة في قصار السور، معالجات للنفس والحياه المعاصرة، تأصيل وتنزيل، فقه وفكر وتزكية*, الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم, ٢٠٢٢م, ص. ٩٧.

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারও সবার ক্ষেত্রে এক। জানমালের নিরাপত্তার অধিকার একই। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্থাৎ বাকস্বাধীনতা সবার ক্ষেত্রে এক।

১৩.৫ পরিবেশ সংরক্ষণ

সুন্দর নয়নাভিরাম এ সবুজ পৃথিবী মহান স্রষ্ঠার অনন্য সৃষ্টি। তিনি ধরণীকে গাছ-পালা, তরু-লতা, পাহাড়-ঝর্ণা, নদ-নদী, সাগর-মহাসগরের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যে সাজিয়েছেন।[৫৪০] জীবের জীবিকা ও কল্যাণের জন্যে গাছপালা, বৃক্ষলতা এবং ফল ফসলের প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। পরিবেশ রক্ষায় গাছপালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জন্যে ইসলামে গাছপালা ও ফসল জন্মানোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি তা সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধাবস্থায় পর্যন্ত বৃক্ষনিধন ও শস্য বিনষ্ট করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। মানুষ তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধপথ্য ইত্যাদির জন্য সরাসরি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। এককথায়, খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মানুষ জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।। ইবন খালদুন তার 'আল-মুকাদ্দিমা' নামক অমর গ্রন্থে বায়ূ দূষণের পেছনে দুর্ভিক্ষ, মহামারিসহ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, এসব কারণে বায়ু দূষিত হয় এবং তা থেকে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়, আর্দ্রতা তৈরি হয় ও বিকৃতি সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি বলেন, মানুষের উচিত বসতি স্থাপনের সময় বাড়ি-ঘরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখা। যাতে বাতাস তরঙ্গায়িত হতে পারে এবং বাতাসে বিদ্যমান বিকৃতি ও পচন থেকে সৃষ্ট ক্ষতিকর উপাদানগুলো উড়ে যেতে পারে। [৫৪১]

জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের প্রত্যক্ষ হুমকিগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্রুত ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বন ও জলাভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর বা ভূমি ব্যবহারের অন্যান্য রূপ, জনসংখ্যার চাপ, বায়ু ও পানিদূষণ, জলবিদ্যুৎ ব্যবস্থার পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত সংগ্রহ। সেই সঙ্গে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার, জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনশিল্প, প্লাস্টিক পণ্যের অ-নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, ইলেকট্রনিকস বর্জ্য, মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ ইত্যাদি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার উৎসাহ দিয়ে মহানবী (স.) বলেন, 'মানুষ, পাখি বা পশু যখন তাদের খাবার গ্রহণ করে, তখন তা তার রোপণকারীর (উৎপাদনকারীর) পক্ষে একটি সদকা বা দান হিসেবে পরিগণিত হয়।'[৫৪২]আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেন, 'যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে,

---

৫৪০ অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান, *কুর'আন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন*, প্রগুক্ত, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৮২

৫৪১ ইবনে খালদূন। *আল-মুকাদ্দিমা* (অনুবাদ: গোলাম সামদানী কোরাইশী), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৭৭১-৭৭২

৫৪২ (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ),ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.). *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-মুযারাআহ, অধ্যায়: ফল ও বৃক্ষরোপণের ফজিলত, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হাদীস নং ২৩২০

কেয়ামত এসে গেছে, তখন হাতে যদি লাগানোর মতো একটি চারাও থাকে, তবে তা লাগাবে।'[৫৪৩]পশুপাখির সঙ্গে যথাসম্ভব দয়াশীল আচরণ করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (স.) ওই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে প্রাণীদের অঙ্গচ্ছেদ করে।'[৫৪৪] অহেতুক পশুপাখির পেছনে লেগে থাকা এবং এগুলোকে অযথা শিকার করা ইসলামে নিন্দনীয়। মহানবী (স.) এরশাদ করেন, 'কোনো প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না।'[৫৪৫] অন্য হাদিসে এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অহেতুক কোনো চড়ুই পাখি মেরে ফেলল, কিয়ামতের দিন পাখিটি আল্লাহর কাছে এই বলে নালিশ করবে যে, হে আল্লাহ, অমুক ব্যক্তি আমাকে অহেতুক হত্যা করেছে।'[৫৪৬] জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার অংশ হিসেবে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমানোর জন্য জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা অতীব প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। সৃষ্টিজগতের ভারসাম্য রক্ষায় এ ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনাই হোক সর্বোত্তম পাথেয়। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতেও সব প্রজাতির জীবকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের প্রত্যেকের অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

এ অধ্যায়ের পরিশেষে এটাই বলা যায় যে, ইসলাম কেবল একটি বিশ্বাসব্যবস্থা নয়, বরং এটি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। এর প্রায়োগিক দিক মানুষের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা, পরস্পরের প্রতি সম্মান ও ঐক্যের চেতনা গড়ে ওঠে। এভাবে এটি শুধু ব্যক্তি নয়, বরং সমগ্র সমাজকে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণমুখী পথে পরিচালিত করে। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতির প্রয়োগ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য এবং তা মুসলিম উম্মাহকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

---

৫৪৩ (إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.). *আল-আদাব আল-মুফরাদ*,অনুবাদ: ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, হাদীস নং ৪৭৯

৫৪৪ (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ), ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ৫৫১৫

৫৪৫ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বুখারী (রহঃ) *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব আল-যাবায়িহ ও আস-সাইদ, বাব: মা নুহি আনিল-মুছলাহ ওয়াল-কাতলি লিঘাইরি মাকলাহ, হাদীস নং ৫৫১৩

৫৪৬ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ."سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: "يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا), মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ, *সুনান ইবনে মাজাহ*, বেইরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, হাদীস নং ৩২২০

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহারিক পরিস্থিতি

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহারিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশের পরাধীনতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে বার বারই নানান রকম জাতি গোষ্ঠীদের দ্বারা শোষিত হওয়ার ধারাবাহিকতায় এ অঞ্চলের মানুষের জীবনাচরণের সঙ্গে মিশেছে নানান ধরণের সংস্কৃতি। তবে এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইসলামের প্রতি ছিলো অগাধ ভালোবাসা ও বিশ্বাস। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিষয় ছিলো ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা ও এর সংস্কৃতির সঠিক চর্চা করা। কিন্তু এ দেশে অন্যান্য ধর্মের অনুসারী থাকায় ইসলামের সাথে তাদের একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রয়োজন ছিলো। তাই দেশের তখনকার সরকার সকলের শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন করেছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি দেশের জনগনের কল্যানে প্রণয়নের ধারাবাহিকতা দৃশ্যমান হয়। বেশ কিছু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে বিষয়টির ধারনা লাভ করার প্রয়াস রইলো।

১. দেশের সংবিধান

দীর্ঘ দুশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, অতঃপর ধর্ম ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় '৪৭ এ পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়। এরপর তেইশ বছরের পাকিস্তানী শাসন ও নিপীড়নের জবাবে নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর '৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।[৫৪৭] আর স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র এক বছরের মধ্যেই এ জাতি লাভ করে এক অনন্য ও স্বতন্ত্র সংবিধান। ১৯৭২ সালে মূল সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সন্নিবেশিত হয়- জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর থেকে এ অবধি ১৫ টি সংশোধনী আনা হয়েছে এবং এতে সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বা ধারা- উপধারা পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজনের পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষতা পরিবর্তিত হয় আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসে।

১.১ সংবিধানে ইসলাম

বাংলাদেশের সংবিধান শুরুই হয়েছে, বিসমিল্লাহির-রাহমানির রাহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে) দিয়ে। আর এখানেই ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। আর সংবিধানের প্রথম ভাগেই রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের কথা বলা আছে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, অন্তত দু'ভাবে ইসলাম ধর্মের মর্যাদা সংবিধানে সব ধর্মের উপরে স্থাপন করা হয়েছে।

---

৫৪৭ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ.১২৩

বাংলাদেশের সংবিধানে সংবিধানের ভূমিকা ও প্রথম অংশে দুইবার ইসলামের কথা বলা হয়েছে। নথিটি আরবি বাক্যাংশ দিয়ে শুরু হয় (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) যা বাংলাতে অনুবাদ করলে হয় "পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর নামে" এবং অনুচ্ছেদ (২ক) ঘোষণা করে যে: "ইসলাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম"।

সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে,"রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন ধর্মের ব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির বৈষম্য বা তার উপর উৎপীড়ন করা হবে না।"মানুষ যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে এবং কেউ যাতে কারো ধর্ম-পালনে বাধা সৃষ্টি করতে না পাওে সেজন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সকল ধর্ম সমান। জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন, প্রচার ও অনুশীলন করতে পারে।[৫৪৮] সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মকে অস্বীকার করা নয়, ধর্মহীনতাও নয়। ১৯৭৯ সালের পঞ্চম সংশোধনীতে সংবিধানের অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ–

ক. ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীতে 'সমাজতন্ত্রের' ব্যাখ্যা দেওয়া হয় 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার'।

খ. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'ধর্ম নিরপেক্ষতার' স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এ কথাগুলো সবিধানে সংযোজন করা হয়।

গ. মূল সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' শব্দটি সংবিধানে সংযোজন করা হয়।

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তবে এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সমুন্নত রাখা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ ধর্মীয় বৈষম্যে বিধিনিষেধ রয়েছে এবং সব ধর্মের সমতা দেওয়া হয়েছে বলে মনে করে। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হচ্ছে সংবিধানের প্রথম ভাগের অংশ (২ক)। আর সংবিধানের প্রথম ভাগ হলো সংশোধন অযোগ্য। সুতরাং কোনো দল বা গোষ্ঠী, এমনকি জাতীয় সংসদ চাইলেও সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংশোধন করতে পারবে না। কেউ যদি মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করে, তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

---

৫৪৮ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা বীকন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খ্রি, পৃ. ৭৮

বলেছেন, বাংলাদেশ মদিনার সনদের চেতনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। সংবিধান ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু এটাও বলে যে অন্য ধর্মগুলোও সম্প্রীতির সাথে পালন করা যেতে পারে। ইসলামী আইন মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত নাগরিক বিষয়ে একটি ভূমিকা পালন করে; যদিও, ইসলামী আইনের কোন আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন নেই এবং এটি অমুসলিমদের উপর চাপিয়েও দেওয়া হয় না।[৫৪৯]

১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চারটি মূল স্তম্ভের তিনটিতে পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তনগুলোয় সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপিত হয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ নং অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিক-ারসমূহ সন্নিবেশিত রয়েছে।

নানান কারণে বৈষম্য : ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না। এগুলো লেখা রয়েছে অনুচ্ছেদ-২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩) অনুচ্ছেদ ২৮(১): বৈষম্য নিষেধাজ্ঞা "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপু-ুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।" এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের কাছে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থান এই কোনো কারণেই নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য করা যাবে না। এটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সমতার নীতির ভিত্তি স্থাপন করে।

অনুচ্ছেদ ২৮(২): নারী-পুরুষ সমতা,"রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।"

এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করে তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এটি রাষ্ট্রের নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব হিসেবে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার নির্দেশনা দেয়।

---

৫৪৯ আরিফ খান, *বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা: বিএলবি, ২০১৮ খ্রি. পৃ.৯৮

অনুচ্ছেদ ২৮(৩), বিশেষ বিধান,"এই অনুচ্ছেদে কিছুই রাষ্ট্রকে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নে বাধা দিবে না।"

এই অনুচ্ছেদটি স্পষ্ট করে যে, নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ আইন বা বিধান প্রণয়ন রাষ্ট্রের জন্য বৈষম্য হিসেবে গণ্য হবে না। বরং, তাদের বিশেষ সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে, যা তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সহায়ক।

১.২ ধর্মীয় স্বাধীনতা

আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হলে তাঁকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসানায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না।

৪১(১), ৪১(২), ৪১(১ক), ৪১(১খ) বাংলাদেশ পৃথিবীর ৪৫টি মুসিলিম দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ, যার জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান। অবশিষ্ট নাগরিক প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। এ দেশটির বিস্তীর্ণ অংশ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে বিরাজমান। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, উত্তরে কিছু অংশ পশ্চিম বঙ্গ ও কিছু অংশ আসাম সীমান্ত বরাবর অবস্থিত আর পূর্বদিকে মিয়ানমার সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত।[৫৫০] ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত প্রসারিত মুসলিম জাহানে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৩ শতকের শুরু থেকে আঠার শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম শাসন ছিল বাংলায়। এ শাসন কখনো দিল্লিকেন্দ্রিক সুবেদারি, কখনো স্বাধীন সুলতানাত। মুসলিম শাসনকালে ইসলামী আদর্শের অনুশীলন ছিল প্রধাণত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক বাঙালি, তেমনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমান। তিনি যেভাবে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মহান স্থপতি ছিলেন, তেমনি বাংলাদেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের প্রচার-প্রসারেরও স্থপতি ছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পান। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের প্রচার-প্রসারে তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন, তা সমকালীন ইতিহাসে বিরল। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির নেতৃত্বের অধিকার হাতে পেয়ে তিনি ওই কথা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।[৫৫১] যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনে মনোযোগের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের প্রচার ও গবেষণার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ

---

৫৫০ গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ, ২০০১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৪৬

৫৫১ আরিফ খান, *বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮

সরকারিভাবে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যাদেশে বলা হয়েছিল, 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হবে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের মূলনীতির প্রসার করা।' ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট' বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। এ আইনের ভূমিকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে। বর্তমানে এটি সরকারি অর্থে পরিচালিত অন্যতম বৃহৎ ইসলামিক সংস্থা।[৫৫২]

১.৩ দুর্নীতি ও ঘুষ বিরোধী আইন

বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন ও ঘুষ বিরোধী আইন ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত একটি পদক্ষেপ। ইসলাম স্পষ্টভাবে ঘুষ ও দুর্নীতিকে হারাম ঘোষণা করেছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং তা দিয়ে বিচারকদের ঘুষ দিও না, যাতে মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে পারো।"[৫৫৩] একইভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়কেই অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি ও ঘুষ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ। এ কারণেই দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইন, দণ্ডবিধি এবং সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ ও অবৈধ সম্পদ অর্জন বিরোধী বিশেষ আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইন ইসলামী শিক্ষা ও নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ এর উদ্দেশ্য হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করা। তবে ইসলামী দৃষ্টিতে শুধু আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়, বরং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে তাকওয়া, আল্লাহভীতি ও জবাবদিহিতার চেতনা জাগ্রত করাও অপরিহার্য। অর্থাৎ, বাংলাদেশের দুর্নীতি ও ঘুষ বিরোধী আইন ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন হলেও এর কার্যকারিতা নির্ভর করে আইনের কঠোর প্রয়োগ ও মানুষের নৈতিক-আধ্যাত্মিক চেতনা গঠনের উপর। দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ৪৫ নং আইনের অধীনে ১৬১-১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭(ক) ধারায় বি-ভন্ন প্রকার অপরাধ ও অপরাধের ধরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে ১৯৪৭ সালের ২ নং আইন হিসেবে প্রনয়ন করা হয় দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন।[৫৫৪] স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে দুর্নীতির মাত্রা বেড়েছে এবং তা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সাংস্কৃতিক খাতের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বার বার আন্তর্জাতিক জরিপে দেশ দুর্নীতির শীর্ষে অবস্থান করা এবং

---

৫৫২ আহমেদ জাভেদ, *বাংলাদেশের সংবিধান : নানা প্রসঙ্গ*, ঢাকা:অন্যপ্রকাশ ২০২০ খ্রি. পৃ. ৪৭

৫৫৩ (وَ لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ), আল-কুর'আন, ২: ১৮৮

৫৫৪ ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, অনন্যা প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ. ৪২১

দেশের মানুষের ক্রমাগত চাহিদার প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় দুর্নীতি দমন কমিশন। ২০০৪ সালে আইনটি প্রবর্তনের পর ২০১৩ ও ২০১৬ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়েছে।

২০০৭ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১৯ সালে এ বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে। দেশের ৮টি বিভাগে দুর্নীতি দমন কমিশনের ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) -এর অধীনে অন্যান্য অপরাধসমূহের মধ্যে রয়েছে ঘুষ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধ। ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রের সকল স্তরে দুর্নীতি এবং অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে খলিফাগণ কতোটা কঠিন ও কঠোর ছিলেন। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে এসব আইন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশাল্লাহ।

১.৪ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন

বাংলাদেশের মুসলিম ব্যক্তিগত আইন ইসলামের শরিয়াহ ভিত্তিক একটি আইনব্যবস্থা, যা মুসলিমদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব ও ভরণপোষণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামে এ ধরনের ব্যক্তিগত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রণীত। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দেন,এক পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান।"[৫৫৫] যা উত্তরাধিকার বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করে। একইভাবে বিবাহকে ইসলামে একটি সামাজিক ও ইবাদতমূলক চুক্তি বলা হয়েছে, যেখানে উভয় পক্ষের সম্মতি অপরিহার্য। বাংলাদেশের মুসলিম ব্যক্তিগত আইন এই মৌলিক ইসলামী বিধানসমূহকে ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে, যেমন মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, যেখানে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কিত নিয়মাবলী নির্ধারিত রয়েছে। তবে সমালোচনার বিষয় হলো, আইনটির অনেক অংশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না এবং সামাজিক রীতিনীতি বা কুসংস্কারের কারণে ইসলামের ন্যায়সঙ্গত বিধানগুলো উপেক্ষিত হয়। ইসলামের আলোকে ব্যক্তিগত আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবারে ন্যায়বিচার, নারীর অধিকার সংরক্ষণ এবং উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বণ্টনে সমতা প্রতিষ্ঠা করা। তাই বাংলাদেশের মুসলিম ব্যক্তিগত আইন ইসলামী শরিয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও এর সঠিক প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। বাংলাদেশে ধর্মীয় আইন সাধারণভাবে পার্সোনাল ল' নামে পরিচিত বাংলাদেশে মুসলিম আইন এবং হিন্দু আইন ছাড়াও সব ধর্মের ধর্মীয় আইন আছে এ সব আইনের সাধারণত উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদসহ ধর্মীয় বিষয়গুলো নিষ্পত্তি হয় মুসলিম

---

৫৫৫ (يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ),আল-কুর'আন, ৪: ১১

আইনের আওতায় আছে- ১. বিবাহ ২. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার ৩. মোহরানা ৪. বিবাহবিচ্ছেদ ও তালাক ৫. পিতৃত্ব বৈধতা এবং স্বীকৃতি ৬. ওয়াকফ ৭. হেবা ও দান ৮. উইল ৯. উত্তারিধকার প্রভৃতি। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনই প্রধানত এখানকার মুসলিম আইন। মুসলিম আইনের মূল উৎসগুলো হলো: কুরআন, হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস এছাড়া কিছু বিধিবদ্ধ আইনও মুসলিম আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ মুসলমান সমাজের নারী ও শিশুকল্যাণের লক্ষ্য এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ আইনের মূল লক্ষ্য হল মুসলিম সমাজের বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজনে আইনী সহায়তা প্রদান করা।[৫৫৬] এ কারণে এ আইনটিকে একাধারে নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপত্তামূলক সামাজিক আইন বলা হয়ে থাকে। মনে রাখা বাঞ্ছনীয় বাংলাদেশে মুসলিম আইন যা শরীয়াহ্ নামে পরিচিত শুধু পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যান্য অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে শরীয়াহ্ দেওয়ানী, সাক্ষ্য এবং এমনকি ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ১৯৩৭ সনের শরীয়াহ্ সংক্রান্ত আইন দ্বারা আমাদের দেশে এর প্রয়োগ কেবল পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমিত রাখা হয়েছে।

মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ উত্তরাধিকার, বিবাহ রেজিস্ট্রি, বহুবিবাহ, তালাক, দেনমোহর ও ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন। এ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্য আইন কমিশনের কিছু সুপারিশ কার্যকর করার ঘোষণা প্রদান করা হয়। এ ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এ অধ্যাদেশটি জারি করা হয়, যা ১৯৬১ সালের ৮নং অধ্যাদেশ নামে পরিচিত। এ অধ্যাদেশে পারিবারিক বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সালিসী কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং প্রতিযোগী পক্ষগণের মধ্য থেকে একজন করে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হবে। পৌর এলাকায় পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক সালিসী কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

এ অধ্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সকল আইন, প্রথা বা রীতির উপর এ আইন কার্যকর হবে। এ আইনের ৪নং ধারায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সংশোধন আনা হয়। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে লা-ওয়ারিশ প্রথাকে বাতিল করা হয়। এ আইনে বলা হয়, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র বা কন্যার মৃত্যু হলে, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হওয়ার সময় ঐ পুত্র বা কন্যার সন্তানাদি যদি জীবিত থাকে, তাহলে ঐ মৃত পুত্র বা

---

৫৫৬ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা বীকন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খ্রি, পৃ. ৭৮

কন্যা বণ্টনের সময় জীবিত থাকলে সে যে অংশ পেতো, তার সন্তানাদি সমষ্টিগতভাবে অনুরূপ অংশ পাবে।[৫৫৭]

৫নং ধারায় বহুবিবাহ সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এ ধারায় বলা হয়, কোন ব্যক্তির একটি বিবাহ বলবৎ থাকা অবস্থায় সালিস পরিষদের পূর্বানুমতি ছাড়া পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না এবং এরূপ অনুমতি ব্যতীত কোন বিবাহ সম্পন্ন হলে তা রেজিস্ট্রি করা যাবে না। বিবাহ করতে হলে সালিস পরিষদের অনুমতির জন্য নির্ধারিত ফি দিয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে হবে এবং আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত বিবাহের কারণ, প্রয়োজনীয়তা এবং এ বিবাহে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সম্মতি আছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনপত্র পাওয়ার পর চেয়ারম্যান আবেদনকারী ও তার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে বলবেন এবং এ সালিস পরিষদ যদি মনে করে যে, প্রস্তাবিত বিবাহটি প্রয়োজন ও ন্যায়সঙ্গত তাহলে পরবর্তী বিবাহে অনুমতি প্রদান করতে পারেন। আবেদনপত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সালিস পরিষদ তার সিদ্ধান্তের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করবে। কোন পক্ষ নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মহকুমা হাকিমের নিকট পুনর্বিচারের আবেদন করতে পারবে এবং মহকুমা হাকিমের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এর বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

কোন পুরুষ সালিস পরিষদের অনুমতি ব্যতীত যদি আরও একটি বিবাহ করে, তাহলে তাকে (ক) অবিলম্বে তার বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সমস্ত দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধ করা না হলে তা বকেয়া রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাবে; (খ) অভিযোগক্রমে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা হবে।

বিবাহ রেজিস্ট্রি এ আইনের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ আইন অনুসারে বিয়ে রেজিস্ট্রির উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিকাহ রেজিস্ট্রার নামে অভিহিত হন। একটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মাত্র নিকাহ রেজিস্ট্রার থাকবেন। এ আইন অমান্যকারীকে তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যাবে। বিয়ে রেজিস্ট্রেশন ফি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে তাকে যে কোন প্রকারে তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশের

---

৫৫৭ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮৯

একটি নকল স্ত্রীকে পাঠাতে হবে। তালাক ঘোষণার পর তা প্রত্যাহার করা না হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেয়ার দিন থেকে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ হবে না।[৫৫৮] নোটিশ পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান পক্ষসমূহের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সালিস পরিষদ গঠন করবেন এবং সালিস পরিষদ এ সমঝোতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তালাক ঘোষণার সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে ৯০ দিন সময় অথবা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না। এই আইনের পর থেকে তালাক দ্বারা বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটেছে এরূপ স্ত্রী, এটি তৃতীয়বারের বিয়ে বিচ্ছেদ না হয়ে থাকলে, মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে না করেই পুনরায় পূর্ব স্বামীকে বিয়ে করতে পারবেন। অর্থাৎ স্বামীকে বিয়ে করার ব্যাপারে অন্য পুরুষকে বিয়ে করার যে বাধ্যবাধকতা ছিল, তা এ আইনে রহিত করা হয়।

তালাক কার্যকর করার ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি তালাকের আইন অনুযায়ী কার্যসম্পাদন না করে, সে ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।

তালাক ব্যতীত অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ যেক্ষেত্রে তালাকের অধিকার স্ত্রীকে যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে এবং স্ত্রী সে অধিকার প্রয়োগ করতে চায়, অথবা যেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী তালাক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়, সেক্ষেত্রে তালাকের বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ যথাসম্ভব প্রযোজ্য হবে।

১.৪.১ দেনমোহর

দেনমোহর ব্যতীত কোন মুসলিম বিবাহ বৈধ নয়। দেনমোহরের বিষয়ে মুসলিম আইনের ২৮৫-৩০৬ ধারায়, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ১০ ধারায় উল্লেখ রয়েছে– দেনমোহর বা মোহরানা হলো কিছু টাকা অথবা অন্য কোনো সম্পত্তি যা বিবাহের প্রতিদান হিসেবে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে পাওয়ার হকদার হয় (ধারা-২৮৫)। দেনমোহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই, তবে হানাফী মাযহাবে এর সর্বনিম্ন পরিমাণ ১০ দিরহাম (ধারা-২৮৬)। দেনমোহর বিবাহের পূর্বে অথবা বিবাহ কালে কিংবা বিবাহের পরেও নির্দিষ্ট করা যায় (ধারা-২৮৭)। উল্লেখ্য দেনমোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা না থাকলেও স্ত্রী উপযুক্ত দেনমোহর পাওয়ার হকদার বটে (ধারা ২৮৯)। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারের অন্যান্য মহিলা সদস্যদের দেনমোহরের পরিমাণ ও তার সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করতে হয়। দেনমোহরের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণত দাম্পত্য মিলন, বৈধ নির্জনতা অথবা স্বামী /স্ত্রীর মৃত্যু দ্বারা (ধারা ২৮৯(ক))। কোন স্বামী তার স্ত্রীর দেনমোহরের টাকা পরিশোধ না করে মারা

---

৫৫৮ গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৬

গেলে তার উত্তরাধিকারীগণ আনুপাতিক হারে দেনমোহর পরিশোধ করার ব্যাপারে দায়ী থাকেন (ধারা -২৯৪) এবং একজন বিধবা তার মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে দেনমোহরের টাকা আদায় করতে পারেন (ধারা-২৯৫) এবং দেনমোহরের টাকা সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত একজন বিধবা তার স্বামীর সম্পত্তি দখলে রাখতে পারেন (ধারা-২৯৬)।[৫৫৯]

কিন্তু এ রকম দখলের ফলে উক্ত সম্পত্তিতে তার মালিকানা স্বত্ত্ব সৃষ্টি হবে না (ধারা-২৯৮)। এক্ষেত্রে বিধবা স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তির আয়-ব্যায়ের হিসেব স্বামীর অন্যান্য ওয়ারিশদের বরাবর প্রদান করতে বাধ্য থাকেন (ধারা-৩০০)। বাংলাদেশে দেনমোহর প্রথা ইসলামী বিবাহ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হলেও বাস্তবে এটি অনেক সময় নানা জটিলতায় পড়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেনমোহর হলো মেয়ের অধিকার, যা তার নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করে। তবে সমাজে প্রথাগত ও আর্থিক কারণে অনেক সময় দেনমোহরের বাস্তবায়ন ঠিকভাবে হয় না। উচ্চ দেনমোহরের চাপ কিংবা যৌথ পরিবারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা মেয়েদের অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। কিছু ক্ষেত্রে যৌতুক বা অতিরিক্ত দাবির ছায়ায় দেনমোহর প্রথা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, আইনগত সুযোগ থাকলেও মেয়েরা প্রায়শই অর্থনৈতিক নির্ভরতার কারণে বা সামাজিক চাপের কারণে তাদের দেনমোহর যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে দেনমোহর প্রথা আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে একটি বড় ব্যবধান তৈরি করেছে।

১.৪.২ খোরপোষ

অন্যদিকে ধর্মীয় ও প্রচলিত আইনে ভরন-পোষণ বা খোর-পোষের দায়িত্ব বিভিন্ন অবস্থায় ব্যক্তির উপর বর্তায়। ভরণ-পোষণ বা খোরপোষ বলতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিত্য প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক জিনিসপত্রকে বুঝায়। ইসলামী পরিভাষায় খোরপোষ বা ভরনপোষণকে নাফকা বলে। নাফকার শাব্দিক অর্থ ব্যয় করা। মানুষ পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে তাকে নাফকা বা খোরপোষ বলা হয় (ধারা-৩৬৯)। খোরপোষের বিষয়ে মুসলিম আইনের ২৭৭ -২৮০ ধারায় এবং স্ত্রীর খোরপোষের বিষয়ে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৯ ধারায়ও উল্লেখ রয়েছে। স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদানে তার স্বামী বাধ্য। স্বামী যতই গরীব হোকনা কেন এ দায়িত্ব স্বামীর একান্ত ব্যক্তিগত। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তখনই খোরপোষ প্রদানে বাধ্য যখন উভয়ের মধ্যে বৈধ বিবাহ বলবৎ থাকে এবং স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত থেকে একত্রে বসবাস করে অথবা কোন যৌক্তিক কারনে স্ত্রী অন্যত্র বসবাস করে। অন্যদিকে কোন স্ত্রী যখন তার স্বামীর অনুগত না থেকে কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া অন্যত্র বসবাস করে তখন স্বামী তার স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদানে বাধ্য নয় (ধারা-২৭৭)। একজন বিব-

---

৫৫৯ ড. সুলতান মাহমুদ, *বাংলাদেশ সংবিধান প্রেক্ষিত এবং প্রাসঙ্গিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

াহিতা স্ত্রী বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন এবং তালাকের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে ইদ্দতকাল পালন পর্যন্ত খোরপোষ দাবি করতে পারেন (ধারা-২৭৯)। অন্যদিকে সন্তান সন্ততির ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে সাবালিকা ও বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাদের পিতা, যদি পিতার আর্থিক সংগতির চেয়ে মায়ের আর্থিক সংগতি বেশী হয় সে ক্ষেত্রে তাদের মাতা, যদি মাতা- পিতার আর্থিক সংগতির চেয়ে দাদার আর্থিক সংগতি বেশী হয়, সে ক্ষেত্রে দাদা তাদের খোরপোষ বহন করবেন (ধারা-৩৭০)। তাছাড়া সচ্ছল হোক আর অসচ্ছল হোক সাবাল ছেলে ও সাবালিকা মেয়ে তাদের পিতা-মাতাকে খোরপোষ প্রদানে বাধ্য (৩৭১)। এছাড়া কোন ব্যক্তি তার আপন দাদদাদীর খোরপোষ প্রদানে বাধ্য (৩৭২) এবং সচ্ছল ব্যক্তিগন তাদের গরীব আত্মীয় সজনের খোরপোষ প্রদানে বাধ্য (ধারা- ৩৭৩)।

কোন স্বামী তার স্ত্রীকে পর্যাপ্ত খোরপোষ না দিলে, অথবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সমান খোরপোষ না দিলে, স্ত্রী বা স্ত্রীগণের যে কেউ আইনের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াও স্থানীয় চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করতে পারবে। [৫৬০]

চেয়ারম্যান সালিস পরিষদ গঠন করবেন এবং সালিস পরিষদ স্বামী কর্তৃক খোরপোষ হিসেবে দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে একটি সার্টিফিকেট দিতে পারবেন। স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ এই সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে মহকুমা হাকিমের নিকট আপীল করতে পারবেন। মহকুমা হাকিমের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্য কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

১.৪.৩ ভরণপোষণ

ভরণপোষণ বলতে কেবলমাত্র খাদ্য, বস্ত্র বা বাসস্থানকেই বোঝায় না বরং এর অর্থ আরও ব্যাপক, যেমন, সন্তানদের ক্ষেত্রে তার শারীরিক-মানসিক সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তার সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে যা যা প্রয়োজন সবই তার ভরণপোষণের আওতাভুক্ত। মুসলিম আইনে বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী এবং রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সন্তান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতাও ভরণপোষণের অধিকারী হন। ভরণপোষণ পাওয়া স্ত্রীর আইনগত অধিকার। এই অধিকার কেবলমাত্র বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন সময়েই প্রযোজ্য হয় না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের পরও যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য এই বাধ্যবাধকতা বলবৎ থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়। এই সময়ে স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকবেন এই বিষয় নিয়ে কোন ভিন্নমত না থাকলেও ইদ্দতকালীন সময়ের পর স্ত্রীকে আর ভরণপোষণ দেয়া হবে কি-না সে বিষয়ে ভিন্ন মত আছে।

---

৫৬০ আরিফ খান, *বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮

ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্য অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। ভরণ-পোষণের মৌলিক বিধানগুলো অনেকের অজানা। অজানা এর ফজিলতও। ফলে ওয়াজিব হক আদায়ে ত্রুটি হয়, অসুস্থ হোক সুস্থ, বৃদ্ধা হোক বা যুবতী সর্বাবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর। এমনকি স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রী তার বাবার বাড়ি থাকলেও ভরণ-পোষণের অধিকারী হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। তোমরা তা স্বাভাবিকভাবে আদায় করবে।'

ক. স্ত্রীর ভরণপোষণ

আমরা এটা অনেকেই জানি যে মুসলিম বিয়ে একটি দেওয়ানি চুক্তি। এই চুক্তির ফলে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস ও সংসার পালন করেন। বিয়ের ফলে কিছু আইনগত অধিকার যেমন যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি কিছু দায়িত্বও সৃষ্টি হয়। এই দায়িত্বগুলোর মাঝে ভরণপোষণ অন্যতম ।

ভরণপোষণ হচ্ছে স্বামীর জন্য দায়িত্ব এবং স্ত্রীর জন্য অধিকার। বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য থাকা-খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা ও জীবনধারণের জন্য অন্যান্য যে যে উপকরন লাগবে স্ত্রী তা স্বামীর কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী হন।[৫৬১] এই অধিকার স্ত্রী যখন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে তখন তো থাকবেই, তেমনি কোনো কারনে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরেও তা বলবত থাকবে।

ভরণপোষণ আদায়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীর আইনগত যে অধিকার রয়েছে, যেমন:

প্রথমত, ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ভরণপোষণের জন্য স্ত্রীর মামলা করার অধিকার আছে। এটি একটি দেওয়ানি প্রতিকার। এই অধ্যাদেশে ভরণপোষণ, দেনমোহর, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পারিবারিক আদালতে মামলা করার কথা বলা হয়েছে। পূর্বে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ভরণপোষণের মামলা দায়ের করা যেত। ২০০৯ সালে ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে এই ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে।[৫৬২]

দ্বিতীয়ত, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৯ ধারায় বলা আছে, স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হলে স্ত্রী স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে এই বিষয়ে আবেদন করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সালিশি পরিষদ গঠন করে ভরণপোষণের পরিমান ঠিক করবেন এবং সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন। স্বামী এরপরেও নির্ধারিত ভরণপোষণ না দিলে স্ত্রী বকেয়া ভুমি রাজস্বের আকারে তা আদায় করতে পারবেন।

---

৫৬১ হাফিজ আবু শায়খই সফাহানী (র), *আখলাকুন নবী*, প্রাগুক্ত,২০০৬ খ্রি., পৃ. ৭৮

৫৬২ স্ত্রীর ভরণপোষণ আইন, *বাংলাদেশ গেজেট*, সরকারি প্রকাশনা, ২০০৯, পৃ. ১২-১৫

খ. বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে ভরণপোষণ

যদি কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেই যায় তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও স্ত্রী কিছুদিন ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হবেন। যেদিন থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ কার্যকরী হয় সেদিন থেকে ৯০ দিন। বর্তমানে মুসলিম আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের দেশের আদালতগুলো বিশেষ করে উচ্চ আদালত উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। হিফজুর রহমান বনাম সামসুন নাহার বেগম এবং অন্যান্য (৪৭ ডি এল আর ১৯৯৫ পৃষ্ঠা ৫৪) মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত নেয় যে, "স্বামীর অবশ্যই তার তালাক প্রদানকারী স্ত্রীকে এমনভাবে ভরণপোষণ দিতে হবে যা তার জন্য প্রয়োজন, এমনকি ইদ্দতকালিন সময় পার হওয়ার পরেও এই যথাযোগ্য ভরণপোষণ দিতে হবে একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যতদিন পর্যন্ত সেই তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর অন্য কোনো বিয়ে না হয়"।[৫৬৩] কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের এই রায়কে দেশের সবোর্চ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ দ্বারা রহিত করা হয়। এই একই মামলায় আপিল বিভাগ শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে কেবল তিন মাস (৯০ দিন) অর্থাৎ ইদ্দতকালিন সময় পর্যন্ত ভরণপোষণ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গ. সন্তানদের ভরণপোষণ

সন্তানদের ভরণপোষণ দেয়ার দায়িত্ব আইনগতভাবে বাবার। সাবালক হওয়া পর্যন্ত ছেলেকে এবং বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মেয়েকে বাবা ভরণপোষণ দিবেন। কোনো অসুস্থ ও অক্ষম সন্তান থাকলে তাদের ভরণপোষণও দিবেন বাবা। সাবালকত্ব অর্জন করার পরেও যদি সন্ড়ানরা নিজ ভরণপোষণ যোগাতে ব্যর্থ হন তবে আইন অনুসারে ঐ সন্তান বাবার কাছে ভরণপোষণ দাবি করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে বাবা ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নন। মা যখন সন্তানের জিম্মাদার তখনও বাবা ভরণপোষণ দিবেন। বাংলাদেশে সন্ড়ানদের ভরণপোষণ ইসলামী এবং আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামি শিক্ষার আলোকে, সন্তানের খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা মা-বাবার মৌলিক কর্তব্য। বাংলাদেশে পারিবারিক আইন অনুযায়ী, পিতা সন্তানের ভরণপোষণের প্রধান দায়িত্বশীল, তবে মা অক্ষম বা অনুপস্থিত থাকলে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। বাস্তবে, সামাজিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা অনেক পরিবারের জন্য সন্তানের ভরণপোষণ নিশ্চিত করা কঠিন করে তোলে। বিশেষ করে বিচ্ছিন্নতা, তালাক বা পিতার আর্থিক অনুপস্থিতিতে অনেক মায়েরা সন্তানের প্রয়োজন পূরণে সংগ্রাম করেন। একই সঙ্গে, আদালতের মাধ্যমে সন্তানের ভরণপোষণ দাবির প্রক্রিয়া বেশ জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় অনেকসময় শিশুদের মৌলিক চাহিদা পুরোপুরি পূরণ

---

৫৬৩ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

হয় না। ফলে, বাংলাদেশে সন্তানের ভরণপোষণ প্রথা আইনের স্বীকৃত থাকলেও সামাজিক বাস্তবতায় তা যথাযথভাবে প্রয়োগে নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

ঘ. পিতা-মাতার ভরণপোষণ

সরকার ২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদে 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩' নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। কোনো সন্তান বাবা-মাকে ভরণপোষণ দিতে অস্বীকৃতি জানালে বা ভরণপোষণ না দিলে তাদের বিরুদ্ধে বাবা-মা চাইলে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন।[৫৬৪]

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩' এর ধারা ৩ এ প্রত্যেক সন্তানকে তার বাবা-মায়ের ভরণপোষণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। যদি কোনো বাবা-মায়ের একাধিক সন্তান থাকে তবে সন্তানরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাবা-মার ভরণপোষণ নিশ্চিত করবেন।[৫৬৫]

এই আইনে বাবা-মার ভরণপোষণ নির্বিঘ্ন করার জন্য প্রত্যেক সন্তানকে বাবা-মায়ের সঙ্গে একই স্থানে বসবাস করার কথা বলা হয়েছে। কোনো সন্তান তার বাবা বা মাকে বা দুজনকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃদ্ধনিবাস বা অন্য কোথাও একসঙ্গে বা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করতে পারবেন না। তাছাড়া এই আইনের ৪ ধারায় বাবা-মায়ের অবর্তমানে দাদা-দাদি, নানা-নানির ভরণপোষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তান বাবার অবর্তমানে দাদা-দাদিকে এবং মায়ের অবর্তমানে নানা-নানিকে ধারা ৩ এ বর্ণিত ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকবেন। আইনটির ধারা ৬ ও ৭ এ বলা হয়েছে, কোনো সন্তান যদি 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩' এর কোনো বিধান আমান্য করেন এবং ওই সন্তানের বাবা বা মা লিখিত অভিযোগ যদি সরাসরি প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে করে থাকেন তবে ওই আদালতে অপরাধের বিচার হবে।

এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপসযোগ্য। তবে কোনো আদালত অপরাধে সংশ্লিষ্ট সন্তানের বাবা বা মায়ের লিখিত অভিযোগ ছাড়া অপরাধ আমলে গ্রহণ করবেন না। এই আইনে আপস-নিষ্পত্তির ধারাও সংযুক্ত করা হয়েছে।

১.৪.৪ অভিভাবকত্ব ও হেফাজত

নাবালক সন্তানের হেফাজত করার ক্ষমতা প্রথমত মায়ের ওপর বর্তায়। এ বিষয়ে কোন ভিন্নমত নেই। যদি মা কোন কারণে সন্তানের হেফাজতকারী হতে অস্বীকার করেন বা অপারগতা প্রকাশ করেন, তবে

---

৫৬৪ বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *ইসলামী জীবন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৫৬৫ আরিফ খান, *বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮

সে ক্ষেত্রে তার মাতৃ সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় যেমন, নানী হেফাজত কারার অধিকারী হবেন। এটি প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্ আইন। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়-

১। মা কতদিন হেফাজত করার অধিকারী হবেন ?

২। মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের ফলে এই ক্ষমতা ক্ষুন্ন হবে কি-না ?

৩। বিয়ে বলবৎ থাকাকালীন সময়ে মা আলাদা বসবাস করলে তার হেফাজত করার ক্ষমতা থাকবে কিনা ?

মা কতদিন হেফাজত করতে পারবেন এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ রয়েছে। হানাফী মাযহাব মনে করে ছেলের ৭ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত মা হেফাজত করার অধিকারী হবেন। অন্যদিকে মালিকী স্কুল মনে করে, ছেলে বয়ঃসন্ধি কাল পর্যন্ত এবং মেয়ের বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মা হেফাজত করার অধিকারী হবেন।[৫৬৬] এখানে উলেণ্ডখযোগ্য বিষয় হলো, শাফি এবং মালিকী মাযহাবে নাবালক ছেলে মেয়েদেরকেই সুযোগ দেয়া হয়েছে তার হেফাজতকারীকে খুঁজে নেয়ার। নাবালক সন্তানের হেফাজত করার ক্ষমতা মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদের পরও বর্তমান থাকে। তবে কয়েকটি কারণে মায়ের এই ক্ষমতা ক্ষুন্ন হতে পারে। উচ্চ আদালতের নজীর বলে, হেফাজত এর ক্ষেত্রে সন্তানের স্বার্থ সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনে 'Welfare doctrine এর প্রচলন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের বিচার বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদিও হেফাজতের ক্ষেত্রে মায়েদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে এখনও প্রচলিত আইনই অনুসরণ করা হয় যেখানে মায়েদের অবস্থান অপেক্ষাকৃত নীচে। অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে পিতাই সন্তানের আইনগত অভিভাবক নিযুক্ত হন। তার অবর্তমানে তার ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত ব্যক্তি, যদি এরকম ব্যক্তি না থাকে তবে তার অবর্তমানে নাবালকের দাদা আর দাদার অবর্তমানে দাদার ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত ব্যক্তি নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত হবেন। তবে অভিভাবকত্ব আইন সন্তানের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে অভিভাবকত্ব নির্ণয়ের বিষয়টি আদালতের মাধ্যমে নির্ধারণ করার সুযোগ রেখেছে।

২. স্বাধীন বাংলাদেশের ইসলাম

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশ অঞ্চলের জনপদে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা ছিলো উল্লেখ করার মতো। তাই ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ব্যপকতা লাভ করেছিলো। জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষ শেখ আউয়াল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে হজরত বায়েজিদ বোস্তামীর (র.) শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন। পরবর্তী সময়ে তারই উত্তর পুরুষরা বর্তমান গোপালগঞ্জ

---

৫৬৬ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

জেলার টুঙ্গিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন।[৫৬৭] জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন ইসলাম প্রচারক শেখ আ-উয়ালের সপ্তম বংশধর। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন একজন সুফি চরিত্রের অধিকারী অন্যতম ধর্মপ্রাণ মুসলমান। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে অর্থাৎ বাংলাদেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৫৬৮]বাংলাদেশকে সব ধর্মের মানুষের জন্য শান্তির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। তিনি সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিকদের অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এবং সুন্দর একটি ইসলামী পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে মদ, জুয়া, হাউজি ও ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ করেন। তিনি মহানবী (স.)-এর ইসলামী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে রেসকোর্স ময়দানে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে সে জায়গায় ফলবৃক্ষ রোপণ করেন এবং রেসকোর্স ময়দানের নাম রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় সীরাত মজলিশ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। সীরাত মজলিশ ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে রবিউল আউয়াল মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বৃহত্তর আঙ্গিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উদ্‌যাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঈদে মিলাদুন্নবী (স.), শবেবরাত ও শবেকদর উপলক্ষে সরকারি ছুটি এবং সরকারিভাবে এই পবিত্র দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুই ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টেলিভিশনে গুরুত্বের সঙ্গে পবিত্র কোরআন ও তার তাফসির এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারের সুব্যবস্থা করা হয়। প্রচারমাধ্যমে সে ধারা আজও অব্যাহত। বঙ্গবন্ধু ইসলামী আকিদাভিত্তিক জীবনযাপন ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করার ফলে আজ বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে।[৫৬৯]

বিশ্ব ইজতেমা শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম স্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে তুরাগ নদীর তীরবর্তী জায়গাটি প্রদান করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি তাবলিগ জামাত ওই স্থানে বিশ্ব ইজতেমা পালন করে আসছে। টঙ্গীতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক এই স্থান বরাদ্দের বদৌলতেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লাখ লাখ মুসলমান আজ এখানে সমবেত হয়ে দ্বিতীয় বৃহৎ সম্মেলন করে যাচ্ছেন। পাকিস্তান আমলে হজযাত্রীদের জন্য কোনো সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রথম হজযাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন এবং হজযাত্রীদের জন্য ভ্রমণ কর রহিত করেন। ফলে হজ পালনকারীদের আর্থিক সাশ্রয় হয়। [৫৭০]

---

৫৬৭ ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩২১

৫৬৮ সৈয়দ আবুল হোসেন (সম্পাদক), *বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৯ খ্রি.,পৃ. ৪৮০

৫৬৯ বিচারপরি এম. ইনায়েতুর রহিম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স,২০২২ খ্রি. ,পৃ. ৯০

৫৭০ ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে গণপরিষদে এক ভাষণে জাতির জনক বলেছিলেন, "ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।"মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অধিবেশনে যোগ দেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু মুসলিম নেতাদের সামনে যে বক্তব্য তুলে ধরেন, এতে আরবসহ মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (১৯৭৭-১৯৮১) সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" অন্তর্ভুক্ত করেন। "সর্বশক্তিমান আল্লাহে বিশ্বাস ও আস্থা" রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সংযোজন করেন। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB) ও ওআইসি (OIC)-তে বাংলাদেশকে সক্রিয় সদস্য করেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম জোরদার করেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশের আরব দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। তিনি আরব দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সম্পর্কের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। বাংলাদেশ তখনও আরব বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো, এবং জিয়াউর রহমানের কূটনীতির ফলে দেশটি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে, সৌদি আরব, কুয়েতে, এবং অন্যান্য গালফ দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এসব দেশের সাথে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, ঋণ সুবিধা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ে সমন্বয় ঘটে। এই সম্পর্কগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (১৯৮১-১৯৮২) জিয়ার ইসলামী নীতিমালা বহাল রাখেন। ইসলামী প্রচারমূলক কর্মসূচিতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা অব্যাহত রাখেন।

রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২-১৯৯০) ১৯৮৮ সালে সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন। উপজেলা পর্যায়ে মসজিদভিত্তিক ইসলামি শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করেন। ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় পর্যায়ে হজ ব্যবস্থাপনা উন্নত করেন।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া (১৯৯১-১৯৯৬,২০০১-২০০৬) কওমি ও আলিয়া মাদরাসার উন্নয়নে অনুদান বৃদ্ধি করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা ও দাওয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেন। আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। হজ্বযাত্রীদের জন্য আধুনিক হজ ক্যাম্প ও সেবা উন্নয়ন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০১, ২০০৯-২০২৪) ২০১৮ সালে কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি) সমমান স্বীকৃতি দেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কর্মসূচি বিস্তৃত করেন। জাতীয় মসজিদ ও জেলা-মহানগর মসজিদের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। হজ ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশন ও অনলাইন সিস্টেম চালু করেন। কুরআন ও ইসলামি সংস্কৃতি প্রচারে গণমাধ্যমে নিয়মিত অনুষ্ঠান সম্প্রচার নিশ্চিত করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের ইসলাম মূলত দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বাংলাদেশের সংবিধান ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যদিও ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিও রাখে। স্বাধীনতার পর থেকে ইসলামিক মূল্যবোধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় অভ্যন্তরীণ জীবনচর্চা, উৎসব, আইন ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা ইসলামিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।[৫৭১] দেশের ইসলামী প্রতিষ্ঠান যেমন: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলো সমাজে ধর্মচেতনাকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে আধুনিকতা, রাজনৈতিক প্রয়োগ এবং বিভিন্ন সামাজিক চ্যালেঞ্জের কারণে ইসলামের চর্চা প্রায়শই দিকনির্দেশনা ও নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনে বিবেচিত হয়। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের ইসলাম কেবল ধর্মীয় আচরণ নয়, এটি জাতীয় পরিচয়, নৈতিকতা ও সামাজিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত।

২.১ ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ঢাকার প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয় রয়েছে, আর্ত-মানবতার সেবায় রয়েছে ২৮টি ইসলামিক মিশন। সাতটি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

২৮ খণ্ডে ইসলামি বিশ্বকোষ, ১২ খণ্ডে সিরাত বিশ্বকোষ প্রকাশ করে ধর্মীয় জ্ঞানের বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন : সেবা সমূহ

- মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম
- যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ
- সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ
- ইমাম-মুয়াজ্জিনদের কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ঋণ/আর্থিক সহায়তা প্রদান
- ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- মসজিদ পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা

---

৫৭১ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মানচিত্রে বাংলার ইতিহাস*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০২৪,পৃ. ৫৬

- ইসলামিক মিশনের মক্তব শিক্ষা কার্যক্রম

ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণে, কোরআন-হাদিসের উন্নত গবেষণা ও বাংলার মুসলিম মানসে ধর্মীয় চেতনা প্রোথিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' এ্যাক্ট প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে ইসলামী আর্দশ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে।[৫৭২] ইসলামের এই সমুন্নত আর্দশ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ্যাক্ট অনুযায়ী এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরুপঃ

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আর্দশ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূলোবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি,আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির বিলি-বন্টনকে উৎসাহিত করা;[৫৭৩]

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বির্তক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

(ঞ)ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

---

৫৭২ মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান (সম্পাদক), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা জোনাকী প্রকাশনী, ২০১৯ খ্রি ,পৃ. ৩৪৫

৫৭৩ বিচারপরি এম. ইনায়েতুর রহিম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

(ট) বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতিবিধান করা এবং

(ঠ) উপরোক্ত কার্যাবলির যেকোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারী অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর ছাড়াও বায়তুল মোকাররমস্থ অফিসে প্রধান কার্যালয়ের কয়েকটি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয়ভাবে ১৭টি বিভাগ, ৭টি প্রকল্প, ১টি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, মাঠপর্যায়ে ৮টি বিভাগীয়সহ ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং আর্তমানবতার সেবায় ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।[৫৭৪]

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিটি জেলা উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ বাস্তবায়ন করেন। এছাড়া অন্যান্য উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে- আল-কোরআনের ডিজিটালাইজেশন, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। দেশের ৩১টি কামিল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্যবর্ধন ও সম্প্রসারণ, ১৭০ মিটারের সুউচ্চ মিনার নির্মাণ, দক্ষিণ সাহান সম্প্রসারণ, সৌন্দর্যবর্ধন ও পূর্ব সাহানের ছাদ নির্মাণ, মহিলাদের নামাজ কক্ষ সম্প্রসারণ, সাহানের স্থান সম্প্রসারণ ও কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ ইত্যাদি। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার; জেদ্দা হজ টার্মিনালে 'বাংলাদেশ প্লাজা' স্থাপন; আশকোনা হজক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি; রেকর্ড সংখ্যক হজযাত্রী প্রেরণ; হজ ব্যবস্থাপনায় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি; মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে আলেম-ওলামাদের কর্মসংস্থান ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি; শিশু ও গণশিক্ষা এবং কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।[৫৭৫]

২.২ মডেল মসজিদ

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করা এবং পৌঁছে দেয়া বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিলো । তারই বাস্তবায়নের পথে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তার সুযোগ্য কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনা। নানান প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় মডেল মসজিদ নির্মাণ অন্যতম।[৫৭৬] ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে তা থেকে পাওয়া যাবে বহুবিধ সুবিধা কারণ মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

---

৫৭৪ মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান (সম্পাদক), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৪৫

৫৭৫ বিচারপরি এম. ইনায়েতুর রহিম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৫৭৬ ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৫৪

১. মসজিদগুলো থেকে প্রতি বছর ১৪ হাজার হাফেজ তৈরি হবে।

২. ইসলামি নানা বিষয়সহ প্রতিবছর এক লাখ ৬৮ হাজার শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে।

৩. এসব মসজিদে সারাদেশে প্রতিদিন একসঙ্গে চার লাখ ৯৪ হাজার ২০০ জন পুরুষ ও ৩১ হাজার ৪০০ জন নারী নামাজ আদায় করতে পারবেন।

৪. লাইব্রেরিতে প্রতিদিন ৩৪ হাজার পাঠক এক সঙ্গে কোরআন ও ইসলামিক বই পড়তে পারবেন।

৫. ইসলামিক বিষয়ে গবেষণার সুযোগ পাবেন ৬ হাজার ৮০০ জন।

৬. ৫৬ হাজার মুসল্লি সব সময় দোয়া, মোনাজাতসহ তসবিহ পড়তে পারবেন।

৭. দুই হাজার ২৪০ জন দেশি-বিদেশি অতিথির আবাসন ব্যবস্থা থাকবে।

৮. পবিত্র হজ পালনের জন্য কেন্দ্রগুলোতে ডিজিটাল নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

৯. উপকূলীয় এলাকার মসজিদগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

১০. মডেল মসজিদগুলোতে দ্বীনি দাওয়া কার্যক্রম ও ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি মাদক, সন্ত্রাস, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি রোধে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

তিন ক্যাটাগরিতে মসজিদগুলো নির্মিত হচ্ছে। 'এ' ক্যাটাগরিতে ৬৯টি চারতলা বিশিষ্ট মডেল মসজিদ ৬৪টি জেলা শহরে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্মিত। এগুলোর প্রতি ফ্লোরের আয়তন ২৩৬০ দশমিক ০৯ বর্গমিটার। উপজেলায় ১৬৮০ দশমিক ১৪ বর্গমিটার আয়তনের 'বি' ক্যাটারির মসজিদ ৪৭৫টি। আর উপকূলীয় এলাকা ২০৫২ দশমিক ১২ বর্গমিটার আয়তনের 'সি' ক্যাটাগরির মসজিদ ১৬টি। জেলা সদর ও সিটি করপোরেশন এলাকার মসজিদগুলোতে একসঙ্গে এক হাজার ২০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন। অপরদিকে উপজেলা ও উপকূলীয় এলাকার মডেল মসজিদগুলোতে একসঙ্গে ৯০০ মুসল্লির নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। এসব মসজিদে সারাদেশে প্রতিদিন চার লাখ ৯৪ হাজার ২০০ জন পুরুষ ও ৩১ হাজার ৪০০ জন নারী একসঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারবেন।

মডেল মসজিদ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৫-এর বাস্তবায়ন এবং দেশব্যাপী শক্তিশালী ইসলামি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। সারাদেশে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও প্রকৃত মূল্যবোধের প্রচার ও দীক্ষাদান চালু করা। সন্ত্রাস ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করা। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। পুরুষ-নারী মুসল্লিদের জন্য নামাজ, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দীনি দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করা। ইসলামিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসার করা এবং সততা ও ন্যায়বিচারের প্রতি মানুষের আনুগত্য সমর্থন সৃষ্টি করা। ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার অনন্য নজির

স্থাপন করেছে।[৫৭৭] জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আজ সারাদেশে বিস্তৃত হচ্ছে এবং ওলামাদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামি মূল্যবোধ প্রচার-প্রসারে বর্তমান সরকার যে অবদান রেখেছে, তা সমকালীন মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবে চিরকাল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত ও তরজমা পেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, কাকরাইল মসজিদের জন্য অতিরিক্ত জায়গা বরাদ্দ, টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার জন্য স্থান নির্ধারণ, বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবি (স.) উদযাপন এবং মদ, জুয়া ও লটারি নিষিদ্ধ করা ছিল বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য অবদান।

৩. ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায়

১৯৭৫ সালে সৌদি আরবে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকটি (আইডিবি) যাত্রা করে এবং এই আইডিবির হাত ধরেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, পাকিস্তান, ইরান, সুইজারল্যান্ড, আম্মান, জর্ডান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ইসলামী ধারার ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুরু হয়।[৫৭৮] ১৯৮২ সালের নভেম্বরে আইডিবির একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় এসে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিবন্ধিত হয়। মূলত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে 'ইসলামী' ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। এই দ্রুত বর্ধনশীল খাতকে সংগঠিত করার জন্য ১৯৯০ সালে অ্যাকাউন্টিং ও অডিটিং সংস্থা (AAOIFI) খোলা হয়।

১৯৯৬ সালে সিটি ব্যাংকও ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ চালু করে এবং অন্য ব্যাংকগুলো শিগগিরই এ পথ অনুসরণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০ টি পূর্নাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, শাখা ব্যাংকিং আছে ১১ টি , উইন্ডোজ আছে ১৪ টি। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পথচলা শুরু ১৯৮৩ সালে। দীর্ঘ ৪০ বছরে ব্যাংকিংয়ের শরিয়াহভিত্তিক ধারাটি বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দেশের ব্যাংক খাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই এখন ইসলামী ধারার ব্যাংকিংয়ের আওতাধীন।[৫৭৯]

পূর্ণাঙ্গ ধারার ১০টি ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোও যুক্ত হচ্ছে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে। বিশেষায়িত শাখা ও উইন্ডোর মাধ্যমে চালাচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং

---

৫৭৭ মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান (সম্পাদক), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৪৫

৫৭৮ মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, অনু মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, ঢাকা:মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৮ খ্রি, পৃ. ৫৯

৫৭৯ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান*, অনু. যোবায়ের হোসাইন রাফীকী, দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৬, পৃ. ২৭০

কার্যক্রম। ইসলামী ব্যাংক, বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড ও ইন্স্যুরেন্সের মতো সেবা বৈশ্বিক আর্থিক খাতে এখন বিশিষ্ট একটি স্থান অর্জন করে নিয়েছে। ঝুঁকি ভাগাভাগি, অন্তর্ভুক্তি ও প্রকৃত সম্পদভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা।[৫৮০] বৈশ্বিক এ প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও এখন দিনে দিনে আরো শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত সহায়তাও খাতটির বিকাশে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ছিল ১০টি। সারা দেশে ১ হাজার ৬৫৯টি শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম চালাচ্ছে ব্যাংকগুলো। অন্যদিকে একই সময়ে দেশের পুরো ব্যাংক খাতে শাখা ছিল ১১ হাজার ১৫৩টি। ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি প্রচলিত ধারার ১১টি ব্যাংকের ২৩টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা কাজ করছে। এছাড়া ১৩টি প্রচলিত ধারার বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৫৩৫টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো এখন বাংলাদেশে ইসলামী আর্থিক সেবা দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে ইসলামী ব্যাংকিং। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কাছেও তা ধীরে ধীরে আকর্ষণীয় ও লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ডিসেম্বর প্রান্তিক শেষে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মোট আমানত ছিল ৪০৯৯.৪৯ বিলিয়ন টাকা। ২০২১ সালের একই প্রান্তিকে আমানত ছিল ১৬৮.৩৮ বিলিয়ন টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে মোট আমদানি পেমেন্ট হয়েছে ৩৭৮.২৫ বিলিয়ন টাকা, যা আগের ত্রৈমাসিকের ২৮০.৩৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪২.৫৭ শতাংশ বেশি। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২-এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং দ্বারা মোট রেমিট্যান্স সংগ্রহ করা হয়েছে ২৫৬.৯১ বিলিয়ন টাকা, যা আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫৪.৬৮ বিলিয়ন বা ২৭.০৪ শতাংশ বেশি।

প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইসলামী শাখা, উইন্ডোসহ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের শাখার সংখ্যা ২০২২ সালের ডিসেম্বরের শেষে ২ হাজার ২১৭-তে দাঁড়িয়েছে, ২০২১ সাল শেষে যা ছিল ২ হাজার ৮০টি। গত বছর শেষে এ খাতে মোট কর্মরত শ্রমশক্তি ছিল ৪৯ হাজার ৮৫১।[৫৮১] ২০২১ শেষে যা ছিল ৪৪ হাজার ২২৩। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বাজার হিস্যা ক্রমেই বেড়েছে। ২০২২-এর ডিসেম্বর শেষে মোট ব্যাংক আমানতের ২৫ দশমিক ৮১ শতাংশ হিস্যা ছিল ইসলামী ব্যাংকের।

---

৫৮০ বাংলাদেশ ব্যাংক বাৎসরিক রিপোর্ট-২০২৩, https://www.bb.org.bd/en/index.php/publication/publictn/0/2

৫৮১ বাংলাদেশ ব্যাংক বাৎসরিক রিপোর্ট-২০২৩, https://www.bb.org.bd/en/index.php/publication/publictn/0/2

৩.১ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মোট আমানত

২০২২ সালের ডিসেম্বর প্রান্তিকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানত পৌঁছায় ৪০৯৯.৪৯ বিলিয়ন টাকায়, সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় যা ১১৪.২৬ বিলিয়ন টাকা কম। ২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে সমগ্র ব্যাংক খাতের ২৫.৮১ শতাংশ হিস্যা ছিল ইসলামী ব্যাংকগুলোর।

এ সময়ে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের আমানত ছিল ৩৭৯৯.৫১ বিলিয়ন টাকা। প্রচলিত ব্যাংকের উইন্ডোতে ১৬১.১৬ বিলিয়ন ও প্রচলিত ব্যাংকের শাখায় ছিল ১৩৮.৮৩ বিলিয়ন টাকা। ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার ৯২ দশমিক ৬৮ শতাংশ। সব ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের (আইবিবিএল) আমানত ছিল ৩৪.৪৫%।

তারপরে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (১১.৫৪%), এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড (১০.৪২%), আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (১০.২৫%), সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৭.৮০%), শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৫.৫৬%), ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড (৫.২০%), স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড (৪.১৭%), ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডোজ (৩.৯৩%), ইসলামী ব্যাংকিং শাখা (৩.৩৯%), গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক (৩.০০%) ও আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (০.৩০%)।

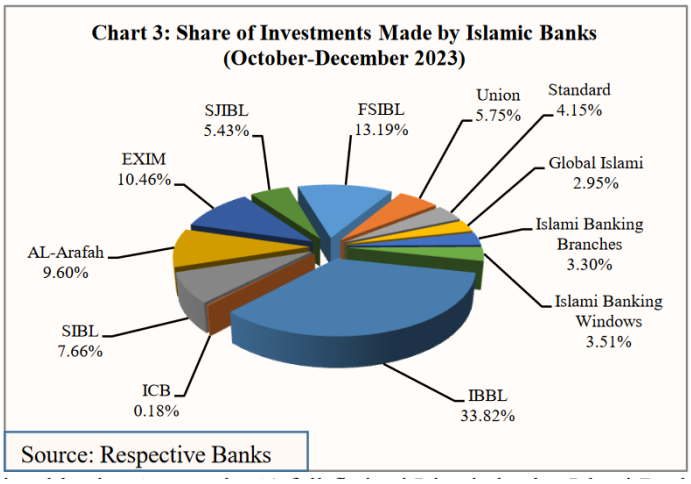

ইসলামী ব্যাংক সমূহের বিনিয়োগ চার্ট-২০২৩[৫৮২]

২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং খাতে মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা। এই পরিমাণ গত এক বছরে প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৫ লাখ নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

৫৮২ বাংলাদেশ ব্যাংক বাৎসরিক, রিপোর্ট, বিভিন্ন উপাত্ত, বিভিন্ন তারিখে সংগৃহীত
https://www.bb.org.bd/en/index.php/publication/publictn/0/2

(আইবিবিএল) বর্তমানে দেশের শীর্ষ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। ব্যাংকটি ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আমানতের পরিমাণ ২ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ।

এজেন্ট ব্যাংকিং খাতেও ইসলামী ব্যাংক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ব্যাংকটির এজেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেলে আমানতের পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে, যা দেশের এ খাতে মোট আমানতের প্রায় ৪২ শতাংশ। এছাড়া, গ্রাহক সংখ্যা ৫৩ লাখ ছাড়িয়ে গেছে এবং দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ গড়ে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ইসলামী ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির পেছনে গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধি এবং প্রবাসী আয় বিতরণে ব্যাংকের শীর্ষ অবস্থান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ।

সর্বোপরি, ইসলামী ব্যাংকিং খাতে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি, গ্রাহক সংখ্যা এবং ব্যাংকিং সেবার প্রসার বাংলাদেশের আর্থিক খাতের জন্য ইতিবাচক সংকেত বহন করে।

৩.২ কৃষি খাতে বিনিয়োগ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করছে, যা সুদবিহীন অর্থায়নের নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এই ব্যাংকগুলো মূলত মুরাবাহা, মুশারাকা ও মুদারাবা মত ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল চুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ প্রদান করে থাকে। ফলে, কৃষকরা সুদের বোঝা ছাড়া ফসল উৎপাদন, সার-সেচ ও যান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী ব্যাংক কৃষি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, কৃষি খাতে বিনিয়োগ দেশের হালাল খাদ্য শিল্প ও স্থানীয় বাজারকে সুসংহত করতে সহায়ক। সরকারের কৃষি উন্নয়ন নীতি ও বিভিন্ন প্রণোদনার সঙ্গে সমন্বয় করে ইসলামী ব্যাংকরা এই খাতে দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই বিনিয়োগ নিশ্চিত করছে, যা নৈতিক ও আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ বিনিয়োগের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ কর্মসূচির বিভিন্ন উপখাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। গত বছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে করা কৃষি খাতে বিনিয়োগ ২০.০৩ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের প্রান্তিকের চেয়ে ৭.২৯ বিলিয়ন টাকা বেশি। তবে গত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.১৫ বিলিয়ন টাকা কম।[৫৮৩]

---

৫৮৩ বাংলাদেশ ব্যাংক বাৎসরিক, রিপোর্ট, বিভিন্ন উপাত্ত, বিভিন্ন তারিখে সংগৃহীত https://www.bb.org.bd/en/index.php/publication/publictn/0/2

Table-4: Summary of Investment in Agricultural Sector

(In Billion BDT)

Period	Investment in Agricultural Sector						
	Investment Target	Actual Investment	Target Achieved (%)	Recovery	Outstanding Investment	Overdue Investment	Classified Investment
1	2	3	4	5	6	7	8
October-December 2023P	23.88	22.83	95.63	13.86	58.28	24.03	32.09
July-September 2023	23.86	15.90	66.63	15.62	75.85	25.92	30.57
October-December 2022	21.45	20.03	93.40	18.98	51.26	23.11	21.49
Quarterly Changes	0.01	6.93	-	-1.76	-17.56	-1.88	1.51
Annual Changes	2.43	2.80	-	-5.12	7.02	0.92	10.59

Source: Islamic banks, branches and windows of conventional banks.
*= Excluding Islamic banking branches and windows of conventional banks.
P= Provisional.

৩.৩ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তারল্য পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের তারল্য বা লিকুইডিটি পরিস্থিতি মূলত ব্যাংকের প্রকল্পভিত্তিক বিনিয়োগ ও জমার পরিমাণের ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদবিহীন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে, যেমন মুরাবাহা, মোবা ও মুশারাকা, যা ধারাবাহিক নগদ প্রবাহ নিশ্চিত করতে কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি করে। এর ফলে, কখনও কখনও ব্যাংকগুলো ছোট ও মাঝারি মেয়াদের তারল্য চাহিদা পূরণে সমস্যায় পড়তে পারে। তবে, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো অল্প সময়ে নগদ শেয়ার ও স্বল্প মেয়াদি সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে তাদের লিকুইডিটি স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (বাংলাদেশ ব্যাংক) নিয়মিত তদারকি ও নগদ রাখার নীতি ইসলামী ব্যাংকগুলোর তারল্য বজায় রাখতে সহায়ক।[৫৮৪] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, ইসলামী ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত ও নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকগুলোর তারল্য পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, তবে বড় পরিমাণ বিনিয়োগ ও ঋণ প্রদানের কারণে শীর্ষকালীন সময়গুলোতে নগদ সংকটের সম্ভাবনা থেকে যায়। ২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অতিরিক্ত তারল্য ১২৮.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের চেয়ে ৪৬.৫৪ বিলিয়ন কম। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর অতিরিক্ত তারল্য দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮২.৩৪ বিলিয়ন, ১৪.৫৮ বিলিয়ন ও ৩১.৮০ বিলিয়ন টাকায়।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে রফতানি আয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষ অবস্থান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের (২৬.২৯%)। তারপর এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড (২১.০৩%), শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক (১৮.৬১%), প্রথাগত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা (১১.২২%), ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো (৫.৯৩%), সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৫.৮৭%), আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৫.৩১%), ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (২.৭৬%),

---

৫৮৪ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানি, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের ইসলামি রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৪৫

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড (২.৪৮%), গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক (০.২০%), ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড (০.২৫%) ও আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক (০.০১%)।

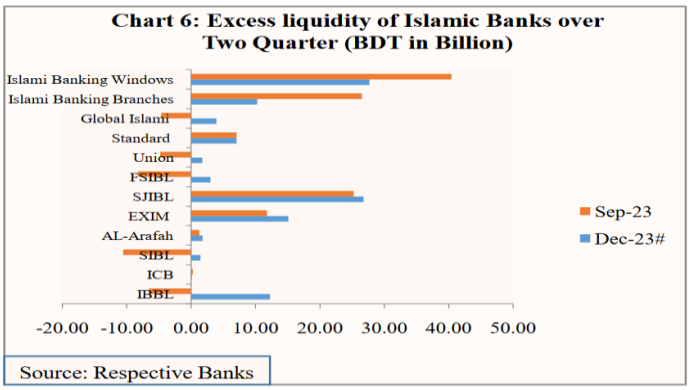

ইসলামী ব্যাংক সমূহের তারল্য পরিস্থিতি চার্ট-২০২৩[৫৮৫]

গত বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মোট আমদানি পেমেন্ট হয়েছে ৩৭৮.২৫ বিলিয়ন টাকা, ২০২১ সালের একই প্রান্তিকে যা ছিল ৪৮৪.৮০ বিলিয়ন টাকা। আমদানি পেমেন্টে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের শীর্ষ ব্যাংকগুলো যথাক্রমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (৩১.২২%), শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক (১৪.৫৪%), এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড (১৩.৯৯%), প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলো (৯.৬৬%), ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো (৯.০৯%), আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৭.৯৪%), সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৫.৭৫%), স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড (৩.৯১%), ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৩.০৩%), ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড (০.৫৮%), গে-াবাল ইসলামী ব্যাংক (০.২৮%) ও আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক (০.০১%)।

৩.৪ রেমিট্যান্স সংগ্রহ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্স সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, বিশেষ করে বিদেশে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকদের মাধ্যমে। ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদের বাইরে থাকা, শরীয়াহ-অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণ করে। ব্যাংকগুলো সাধারণত সাদা হিসাবের মাধ্যমে রেমিট্যান্স গ্রহণ করে, যা গ্রাহকদের জন্য নিরাপদ ও স্বচ্ছ।[৫৮৬] এই রেমিট্যান্স ব্যাংকগুলোকে স্থানীয় বিনিয়োগে কাজে লাগাতে সহায়তা করে, যেমন কৃষি, ছোট ব্যবসা বা হালাল শিল্প খাতে অর্থায়ন। এছাড়া, ইসলামী ব্যাংক প্রবাসীদের জন্য কম খরচে দ্রুত লেনদেন সুবিধা নিশ্চিত

---

৫৮৫ বাংলাদেশ ব্যাংক বাৎসরিক, রিপোর্ট, বিভিন্ন উপাত্ত, বিভিন্ন তারিখে সংগৃহীত https://www.bb.org.bd/en/index.php/publication/publictn/0/

৫৮৬ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানি, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের ইসলামি রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৩৪

করছে, যা অর্থের সময়মতো প্রাপ্তি ও পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার উন্নয়নে সহায়ক। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি অনুসারে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর রেমিট্যান্স সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়া নিয়মিত তদারকির আওতায় থাকে, ফলে এর স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।ইসলামী ব্যাংক খাত বৈদেশিক রেমিট্যান্স সংগ্রহ এবং সারা দেশের সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোট রেমিট্যান্স সংগ্রহ হয়েছে ২৫৬.৯১ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী প্রান্তিকের চেয়ে ৫৪.৬৮ বিলিয়ন বা ২৭.০৪ শতাংশ বেশি।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে রেমিট্যান্স সংগ্রহে চতুর্থ প্রান্তিকে শীর্ষস্থান (৫০.০১%) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের। তারপরে রয়েছে যথাক্রমে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৩৪.৩৮%), সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৮.৩৯%), ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (১.৭৯%), গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক (১.৬২%), শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক (১.৩১%), প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা (০.৬৪%), এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড (০.৫২%), ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো (০.৪৮%), ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড (০.৪২%), স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড (০.৪২%) ও আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক (০.০৩%)[৫৮৭]। রেমিট্যান্স প্রেরণে ইসলামী ব্যাংকের অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশে বৈধ চ্যানেলে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের একটি বড় অংশ ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে আসে। নিরাপদ, দ্রুত ও সহজ প্রক্রিয়ায় টাকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিস্তৃত শাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক থাকায় রেমিট্যান্স গ্রহণকারীরা সহজেই ঘরে বসেই টাকা তুলতে পারছেন। এছাড়া প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন ইনসেনটিভ, যেমন বাড়তি হারে ডলার বিনিময় ও সরকারি প্রণোদনা দ্রুত প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী হচ্ছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে ইসলামী ব্যাংকের রেমিট্যান্স সেবা বিশেষভাবে সহায়ক হচ্ছে। কিছুদিন আগে ইসলামী ব্যাংকের রেমিট্যান্স সেবায় নানা অনিয়ম ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে প্রবাসীদের মধ্যে আস্থা কমে যায় এবং রেমিট্যান্স প্রবাহও হ্রাস পায়। বিশেষ করে ২০২২-২৩ সালের দিকে ব্যাংকটির তারল্য সংকট ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সমালোচনার ফলে অনেক প্রবাসী বিকল্প চ্যানেলের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা উন্নতির দিকে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি, নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগ, এবং প্রযুক্তিনির্ভর সেবার সম্প্রসারণের ফলে ইসলামী ব্যাংকের রেমিট্যান্স সেবা আবারও স্থিতিশীল

---

৫৮৭ বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্য https://www.tbsnews.net/economy/banking/remittance-inflow- rises-242b-august-89-1226071?utm_source=chatgpt.com

হয়েছে। এখন প্রবাসীরা আগের মতোই সহজে ও দ্রুত রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছেন, এবং ব্যাংকের গ্রাহক আস্থাও ধীরে ধীরে ফিরে আসছে।

৩.৪ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

সিএসআর (CSR) বা কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশের একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র লাভ অর্জনের চেয়ে সমাজের কল্যাণে অবদান রাখে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো এই দায়িত্বকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছে। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দারিদ্র্য বিমোচন, মহিলা উন্নয়ন ও চ্যারিটেবল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। উদাহরণস্বরূপ, স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য বৃত্তি প্রদান, গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে অর্থায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ সহায়তা এবং স্থানীয় কমিউনিটিতে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম আয়োজন ইসলামী ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রমের অংশ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তারা শুধু আর্থিকভাবে নয়, সামাজিকভাবে ও নৈতিকভাবে দেশের উন্নয়ন অবদান রাখছে এবং ইসলামী ব্যাংকের ভাবমূর্তিকে সমাজের কাছে আরও শক্তিশালী করছে। করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) কার্যক্রমের আওতায় ইসলামী ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের আর্থিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রমেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এই ব্যাংকগুলো শরীয়াহ-অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, দরিদ্র রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও ত্রাণ বিতরণ। এছাড়া, ইসলামী ব্যাংক সমাজে নৈতিক ও ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান, দোয়া মাহফিল, নারী ও শিশু শিক্ষা কার্যক্রমেও অর্থায়ন করে। CSR কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বও পালন করে, যা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি "সমাজকল্যাণে অর্থায়ন"এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকারের ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকির মাধ্যমে এই উদ্যোগগুলো স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। সিএসআর কার্যক্রমের ইসলামী ব্যাংকগুলোর তহবিল উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে যাকাত, ক্ষতিপূরণ চার্জ (খেলাপি বিনিয়োগ ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে শাস্তিমূলক চার্জ) এবং শরিয়াহ অনুমোদিত উপার্জনের অন্যান্য উৎস। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও দাতব্য সংস্থার মধ্যে এ তহবিলগুলো ব্যয় করা হয়।[৫৮৮] ইসলামী ব্যাংকগুলো

---

৫৮৮ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তথ্য সংগ্রহের তারিখ ২০.৬.২৩
https://bbs.gov.bd/site/page/453af260- 6aea-4331-b4a5-7b66fe63ba61/Agriculture

সুবিধাবঞ্চিত লোকদের সেবা করে, যারা চরম দারিদ্র্যের কারণে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকে। ২০২২ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে সিএসআর কার্যক্রমে ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২.২০ বিলিয়ন টাকা। ২০২১ সালের একই প্রান্তিকে ছিল ১.২৮ বিলিয়ন টাকা।

৩.৫ বিনিয়োগে সুকুক

সারা দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৮০ বিলিয়ন টাকা সংগ্রহে সরকারের পক্ষ থেকে ২০২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রথম সার্বভৌম বিনিয়োগ সুকুক জারি করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকল্পের সামগ্রিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৮.৫১ বিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে ৮.৫১ বিলিয়ন টাকা দেবে সরকার।

সুকুকের জন্য যথাক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোক্তা ও বিশেষ উদ্দেশ্য বাহন (এসপিভি) ভূমিকা পালন করছে। প্রথম পর্যায়ে ২৮ ডিসেম্বর ২০২০-এ অনুষ্ঠিত নিলামের মাধ্যমে প্রকল্পগুলোর জন্য ৪০ বিলিয়ন টাকা সংগ্রহ করেছে সরকার। নিলামের সময় বিনিয়োগকারীরা ১৫১.৫৩ বিলিয়ন টাকার বিড জমা দিয়েছে। ইস্যুটি প্রায় চারবার ওভার সাবস্ক্রাইব হয়েছে। দ্বিতীয় নিলামটি ৯ জুন ২০২১-এ ৪০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের অবশিষ্ট তহবিল সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা আট গুণ ওভার সাবস্ক্রাইব হয়েছিল। ২০২২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ইস্যুকৃত সুকুকের মোট পরিমাণ ছিল ১৮০ বিলিয়ন টাকা।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশ সহায়ক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে দেশের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো ইসলামী পুঁজিবাজার, বীমা (তাকাফুল) এবং ক্ষুদ্র ঋণ খাতও পদ্ধতিগতভাবে বিকশিত হতে পারবে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অগ্রগতি বজায় রাখতে এ-সংক্রান্ত সর্বশেষ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মোট ব্যাংক খাতের আমানতের ২৫ শতাংশের বেশি এবং বিনিয়োগের ২৯ শতাংশের বেশি শেয়ারের প্রতিনিধিত্ব করছে।[৫৮৯] কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম বাড়লেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। এসব প্রতিষ্ঠানের এখন গ্রামীণ এলাকায় কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসারের দিকে আরো বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। এছাড়া কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসার মতো সামাজিক ভূমিকা রাখা খাতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিনিয়োগ আরো বাড়ানো প্রয়োজন। মুদারাবা ও মুশারাকার মতো আদর্শ ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ এখনো ন্যূনতম পর্যায়ে রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুদারাবা ও মুশারাকার অধীনে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক দিকনির্দেশনা ও নীতিমাল

---

৫৮৯ মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

তৈরিতে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে আরো মনোযোগী হতে হবে। ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র অর্থ প্রকল্পগুলোয় গ্রাহকদের জন্য বিনিয়োগের নতুন খাত খুঁজে বের করতে পারে।[৫৯০] এছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা ও সরকারি সংস্থাগুলোর আর্থিক চাহিদা পূরণের মতো অনেক সেবা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বিকাশের জন্য একটি বড় সুবিধা দেবে। অতিরিক্ত তারল্যকে কাজে লাগানোর জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোকে মুদ্রাবাজার ও পুঁজিবাজারসংশ্লিষ্ট নতুন পণ্য চালু করতে হবে।

যেহেতু ইসলাম রিবা (সুদ) নিষিদ্ধ করেছে, তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো বর্তমানে বাজারে বিদ্যমান সুদ বহনকারী সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডগুলোয় বিনিয়োগ করতে পারে না। এ অবস্থায় সুকুকের সাম্প্রতিক প্রবর্তন ও বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে এর বিশাল প্রতিক্রিয়া ইঙ্গিত দিচ্ছে এটি ইসলামী ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করবে, যা সরকারের বাজেটের ঘাটতি অর্থায়নে সহায়তা করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে ইসলামী পুঁজিবাজারের বিকাশ ঘটাতে পারে।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণে বর্ধিত ব্যয়ের মাধ্যমে মানবসম্পদের মান উন্নত করার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলোর কর্মক্ষমতা আরো উন্নত করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা ও জ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে, যা নতুন ইসলামী আর্থিক উপকরণ ও পদ্ধতি তৈরির ক্ষেত্রে সামনের দিনগুলোয় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।[৫৯১] স্থানীয় ও বৈশ্বিক আর্থিক বাজারে অংশগ্রহণ বাড়াতে পেশাদারত্বনির্ভর প্রয়াসগুলোকেও আরো জোরদার করা দরকার।বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টার সঙ্গে সংগতি রেখে গভীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং ক্যাশলেস সমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক, শাখা ও উইন্ডোগুলোকে সব ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও ডিজিটাল ব্যাংকিংয়েও মনোযোগী হতে হবে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুকুক ব্যবহার করে শরীয়াহ-অনুমোদিত বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করছে। সুকুক হলো ইসলামিক বণ্ডের সমতুল্য, যা সুদমুক্তভাবে সম্পদভিত্তিক বা প্রোজেক্টভিত্তিক অর্থায়ন নিশ্চিত করে। ব্যাংকগুলো সুকুক ইস্যু করে বড় পরিসরে অবকাঠামো, শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদন খাত বিনিয়োগে অর্থ সংগ্রহ করে। এতে বিনিয়োগকারীরা অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে, যা মুনাফা-ক্ষতির নীতির ওপর নির্ভরশীল। সুকুক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সহজ হয় এবং দেশের হালাল শিল্প, কৃষি ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য স্থিতিশীল

---

৫৯০ মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৫৯১ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট ২০২৩, https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/f2d8fabb_29c1_423a_9d37_cdb500260002/Chapter-5%20%28Bangla-2023%29_Draft%20%281%29.pdf

অর্থনৈতিক সহায়তা নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি, সুকুক বাজার বাংলাদেশের ইসলামী ফাইন্যান্সে স্বচ্ছতা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে, যা টেকসই বিনিয়োগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৪. মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস অতি প্রাচীন। আমাদের এই উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়ে। ১২৭৮ সালে শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা কর্তৃক সোনারগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি ছিল বাংলার সবচেয়ে বড় মাদরাসা। এসময় মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে ছিল আরবি, নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতিক, কালাম, তাসাউফ, সাহিত্য ফিকাহ, দর্শন ইত্যাদি। মোগল আমলে (১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ সালে) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এ পাঠ্যসূচির সাথে সংযুক্তি ঘটে। জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, কৃষি, লোকপ্রশাসন, চারুকলা ইত্যাদি জ্ঞানের এ শাখাগুলো মাদরাসাশিক্ষার সাথে সংযুক্ত হয়।[৫৯২] এভাবেই প্রাচীনকালে মাদরাসাশিক্ষার মাধ্যমে উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার সোনালী অধ্যয়েরর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে Islamic Arabic University commettee এবং ১৯৭৩ সালে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নে সুপারিশ গৃহীত হয়।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর আমলে তার সুযোগ্য নির্দেশনায় মাদরাসাসমূহে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও বহুমুখী পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত হয়। তাঁর নির্দেশনায় কোরআন-হাদিসের উন্নত গবেষণা লিখন, পঠন ও অধ্যয়নের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। মাদরাসা ও স্কুল কলেজের শিক্ষার ব্যবধান দূর করতে ১৯৮৫ সাল থেকে দাখিলকে এস.এস.সি এবং ১৯৮৭ থেকে আলিমকে উচ্চমাধ্যমিক সমমানের স্বীকৃতি দেয়া হয়। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ জনতার দাবির মুখে মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে ২০০৬ সালে তৎকালীন সরকার ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্স মান প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার অধীনে ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্সের মান ঘোষণা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালের ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার রাতে গণভবনে আয়োজিত কওমি মাদরাসার আলেম ওলামাদের সঙ্গে এক বৈঠকে কওমি মাদরাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের মান ঘোষণা করেন।

৪.১ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির ধারণা

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে এসেছে। মূলত মুঘল ও ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে ইসলামী শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, এবং স্বাধীনতার পর

---

৫৯২ হোসেন আরা শাহেদ (সম্পাদক), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, ঢাকা সূচীপত্র, ২০১৯ খ্রি ,পৃ. ২৪০

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মাদরাসাগুলোর আধুনিকীকরণ শুরু হয়। বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষাকে প্রধানত কওমি ও আলিয়া বিভাগে ভাগ করা হয়। আলিয়া মাদরাসা সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকায় এখানে ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো হয়, যেখানে কোরআন, হাদিস, ফিকহের পাশাপাশি গণিত, বিজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষাও দেওয়া হয়। কওমি মাদরাসাগুলো মূলত প্রথাগত ইসলামী শিক্ষা প্রদান করে এবং সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চশিক্ষা ও আধুনিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা দেশের সামাজিক ও নৈতিক চেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যেমন নৈতিক শিক্ষা, নামাজ, দোয়া ও কুরআন হিফজ। সরকার ও বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা মাদরাসাগুলোর উন্নয়ন, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।[৫৯৩] এছাড়া, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সফল হাফেজ, ইসলামী গবেষক এবং সমাজসেবামূলক কর্মসূচি মাদরাসা শিক্ষাকে দেশের শিক্ষার মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছে। ফলে, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে আজ একটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও শিক্ষাগত সমন্বিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা অর্জনের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ রয়েছে। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই একাধিক মাধ্যমের শিক্ষা প্রচলিত। যেমন- সাধারণ মাধ্যম, মাদ্রাসা মাধ্যম, ইংরেজী মাধ্যম, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি। ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে এদেশের সাধারণ শিক্ষা মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি শ্রেণীতেই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি স্নাতক স্নাতকোত্তর ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা অর্জনের অবাধ সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলোর ন্যায় ইসলাম বিষয়েও এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকতর শিক্ষা প্রদান করা হয়।

৪.১.১ ব্রিটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা

১৮৮১ সালে ঢাকা মাদরাসায় এ্যাংলো-পার্সিয়ান শাখায় এন্ট্রান্স খোলা হয়। এ ধারা ১৯১৫ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯১৬ সালে নিউ স্কীম মাদরাসার ধারা প্রবর্তন করা হলে ঢাকা মাদরাসার অ্যাংলো-পার্সিয়ান শাখাটিকে স্বতন্ত্ররূপে ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯১৬ সাল থেকেই ঢাকার ন্যায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদরাসার অ্যাংলো পার্সিয়ান শাখা, গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল নামে চালিত হয়। যার ফলে ঢাকা ছাড়া চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদরাসা, ইংরেজি শিক্ষা ধারায় বিলীন হয়ে যায়। [৫৯৪]

ইতিমধ্যে, ১৯০৯ সালে স্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে সিলেট ও আসাম অঞ্চলে প্রথম মাদরাসা সিলেটে স্থাপিত হয় যা পরবর্তীতে "সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা" নামে সুপ্রতিষ্ঠা পায়। বর্তমানে

---

৫৯৩ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান, প্রাগুক্ত,২০১৬, পৃ ২৫৬

৫৯৪ হোসেন আরা শাহেদ (সম্পাদক), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৪

বাংলাদেশে ঢাকা, সিলেট এবং বগুড়ায় তিনটি সরকারি আলিয়া মাদরাসাসহ বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মাদরাসা রয়েছে। যেখানে ইসলাম ধর্মীয় এবং সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রমে অধ্যয়ন করানো হয়।

ব্রিটিশ ভারতের চব্বিশ পরগণ জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮৫৩) এবং অন্যান্য মুসলিম নেতা বর্গের একান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৭৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী জেলাতে তিনটি মাদরাসা স্থাপিত হয়। তখন বাংলায় ইংরেজ গভর্নর ছিলেন লেফটেন্যান্ট জর্জ ক্যাম্পবেল। এসব মাদরাসা পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক শিক্ষাখাত হতে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। আর সিংহভাগ খরচের যোগান দেয়া হত হুগলীর দানবীর এবং মুসলিম দরদী মহান ব্যক্তিত্ব হাজী মোহাম্মদ মোহসীন এর ওয়াকফ করা সম্পত্তির আয় হতে। [৫৯৫]

তখনকার দিনে সিদ্ধান্ত ছিল দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহসীন ফান্ডের অংশ বিশেষ প্রাচ্য শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহার করা হবে। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা তিনটিতে আরবি, ফার্সি এর পাশাপাশি ইংরেজি বিষয়ও খোলা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে মুসলিমদের অধ্যয়নের জন্য ইসলাম ধর্মের মূল বিষয় গুলোও রাখা হয়। ঢাকা মাদরাসায় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইংরেজি রাখা হয়। এ মাদরাসার প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মাওলানা উবায়দুল্লা সোহরাওয়ার্দী। পরবর্তীতে মাদরাসাটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "ঢাকা সরকারি মাদরাসাই আলিয়া"।

৪.১.২ আলিয়া মাদরাসার গোড়া পত্তন

ইসলামে মাদরাসা শিক্ষার সূচনা হয় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যুগে। তিনি ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দারুল আরকাম, হিজরতের পর সুফফা আবাসিক মাদরাসা স্থাপন করেন। এছাড়া মসজিদে নববী (৬২২ খ্রি.) এবং মদীনার আরও ৯টি মসজিদ শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা আরও সম্প্রসারিত হয়। হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (স.)-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখেন। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ করেন। এসব মসজিদে কুরআন ও হাদিস শিক্ষাদানের জন্য সাহাবীদের নিয়োগ করেন।[৫৯৬]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.) কুরআন-হাদিসের শিক্ষার প্রসারকল্পে মক্কা, মদিনা ছাড়াও বসরা, কুফা, দামেস্ক প্রভৃতি অঞ্চলে কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনামলেই শিক্ষকগণকে বায়তুল মাল থেকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। হযরত উসমান (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক সংকলিত আল-

---

৫৯৫ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি*, অনু.সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান,২০২২, গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস, পৃ. ২৫৪

৫৯৬ ড. হাসান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা*, ঢাকা:এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৪৯

কুরআনের মাসহাফের আলোকে একটি নির্ভুল কপি তৈরি করে সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রেরণ করেন এবং তদানুযায়ী আল-কুরআন অধ্যায়নের নির্দেশ দেন।

হযরত আলী (রা.) পূর্ববর্তী খলিফাদের অনুকরণে আল-কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করেন। তিনি বসরা ও কুফায় দুটি বৃহৎ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্যে শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। উমাইয়া যুগে দেশের বড় বড় মসজিদগুলি মাদরাসারূপে ব্যবহৃত হতো। আব্বাসীয় বংশের শাসকগণ মাদরাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের অনেকেই মসজিদ কেন্দ্রিক মাদরাসা নির্মাণ করা ছাড়াও আলাদা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় মসজিদে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক ছিল। [৫৯৭]

ভারতে মুসলিম সূচনাকাল থেকেই মাদরাসা শিক্ষার উদ্ভব ঘটে। মুসলিম শাসনামলে ভারতে এই শিক্ষা ব্যবস্থা সগৌরবে বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমাহাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হিসেবে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রাচীনতম। ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর আলিয়া মাদরাসার দায়ভার পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করে। ঢাকা আলিয়া মাদরাসাকে কেন্দ্র করে এ দেশে গড়ে উঠতে থাকে হাজার হাজার সমগোত্রীয় মাদরাসা। এসব মাদরাসায় বর্তমানে কুরআনের চর্চা হয়ে থাকে। বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের ফলে শিক্ষার্থীগণ কুরআন ও আরবি ভাষা চর্চার সুযোগ বেশি পাচ্ছে। বাংলাদেশে আল-কুরআনের শিক্ষা বিস্তারে আলিয়া মাদরাসা বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। আলিয়া মাদরাসা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার প্রণীত শর্ত পূরণ করে এমন সকল ধরণের অনুমোদিত মাদরাসা সরকারি অনুদান পায়। এ সকল মাদরাসায় কুরআন পাঠ অত্যাবশ্যকীয়। এছাড়াও কুরআন বুঝার জন্য হাদিস, ফিকাহ্, আকাঈদ, আরবি ভাষা ও সাহিত্য সহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কৃষি, কম্পিউটার, কারিগরি প্রভৃতি বিষয় শেখানো হয়।[৫৯৮]

মাদরাসা গুলোতে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়। কলকাতা আলিয়া মাদরাসার আদলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণির অসংখ্য আলিয়া নিসাবের মাদরাসা। এই মাদরাসা গুলো বাংলাদেশে কুরআনের ইলম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

---

৫৯৭ শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০)*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

৫৯৮ এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *মাদ্রাসা শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.,২০১৮ খ্রি., পৃ. ৬৭

৪.১.৩ কওমী ধারা

ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই কওমী ধারার মাদরাসা মুসলমানদের ব্যক্তিগত বা মুসলিম সমাজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা আজও অব্যাহত আছে। এসব মাদরাসা "স্থানীয় মাদরাসা ব্যবস্থাপনায়" পরিচালিত হয়ে আসছে। যেমন– দেওবন্দ মাদরাসা, দিল্লী মাদরাসা, হাটহ-াজারী মাদরাসা, লালবাগ মাদরাসা, মোমেনশাহী কওমী মাদরাসা ইত্যাদি। কওমী ধারার মাদরাসা গুলোতে শুরুতেই কোরআন, হাদিস, ফিকাহ নিয়ে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমানে তাতে বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিজ্ঞান শিক্ষা ধারার প্রাথমিক রূপ চালু করা হয়েছে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মাদরাসা তথা কওমী মাদরাসায় মূলত দেওবন্দ মাদরাসা (ভারত) এর সিলেবাস অনুসরণ করা হয়।[৫৯৯] বাংলাদেশের প্রচলিত কওমি মাদ্রাসাগুলো মূলত ইসলামের প্রাচীন শিক্ষার ধারাকে ধরে রেখেছে এবং কোরআন, হাদিস, ফিকহ ও আরবী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রীক পাঠ্যক্রমে শিক্ষা প্রদান করে থাকে। এই মাদ্রাসাগুলো সাধারণত সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে পরিচালিত হয় এবং নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী গ্রহণ ও পরিচালনা করে। শিক্ষার মান ও অবকাঠামো মিশ্র কিছু প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও শিক্ষার মান খুব উচ্চ, আবার অনেক স্থানে আধুনিক শিক্ষার অভাব, প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক এবং সীমিত সুযোগ-সুবিধা লক্ষ্য করা যায়। নারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সীমিত এবং শিক্ষার আধুনিকীকরণ প্রায়শই বিলম্বিত হয়। কওমি মাদ্রাসাগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪.১.৪ বর্তমানে বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন আলিম পর্যন্ত আলিয়া মাদরাসা গুলোতে ইসলামী বিষয় গুলোর জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস এবং National Curricu-lum & Textbook Board (NTCB)-এর প্রদত্ত সাধারণ বিষয়গুলোর সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। ফাজিল এবং কামিল শিক্ষাস্তরেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) এর প্রদত্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হয়। আলিম মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় মূলত আল কুরআন, আত তাফসির, উসূলুল তাফসির, আল হাদিস, উসূলুল হাদিস, আল ফিকাহ, ইসূলুল ফিকাহ, বালাগাত, হিকমাত, মানতিক, আরবি সাহিত্য, নাহু, সরফ, বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইসলামের ইতিহাস, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং কম্পিউটার ইত্যাদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৬০০] ১৯২৮ সালে

---

৫৯৯ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., *ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস*, অনুবাদক : আম্মার আবদুল্লাহ,অর্পণ প্রকাশন, ২০২০,পৃষ্ঠা : ৮৬

৬০০ এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *মাদ্রাসা শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদরাসা এ্যাকজামিনেশন নামে ৮ সদস্য বিশিষ্ট মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষাবোর্ড বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করে চলেছে এবং বিভিন্নভাবে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এক সময় এদেশের আলিয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বক দাখিল, আলিম, ফাজিল এবং কামিল পাশের সনদ প্রদান করত। বর্তমানে এ বোর্ডের ওপর শুধুমাত্র দাখিল ও আলিম পরীক্ষার সনদ প্রদানের ক্ষমতা অর্পিত আছে। ২০০৬ সাল হতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর অধীনে ফাজিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স এর সমমান দেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বেই ১৯৮৫ সাল হতে দাখিলকে এসএসসি এবং ১৯৮৭ সালে আলিমকে এইচএসসি এর সমমান হিসেবে গণ্য করে মাদরাসা এবং শিক্ষকদেরকে জাতীয় বেতন কাঠামোর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট BMTTI ১৯৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে মাদরাসায় কর্মরত ইবতেদায়ী প্রধান, সুপার, অধ্যক্ষ, সহকারী শিক্ষক (বিষয়ভিত্তিক) এবং প্রভাষক (বিষয়ভিত্তিক) ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিক্ষকদের কর্মকালীন স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করার কাজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলছে।[৬০১] বর্তমান বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার পাঁচটি স্তর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল এবং কামিল স্তর। এসব স্তর ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে ভিন্ন ধারায় বেশ কিছু মাদরাসা রয়েছে যথা– (ক) কওমী মাদরাসা (খ) মসজিদ ভিত্তিক স্বতন্ত্র মক্তব (গ) ফোরকানিয়ামাদরাসা (ঘ) হাফেজি মাদরাসা এবং (ঙ) কিন্ডার গার্টেন মাদরাসা। এগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণযুক্ত এবং কোনো সরকারি অনুদান গ্রহণ করে না।

৫. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে

কান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণ করার জন্য পরিবার হলো প্রথম স্তর। পরিবার বলতে আমরা বুঝি আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন আর নিকটাত্মীয়। চাচা, মামা, খালা, খালুসহ পরম নিকটাত্মীয়রা। এদের সমন্বয়ে সুন্দর সমাজ নির্মাণ সহজ হয়। সে কারণে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অত্যধিক। বাংলাদেশে ইসলামের ক্রমবিকাশের কারণ বিশ্লেষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো সামাজিক মুক্তি। হেনরি রেভারলিসহ আরো বহু গবেষক বাংলাদেশে ইসলামের প্রসারে এ বিষয়টির কার্যকারিতা সমর্থন করেন। এর আলোকে বুঝা যায় সামাজিক শৃঙ্খল হতে মুক্তির উপায় হিসেবে এদেশের জনগণ গণহারে ইসলাম গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম আগমনের পূর্বে এদেশে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

---

৬০১ হোসেন আরা শাহেদ (সম্পাদক), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৪

বিশেষকরে সেন বংশের শাসনামলে এ সময় এ অঞ্চলে হিন্দু জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথা কঠোরভাবে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা দারুণভাবে নির্যাতিত হয়।[৬০২] এমতাবস্থায় এদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর বাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে। আর এভাবেই ইসলামের উদার ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু অনুষ্ঠান ইসলামী রীতিতে পরিচালিত বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চর্চিত হয়ে আসছে, যা সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন। বিবাহ বা বিয়ে অনুষ্ঠানকে ইসলামে শুধু একটি সামাজিক বন্ধন হিসেবে দেখা হয় না, বরং এটি আল্লাহর দেওয়া বিধানের মাধ্যমে দুটি আত্মার মিলন এবং নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের সূচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে বিবাহ অনুষ্ঠান সাধারণত খিতাব, নিকাহ, Walima-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যেখানে নিকাহ হলো বৈধ ও ইসলামী নিয়মে সম্পন্ন চুক্তি, এবং Walima হলো পারিবারিক ও সামাজিক আনন্দের মাধ্যমে নবদম্পতির জন্য শুভকামনা প্রকাশের অনুষ্ঠান।[৬০৩] জন্ম অনুষ্ঠানে ইসলামী প্রথা অনুসারে নবজাতককে আযান দেওয়া, কুচি বা আকিকাহ সম্পন্ন করা হয়, যা শিশুর জীবনের প্রথম প্রার্থনার সূচনা এবং পরিবারের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন দৃঢ় করে। মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে, ইসলামী সংস্কৃতির মূলনীতি অনুসারে মৃতদেহকে যথাযথ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে দাফন করা হয়; তাজনিস, কফন, জানাযা নামাজ এবং কবর স্থাপন প্রক্রিয়া ইসলামী নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশে এসব অনুষ্ঠান সামাজিক ও পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল রেখে, প্রথাগত এবং আধুনিক উপাদানের সংমিশ্রণে উদযাপিত হয়। তবে, নগর অঞ্চলে কখনও কখনও প্রাচীন ইসলামী রীতি থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে দৃষ্টিনন্দন আয়োজনে অতিরিক্ত খরচ ও প্রথাগত প্রণালির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ইসলামী শিক্ষার আলোকে সামাজিক অনুষ্ঠানের সঠিক প্রভাব এবং সংস্কৃতির বাস্তব রূপের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫.১ শিশু ও কিশোরদের ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রচার

বাংলাদেশে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রচার করা সমাজের স্থায়ী উন্নয়ন এবং মুসলিম সমাজের মূল চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোটবেলা থেকেই শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশ শুরু হয়, এবং এই সময়ে তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার সাথে পরিচয় করানো হলে তাদের জীবনে নৈতিকতা, সততা, দায়িত্বশীলতা এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের

---

৬০২ আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী (র.), *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত,, খ. ৩, পৃ. ৪৩

৬০৩ ড. ইউসুফ আল কারজাভি , *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি* প্রাগুক্ত,, পৃ. ২৪

মূলে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুরআন, হাদিস, দু'আ, ইবাদত, আখলাকি মূল্যবোধ এবং ইসলামী ইতিহাস শেখানোর পাশাপাশি পরিবার ও সামাজিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুদের মাঝে ভ্রান্ত ধারণা ও সামাজিক খারাপ প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্য তাদেরকে ছোট বয়স থেকেই সততা, সহযোগিতা, ধৈর্য, দয়া ও পরোপকারের মূল্যবোধ শেখানো উচিত। কিশোর বয়স, যখন আত্মপরিচয় ও আত্মসম্মান গড়ে ওঠে, তখন ইসলামী নৈতিকতা তাদের চরিত্রের কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে প্রতিস্থাপন করা জরুরি। এই সময়ে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের মূলনীতির আলোকে সামাজিক দায়িত্ব, পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা, বন্ধু ও সমাজের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিক সীমারেখা রক্ষা করা শেখানো উচিত।[৬০৪] বাংলাদেশে বিভিন্ন মাদ্রাসা, ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু ও কিশোর ক্লাব এবং পরিবার এই প্রচেষ্টায় যুক্ত রয়েছে, তবে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিশুদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা আরও কার্যকর হতে পারে। ফলে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রচার কেবল তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে সাহায্য করে না, বরং সমগ্র সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন স্থায়ী প্রভাব ফেলে।

৫.২ নারীদের ইসলামী শিক্ষা ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে নারীদের ইসলামী শিক্ষা ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে সমাজে নারীর মর্যাদা, ধর্মীয় সচেতনতা এবং নৈতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা যায়। ইসলামের মূল শিক্ষা অনুযায়ী, নারী ও পুরুষ সমানভাবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, জ্ঞানার্জন এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের অধিকারী। তবে প্রথাগত সামাজিক ধারা, সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধ এবং কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার অভাব নারীর ইসলামী শিক্ষায় অংশগ্রহণকে সীমিত করেছে। সাম্প্রতিক দশকে নারীরা মাদ্রাসা, ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র, মহিলা ক্লাব এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কুরআন, হাদিস, ফিকহ এবং আখলাক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামিক সেমিনার, কর্মশালা এবং সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রমে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। ইসলামী কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ শুধু ব্যক্তিগত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজে সঠিক নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনা প্রচার এবং পরিবার ও সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে নারীদের এই অংশগ্রহণকে আরও কার্যকর করতে শিক্ষাগত সুযোগ বৃদ্ধি, সামাজিক সমর্থন, পরিবেশগত নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। ফলে নারীর ইসলামী শিক্ষা ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কেবল তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন সহায়ক নয়, বরং সমগ্র সমাজের নৈতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী

---

৬০৪ ড. ইউসুফ আল কারজাভি , *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে নারীদের ইসলামী শিক্ষা দীর্ঘ সময় ধরে সীমিত সুযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। যদিও নারীদের জন্য আলাদা মাদ্রাসা ও কোরআন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তবে তাদের শিক্ষার পরিধি প্রায়শই প্রথাগত ইসলামী শিক্ষা, যেমন কোরআন, হাদিস, ফিকহ ও আরবী ভাষার ওপর সীমাবদ্ধ থাকে। আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংযোজন এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ তুলনামূলকভাবে খুব কম। অনেক ক্ষেত্রে অর্থায়ন, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব নারীদের ইসলামী শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে। তদুপরি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার কারণে নারীদের শিক্ষা প্রায়ই পেছনে থাকে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু সংগঠন ও সরকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে নারীদের ইসলামী শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিক শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটানো হচ্ছে, যা নারীদের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অবস্থান শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৫.৩ দরিদ্রদের জন্য জাকাত, ইফতার ও সামাজিক সাহায্য

বাংলাদেশে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কল্যাণে জাকাত, ফ্রি ইফতার এবং বিভিন্ন সামাজিক সাহায্য ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইসলামে জাকাত একজন ধনী মুসলিমের জন্য ফরজ ইবাদত হিসেবে নির্ধারিত, যা দরিদ্র, অসহায়, ভূমিহীন, এবং সমাজের অসুস্থ ও দারিদ্র্যপীড়িত সদস্যদের জীবনমান উন্নয়ন সাহায্য করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তরিকতখানা এবং সমাজসেবী ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালন করেন, যেখানে জাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়।[৬০৫] বিশেষ করে রমজান মাসে ফ্রি ইফতার বিতরণ করা হয়, যা ক্ষুধার্ত ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের অভাব মিটিয়ে সাম্যবোধ ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করে। এ সময় একে সামাজিক বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা এবং সম্প্রদায় চেতনার উদাহরণ হিসেবেও দেখা যায়। এছাড়া ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজহা, এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় দরিদ্রদের জন্য কাপড়, খাদ্য এবং নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়, যা তাদের মানসিক স্বস্তি ও আত্মসম্মান রক্ষা করতে সহায়ক।[৬০৬] এই ধরনের সামাজিক সাহায্য কেবল অর্থনৈতিক সহায়তা নয়, বরং ইসলামের নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং সমাজের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ ও দায়িত্বশীল পরিবেশ গড়ে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে বাংলাদেশের প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, এই উদ্যোগগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের ওপর ইতিবাচক ও স্থায়ী প্রভাব পড়ে।

---

৬০৫ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

৬০৬ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, ২০১৬, পৃ. ২৫৬

৫.৪ লোকসংস্কৃতিতে ইসলামী প্রবাদ, গান ও কাব্য

বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতিতে ইসলামী প্রবাদ, গান ও কাব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে লোকগীতি, শ্লোক, কবিতা ও প্রবাদ বাক্য প্রায়শই দৈনন্দিন জীবন, নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইসলামী প্রবাদবাক্য যেমন সততা, ধৈর্য, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা এবং আল্লাহর প্রতি ভরসার গুরুত্ব প্রকাশ করে, লোকসংস্কৃতিতে তা সহজভাবে রূপান্তরিত হয়ে মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, লোকগীতি ও ইসলামিক কাব্য গ্রামীণ সামাজিক অনুষ্ঠান, চাষাবাদী উৎসব, এবং পরিবারিক সমাবেশে পরিবেশিত হয়, যা মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সামাজিক সম্পর্ক মজবুত করে। বিশেষ করে বাংলার বাউল, ফকির ও দরবেশ গানগুলোতে ইসলামিক আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন লক্ষণীয়, যেখানে আল্লাহর প্রেম, তাওহীদ, মানবিকতা এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের বিষয়গুলো লঘু ছন্দ ও সরল ভাষায় উপস্থাপিত হয়।[৬০৭] এছাড়া শিশু ও কিশোরদের নৈতিক শিক্ষায়ও এই লোকগীতি ও প্রবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ তা সহজ, মনোগ্রাহী ও মনে রাখার উপযোগী। তবে আধুনিক সময়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রভাব, প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের কারণে এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও যথাযথ প্রচার একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে লোকসংস্কৃতিতে ইসলামী প্রবাদ, গান ও কাব্য কেবল বিনোদন বা সাংস্কৃতিক প্রকাশ নয়, বরং নৈতিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং সমাজের ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধির এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫.৫ সামাজিক নৈতিকতা বৃদ্ধি সততা, দয়া, অহিংসা ও দুশ্চরিত্র থেকে বিরত রাখা

বাংলাদেশে সামাজিক নৈতিকতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সততা, দয়া, অহিংসা এবং দুশ্চরিত্র থেকে বিরত থাকার শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী, ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক চরিত্রকে শক্তিশালী করা হলো সমাজের স্থায়ী শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলার মূল হাতিয়ার। সততা মানুষকে অন্যের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ সম্পর্ক রক্ষায় সহায়তা করে, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে জালিম ও প্রতারণামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে। দয়া ও করুণা সামাজিক সংহতি ও সহযোগিতার বোধ বৃদ্ধি করে, দরিদ্র ও অসহায়র প্রতি সহমর্মিতা উদ্দীপিত করে এবং সমাজে মানবিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে। অহিংসার শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ক্ষতির পথ থেকে বিরত থাকে, যা সামগ্রিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করে। একই সঙ্গে দুশ্চরিত্র বা অসৎ আচরণ যেমন মিথ্যা, চুরি, প্রতারণা ও অহেতুক হিংসা সমাজের নৈতিক

---

৬০৭ ড. ইউসুফ আল কারজাভি , *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে ক্ষুণ্ন করে; তাই ইসলাম এই ধরনের আচরণ থেকে দূরে থাকার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।[৬০৮] বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা এবং সামাজিক সংগঠন শিশু, কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই নৈতিক শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিস্তার নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। তবে আধুনিক প্রযুক্তি, সামাজিক চাপ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার কারণে এই নৈতিক শিক্ষার কার্যকারিতা প্রায়শই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।[৬০৯] ফলে সামাজিক নৈতিকতা বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিক শিক্ষা, পরিবার ও সমাজের সহায়তা, ধর্মীয় অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত অন্তদৃষ্টি সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

৬. সূফীগণের মাধ্যমে ইসলাম ও এর সংস্কৃতির বিকাশ

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বাংলাদেশে ইসলামের বিকাশ ঘটেছিল। বাংলায় ইসলাম যখন রাজশক্তি হিসেবে বিজয় লাভ করে তখন এখানকার শাসক গোষ্ঠীর আনুকূল্য ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য এদেশীয় অমুসলিমগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

তাছাড়া মুসলিম রাজশক্তি ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহুল পরিমাণে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ইত্যাদি স্থাপিত হয়। বিপুলসংখ্যক মুবাল্লিগ ও মুসলিম এদেশে বসতি স্থাপন করেন। ফলে এসব কারণে এদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এদেশে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল।[৬১০] কিন্তু রাজশক্তির নির্যাতনের ভয়ে কিংবা আনুকূল্য লাভের আশায় জনগণের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সর্বাংশে সত্য নয়। কেননা রাজশক্তির প্রভাবে ধর্মান্তরকরণ হলে গোটা ভারতবর্ষে দিল্লী অঞ্চলেই বেশি মানুষ মুসলিম হওয়ার কথা। কেননা তৎকালে দিল্লীই ছিল মুসলিম শাসনের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং যৌক্তিক দিক হতেও রাজশক্তির প্রভাবে ধর্মান্তরকরণের বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

৬.১ ইসলাম প্রচার ও প্রসার

বাংলাদেশে ইসলামের ক্রমবিকাশের সর্বপ্রধান কারণ হলো- ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচারণা। এদেশে ইসলাম প্রচাওে সর্বপ্রধান ভূমিকা পালন করেন- পীর, সুফি-সাধক, ফকির-দরবেশ, মুবাল্লিগ ও আলেমগণ। তাদের দ্বারা মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই এদেশে ইসলামের প্রচার কার্য শুরু হয় এবং অদ্যাবধি এ প্রচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে। পীর-মাশায়েখের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এদেশে ক্রমান্বয়ে ইসলাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এসব প্রচারকগণ জোরজবরদস্তি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে

---

৬০৮ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান, প্রাগুক্ত,২০১৬, পৃ. ২৫৬

৬০৯ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৬১০ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩০

বিশ্বাসী ছিলেন না।[৬১১] বরং প্রেম, ভালবাসা, সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের উদার শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। সাধারণত কোন অঞ্চলে সুফি-সাধকদের একটি খানকাহ থাকত। এর সাথে মসজিদ, মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হত। এসব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সুফিগণ তাঁদের আদর্শ ও ধর্ম প্রচার করতেন। ফলে ঐ অঞ্চল ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। প্রাচীন বাংলার এসব কেন্দ্রের মধ্যে শ্রীহট্ট, সোনারগাঁ, পাণ্ডুয়া ইত্যাদি ছিল অন্যতম। এসব কেন্দ্র হতে পরবর্তীকালে সারা বাংলায় ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। বাংলাদেশে ইসলামিক অনুষ্ঠান এবং কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় ও নিয়মিত আয়োজিত হয়। রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, মিলাদুন্নবী (সা.) এবং কুরআন শিক্ষার প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা সাংস্কৃতিক উৎসবে এসব প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। অংশগ্রহণকারীরা তাজবীদ, সূচীপত্রের যথাযথ পাঠ এবং স্বর ও লয় মেনে কুরআন তিলাওয়াতের দক্ষতা প্রদর্শন করে। বাংলাদেশ শুধু দেশীয় পর্যায়েই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতায় শক্ত অবস্থান রাখে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি তিলাওয়াতকারীরা ভালো ফলাফল অর্জন করে দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। এ ধরনের উদ্যোগ কেবল ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারেই অবদান রাখে না, বরং দেশের ইসলামিক সাংস্কৃতিক পরিচয় ও বিশ্বে মুসলিম সমাজের সাথে সংযোগ সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬.২ সম্প্রীতি স্থাপন, ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ

সম্প্রীতি সম্প্রসারণে সুফি সংস্কৃতির ভূমিকা বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজরত মহম্মদ (স.)-এর ইচ্ছা ছিল জীবন্ত। জ্ঞানই ছিল ভারতবর্ষের সুফি সাধক ও আধ্যাত্মিক ঝাণ্ডাবাহীদের সবচেয়ে বড় গুন ও প্রতিভা। তাঁরা ইসলামী জ্ঞানের প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং জ্ঞানের সেবা করেছেন, তাদের অনেকেই ছিলেন সাহিত্যের বোধ ও উচ্চতর জ্ঞানগত দক্ষতার অধিকারী।[৬১২] তাঁরা বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত ইলম তথা জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে আগত সর্বাধিক স্মরণ তালিকায় যে সব সুফিদের নাম সাধারণ্যে উচ্চারিত হয় এঁদের মধ্যে : সিলেটে হজরত শাহ জালাল ও শাহ পরাণ। চট্টগ্রামে শাহ আমানত, বায়েজিদ বোস্তামি, শাহ বদর, মহসিন আউলিয়া, শাহ গরিব উল্লাহ, শাহ ফরিদ, মিসকিন শাহ।[৬১৩] বাগেরহাটের খান জাহান আলী, শাহ দৌলত। রাজশাহীতে শাহ মখদুম, ঢাকায়-শাহ ইয়ামেনি এবং শাহ আলী বাগদাদী বিশেষ উল্লেখিত নাম। মসনবী শরীফ গ্রন্থে মাওলানা রুমি চার শতাধিক ছোট-বড় গীতিকাহিনী উপস্থাপনের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি তথা জীবন

---

৬১১ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ.১৪৩

৬১২ আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী (র.), *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৭

৬১৩ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০২১, পৃ. ২৫৬

ও জগতের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধানে দৃষ্টান্তের আলোকে মূল কোরআনের ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয়গুলিকে চিন্তাশীল মানুষদের কাছে সহজতর করে তুলেছেন। ফলে কোরআন সন্ধিৎসার সহায়ক এই মসনবী প্রকৃতপক্ষে কোরআনের সারবস্তু হয়েও মানবমনের সকল জিজ্ঞাসার উৎস হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে।

৬.৩ সূফীগণের দাওয়াত পদ্ধতি

বাংলাদেশে সূফীগণ ইসলামের দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন, যা তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক সংহতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। সূফীগণের দাওয়াত সাধারণত আল্লাহভয়, আধ্যাত্মিক অনুশাসন এবং নৈতিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে, যেখানে প্রচলিত বক্তৃতা বা বিতর্কের চেয়ে ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার, সহানুভূতি ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। তারা দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে সততা, ধৈর্য, দয়া, অহিংসা এবং দুশ্চরিত্র থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব বোঝান, যা সমাজে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। সূফীগণ প্রায়শই গান, কবিতা, দরবেশি উপাখ্যান ও আধ্যাত্মিক গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলেন, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ আত্মস্থ করতে পারে। এছাড়া তারা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পরামর্শ ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে দাওয়াতকে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করেন, যা কেবল তত্ত্ব নয় বরং অনুশীলনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হয়।[৬১৪] তাদের দাওয়াত পদ্ধতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার নয়, বরং সমাজের অসহায় ও দরিদ্রদের সহায়তা, মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। ফলে সূফীগণের দাওয়াত পদ্ধতি ব্যক্তিগত নৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা এবং সামগ্রিক আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখে।

৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক স্থিতিশীলতার মূল ভিত্তি। ইসলামে শান্তি, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন, "সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী,

৬১৪ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে।"[৬১৫]

যা সব সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি ন্যায় ও দয়া বজায় রাখার আহ্বান। সহিংসতা বা বৈষম্যকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। হাদিসে নবী করিম (স.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্যের উপর অত্যাচার করবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে নয়।"বাংলাদেশে মুসলিম ও অ-মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রথাগতভাবে মান্য। ইসলামিক নীতি অনুযায়ী, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিমরা তাদের প্রতিবেশী হোক অন্য ধর্মের মানুষ তার দুঃখে সহমর্মিতা দেখানো, সাহায্য করা ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা সবই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা শুধু সামাজিক নয়, আধ্যাত্মিকভাবে ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ। কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনায়, সহনশীলতা, ন্যায়বিচার এবং ভ্রাতৃত্বই একটি মুসলিম সমাজকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল রাখে। বাংলাদেশের বহুসংস্কৃতির সমাজে এই ইসলামী নীতি অনুসরণ করলে, সাম্প্রদায়িক সহমর্মিতা ও শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।

৮. বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ জীবনে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাব

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামি বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধে গঠিত হলেও এখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবও বিদ্যমান। মুসলমানরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রায় কুরআন-সুন্নাহকে প্রাধান্য দিলেও আধুনিক শিক্ষা, গণমাধ্যম ও বিশ্বায়নের কারণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব তাদের জীবনধারায় প্রবলভাবে প্রবেশ করেছে। এর ফ লে পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার, বিনোদন ও সামাজিক আচরণে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক প্রভাবও বিদ্যমান, যেমনলোকসংগীত, উৎসব, লোকাচার ও গ্রামীণ প্রথায়।[৬১৬] ফলে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ একদিকে ধর্মীয় আদর্শকে আঁকড়ে ধরে রাখলেও অন্যদিকে বহুসংস্কৃতির প্রভাবে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপ ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে।

৮.১ উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে মুসলিমদের জীবনে উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ওপর অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইসলামিক উৎসব যেমন ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা ও মিলাদুন্নবী মুসলিম সমাজে প্রধান হিসেবে পালন করা হয়, তবে গ্রামীণ ও আঞ্চলিক সমাজে হিন্দু ও বৌদ্ধ উৎসবের আ-

---

৬১৫ (بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ), আল-কুর'আন, ৪:৩৬

৬১৬ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

চার-অনুষ্ঠানের ছাপও লক্ষ্য করা যায়।[৬১৭] উদাহরণস্বরূপ, ফসল সংক্রান্ত নবান্ন উৎসব বা গ্রামের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী মহোৎসবগুলোতে স্থানীয় প্রথার কিছু রীতি ইসলামী সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে এসেছে।[৬১৮] এছাড়া, বিবাহ, জন্ম, এবং মৃত্যুসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে কিছু পুরনো আচার-অনুষ্ঠান আজও চলে আসছে। এই মিলন মুসলিম সমাজকে একটি অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়েছে, যেখানে ইসলামের মূলনীতি বজায় রেখে স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছাপও সংরক্ষিত আছে।[৬১৯]

৮.২ বিবাহ ও পারিবারিক রীতি

বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের বিবাহ ও পারিবারিক রীতি ইসলামের মৌলিক নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও এর ভেতরে স্থানীয় ও অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইসলামে বিবাহ একটি ইবাদত এবং তা খুবই সরলভাবে সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছেড়মহর নির্ধারণ, সাক্ষীর উপস্থিতি এবং সংক্ষিপ্ত খুতবা বা দোয়া মূল কাঠামো। কিন্তু বাস্তবে মুসলিম সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনেক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত, যা মূলত হিন্দু, বৌদ্ধ ও আঞ্চলিক বাঙালি সংস্কৃতি থেকে এসেছে। যেমন, গায়ে হলুদ, কনের বরণ, শাশুড়ি-বরের পায়ে দুধ বা মিষ্টি লাগানো, শাড়ি-গয়না প্রদর্শন, শোভাযাত্রা ও বিভিন্ন নাচ-গানের আয়োজন। এগুলো ইসলামী সরলতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলেও বর্তমানে অনেক পরিবারে তা সামাজিক রীতির নামে পালিত হয়। এছাড়া পারিবারিক জীবনে জন্ম, নামকরণ, এবং মৃত্যুকে ঘিরেও নানা লোকাচার টিকে আছে।[৬২০] যেমনড়নবজাতককে নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ খাবার খাওয়ানো, মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট দিনে খাওয়ানো বা শিরনি বিতরণ করা, ইত্যাদি। যদিও ইসলামি শরিয়তে আকীকা, জানাজা, দাফন-কাফন ও ইসালে সাওয়াবের নির্দেশনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, তথাপি স্থানীয় প্রভাব মুসলিম পারিবারিক জীবনে সাংস্কৃতিক মিলনের চিহ্ন রেখেছে।

৮.৩ শিল্প ও স্থাপত্য

মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। ইসলাম তার মৌলিক রূপে সরলতা, জ্যামিতিক নকশা, ক্যালিগ্রাফি ও প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রকাশকে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু স্থানীয় ও ঐতিহাসিক সংস্কৃতির প্রভাবে শিল্প ও স্থাপত্যে ভিন্ন বৈচিত্র্য এসেছে।

প্রথমত, ইসলামী স্থাপত্য যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা ও সমাধিস্থল, এগুলোতে প্রাথমিকভাবে গম্বুজ, মিন-ার, খিলান ও জ্যামিতিক অলঙ্করণ ব্যবহৃত হতো। কিন্তু বাংলার স্থাপত্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের

---

৬১৭ মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., *ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৬

৬১৮ রঞ্জনা বিশ্বাস, *বাংলাদেশের লোকধর্ম* - ১ম খণ্ড, ২০২০,ঢাকা: বেহুলাবাংলা, পৃ. ৩০৪

৬১৯ সৈয়দ আব্দুল হালিম, *বাঙালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙালী জাতির বিকাশের ধারা* -১ম খণ্ড, নবযুগ প্রকাশনী, ১ম, ২০১৫,পৃ.৩৫৬

৬২০ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

প্রভাব প্রবলভাবে এসেছে।[৬২১] প্রাচীন মন্দির বা বৌদ্ধ বিহারের টেরাকোটা কারুকাজ, লাল ইটের কাজ, এবং অলঙ্কৃত খোদাই মসজিদের দেয়াল ও দরজায় ব্যবহার হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদে ইসলামী স্থাপত্যের পাশাপাশি বাংলার লোকশিল্প ও হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়।[৬২২]

দ্বিতীয়ত, শিল্পকলায় প্রভাব,মুসলিম শিল্পে মূলত চিত্রকলায় জীবজন্তু বা মানুষের ছবি এড়িয়ে চলা হলেও, স্থানীয় প্রভাবের কারণে লোকশিল্প, হস্তশিল্প ও নকশায় প্রকৃতি, ফুল, লতা-পাতার নকশা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো বাংলার প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পের উত্তরাধিকার বহন করে।

তৃতীয়ত, হস্তশিল্প ও অলংকরণে প্রভাব গ্রামীণ মসজিদ, দরগাহ বা বাড়িঘরের গায়ে টেরাকোটা নকশা, কাঠের খোদাই, শাড়ি ও হস্তনির্মিত অলঙ্কারে ইসলামী নকশার পাশাপাশি বাঙালি লোকজ নকশা মিশ্রিত হয়েছে।

৮.৪ সঙ্গীত ও লোকসংগীত

মুসলিম সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদান হলেও এখানে ইসলামের মৌলিক দিকনির্দেশনা এবং অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইসলামে আল্লাহর নাম, কোরআন তিলাওয়াত, হামদ-নাত, কাওয়ালি বা গজলের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।[৬২৩] কিন্তু স্থানীয় ও হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে লোকসঙ্গীত, পালাগান, বাউল গান, জারিগান, সারিগান ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। এসব গানের অনেকগুলো আধ্যাত্মিকতাকে উপজীব্য করলেও তাদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী আকিদার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শন বা উপাদান যুক্ত হয়েছে।[৬২৪]

লোকসংগীতে প্রকৃতি, প্রেম, সামাজিক সম্পর্ক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি ফুটে ওঠে, যা বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারার অংশ। মুসলিম সমাজও এগুলোকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বাউল গানে "রূহ" ও "নফস"-এর ধারণা কাব্যিকভাবে প্রকাশ করা হলেও তা অনেক সময় ইসলামের সঠিক শিক্ষার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একইভাবে, বিভিন্ন মেলা বা গ্রামীণ অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীতের ব্যবহার মুসলিম সমাজে বিনোদন ও সামাজিক মিলনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতে ইসলামের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। সুফি সাধক ও বাউলরা লোকসঙ্গীতকে ধর্মীয় দাওয়াত ও আধ্যাত্মিকতার প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষত লালন, হাসন রাজা কিংবা অন্যান্য সুফি ধারার গীতিকাব্যে আল্লাহর প্রতি

---

৬২১ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., *ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৬২২ সৈয়দ আব্দুল হালিম, বাঙালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙালী জাতির বিকাশের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৬২৩ রঞ্জনা বিশ্বাস, *বাংলাদেশের লোকধর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

৬২৪ এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, ২০১৯, মজিদ পাবলিকেশন,পৃ.৩৪৬

ভালোবাসা, নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মানবসেবার শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির বার্তা প্রকাশ পেয়েছে। এসব গানে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা যেমন,তওহীদ, আল্লাহর প্রেম, নফস নিয়ন্ত্রণ ও ভ্রাতৃত্ববোধ সহজ-সরল ভাষায় মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ফলে লোকসঙ্গীত শুধু বিনোদন নয়, বরং ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার ও মানুষের অন্তরে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। একদিকে দেখা যায়, যেসব লোকসঙ্গীতে ইসলামের শিক্ষা, আল্লাহর প্রেম, আধ্যাত্মিক জাগরণ ও মানবসেবার বার্তা তুলে ধরা হয় এবং যেখানে অশ্লীলতা, গুনাহের আহ্বান বা ধর্মবিরোধী কোনো বিষয় নেই, সে ধরনের গান অনেক সুফি সাধক দাওয়াহ ও তাবলিগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে সহজ-সরল ভাষায় আল্লাহর দিকে ডাক দেওয়া। এ দিক থেকে বলা যায়, এসব গান মুসলমানকে ধর্মীয় চিন্তা জাগাতে সাহায্য করতে পারে।

তবে অন্যদিকে, সব লোকসঙ্গীতই যে ইসলামের আলোকে গ্রহণযোগ্য, তাও নয়। অনেক ক্ষেত্রে লোকগানে কুসংস্কার, শিরকীয় ধারণা বা ভুলভাবে আধ্যাত্মিকতা প্রচার পায়, যা মুসলমানের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই মূলত বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করেই ঠিক করতে হবে, কোন গান শোনা যুক্তিসংগত আর কোনটি নয়।

৮.৫ খাদ্য ও জীবনধারা

মুসলিম সমাজে ইসলামের মৌলিক দিকনির্দেশনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, এ ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্কৃতি ও বাঙালি আঞ্চলিক প্রভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান। ইসলাম খাদ্যের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের স্পষ্ট সীমানা নির্ধারণ করেছে। হালাল মাংস, মাছ, শাকসবজি, শস্যজাতীয় খাবার মুসলিমদের খাদ্যতালিকার মূল উপাদান। তবে বাংলাদেশের খাদ্যসংস্কৃতিতে হিন্দু-বৌদ্ধ ও আঞ্চলিক প্রভাবের কারণে অনেক রীতি চালু আছে। যেমন, পান্তাভাত, নবান্ন উৎসবে নতুন চালের ভাত, খিচুড়ি, পিঠা-পায়েস ইত্যাদি মূলত আঞ্চলিক সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ হলেও মুসলিম সমাজে তা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হিন্দু প্রথার মতো নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট খাবার খাওয়ার অভ্যাসও চালু আছে, যদিও ইসলামে এমন বাধ্যবাধকতা নেই।[৬২৫]

জীবনধারায়ও ইসলামের সরলতা ও পরিমিতিবোধের পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক অনুষ্ঠান বা অতিথি আপ্যায়নে অতিরিক্ত ব্যয়, ধুমধাম করে আয়োজন, কিংবা ঋণ করে হলেও ভোজসভার আয়োজন মূলত সামাজিক চাপে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি, যা ইসলামের

৬২৫ এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

মিতব্যয়ী জীবনধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। পোশাক-পরিচ্ছদেও পশ্চিমা ও আঞ্চলিক ফ্যাশনের প্রভাব মুসলিম সমাজে দৃশ্যমান, যদিও ইসলাম শালীনতা ও পর্দার প্রতি গুরুত্ব দেয়।[৬২৬]

৮.৬ শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

মুসলিম সমাজে ইসলামের মূল শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে অন্যান্য সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক প্রভাবের ছাপ গভীরভাবে রয়েছে।

প্রথমত, ইসলামের মূল নির্দেশ হলো, শিক্ষা পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজ, এবং জ্ঞানচর্চা আল্লাহর সৃষ্টিকে জানা ও তাঁর মহিমা উপলব্ধির মাধ্যম। প্রাথমিকভাবে মসজিদ-মাদ্রাসা ছিল মুসলিম সমাজের শিক্ষার কেন্দ্র, যেখানে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি সাহিত্য ও তাসাউফ পড়ানো হতো। তবে উপমহাদেশে ইসলাম প্রবেশের আগে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় ছিল। বৌদ্ধ মহাবিহার ও টোল সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে প্রভাব রেখেছিল। এর ফলে মুসলিম শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য ও দার্শনিক আলোচনায় হিন্দু-বৌদ্ধ ভাবধারার ছাপ পড়ে।[৬২৭]

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শাসনামলে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলে মুসলিম সমাজে জ্ঞানচর্চার নতুন ধারা প্রবেশ করে। ইংরেজি শিক্ষা, বিজ্ঞানের চর্চা এবং আধুনিক প্রশাসনিক জ্ঞান মুসলিম শিক্ষার পরিসরকে প্রসারিত করে, কিন্তু একই সঙ্গে ইসলামিক শিক্ষার সরল ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনোভাবও সৃষ্টি করে। ফলে মুসলিম সমাজে দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য ধাঁচের আধুনিক শিক্ষা।

তৃতীয়ত, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানেও অন্যান্য সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। যেমন,বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিরা ইসলামী ভাবধারা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে স্থানীয় লোককাহিনী, হিন্দু পুরাণ কিংবা বৌদ্ধ কাহিনীর প্রভাবও মিশে গেছে।

৮.৭ পোশাক ও সাজ-সজ্জা

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে সামাজিক অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে। বিবাহ, জন্মদিন বা অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠানে অনেক মুসলিম পরিবার অতিরিক্ত রঙিন পোশাক, জাঁকজমক এবং নকশা ব্যবহার করে, যা ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু বা বৌদ্ধ সমাজের প্রভাব দ্বারা এসেছে। এছাড়া হলি উৎসব বা বড় দিন উদযাপনের মতো রঙ-খেলা, মিষ্টি ও উপহার বিনিময় সামাজিকভাবে কিছু ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, যদিও ইসলামে সরাসরি এর অনুমোদন নেই। [৬২৮]এই প্রভাবের মূল কারণ হলো

---

৬২৬ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত,২০১৬, পৃ ২৫৬

৬২৭ সৈয়দ আব্দুল হালিম, বাঙালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙালী জাতির বিকাশের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

৬২৮ রঞ্জনা বিশ্বাস, *বাংলাদেশের লোকধর্ম* - ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

পারস্পরিক সামাজিক মেলামেশা, গ্রামীণ ও শহুরে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ এবং মিডিয়া ও প্রযুক্তির মাধ্যমে বৈশ্বিক সংস্কৃতির দ্রুত প্রবেশ। ফলে অনেক সময় মুসলিম সমাজে ধর্মীয় নীতি ও সামাজিক রীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় একদিকে ইসলামি মূল্যবোধে শালীনতা ও সরলতার আদর্শ বজায় রাখার চেষ্টা, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য গ্রহণের প্রবণতা। এটি সমাজে এক ধরনের "সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণ" সৃষ্টি করেছে, যা কখনও কখনও ঐতিহ্যগত ইসলামী চেতনার সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু একই সঙ্গে সামাজিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের ক্ষেত্রেও একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করতে পারে।[৬২৯] বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে পোশাক ও সাজ-সজ্জা ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সামাজিক রীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ইসলামের প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারী ও পুরুষের জন্য আড়ম্বরহীনতা, শালীনতা এবং অহংকারের অভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই মুসলিম নারীরা সাধারণত হিজাব, লং কামিজ বা আবায়া পরিধান করেন, আর পুরুষরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক ও স্বাভাবিক সাজ-সজ্জা বজায় রাখেন। তবে আধুনিক সময়ের প্রভাব, বিশেষ করে মিডিয়া, ফ্যাশন এবং বৈশ্বিক সংস্কৃতি, পোশাকের ধরন ও সাজ-সজ্জার দিকে বৈচিত্র্য এনেছে। তরুণ প্রজন্ম অনেক সময় ফ্যাশন ও স্টাইলকে ধর্মীয় বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রহণ করে। ফলে পোশাক ও সাজ-সজ্জা কেবল ব্যক্তিগত সৌন্দর্য প্রকাশ নয়, বরং ধর্মীয় ও সামাজিক শালীনতার প্রতিফলন হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলিম সমাজে ইসলামের শালীনতা ও পর্দার নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে স্থানীয়, হিন্দু-বৌদ্ধ এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, ইসলামে পোশাকের মূল উদ্দেশ্য হলো দেহকে আবৃত রাখা, অহংকার থেকে বিরত থাকা এবং পর্দা বজায় রাখা। কিন্তু বাস্তবে বাঙালি মুসলিম সমাজে পোশাকে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব গভীর। যেমন শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, হিজাববিহীন আঞ্চলিক পোশাক ইত্যাদি মূলত বাঙালি জীবনধারার প্রতিফলন, যা ইসলামি পোশাক নির্দেশনার সঙ্গে আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও সবসময় ইসলামী শালীনতা মেনে চলে না।

দ্বিতীয়ত, সাজ-সজ্জায় হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন-কনের শাড়ি, গয়না, সিঁদুর সদৃশ রীতি (যদিও মুসলিমদের জন্য সিঁদুর বৈধ নয়), হাতের মেহেদি, আলতা, কপালে টিপ ব্যবহার ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু ইসলামসম্মত হলেও (যেমন মেহেদি ব্যবহার), কিছু আবার ইসলামী নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

---

৬২৯ এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

তৃতীয়ত, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব পোশাকে প্রবলভাবে এসেছে।[৬৩০] প্যান্ট-শার্ট, টাই, স্যুট, জিন্স, স্কার্ট ইত্যাদি পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হয়েছে, যা সবসময় ইসলামী পর্দার নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। একইভাবে প্রসাধনী, চুলের স্টাইল, ফ্যাশন-শো বা কসমেটিকস ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলাফল।

৮.৮ মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাব

প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ, দ্রুত ও উন্নত করার জন্য অপরিহার্য। আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, ব্যবসা ও শিল্প সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে দক্ষতার সাথে কাজ সম্পন্ন করতে পারে। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ ও উন্নত করলেও এর অপব্যবহার সমাজে নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে। প্রযুক্তির অপব্যবহার মানবজীবন ও সমাজের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।[৬৩১] মুসলিম সমাজে আজকের যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বিমুখী রূপে কাজ করছে। একদিকে এটি ইসলামের দাওয়াহ, জ্ঞানচর্চা ও বিশ্বব্যাপী যোগাযোগকে সহজ করেছে, অন্যদিকে এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য ও অন্যান্য সংস্কৃতির এমন অনেক উপাদান প্রবেশ করেছে, যা ইসলামের মৌলিক আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

প্রথমত, ইতিবাচক দিক ডিজিটাল মিডিয়া, টেলিভিশন, ইউটিউব, অনলাইন কোর্স এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রসার অনেকগুণ বেড়েছে। কোরআন তিলাওয়াত, হাদিস শিক্ষা, আলিমদের বক্তব্য ও ইসলামিক লেকচার এখন সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। অনলাইন কুরআন ক্লাস, ইসলামী অ্যাপস এবং ডিজিটাল লাইব্রেরি জ্ঞানার্জনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।[৬৩২]

দ্বিতীয়ত, নেতিবাচক দিক মিডিয়ার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জীবনধারা, ফ্যাশন, গান-বাজনা, নাচ-গান, সিনেমা ও অশালীন কনটেন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এসবের প্রভাবে মুসলিম তরুণ সমাজের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে পোশাক-আশাক, সামাজিক সম্পর্ক এবং বিনোদনে। একইভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহার (যেমন গেমে আসক্তি, অশ্লীল ওয়েব কনটেন্ট দেখা, সময় নষ্ট করা) ইসলামী জীবনব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তৃতীয়ত, মিশ্র প্রভাব মিডিয়া ও প্রযুক্তি যেমন ইসলামি

---

৬৩০ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, প্রাগুক্ত,২০১৬, পৃ. ২৫৬

৬৩১ এনামুল হক, *আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স*, আদর্শ পাবলিশার্স ২০২৩,পৃ. ১০২

৬৩২ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

গবেষণা, দাওয়াহ ও সংস্কৃতি প্রচারের সুযোগ দিয়েছে, তেমনি ভিন্নধর্মী ও ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রও তৈরি করেছে।[৬৩৩] ফলে অনেক সময় সাধারণ মুসলিম বিভ্রান্তির শিকার হয়।

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহারিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই সংস্কৃতি দেশের সামাজিক, শিক্ষাগত, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনের প্রতিটি স্তরে গভীরভাবে প্রোথিত। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস, আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে। মসজিদ, মাদরাসা, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই সংস্কৃতি আজও জীবন্ত ও প্রভাবশালী। তবে আধুনিকতা ও বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক প্রবাহের প্রভাবে ইসলামী সংস্কৃতির কিছু ক্ষেত্র চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তাই প্রয়োজন এই সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ তাওহীদ, নৈতিকতা, ন্যায়বোধ ও মানবকল্যাণ নতুন প্রজন্মের মধ্যে পুনর্জাগরিত করা।

সর্বশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতি এখনো জাতির আত্মিক ও নৈতিক শক্তির প্রধান উৎস। এর সংরক্ষণ, চর্চা ও আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ জাতীয় ঐক্য, মূল্যবোধ ও সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।

---

৬৩৩ ড. ইউসুফ আল কারজাভি , *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

ইসলামের আবির্ভাবের সময় বাংলাদেশের এ অঞ্চলটি বঙ্গ বা বাংলা নামে পরিচিত ছিল। তবে সেসময়ের বাংলা বা বঙ্গ অঞ্চলের সীমানা শুধু বর্তমান সময়ের বাংলাদেশের সীমানা দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিল না; বরং তৎকালীন বঙ্গদেশের সীমানা ছিল অনেক বিস্তৃত। ঐতিহাসিকদের মতে, নানান দলীল দস্তাবেজ প্রমাণ করে প্রাচীন যুগে বাংলা ছিল প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এক বিশাল সমভূমি। ঐতিহাসিকরা নানা তথ্য-উপাত্তের আলোকে বঙ্গ অঞ্চলে ইসলামের আগমনকাল সম্পর্কে নানা মত প্রকাশ করেছেন। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকেই বর্তমান বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। এমনকি এর পূর্বতন রূপ পূর্বপাকিস্তান অঞ্চলটিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই সৃষ্ট হয়েছিল। তাই অন্তত এই বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, দেশের মানুষের সাথে ইসলাম ও এর সংস্কৃতি দীর্ঘ দিন ধরেই জড়িয়ে আছে। তবে ইসলাম আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলে নানান জাতির মানুষের বসবাস এ অঞ্চলে তাদের সংস্কৃতির ছাপ ফেলে গেছে। এখন পূর্বসূরীদের অনুসৃত সংস্কৃতির অনুকরণ হোক বা নতুন করে প্রবেশকৃত নানান রাষ্ট্রীয় মতবাদের বাস্তবায়নের কারণে হোক, ইসলামের মৌলিক সংস্কৃতি আমাদের বাংলাদেশে কখনোই অনুসৃত হয়নি। অথচ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯১.০৪ শতাংশ মুসলমান, আর বাকীরা অন্যান্য।[৬৩৪] আর ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবনবিধানের নাম, এর কিছু অংশ গ্রহণ, কিছু অংশ বর্জনের কোন নিয়ম নেই। এটাই কাঙ্ক্ষিত বিষয়, তবুও অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে এদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়নে নানান প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হল

১. বাংলাদেশের সংবিধান, ধর্ম ও আইনের ক্ষেত্রে

বাংলাদেশের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুখ্য সেবা প্রদান করে কারণ এটি বাংলাদেশের মূল সংবিধানের চারটি মৌলিক নীতির একটি, ২ক দ্বারা রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলাম থাকা সত্ত্বেও। বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮০ এর দশকে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়।

বাংলাদেশের ১ম সংবিধান রচিত হয় ১৯৭২ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের জন্য ১৯৭০ সালে নির্বাচিত এম.পি-দের মাধ্যমে। ঐ সংবিধানে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি যুক্ত করা হয়। যথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ। অথচ এইগুলি ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ২১ দফা, ৬ দফা প্রভৃতি ৭টি বড় বড় আন্দোলনের ইশতেহারের কোথাও ছিল না। এমনকি ১৯৭১ সালের ১০ই

৬৩৪ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ১১৩

এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে'ও ছিল না। এগুলি এসেছিল ভারতীয় সংবিধান থেকে।[৬৩৫] যাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র। ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত উক্ত সংবিধান অনুযায়ী দেশ চলে বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় নেতার শাসন-াধীনে। কিন্তু ১৯৭৫-এ পরিবর্তন আসে সংবিধানে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বিলুপ্ত করে সেখানে বলা হয়, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' (৮/১-ক)। বলা হ'ল যে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশী' বলিয়া পরিচিত হইবেন (৬/২), 'বাঙ্গালী' বলে নন। অতঃপর নির্বাচিত ৪র্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাসকৃত ১৯৮৮ সালের ৫ই জুন তারিখে সংবিধানের ৮ম সংশোধনী হিসাবে যুক্ত হয় 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' (২/ক)।[৬৩৬] ঘটনার নানান ধারাবাহিকতায় পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৯৭২-এর ফেলে আসা চার মূলনীতি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। 'আল্লাহর উপরে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' উঠিয়ে দিয়ে সেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'ও রাখা হয়েছে। সংবিধান হবে দেশের জনগণের মুখপত্র স্বরূপ। যেখানে দেশের জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল-আচরণের প্রতিফলন থাকবে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে সেটা নেই। 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' হ'ল মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি বস্তুবাদী জীবনাচারের নাম। যেখানে ওহি-র বিধানের প্রবেশাধিকার নেই। যার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল যেনতেন প্রকারে 'দুনিয়া' হাছিল করা।

১.১ সাংবিধানিক অবস্থান

বাংলাদেশের আইনের উৎস মূলত ব্রিটিশ আইন আর বাংলাদেশের ফৌজদারি এবং দেওয়ানি আইন সার্বজনীন ও সেক্যুলার। রাষ্ট্রীয় আইনে ধর্মের কোনো প্রভাব নেই। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা মূলত দণ্ডবিধি, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর কোড এবং সিভিল প্রসিডিউর কোড দিয়ে পরিচালনা করা হয়। আদালত ব্যবস্থাও সার্বজনীন। এখানে ধর্মের ভিত্তিতে আদালতের কোনো বিভাজন নেই। রাষ্ট্রীয় আইনে ধর্মীয় বা শরিয়া আইন বা আদালত বলতে কিছু নেই। ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, জেলা ও দায়রা আদালত এবং সুপ্রিম কোর্ট মোটা দাগে এভাবেই আদালতের স্তর বিন্যাস, আইন দু'ধরনের, রাষ্ট্রীয় এবং পার্সোনাল ল' বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইন সেক্যুলার এবং সার্বজনীন। পার্সোনাল ল' সারা পৃথিবীতেই ধর্মের ভিত্তিতে হয়।[৬৩৭] বাংলাদেশের সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদ বলছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। অথচ ১২(খ) অনুচ্ছেদ বলছে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান বিলোপ করা হইবে। আবার ৭(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই বিধানকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ঘোষণা করে সংশোধনের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তার মানে সংসদ চাইলেও এই বিধান

---

৬৩৫ রিচার্ড এম. ইটন, *ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯,পৃ.৪৫

৬৩৬ ড. সুলতান মাহমুদ, *বাংলাদেশ সংবিধান প্রেক্ষিত এবং প্রাসঙ্গিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

৬৩৭ গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ, ২০০১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৪৬

সংশোধন বা বাতিল করতে পারবে না। সংবিধানের এটি এক বিরাট গোলকধাঁধা। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে ধর্মকে পৃথক করাই সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অথচ মুসলিম জীবনের ভিত্তিই হ'ল ইসলাম ধর্মের উপরে। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন (সূরা মায়েদাহ ৩)। যার বিধান সমূহ থেকে মুসলমানের জীবনের কোন একটি দিক ও বিভাগ মুক্ত নয়। তার রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার নীতি সবকিছুই ইসলামী হেদায়াত দ্বারা আলোকিত। উক্ত হেদায়াতের বাইরে গেলে সে জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। অথচ ঈমানদার হওয়ার শর্ত শুধু মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলা নয়, বরং সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করা। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ থেকেই যেমন তাঁর জন্ম, তেমনি তাঁর অনুগ্রহের বরকতেই তার জীবনধারণ ও বেঁচে থাকা। আর ইসলামী চেতনাই এদেশের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। এই চেতনাকে সমুন্নত করাই যেকোন নির্বাচিত সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল পাকিস্তানী শাসকদের যুলুম থেকে মযলূমদের বাঁচার চেতনা।[৬৩৮] ইসলাম ত্যাগ করে কুফরী মতবাদ গ্রহণের চেতনা নয়। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও আছে, ধর্মীয় স্বাধীনতার কথাও আছে। স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকারের কথাও আছে।[৬৩৯] ১৯৪৭ সালের পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন এবং বেআইনি কার্যকলাপের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খৃস্টানসহ অন্যান্য নাগরিকরা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ভারত-রাশিয়াসহ অন্যান্য দেশের সার্বিক সহযোগিতায় স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের ১৯৭২ সালের পবিত্র সংবিধানে স্বাধীনতার চেতনাসহ রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। 'স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ পরিবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলাম ধর্মকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে সমালোচনা আছে। তবে সব ধর্মের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিতের কথাও বলা হয়েছে। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সার্বজনীন। আর প্রচলিত আইনে ধর্ম অবমাননা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বাংলাদেশের সংবিধান শুরুই হয়েছে, বিসমিল্লাহির-রাহমানির রাহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে) দিয়ে। আর এখানেই ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করে আছে বলে সমালোচনা করা হয়।আর সংবিধানের প্রথম ভাগেই রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের কথা বলা আছে।

---

৬৩৮ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৬৩৯ রিচার্ড এম. ইটন, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৬

সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন। আর সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে

(১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে

(২) কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।[৬৪০]

সংবিধানের প্রস্তাবনা শুরুর আগে 'বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম', রাষ্ট্রধর্ম এবং ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিয়ে যা বলা হয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে, সংবিধান সব ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। তবে সংবিধান একই সঙ্গে ধর্মীয় সমমর্যাদা নিশ্চিত করেছে কিনা তা নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক আছে।

এটা স্পষ্ট যে, অন্তত দু'ভাবে ইসলাম ধর্মের মর্যাদা সংবিধানে সব ধর্মের উপরে স্থাপন করা হয়েছে।

সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা'-র ব্যাপারে বলা হয়েছে, ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।

ধর্ম, ধর্মীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, ধর্ম নিরপেক্ষতা এ সব বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে পরস্পর বিরোধিতা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম' এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিষয় দু'টি ছিল না। ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম সংযোজন করা হয়। আর ১৯৮৮ সালে সাবেক সেনাশাসক এইচ এম এরশাদের সময় সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংযুক্ত হয়। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের

---

৬৪০ আহমেদ জাভেদ, *বাংলাদেশের সংবিধান : নানা প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

পর ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ফেরার কথা বলা হয়। ২০১১ সালের জুনে আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭২-এর সংবিধানে ফেরার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপের পাশাপাশি অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বিবেচনায় সর্বোচ্চ দণ্ডের বিধান রাখে।[৬৪১] এ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭২-এর সংবিধানের চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থেকেই যায়।

১.২ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে

মালয়েশিয়ায় রাষ্ট্রীয় আইন ছাড়াও শরিয়া আইন আছে। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো শরিয়া বা ইসলামি আইন বলে কিছু নেই। বাংলাদেশের নাগরিকরা অপরাধ করলে বা বিচার চাইলে তা রাষ্ট্রীয় আইনেই নিস্পত্তি হবে। ধর্মীয় বা অন্য কোনো কারণে আইনের আলাদা প্রয়োগ বাংলাদেশের সংবিধান এবং আইন বিরোধী। ধর্মের নামে ফতোয়া বা সালিশ আইন সম্মত নয়।[৬৪২] বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে ইসলামের ঘাটতি মূলত রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে ইসলামী নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ না হওয়ার মধ্যে নিহিত। সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও আইন প্রণয়ন ও বিচারব্যবস্থায় অনেকাংশে ধর্মনিরপেক্ষ ধারা বহাল রয়েছে। পারিবারিক আইন, আর্থিক ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ পুরোপুরি কার্যকর নয়। ফলে ইসলামী আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সংস্কার সাধনে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।[৬৪৩] এছাড়া অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতে সুদভিত্তিক লেনদেন বহাল থাকায় ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। নারীর অধিকার, শিক্ষানীতি এবং সংস্কৃতিতেও ইসলামের মূল নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। সর্বোপরি, ইসলামী আইনকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দক্ষ আলেম-আইনবিদ এবং জনগণের সচেতন অংশগ্রহণের অভাব বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে ইসলামের ঘাটতিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

১.৩ ধর্মের অবমাননা

প্রচলিত ফৌজদারি আইনেই ধর্ম অবমাননা এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ২৯৫ থেকে ২৯৮ ধারার আইনে এ সংক্রান্ত অপরাধ এবং শাস্তির বিধান আছে। মোটা দাগে এই অপরাধগুলো হলো:

---

৬৪১ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৬৪২ আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*, মহাকাল চতুর্থ মুদ্রণ, ২০২১,পৃ. ২৪৫

৬৪৩ আকবর আলি খান, *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, ঢাকা প্রথমা প্রকাশন, পৃ. ২৪০

২৯৫ -কোনো বা যে কোনো বিশেষ ধর্মবোধে অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপসানলয়ের ক্ষতি সাধন বা অপবিত্র করা।

২৯৫ (ক)- কোনো বা যে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে উক্ত যে কোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বিদ্বেষাত্মক কাজ।[৬৪৪]

২৯৬- ধর্মীয় সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি।

২৯৭ - সমাধিস্থান ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ।

২৯৮- ধর্মীয় অনুভূতি আঘাত করার উদ্দেশে শব্দ উচ্চারণ বা অঙ্গভঙ্গি।

এ সব অপরাধ প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত শাস্তির বিধান আছে। এর বাইরেও বিতর্কিত তথ্য-প্রযুক্তি আইনে ইলেকট্রনিক বিন্যাসে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই আইনে অপরাধ প্রমাণ হলে ১০ বছর কারাদণ্ড এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডের বিধান আছে।[৬৪৫] তবে ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে ধর্মের অবমাননা মারাত্মক গুনাহ এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হলেও বাংলাদেশের আইন কাঠামোতে তা সীমিত আকারে প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, এসব মামলায় দীর্ঘসূত্রতা, রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের জটিলতার কারণে শাস্তি কার্যকর হয় না বা অনেক ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয়। ফলে ধর্ম অবমাননার শাস্তি আইনে থাকলেও কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি রয়ে গেছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে আইন প্রণয়নের পাশাপাশি এর যথাযথ ও নিরপেক্ষ বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

১.৪ ধর্মীয় আইন

বাংলাদেশে ধর্মীয় আইন সাধারণভাবে পার্সোনাল ল' নামে পরিচিত। বাংলাদেশে মুসলিম আইন এবং হিন্দু আইন ছাড়াও সব ধর্মের ধর্মীয় আইন আছে। এ সব আইনের সাধারণত উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদসহ ধর্মীয় বিষয়গুলো নিষ্পত্তি হয়।

মুসলিম আইনের আওতায় আছে- ১. বিবাহ ২. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার ৩. মোহরানা ৪. বিবাহবিচ্ছেদ ও তালাক ৫. পিতৃত্ব বৈধতা এবং স্বীকৃতি ৬. ওয়াকফ ৭. হেবা ও দান ৮. উইল ৯. উত্তারিধকার প্রভৃতি।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনই প্রধানত এখানকার মুসলিম আইন। মুসলিম আইনের মূল উৎসগুলো হলো: কুরআন, হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস। এছাড়া কিছু বিধিবদ্ধ আইনও মুসলিম আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

৬৪৪ আহমেদ জাভেদ, *বাংলাদেশের সংবিধান : নানা প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

৬৪৫ আকবর আলি খান, *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

যে সব আইন ধর্মের ভিত্তিতে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়েছে, নিয়ম হলো যদি রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে ধর্মীয় আইনের বিরোধ হয়, তাহলে ধর্মীয় আইন প্রাধান্য পাবে। যেমন, মুসলমান মারা গেলে দাফন করা হয় আর হিন্দু মারা গেলে দাহ করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন দিয়ে কেউ মারা গেলে কীভাবে তার শেষকৃত্য করা হবে, তা নির্ধারণ করার কোন ব্যবস্থা নেই।[৬৪৬]

তবে বাংলাদেশে 'ইউনিভার্সাল ফ্যামিলি কোড'-এর দাবি আছে। উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার নিয়ে সব নাগরিকের জন্য একই আইনের দাবি তুলছেন অনেকেই। সরকার এ জন্য হিন্দুদের উত্তরাধিকার আইন সংশোধনের উদ্যোগও নিয়েছিল। হিন্দু আইনে বিবাহিত মেয়েরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয় না।

মুসলিম আইনে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনও সংস্কার করতে চায় সরকার। কারণ মুসলিম আইনে বিবাহিত মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তি পায় ভাইয়ের অর্ধেক। কিন্তু এই দু'টি সংস্কার প্রস্তাবই ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিরোধের মুখে এগোতে পারেনি। তবে বাংলাদেশে সব ধরনের বিবাহের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক।[৬৪৭]

বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইন ছাড়াও বাংলাদেশে একটি বিশেষ আইন আছে, যা ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহ আইন নামে পরিচিত। পাত্র-পাত্রী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে এই আইনের আশ্রয় নিয়ে বিয়ে করতে পারেন। এই বিয়েতে কোনো ধর্মীয় আইন প্রযোজ্য নয়।

বিশেষ বিবাহ আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী, বিয়ে সম্পন্ন করতে হবে রেজিস্ট্রার এবং ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদানকারী তিনজন সাক্ষীর সামনে।[৬৪৮]

তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাংলাদেশের সংবিধান আইনের দৃষ্টিতে সবাইকে সমানভাবে দেখেছে। সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৭ অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তার সারমর্মে যেমনটি আসে তা হলো-

দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ, এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশটির একটি রাষ্ট্রধর্ম রয়েছে যা ইসলাম, এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ আবার সমাজতান্ত্রিক, এই সমাজতান্ত্রিক দেশটি আবার একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং যার একটি মুক্ত বাজার অর্থনীতি রয়েছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় আইনের বাস্তবায়নে কয়েকটি বড় প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত হলেও আইন কাঠামো মূলত ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলের ধারা অনুসরণ করে, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ আইনই প্রাধান্যশীল। দ্বিতীয়ত,

---

৬৪৬ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা বীকন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খ্রি পৃ.৭৮

৬৪৭ আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২২৫

৬৪৮ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব অন্যতম সমস্যা। শাসকগোষ্ঠী ইসলামী আইন বাস্তবায়নের কথা বললেও বাস্তবে অর্থনীতি, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থায় তা কার্যকর হয় না। তৃতীয়ত, ধর্মীয় আইনের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নিয়ে আলেম সমাজের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে, যা একটি একক নীতিমালা গঠনে বাধা দেয়। চতুর্থত, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য শিক্ষা কাঠামো, এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। পঞ্চমত, আন্তর্জাতিক চাপ ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক বাস্তবতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ শরীয়াহভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ আইন চালুর উদ্যোগ নিলে তা অনেক সময় পশ্চিমা দেশগুলোর সমালোচনা ও কূটনৈতিক চাপের মুখে পড়ে। সর্বোপরি, জনগণের সচেতনতা, সামাজিক প্রস্তুতি এবং দক্ষ শরীয়াহ ভিত্তিক আইনবিদের অভাবও ধর্মীয় আইনের বাস্তবায়নকে কঠিন করে তুলছে।

১.৫ স্ত্রীর ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইনের সীমাবদ্ধতা

মুসলিম আইনে স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকারটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো বিষয়। কিন্তু আমরা যদি একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে এর সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে, যেমন-বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সীমিত সময়ের জন্য ভরণপোষণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি আমাদের দেশের এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বেশিরভাগ নারীরা আত্মনির্ভরশীল না সে কারণে যদি কোনো নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তাহলে তাকে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়িতে চলে আসতে হয়।[৬৪৯] বাবার বাড়িতেও মেয়ের অবস্থা হয় অত্যন্ত লজ্জার এবং অপমানের, সবার কাছে সে পরিগনিত হয় বোঝা হিসাবে। আবার মাঝে মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ঐ মেয়ের বাবার বাড়িতেও থাকা সম্ভব হয়না। আর বেশিরভাগ মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল না হবার কারণে আলাদাভাবে বাসা নিয়েও থাকতে পারেনা। এজন্য শুধু নিজের কিছু দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য শত অত্যাচার-অপমান সহ্য করে, এমনকি স্বামীর বহুবিবাহের মতো ঘটনাকে মেনে নিয়েও মেয়েরা স্বামীর সংসার করে। যেহেতু আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহোত্তর সম্পদ বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সমানভাবে ভাগ-বাটোয়ারার কোনো ব্যবস্থা নাই, তাই বিবাহ বিচ্ছেদের পর অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ ক্ষতি এককভাবে স্ত্রীকেই বহন করতে হয়।[৬৫০] এসব কারনেই আমাদের ভরণপোষণ আইনে কিছু পরিবর্তন আনা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর একজন নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় এবং নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে অবশ্যই ভরণপোষণ সংক্রান্ত নতুন আইন প্রনয়ণ জরুরি। কারণ স্ত্রীর ভরণপোষণ ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী স্বামীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলেও বাংলাদেশের সামাজিক ও আইনি কাঠামোতে এর বাস্তব প্রয়োগে কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রে স্বামী আর্থিক

---

৬৪৯ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৬৫০ আকবর আলি খান, *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, ঢাকা প্রথমা প্রকাশন, পৃ. ২৪০

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর ভরণপোষণে অবহেলা করে, আর স্ত্রী সামাজিক লজ্জা বা পারিবারিক চাপে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, আদালতে ভরণপোষণের মামলা দায়ের করলে প্রমাণ, সাক্ষ্য এবং দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ভরণপোষণ আদায় প্রক্রিয়া জটিল হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, বিদ্যমান আইনে ভরণপোষণের পরিমাণ নির্ধারণ প্রায়ই বাস্তবসম্মত হয় না; অনেক সময় তা স্ত্রীর মৌলিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়। চতুর্থত, গ্রামীণ সমাজে স্ত্রীর আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং সামাজিক চাপের কারণে অধিকাংশ নারী এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। সর্বশেষে, শরীয়াহ অনুসারে ভরণপোষণ শুধু খাদ্য বা বস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং চিকিৎসা, বাসস্থান, মানসিক নিরাপত্তা ও সম্মানজনক জীবনযাত্রাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাস্তবে এসবের পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায় না, ফলে স্ত্রীর ভরণপোষণে সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

২. ধর্মের নামে রাজনীতি

ধর্ম নিয়ে ধর্মবণিকদের খেলা অনেক পুরোনো। পৃথিবীর নানা দেশে এমন খেলা অতীতেও চলেছে, এখনো চলছে। বাংলায় তেরো শতকের আগে ইসলাম বিস্তার ও মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার ধারাটি তেমন প্রবল ছিল না। মুসলমান সমাজ গড়ার আদি পদচিহ্ন দেখা যায় আট থেকে এগারো শতকের মধ্যে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমুদ্র তীরাঞ্চলে। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। ১৯৮৮ সালের আগে রাষ্ট্রধর্ম যখন ইসলাম ছিল না, তখনও এ দেশের মানুষ ধর্ম পালন করতেন। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করার পরেও মানুষ ধর্ম পালন করেন। ধর্ম পালনে আগেও কোনো সমস্যা ছিল না, এখনও নেই। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষকে নিয়ে রাষ্ট্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম। আলাদা করে রাষ্ট্রের কোনো ধর্মীয় পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না।[৬৫১]

বরং ধর্মীয় পরিচয় থাকলে, অন্য ধর্মের (সংখ্যায় তারা কম হলেও) মানুষ নিজেদের নিরাপত্তাহীন ভাবতে পারেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দায়িত্ব সংখ্যায় যারা কম তাদের দেখে রাখা। নিজের অধিকারের নামে তাদের মনে ভীতি তৈরি করা নয়। (১) দেওবন্দী ধারা; (২) ব্রেলভী ধারা; (৩) আহলে হাদীস ধারা; (৪) জামায়াতে ইসলামী মওদূদীবাদ ধারা; (৫) উগ্র বা ভুয়া মুজাহিদ বা জঙ্গী ধারা। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী জামায়াতে ইসলামী ও তাদের তাত্ত্বিক গুরু মওলানা আবুল আলা মওদুদীর দর্শন ইসলামের বিপরীত। তাদের বই ও ওয়াজ এমনটিই প্রমাণ করে। এসব উপাদানের অনুষজ্ঞ ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষই ধর্মের ব্যাপারে সবসময় সহানুভূতিশীল, শ্রদ্ধাশীল। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মানুষের সহানুভূতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের মতো করে ধর্মকে বিকৃত করছে জামায়াত-শিবির, সেই সঙ্গে প্রকৃত

---

৬৫১ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

ধর্মের আড়ালে প্রচার করছে মওদুদীর দর্শন। এ প্রচারণা তারা স্কুল-মাদ্রাসার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝেও চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে সারাদেশে যেভাবে সন্ত্রাসের তাণ্ডব চালানো হচ্ছে, যে কোনো সংজ্ঞায় এখন জামায়াত-শিবির সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন রায়ে যুদ্ধাপরাধের রায়ে জামায়াতকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে উল্লেখও করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেয়া সংগঠনগুলো হলো- জামিউতুল ফালাহ, আল হারাত-আল-ইসলামিয়া, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট, তৌহিদী জনতা, জুমাদআতুল আল সাদাত, তামিরউদ্দীন দ্বীন বাংলাদেশ, আল খিদমত, হিজবুল মাহদি, হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ, দাওয়াতি কাফেলা, বাংলাদেশ এন্টি টেররিস্ট পার্টি, আল মারকাজুল আল ইসলামী, আল ইসলাম মার্টেনস ব্রিগেড, সত্যবাদ, মুসলিম মিল্লাত, শরিয়া কাউন্সিল বাংলাদেশ, তাজির বাংলাদেশ, হায়াতুর ইলাহা, ফোরকান মুভমেন্ট, জামিউতুল এহজিয়া এরতাজ, আনজুমানে তালামিজ ইসলামিয়া, কলেমার জামাত, সাহাবা পরিষদ, কাতেল বাহিনী, মুজাহিদিন-ই-তাজিম, এশার বাহিনী, আল ফাহাদ, হরকাতুল মুজাহিদিন ও জাদিদ আল কায়দা।[৬৫২]

২.১ প্রায়োগিক প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত (ধারা ২ক)। একইসাথে, সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে -

"রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হইবে না।"

এই দুই ধারার মাঝে স্পষ্ট দ্বৈততা বিরাজ করে। একদিকে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ থাকার কথা বলছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বলেও একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এতে আইন প্রণয়ন ও বিচারব্যবস্থায় দ্বিধা সৃষ্টি হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শঙ্কা সৃষ্টি হয় যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে এক ধর্মের প্রাধান্য দিলে তারা বৈষম্যের শিকার হতে পারে।

ধর্মভিত্তিক বৈষম্য: মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান প্রত্যেকের জন্য আলাদা পারিবারিক আইন থাকায় একটি অভিন্ন নাগরিক আইন (Uniform Civil Code) গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি হয়।[৬৫৩]

বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার পরও আইন প্রণয়ন প্রায়শই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে হয়, যেমন: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, তথ্য ও প্রযুক্তি আইন,দণ্ডবিধি ইত্যাদি এগুলো মূলত ইংরেজ আইনব্যবস্থার ছায়া। ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আইন অনুসরণের দাবি থাকলেও আইন

---

৬৫২ মো আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৬৫৩ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০২১, পৃ. ২৫৬

কাঠামোতে তার প্রয়োগ সীমিত।[৬৫৪] আবার, ইসলামিক আইন প্রণয়নের চেষ্টায় অনেক সময় আধুনিক মানবাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে বেশ কিছু প্রায়োগিক প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হলেও, অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোতে যুক্ত রয়েছে, যা সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় দ্বন্দ্ব তৈরি করে। ফলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও সমান্তরালে অন্যান্য সংস্কৃতির সমান সুযোগ নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা থাকে। এই দ্বৈত অবস্থান নীতি-নির্ধারণে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে এবং শিক্ষা, গণমাধ্যম ও শিল্প-সাহিত্যে ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতিফলনকে সীমিত করে। এছাড়া ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতিগত জটিলতা, ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের প্রবণতা এবং প্রশাসনিক তদারকির ঘাটতি তৈরি হয়, যা ইসলামী সংস্কৃতির ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তদুপরি, বৈশ্বিকীকরণ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবেও সংবিধানসম্মত নীতি ও বাস্তব প্রয়োগে অমিল চর্চাকে অনেকাংশে সীমিত করে রাখে।

২.২ ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহার

বাংলাদেশে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ইসলামকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে, যা ইসলামের মূলনীতি ও আদর্শের পরিপন্থী।[৬৫৫] ইসলামের মূল শিক্ষা হলো ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, পরস্পরের প্রতি সম্মান এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দল বা নেতারা ইসলামি পরিভাষা ও ধর্মীয় আবেগ ব্যবহার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে, ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে এবং কখনো কখনো সহিংসতাও উসকে দেয়। এমনকি শরিয়াহর অপব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে ধর্মের নামে ভুল পথে পরিচালিত করার ঘটনাও ঘটে থাকে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়।[৬৫৬] বাস্তবতা হলো, ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, ন্যায়ের ভিত্তিতে শাসন ও জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়; কিন্তু অপপ্রয়োগের মাধ্যমে তা ক্ষমতার লালসা ও স্বার্থপর রাজনীতির উপকরণে পরিণত হয়। এই অপ-প্রয়োগ ইসলামকে রাজনৈতিক সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করে, যা ইসলামের বিশ্বজনীন ও কল্যাণমুখী চেতনাকে আঘাত করে।

---

৬৫৪ গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ, ২০০১ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৪৬

৬৫৫ আহমদ শরীফ, *বাঙলা বাঙালী বাঙলাদেশ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২২৫

৬৫৬ আরিফ খান, *বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা: বিএলবি, ২০১৮ খ্রি. পৃ.৯৮

২.৩ ইসলামপন্থী দলের কার্যক্রম ও রাষ্ট্রনীতি

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা ও ৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার মানে এই নয় যে, ধর্মকে সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে বাদ দিতে হবে। বরং,"ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ হল সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখানো এবং কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করা।"

এখানে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক মত প্রকাশও এই পরিসরের অন্তর্গত, যদি তা সহিংস না হয় এবং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল থাকে।

ধারা ৪১ অনুযায়ী:"প্রত্যেক নাগরিক ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ ও প্রচার করার পূর্ণ অধিকার রাখবে।" এই ধারা ইসলামপন্থী রাজনীতির মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কেউ যদি ইসলামের আলোকে সমাজ সংস্কার ও নীতি নির্ধারণ চায়, সেটি সাংবিধানিকভাবে অনুমোদিত, যতক্ষণ না তা রাষ্ট্রদ্রোহ বা সন্ত্রাসের পথে যায়। সংবিধানের ৩৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী,"প্রত্যেক নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে সমিতি ও সংগঠন গঠনের অধিকার ভোগ করবেন।"এই ধারা অনুযায়ী, ইসলামি চিন্তাধারার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন বৈধ, যদি তা সংবিধান-বিরোধী কাজ না করে। ১৯৮৮ সালে সংবিধানে সংযোজিত হয়, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না।"

এটি বোঝায় যে, রাষ্ট্র নিজেই ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়েছে, অতএব ইসলামি চিন্তাধারায় গঠিত রাজনৈতিক দল বা আন্দোলনের জন্য সাংবিধানিক বাধা থাকার কথা নয়।বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, আবার ধর্মনিরপেক্ষতাও অন্যতম মূলনীতি। তাই ইসলামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তা ও দল একদিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়, অন্যদিকে কিছু সীমার মধ্যে পরিচালিত হতে হয়।[৬৫৭] ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল সংবিধান অনুযায়ী বৈধ, যদি তারা সহিংসতা, উগ্রবাদ ও অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকে। তবে বাংলাদেশে ধর্মের নামে রাজনীতি একটি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এখানে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। সংবিধানে একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হলেও অন্যদিকে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে, যা রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করেছে। বিভিন্ন ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে ভোটের রাজনীতি করে থাকে।[৬৫৮] তারা অনেক সময় ধর্মকে নীতি ও আদর্শের পরিবর্তে ক্ষমতা লাভ ও প্রভাব বিস্তারের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। এর ফলে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিফলিত হয় না; বরং ধর্মের নামে বিভেদ, সংঘাত ও উগ্রতার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, রাষ্ট্র

---

৬৫৭ আরিফ খান, *বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত,পৃ.১২৩

৬৫৮ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

পরিচালনায় ইসলামী আইন বা শরীয়াহ বাস্তবায়নের দাবি থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় নিজেদের স্বার্থে তা আংশিকভাবে ব্যবহার করে, সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের দিকে যায় না। ফলে ধর্মের নামে রাজনীতি একদিকে মানুষের ধর্মীয় আবেগকে প্রভাবিত করছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নীতি ও গণতন্ত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন ইসলামপন্থী দল রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আসছে। তাদের মূল কার্যক্রম হলো সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, শরীয়াহভিত্তিক আইন বাস্তবায়নের দাবি তোলা, ইসলামি শিক্ষা বিস্তার, মসজিদ-মাদরাসা কেন্দ্রিক সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করা এবং জনগণকে ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। এসব দলের অনেকেই দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে ইসলামের প্রতি অনুরাগ বাড়ানোর চেষ্টা করে। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে ইসলামপন্থী দলগুলো সাধারণত রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী নীতি-কানুনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষে। তারা সংবিধানকে শরীয়াহসঙ্গত করার দাবি তোলে, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও হালাল শিল্পের প্রসার চায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিফলনের ওপর জোর দেয়। তবে বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য ও আন্তর্জাতিক প্রভাবের কারণে তাদের দাবি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না। অনেক সময় ইসলামপন্থী দলগুলো ক্ষমতার রাজনীতিতে জোট গঠন বা আপসের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখে, ফলে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।

৩. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাগুলো নানামুখী এবং দীর্ঘদিনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। প্রত্যেক শিক্ষানীতিরই কতগুলো উপাদান থাকে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। আমাদের শিক্ষানীতির মূল আদর্শ বানানো হয়েছে সেক্যুলারিজমকে।[৬৫৯]

ধর্মনিরপেক্ষতাকে মাথায় নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে তা উল্লেখও করা হয়েছে। ব্রিটিশদের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়েই মূলত বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের মূল কাঠামো চলছে। আর সৃজনশীল বা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামকে মাথায় রেখে কিছুই করা হয়নি। বরং কিছু কিছু পদক্ষেপ ইসলামের মৌলিক অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক হলেও আধুনিক বাস্তবতা ও জাতীয় চাহিদার প্রেক্ষাপটে এর কার্যকারিতা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। জাতির নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।[৬৬০] কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি প্রধান ধারা আলিয়া ও কওমি প্রতিবন্ধকতা, পশ্চাৎপদতা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। এ আলোচনায় বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষার সীমাবদ্ধতাগুলো নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

---

৬৫৯ হোসেন আরা শাহেদ (সম্পাদক), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৪

৬৬০ ড. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ: সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, ঢাকা: মজিদ পাবলিকেশন্স,২০০৩ খ্রি, পৃ ১৩

৩.১ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবস্তুর আধুনিকতার অভাব

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হলো সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়নের ঘাটতি। আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচি অনেকাংশে ধর্মীয় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হলেও তা যুগোপযোগী নয় এবং আধুনিক বিশ্বের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে হালনাগাদ করা হয়নি। অধিকাংশ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, গণিত, ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক অর্থনীতি বিষয়ক শিক্ষা সীমিত বা একেবারেই অনুপস্থিত, ফলে শিক্ষার্থীরা মূলধারার উচ্চশিক্ষা বা চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়গুলোও ব্যাখ্যামূলক, গবেষণাভিত্তিক না হয়ে কেবল মুখস্থ নির্ভর হয়ে ওঠে, যা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী দক্ষতা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও উপস্থাপনা রীতি অনেক সময় শিক্ষার্থীদের অনুধাবনের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে বিষয়গুলো বিরক্তিকর ও কঠিন মনে হয়। এই সমস্যাগুলোর সমাধানে পাঠ্যক্রমের কাঠামোগত সংস্কার, যুগোপযোগী কনটেন্ট সংযোজন এবং ধর্মীয় বিষয়ের গভীরতা বজায় রেখেই আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। অধিকাংশ মাদ্রাসায় পাঠ্যক্রম সময়োপযোগী নয়। কওমি ধারায় এখনও প্রায় একশ বছরের পুরাতন 'দরসে নিজামী' কিতাবভিত্তিক পাঠ্যক্রম চলে আসছে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ যেমন জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি যুক্ত না থাকায় শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের সাথে শিক্ষা মিলিয়ে নিতে পারে না। তারা কর্মজীবনে প্রবেশে পিছিয়ে পড়ে, দেশ-বিদেশে প্রতিযোগিতায় অযোগ্য হয়ে পড়ে।[৬৬১]

৩.২ কর্মমুখী শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতার একটি হলো কর্মমুখী শিক্ষা ও ব্যবহারিক দক্ষতার অভাব। অধিকাংশ আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসায় সাধারণত তত্ত্বভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়, কিন্তু কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি, প্রযুক্তিগত বা পেশাভিত্তিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলা হয় না। এর ফলে মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে যেমন সরকারি-বেসরকারি চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাও অর্জন করতে পারেন না। বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি, গ্রাফিক ডিজাইন, মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি কর্মক্ষেত্র দ্রুত বিস্তৃত হলেও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা এসব ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত না থাকায় তারা পিছিয়ে পড়ে।[৬৬২] এছাড়া উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ দক্ষতা, ভাষাগত সক্ষমতা ও নেতৃত্বের মতো জীবনের জন্য অপরিহার্য দক্ষতাও সিলেবাসে উপেক্ষিত থাকে। এই ঘাটতি পূরণে ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিত কর্মমুখী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ

---

৬৬১ গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৬

৬৬২ ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম, *সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

কেন্দ্র স্থাপন ও ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সংযোগ গড়ে তোলা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সাধারণত কোনো প্রকার প্রযুক্তিগত বা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে তারা জীবিকা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি পেশা (ইমামতি, শিক্ষকতা, খতিব ইত্যাদি) ছাড়া অন্য পেশায় প্রবেশ করতে পারে না। একজন দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রিধারী ছাত্র যদি চায় ব্যাংক, শিল্প বা প্রশাসনে কাজ করতে তাকে পুরোপুরি নতুনভাবে শিক্ষা নিতে হয়, যা বাস্তবসম্মত নয়।

৩.৩ প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত বা অনুপস্থিত

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত বা অনুপস্থিত থাকার ফলে শিক্ষার গুণগত মানে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অধিকাংশ মাদ্রাসায় ইন্টারনেট সুবিধা, কম্পিউটার ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা উপকরণ বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার খুবই কম বা নেই বললেই চলে। ফলে শিক্ষার্থীরা আধুনিক তথ্য ও জ্ঞানের উৎস থেকে বঞ্চিত থাকে এবং বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শেখার সুযোগ হারায়। বিশেষ করে ডিজিটাল শিক্ষা, অনলাইন রিসোর্স, ভিডিও লেকচার বা ই-লার্নিং এর অভাবে শিক্ষার গতিশীলতা ও আকর্ষণীয়তা কমে যায়। এছাড়া শিক্ষকগণও প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষাদানে উন্নত পদ্ধতি গ্রহণে অক্ষম থাকেন, যা শিক্ষার্থীদের বুঝতে ও শিখতে অসুবিধা সৃষ্টি করে। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ব্যবহার ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা পিছিয়ে পড়া স্বাভাবিক, তাই ইসলামী শিক্ষায় প্রযুক্তির সমন্বয় ও আধুনিকীকরণ এখন সময়ের অতি প্রয়োজনীয়। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি শিক্ষায়তনে প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক হলেও বেশিরভাগ মাদ্রাসায় এখনো ইন্টারনেট, প্রজেক্টর বা ডিজিটাল ক্লাসরুমের কোনো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার জানে না, যা আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক।

৩.৪ গবেষণা, চিন্তাশীলতা ও জ্ঞান উৎপাদনের ঘাটতি

ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল চিন্তাশীল আলিম, গবেষক ও দার্শনিক তৈরি করা। অথচ বর্তমান ব্যবস্থায় গবেষণার সুযোগ ও মনোভাব খুব সীমিত। কোনো রকম মৌলিক গবেষণা ছাড়া কেবল মুখস্থনির্ভর শিক্ষা আলিম তৈরি করছে, চিন্তাশীল চিন্তাবিদ নয়।[৬৬৩] আজকের জটিল বিশ্ব সমস্যার ইসলামী সমাধান দিতে সক্ষম পণ্ডিত তৈরি হচ্ছে না। সাধারণত মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম মুখস্থনির্ভর এবং পরীক্ষাকেন্দ্রিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা সমালোচনামূলক চিন্তা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সুযোগ খুব কম পায়। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, অর্থায়ন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আধুনিক গ্রন্থাগারের অভাব রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক গবেষণা প্রবণতা, নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে

---

৬৬৩ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫, পৃ. ২২৬

সেভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী নয়; এতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান কিংবা সমসাময়িক সমস্যাবিষয়ক গবেষণার সুযোগ সীমিত থাকে।

চিন্তাশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রেও মাদ্রাসা শিক্ষায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শিক্ষকরা সাধারণত পূর্বনির্ধারিত পাঠ্যক্রমের বাইরে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন বা নতুন মতামত প্রকাশে উৎসাহ দেন না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্থ হয়। এছাড়া ইসলামী চিন্তাধারা ও দর্শনের গভীরতা তুলে ধরার পাশাপাশি সমসাময়িক জ্ঞানচর্চার সাথে সমন্বয় না থাকার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা আধুনিক জ্ঞান উৎপাদনে পিছিয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় ঘাটতি হলো গবেষণার সংস্কৃতি না থাকা।[৬৬৪] বিশ্ববিদ্যালয় ও আধুনিক শিক্ষাপৃতিষ্ঠানের মতো মাদ্রাসায় গবেষণাধর্মী কাজের পরিবেশ নেই, গবেষণা জার্নাল বা প্রকাশনার সুযোগও সীমিত। ফলে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির পরিবর্তে কেবল পুরোনো জ্ঞান পুনরাবৃত্তি হয়।

৩.৫ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও তদারকির অভাব

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও কার্যকর তদারকির অভাব একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। অনেক মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা দুর্বল এবং নিয়মিত তদারকি না থাকায় দুর্নীতি, অর্থের অপব্যবহার ও অপ্রয়োজনীয় খরচ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া শিক্ষার মান ও পাঠ্যক্রম নিয়ন্ত্রণে যথাযথ নজরদারি না থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠান গুণগত মানহীন শিক্ষা প্রদান করছে, যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর। সরকারি তত্ত্বাবধানে থাকা আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে শিক্ষাদানের মানের পার্থক্য দেখা যায়। এই অবস্থা শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিক দায়িত্ববোধ ও স্বচ্ছতার অভাব তৈরি করে, যা ইসলামী শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য কঠোর প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন ও নিয়মিত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ও মনিটরিং অপরিহার্য। সুশাসনের অভাব শিক্ষার পরিবেশকে দুর্বল করে তোলে। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও তদারকির অভাব শিক্ষার মান উন্নয়ন বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। অনেক মাদ্রাসার অর্থ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম এবং শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নেই, যা অনিয়ম ও অপচয় সৃষ্টি করে। সরকারি নিয়মনীতি থাকলেও তদারকি যথাযথভাবে কার্যকর হয় না, ফলে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম, শিক্ষক যোগ্যতা এবং শিক্ষার মান পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে যায়। এই অনিয়ম শিক্ষার্থীদের সঠিক ও সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

---

৬৬৪ ড. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ: সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

৩.৬ আর্থিক সংকট ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সংকট ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা অন্যতম গুরুতর প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত। অধিকাংশ কওমি ও কিছু আলিয়া মাদ্রাসা স্বল্প অর্থায়নের কারণে আধুনিক শিক্ষা উপকরণ, বিজ্ঞানের ল্যাব, গ্রন্থাগার, এবং যথাযথ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থা করতে অক্ষম।[৬৬৫] অনেক ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ভবনই খুবই পুরনো ও অপর্যাপ্ত, যা শিক্ষার্থীদের শিখন পরিবেশকে প্রভাবিত করে। আর্থিক স্বচ্ছতার অভাব ও অনিয়মের কারণে তহবিল যথাযথভাবে ব্যবহার না হওয়া, শিক্ষকদের বেতন ও সুবিধা কম থাকা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অভাব শিক্ষার গুণগত মানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে শিক্ষার্থীরা আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।[৬৬৬] এই সংকট দূর করতে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের সহযোগিতা ও উদ্দীপনার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুশৃঙ্খল ও আধুনিক অবকাঠামোতে উন্নীত হতে পারে। বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসাগুলো পুরোপুরি স্বশাসিত। সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদারকি নেই বললেই চলে। এতে কিছু মাদ্রাসায় অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার দেখা যায়। অধিকাংশ মাদ্রাসা দান-খয়রাত ও ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল। সরকারের পূর্ণ অর্থায়ন না থাকায় শিক্ষক বেতন, বই, প্রযুক্তি, পরীক্ষার অবকাঠামো তৈরি সবই সংকটে পড়ে। অনেক প্রতিষ্ঠান জরাজীর্ণ ভবনে চলে। শিক্ষার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়।

৩.৭ জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে এর অসামঞ্জস্যতা। কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসার অনেক সময় শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যার ফলে শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চশিক্ষা বা কর্মজীবনে প্রবেশে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক বিষয় যেমন বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি, ইংরেজি ভাষা ইত্যাদি যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে কেবল ধর্মীয় বিষয়কে প্রাধান্য দেয়, যা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা নীতির লক্ষ্যের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে যেমন সমন্বিত ও বহুমুখী দক্ষতা বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়, ইসলামী শিক্ষায় তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। এই অসামঞ্জস্যতার কারণে শিক্ষার্থীরা আধুনিক সমাজ ও অর্থনীতির চাহিদা পূরণে প্রস্তুত হতে পারেনা এবং একটি ঐক্যবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা গঠনে বাধা সৃষ্টি হয়।

---

৬৬৫ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৬৫

৬৬৬ মালিক বিন নাবী, *মুশকিলাহ আস-সাকাফাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হলে পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন ও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কওমি ও আলিয়া ধারার শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সমন্বিত নয়। একদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিয়া মাদ্রাসা, অপরদিকে কওমি একটি আলাদা নেটওয়ার্ক। শিক্ষার্থীরা একই দেশে থেকেও ভিন্ন যোগ্যতা অর্জন করে, যার ফলে উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

৩.৮ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উগ্রবাদে ঝুঁকি

বাংলাদেশের কিছু ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উগ্রবাদ বৃদ্ধি পাওয়া একটি জটিল ও সংকটজনক সমস্যা। অধিকাংশ সময় ধর্মীয় শিক্ষা প্রচলিত ধ্রুপদী ও রূঢ় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়, যা সমসাময়িক সমাজের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সঙ্কীর্ণ মতাদর্শে সীমাবদ্ধ থেকে সহনশীলতা, বৈচিত্র্য গ্রহণ ও সংহতি বজায় রাখার ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়। এ ধরনের শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক দূরত্ব ও ধর্মীয় বিভাজন বৃদ্ধি পেতে পারে, যা উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের জন্য উর্বর ভূমিকা সৃষ্টি করে। এছাড়া, আধুনিক জ্ঞানের অভাবে শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করে রোবোটিকভাবে ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণ করে, যা উগ্রপন্থার বিকাশে প্রভাব ফেলে।[৬৬৭] এই ঝুঁকি মোকাবেলায় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় মুক্তচিন্তা, সমঝোতা ও মানবিক মূল্যবোধ জোরদার করতে হবে এবং শিক্ষকদের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাদানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় মতানৈক্য, দলাদলি ও অন্ধ বিশ্বাস প্রবেশ করে ধর্মীয় কূপমণ্ডকতা তৈরি করছে। কিছু প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী ইসলামের অপব্যাখ্যা করে উগ্র চিন্তাভাবনা ছড়ায়। সমাজে বিভেদ, সহিংসতা ও জঙ্গিবাদের ঝুঁকি বাড়ে।

৩.৯ নারীর অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার শিকার। অনেক জায়গায় মেয়েদের জন্য আলাদা মাদ্রাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে, যা নিরাপত্তা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে তাদের শিক্ষা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া কিছু কনজারভেটিভ পরিবেশে নারীদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে অব্যাহত সুযোগ ও উৎসাহ কম থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রমের ঘাটতি এবং পরিবারের পক্ষ থেকে শিক্ষায় অনুপ্রেরণার অভাবও নারীর শিক্ষা প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনেক সময় নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত থাকায় তারা দেশের সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারছে না। এ অবস্থায় নারীদের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে

---

৬৬৭ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, ২০১৫,পৃ. ২২৬

তোলা, তাদের শিক্ষাগত অধিকার নিশ্চিত করা এবং পরিবার ও সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো একান প্রয়োজন। কিছু মাদ্রাসায় নারীদের ইসলামিক শিক্ষার সুযোগ থাকলেও অনেক জায়গায় তা পর্যাপ্ত নয়। অনেক কওমি মাদ্রাসায় নারী শিক্ষা সীমিত, এবং কিছু এলাকায় তা একেবারেই নিষিদ্ধ বা অনুৎসাহিত। নারীরা ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় এবং সমাজে ইসলামী মূল্যবোধের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

৩.১০ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও মান অর্জনে ব্যর্থতা

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে যথাযথ কার্যক্রমের অভাব। অধিকাংশ মাদ্রাসা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণা, ও আধুনিক ইসলামী চিন্তাধারার সঙ্গে পর্যাপ্ত সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি।[৬৬৮] ফলে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকে। বিদেশি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা না থাকায় নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি, গবেষণার আধুনিক কৌশল এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিনিময়ের সুযোগ কমে যায়।[৬৬৯] পাশাপাশি, বিদেশি ভাষায় দক্ষতার অভাব ও প্রযুক্তিগত সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক ইস্যু ও আধুনিক বিষয়গুলোকে পর্যাপ্তভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। এর ফলে বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতায় পিছিয়ে পড়ে, যা দেশের ইসলামি চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য আন্তর্জাতিক সমন্বয়, আধুনিক গবেষণা উৎসাহ প্রদান ও প্রযুক্তির ব্যবহার জরুরি। আন্তর্জাতিক মানের ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে গবেষণামূলক সংযোগ নেই। সেমিনার, জার্নাল, স্কলারশিপ ইত্যাদিতে মাদ্রাসার কোনো অংশগ্রহণ থাকে না। শিক্ষার্থীরা আঞ্চলিক পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে, বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।

৩.১১ সমন্বিত ইসলামী শিক্ষানীতির অভাব

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো সমন্বিত ও ব্যাপক শিক্ষানীতির অভাব। আলিয়া, কওমি এবং সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যথাযথ সমন্বয় না থাকায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তির মুখোমুখি হয়। ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করার কোনো সুসংহত নীতিমালা না থাকায় পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাদের ব্যক্তিগত ও

---

৬৬৮ মো. জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত, *আমাদের সংস্কৃতি বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০১ খ্রি., পৃ. ১৪৩

৬৬৯ ড. আহমদ শরীফ, *শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতি*, ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৮,পৃ.৩২

পেশাগত উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। তদুপরি, এককভাবে ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক বিষয় ও জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতাকে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না, যার ফলে শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিকতা কমে যায়। এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত, যুগোপযোগী ও বহুমুখী ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়ন জরুরি, যা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করবে। বর্তমানে কোনো একটি জাতীয় ইসলামী শিক্ষানীতি নেই যা সকল ধারাকে সমন্বিত করে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করবে। সরকারের একেক সময়ে একেক নীতির প্রয়োগে ধারাবাহিকতা হারায়। একটি স্থায়ী উন্নয়ন কাঠামো গড়ে ওঠে না।

৪. বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের সমস্যা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারীরা। কোন সমাজেই নারীর সম্মান ছিলোনা কোন কালে। বেঁচে থাকার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, পরিবারে স্নেহ-ভালোবাসা পাবার অধিকার কোনটাই নারীর কপালে জোটেনি।[৬৭০] ইসলামই প্রথম নারীকে সকল ক্ষেত্রে সম্মান দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামী সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা নেই, তাই পূর্ববর্তী সময়ের অনুসরণেই নারীরা সুবিধাবঞ্চিত হতে থাকে। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হলেও ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে এ সমস্যাগুলোকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা যায়। ইসলাম নারীকে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে শিক্ষা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় নারীরা প্রায়ই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সামাজিক কুসংস্কার ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নারীদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। কর্মক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হন, আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের সামাজিক অংশগ্রহণ সীমিত করা হয়।[৬৭১] ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত শিক্ষা হলো ন্যায়, সমতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা, যা নারীকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সমাজে এই আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে নারীরা পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপদ পরিবেশ পাচ্ছেন না। ফলে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদান সম্ভাবনার তুলনায় সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

৪.১ পারিবারিক শিক্ষায় ঘাটতি

এই উপমহদেশে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিলোনা বলেই চলে। রান্না শেখা, সেলাই শেখা, পরিবারের সদস্যদের সেবা যত্ন করা এসবই ছিলো পারিবারিক শিক্ষা। কিন্তু ইসলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ আলাদা করে কিছু বলেনি। নারী যেহেতু পুরুষের সঙ্গী তাহলে তাকেও তো সমানভাবে শিক্ষিত

---

৬৭০ ড. ইউসুফ আল-কারযাবী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৬৭১ মো. জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত, *আমাদের সংস্কৃতি বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

হওয়াটা জরুরী মনে করতে হবে। বাংলাদেশে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরী করার জন্য এবং নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য সরকার অনেক ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তির ব্যবস্থা, বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ, প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের নানান কাজের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নারীদের সুযোগ প্রদান। তবে দুঃখের বিষয় হলো সরকার এতো ব্যবস্থা করে দেওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই নারী পরিবারে বৈষম্যের স্বীকার হয়, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ীতে নির্যাতিত হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে অতি আধুনিকতার ছোঁয়ায় নারীরা বেপথে চলে যায়।[৬৭২] এই প্রতিযোগিতা বর্তমান সময়ের একটি চলমান ঘটনা। তাছাড়া বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে তা পালনের নামে পরিবারে বা প্রতিষ্ঠানে অথবা যেকোন স্থানে সমবেত হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। যাতে বেশিরভাগ সময়েই ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের চর্চা হয়ে থাকে। যা নারীদের চারিত্রিক নৈতিকতা বর্জনের পথ সুপ্রশস্ত করে দেয়।

৪.২ বিজ্ঞাপণে নারীকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন

নাটক, চলচিত্র, বিজ্ঞাপনে নারীকে উপস্থাপনার বিষয়টি একটু লক্ষ্য করলে বোঝাযাবে অহেতুক নারীর উপস্থিতি, অপ্রাসঙ্গিক নারী দেহ প্রদর্শন, নারীকে কোমল দূর্বল হিসেবে উপস্থাপন এ তো হর হামেসাই চলছে। বিশ্বায়নের এই যুগে পণ্যের বিজ্ঞাপন অপরিহার্য।[৬৭৩] আর বিজ্ঞাপন চিত্রে নারী পণ্যের মডেল হতে গিয়ে নিজেই যেনো পণ্য হয়ে উঠেছে। নারী তার শিক্ষা, মেধা, কর্মদক্ষতা, মূল্যবোধ ও শিল্পসচেতনতাকে উপেক্ষা করে মডেল হচ্ছে পুরুষের আন্ডারগার্মেন্ট, পুরুষের সেফটি রেজর এবং পুরুষের জন্য তৈরি পারফিউমে। শুধু মেয়েলি পণ্যের বিজ্ঞাপনেই নয়, ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় সাবান, খাবার, গাড়ি, ব্যাটারি এমনকি আসবাবের বিজ্ঞাপনেও নারী। শালীনতা অনুপস্থিত হতে হতে অশ্লীলতাকে নান্দনিক কিংবা শৈল্পিক ও সৃষ্টিশীল বলা শুরু হয়েছে।[৬৭৪] নারীর শরীর প্রদর্শন কিংবা অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করতে পারলেই বিজ্ঞাপন হয়ে যায়।[৬৭৫] একজন মুসলিম নারীর সম্মান তার পর্দা রক্ষায়, নিজেকে উম্মুক্ত করে সবার মাঝে উস্থাপনে কোন বাহাদুরি নেই। সমাজের ঘৃণ্য কর্মগুলো এই কারণে আরও বেশি সংগঠিত হচ্ছে, নারী শ্লীলতাহানীর শিকার হচ্ছে। ইসলামের শিক্ষার আলোকে নারীকে বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা যৌক্তিক নয়। ইসলাম নারীর মর্যাদা, সতীত্ব ও ইজ্জতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় এবং নারীকে কোন পরিস্থিতিতেই অবমাননাকর বা বিনোদনমূলকভাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না। বিজ্ঞাপনে নারীকে শুধু দেহ সৌন্দর্য বা আকর্ষণীয় তার মাধ্যমে

---

৬৭২ প্রফেসর ড. মুস্তাফা মুসাল্লাম ও প্রফেসর ড. ফাতহী মুহাম্মাদ আয-যাগবী, *আস-সাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৬৭৩ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৬৮

৬৭৪ বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *ইসলামী জীবন ব্যবস্থা*, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৭৮

৬৭৫ প্রফেসর ড. মুস্তাফা মুসাল্লাম ও প্রফেসর ড. ফাতহী মুহাম্মাদ আয-যাগবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

পণ্যের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা নারীর মর্যাদা হ্রাস করে এবং সমাজে যৌনিকীকরণকে উস্কে দেয়। ইসলামী নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে, এমন প্রচারণা নারীকে বস্তুগতভাবে প্রদর্শন করে, যা ইসলামের আদর্শ মানসিকতা এবং নৈতিকতার সাথে বিরোধপূর্ণ। তাই পণ্য প্রচারের ক্ষেত্রে নারীকে ব্যবহার করার পরিবর্তে বৈধ ও নৈতিক উপায় অবলম্বন করাই ইসলামের দৃষ্টিতে যথোপযুক্ত।

৪.৩ কর্ম ক্ষেত্রে নারীদের সমস্যা

কোরআন ও হাদিসের কোনো স্থানে নারীর কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। শুধু দু'টি বিষয়ের প্রতি সঙ্গত কারণে নির্দেশ দিয়েছে। শর্ত দু'টি হলো প্রথমত, ব্যবসা হতে হবে হালাল পদ্ধতিতে ও শরিয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, পর্দা রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া ইসলাম নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী কোনো পেশায় নিয়োজিত হতেও নিষেধ করেছে। কিন্তু জীবনযাপনের মান উন্নত করার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীরও কর্ম ক্ষেত্রে যোগদান প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়িয়েছে। যেহেতু পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি এ সময়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকেও। আন্তর্জাতিক শ্রম তহবিলের (আইএলও) 'বিশ্ব কর্মসংস্থান ও সামাজিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নারীদের অবস্থান ২০২৩' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে ভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে।[৬৭৬] আইএলও এর তথ্য অনুযায়ী, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে গত দুই দশকে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ার পরিবর্তে কমেছে। কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে নারীদের নানান রকমের সমস্যার তথ্য ও চিত্র। ঢাকায় কর্মজীবী নারীকে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যাতায়াতের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক এবং পৃথক পরিবহন না থাকায় এমনিতেই প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হতে হয় তাদের। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত এমন অনেক সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয় নারীদের, কিন্তু আজ অব্দি এসব নিয়ে অনেক কথা হলেও সমাধান পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারী নিপীড়ন বন্ধে আইন আছে, কিন্তু এর যথাযথ ও বাস্তব প্রয়োগ না থাকায় নারীদের এমন বিড়ম্বনা শেষই হচ্ছে না। নারীদের জন্য আলাদা রেস্টরুমের ব্যবস্থা নেই, কোন কোন ক্ষেত্রে আলাদা ওয়াশরুমেরও ব্যবস্থা নেই। নেই কোন স্বাস্থ্যসেবা, নেই প্রসূতি মায়ের জন্য কোন রকম সুবিধা, নেই ছোট শিশু রাখার ব্যবস্থা বা ডে-কেয়ার সেন্টার। নারী অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা শারীরিক বা মানসিক অবমাননাকর ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে।[৬৭৭] নিম্ন আয়ের নারীরাও তাদের প্রাপ্য মজুরী পায়না। অনেক সময় পুরুষদের সমান কাজ করেও তারা প্রাপ্য মজুরী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে, বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। দেশের বর্তমান

---

৬৭৬ ফাহমিদ-উর-রহমান, *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২১ খ্রি., পৃ. ১১২

৬৭৭ ব্যারিস্টার মোঃ আব্দুল হালিম, *বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা*, ঢাকা: দ্য সিসিবি বুক সেন্টার, ২০১৯ খ্রি. ,পৃ.৩৫৬

সরকার প্রধান নারী হওয়া সত্ত্বেও এবং নারীদের অনেক অগ্রগতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৪.৪ উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া

ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান মানব জাতির জন্য কল্যাণকর। জাগতিক অনেক নিয়ম-কানূন পরিবর্তিত হচ্ছে কিংবা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে কিন্তু ১৫০০ বছরের পুরনো ইসলামী নীতিমালা মানব জীবনের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়িয়েছে। ইসলামের ফারায়েজ নীতিমালাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সম্পত্তিতে অধিকার ও মালিকানাকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া হয় না কিংবা প্রাচীন কাল থেকেই নারী কেবলমাত্র ঘরের দেখা-শোনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা সম্পত্তির মালিকানা হবে সেটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না। সংস্কৃতির এই নতিবাচক প্রভাব মানুষের মধ্যে মজ্জাগত হয়ে আছেসম্পত্তি বন্টনকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, আল-কুরআনের একাধিক জায়গায় এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। মিরাসকে গুরুত্ব দিয়ে মহান রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনে বলেন, এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহা সাফল্য।[৬৭৮]

মুসলিম আইনে নারীদের সম্পত্তির যে অধিকার রয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে কোনো নারী উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। আমাদের দেশে বেশির ভাগ মুসলিম নারী আইন অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার পায় না। এতে স্বামী মারা গেলে বা বিবাহবিচ্ছেদ হলে তাদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। এখনও গ্রামের অনেক নারী, এমনকি শহরেও বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় নারীরা। অথচ এই অধিকার স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদের অংশ আছে। তা কম হোক অথবা বেশি, তা নির্ধারিত অংশ" [৬৭৯] প্রকৃতপক্ষে নারী-পুরুষ সৃষ্টিগতভাবে যেমন আলাদা, পরিবার ও সমাজে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকারও আলাদা। পুরুষদের দায়িত্ব সংসারের সদস্যদের ভরণপোষণ খরচ চালানো। কিন্তু তাই বলে পরিবারের নারী সদস্যকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা। আমাদের দেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি দৃষ্টিভঙ্গী নারীরা বিয়ে করে অন্য পরিবারে চলে যায়, তাদের বিয়ের যাবতীয় খরচ বহন করা,

---

৬৭৮ (تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ), আল-কুর'আন, ৪: ১৩

৬৭৯ (لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا), আল-কুর'আন, ৪ : ৭

আবার তারা যখন বাবার বাড়ি বা ভাইয়ের বাড়ি বেড়াতে আসে তখন তাদের আপ্যায়ন করা ইত্যাদে খাতে অনেক খরচ পরিবারকে করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিয়েতে যৌতুক দিতে হয় । তাই নারীরা সামাজিক ও পারিবারিক নানা ঘটনার সম্মুখীন হয়ে হোক বা সঠিক ইসলামী জ্ঞান না থাকার কারনে হোক সম্পত্তির অধিকার মৌখিক বা লিখিত ভাবে ছেড়ে দিয়েই আসে।

৪.৫ মসজিদে নারীদের নামাজের সুযোগ না থাকা

দেশের বিভিন্ন জনবহুল স্থানে পুরুষদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীদের জন্য কোনো সুযোগ থাকে না। এই অঞ্চলে ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন, পরবর্তী শাসনব্যবস্থা- এসব ব্যবস্থায় ইসলাম নারীদের যে অধিকার দিয়েছে, সেটা দেয়া হয় নাই। সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের উৎসাহ দেয়া হয় নাই। এই কারণে মেয়েদের নামাজের ব্যবস্থা নাই, কিন্তু ছেলেদের জন্য ব্যবস্থা আছে। ইসলামই বলেছে- নারীর নামাজের জন্য উত্তম জায়গা হলো ঘর; মসজিদ নয়। বিষয়টি জায়েজ হলেও রাসুল (স.) থেকে শুরু করে, পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কেরামও তাদের মসজিদে এসে নামাজ আদায়ে নিরুৎসাহিত করেছেন। কিন্তু মুসলিম নারীদের অনেককেই পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে ঘরের বাইরে অবস্থান করতে হয়। তাছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, কোনো ধর্মপ্রাণ নারী তার স্বামী, সন্তান, পিতা বা ভাইয়ের সাথে কেনাকাটা করতে বা কাজে কোথাও বেড়াতে বের হয়ে থাকেন। এ অবস্থায় পুরুষরা নিকটবর্তী মাসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতে পারলেও নারীদের জন্য পৃথক কোনো নামাজের জায়গা না থাকায় প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা নামাজ আদায় করতে পারছেন না। বর্তমানে ঢাকা শহরের বেশ কিছু এলাকায় নারীদের জন্য নামাজ আদায় করার পৃথক জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে অনেক মসজিদ, শপিং সেন্টার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে এ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সে জন্য দেশের প্রতিটি জনবহুল স্থানে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং মসজিদগুলোতে নারীদের জন্য নামাজের পৃথক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। [৬৮০] যাতে তারা প্রয়োজনে বাইরে গেলেও সুবিধা মতো নামাজ আদায় করে নিতে পারেন। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, শিল্পকারখানা, শপিং সেন্টার, বাসস্টেশন, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, যানবাহন-যাত্রাপথ, পর্যটন এলাকা, বিনোদন কেন্দ্র, হোটেল-মোটেলসহ সব জায়গায়ই পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যেন শরিয়তসম্মতভাবে নামাজ আদায় করতে পারেন সে ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করা জরুরী। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ, যেখানে ইসলাম ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামের মূলনীতি অনুসারে নারীদের মসজিদে যাওয়া ও নামাজ আদায়ের অধিকার রয়েছে। তবে

---

৬৮০ অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান, *কুর'আন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন*, প্রাগুক্ত,২০০৪ খ্রি., পৃ. ৭৮

বাংলাদেশের বাস্তবতায় নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণ প্রায় অদৃশ্য। ধর্মীয় ব্যাখ্যার বৈচিত্র্য, সামাজিক রক্ষণশীলতা, অবকাঠামোগত ঘাটতি ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এই গবেষণাপত্রে নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতাগুলোকে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে নারীরা নিয়মিত মসজিদে যেতেন। হাদীসে এসেছে-ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-"যখন তারা তোমাদের অনুমতি চায়, তখন তোমরা তোমাদের নারীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিও না"[৬৮১] বিভিন্ন কাজে নারীরা ঘরের বাইরে অবস্থান করতে পারে। প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া কোন অপরাধ নয়। তাই সময় মতো তারা যাতে সলাত আদায় করতে পারে সে জন্য মসজিদে গমনের কোন বিকল্প নেই। আবার অন্য একটি অন্য হাদীসে বলা হয়েছে: "তাদের ঘরে নামাজ আদায় করা তাদের জন্য উত্তম।"[৬৮২] এটি মূলত নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহজলভ্য পরামর্শ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, যেন ফিতনা বা অতিরিক্ত ঝুঁকি না ঘটে।

এই দুই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইসলামে নারীদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে, তবে ঘরে নামাজ পড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইসলামী আইনবিদদের মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও, নারীদের মসজিদে যাওয়াকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা সমাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং মসজিদ ছিল তাদের ইবাদতের স্থান। তবে সময়ের পরিবর্তনে, বিশেষ করে মধ্যযুগে নিরাপত্তা ও সামাজিক নীতির কারণে নারীদের মসজিদে যাওয়া সীমিত হয়ে পড়ে। আধুনিক মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ যেমন তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও মিশরে নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মসজিদে নামাজ পড়েন। সৌদি আরবের হারামাইন শরীফেই নারীদের জন্য বড় পরিসরে আলাদা জায়গা নির্ধারিত।

বাংলাদেশে অধিকাংশ মসজিদ পুরুষদের জন্য নির্মিত ও পরিচালিত। নারীদের জন্য আলাদা নামাজ-ঘর, ওযুখানা বা প্রবেশপথ থাকে না। কিছু বড় শহরের আধুনিক মসজিদে নারী গ্যালারি থাকলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক নয় এবং সচরাচর ব্যবহৃতও হয় না। অধিকাংশ নারী মসজিদে প্রবেশ বা ইবাদতের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন না।

নারীদের অংশগ্রহণ না থাকার কারণসমূহ

১. ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিভাজন: হানাফি মাজহাবে নারীদের মসজিদে যাওয়া নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। একে কেন্দ্র করে অনেক আলেম নারীদের মসজিদে যাওয়ার বিপক্ষে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। ফলে

---

৬৮১ (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ), *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হা.নং. ৪৪২

৬৮২ (وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ), আবু দাউদ: ৫৬৭

সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হন। বাংলাদেশে নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণ সীমিত থাকার একটি বড় কারণ হলো ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিভাজন। কিছু সমাজে প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে নারী মসজিদে গেলে তারা সামাজিক বা ধর্মীয়ভাবে সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ব, বা শ্লীলতা হ্রাস পাবে। এই ধারণার মূল ভিত্তি হলো হাদীস ও কোরআনের আংশিক বা অস্পষ্ট ব্যাখ্যা, যা নারীদের মসজিদে যাওয়া কমিয়ে দেয়। কিছু মুসলিম সমাজে পুরুষদের আধিপত্য, পরিবারিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রথাগত রীতি অনুসারে নারীদের অংশ-গ্রহণ সীমাবদ্ধ করা হয়। এছাড়াও, হাদীসের কিছু দিক নারীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে কেন্দ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, যা নারীদের ঘরে নামাজ আদায় করাকেই মূল প্রাধান্য দেয়। ফলে ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিভাজন এবং সামাজিক প্রথার মিশ্রণ নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণকে সীমিত করে এবং তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক স্বীকৃতিতে অসামঞ্জস্য তৈরি করে।[৬৮৩]

২. সামাজিক রক্ষণশীলতা: এলাকা এবং মধ্যবিত্ত সমাজে নারীদের বাইরে যাওয়া এখনও সীমিত। ধর্মীয় শিক্ষা ও মসজিদে অংশগ্রহণকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। বাংলাদেশে নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণ সীমিত থাকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো সামাজিক রক্ষণশীলতা। অনেক পরিবার ও সমাজে প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে নারীদের বাইরে বের হওয়া বা জনসমক্ষে অংশগ্রহণ "অপ্রীতিকর" বা "অসম্মানজনক" হতে পারে। এই রক্ষণশীল মনোভাব নারীদের মসজিদে যাওয়া কমিয়ে দেয়, কারণ পরিবার ও সমাজ থেকে চাপ, সমালোচনা বা অভিমতগত বাধা থাকে। নারীরা প্রায়ই পরিবারের সম্মান, সামাজিক মান বা নিরাপত্তার কারণে মসজিদে যেতে অনীহা দেখায়। এছাড়াও, সমাজে পুরুষদের আধিপত্য ও নারীদের জন্য স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা এই রক্ষণশীল পরিবেশকে আরও দৃঢ় করে, ফলে নারীদের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং ধর্মীয় অংশগ্রহণও সীমিত হয়। সামাজিক রক্ষণশীলতা কেবল পারিবারিক নিয়ম সীমাবদ্ধ নয়, বরং স্থানীয় কমিউনিটি, বন্ধুবৃত্তি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও নারীর উপস্থিতি প্রভাবিত করে।

৩. অবকাঠামোগত সমস্যা: অধিকাংশ মসজিদে নারীদের জন্য নামাজঘর নেই, আলাদা প্রবেশপথ বা ওযুখানাও থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী গ্যালারি থাকলেও সেটি ব্যবহারযোগ্য নয়। নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণ সীমিত থাকার একটি বড় কারণ হলো অবকাঠামোগত সমস্যা।[৬৮৪] বাংলাদেশের অনেক মসজিদে নারীদের জন্য আলাদা প্রার্থনার স্থান নেই বা থাকলেও তা অত্যন্ত ছোট, অপরিষ্কার এবং পুরুষদের স্থান থেকে দূরে। এমন পরিবেশে নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারেন না, যার ফলে মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ কমে যায়। এছাড়া, পর্যাপ্ত আলো, বায়ুচলাচল এবং স্যানিটেশন সুবিধার অভাবও নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত করে। কিছু মসজিদে জুমার নামাজ বা অন্যান্য ইবাদতের সময়

---

৬৮৩ ফাহমিদ-উর-রহমান, *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১২

৬৮৪ রিচার্ড এম. ইটন, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৫

নারী অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ও ব্যবস্থা থাকেনা, ফলে তারা প্রায়ই ঘরে নামাজ আদায়কে বেছে নেন। অবকাঠামোগত সমস্যা শুধু শারীরিক সীমাবদ্ধতা নয়, এটি নারীর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অংশগ্রহণকেও প্রভাবিত করে।

৪. নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার অভাব: হিজাব রক্ষা, নির্জনতা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে অনেক পরিবার নারীদের মসজিদে যেতে নিরুৎসাহিত করে। যৌক্তিকভাবে অনেক নারীরাও সংকোচবোধ করেন। নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণ সীমিত থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার অভাব। অনেক মসজিদে নারীদের জন্য আলাদা এবং নিরাপদ প্রবেশদ্বার, পর্যাপ্ত আলাদা প্রার্থনার স্থান বা পর্যাপ্ত গোপনীয়তা নেই। এর ফলে নারীরা মসজিদে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি অনুভব করেন। বিশেষ করে রাতের নামাজ বা জুমার সময়, নিরাপত্তার অভাব ও অনিরাপদ পরিবেশ নারীদের মসজিদে নিয়মিত অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়াও, সামাজিক নজরদারি বা অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিকোণও নারীদের স্বাচ্ছন্দ্যহীন করে তোলে। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার অভাব কেবল শারীরিক সুরক্ষা নয়, বরং নারীর মানসিক স্বস্তি এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকেও প্রভাবিত করে, ফলে তারা প্রায়ই ঘরে নামাজ আদায়কেই প্রাধান্য দেয়।[৬৮৫]

৫. পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা: অনেক পুরুষ মনে করেন মসজিদ তাদের একচেটিয়া জায়গা। নারীদের উপস্থিতিকে অনভিপ্রেত মনে করেন। এই মানসিকতা মসজিদ কমিটি ও ধর্মীয় নেতৃত্বে প্রতিফলিত হয়। নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণ সীমিত থাকার পেছনে একটি গভীর সামাজিক কারণ হলো পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। বাংলাদেশের সমাজে এখনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে মসজিদকে, পুরুষের একচেটিয়া ইবাদতের স্থান হিসেবে ধরা হয়। অনেক পুরুষ মনে করেন মসজিদে নারীদের উপস্থিতি অপ্রয়োজনীয় বা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। এই মানসিকতা কেবল ধর্মীয় শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা থেকেই নয়, বরং দীর্ঘদিনের সামাজিক অভ্যাস ও পুরুষ-আধিপত্যমূলক সংস্কৃতি থেকেও জন্ম নিয়েছে। ফলে নারীরা মসজিদে গেলে প্রায়ই সন্দেহ, সমালোচনা বা অবমূল্যায়নের শিকার হন।[৬৮৬] পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে মসজিদ একটি সর্বজনীন ইবাদতের স্থান না হয়ে বরং পুরুষকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে।

৬. ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা: মসজিদের ইমাম ও খতিবরা প্রায়ই নারীদের ঘরে নামাজ পড়ার উপর জোর দেন, কিন্তু মসজিদে আসার সুযোগ তৈরির কথা বলেন না। এর ফলে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি আরও সংকুচিত হয়। বাংলাদেশে নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণ সীমিত থাকার পেছনে ধর্মীয় নেতাদের

---

৬৮৫ ফাহমিদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৬৮৬ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

ভূমিকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৬৮৭] অনেক সময় ইমাম, খতিব বা আলেমরা নারীদের মসজিদে আসা-যাওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন বা সীমিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তারা হাদীস ও ইসলামী শিক্ষার সেই অংশকে গুরুত্ব দেন যেখানে নারীর ঘরে নামাজ আদায়কে উত্তম বলা হয়েছে, অথচ অন্য দিকটি যেখানে নারীদের মসজিদে যেতে বাধা না দিতে বলা হয়েছে তা অবহেলিত থাকে। এর ফলে সাধারণ মানুষ মনে করেন যে নারীদের মসজিদে যাওয়া অনুচিত বা গুনাহের কাজ। আবার কিছু ধর্মীয় নেতা মসজিদের অবকাঠামোতে নারীদের জন্য আলাদা ও নিরাপদ স্থান তৈরির উদ্যোগ নেন না, যা নারীদের অংশগ্রহণ আরও সীমিত করে। তবে ইতিবাচক দিক হলো, কিছু প্রগতিশীল আলেম ও গবেষকরা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মসজিদকে সমানভাবে উন্মুক্ত করার কথা বলছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় নেতাদের ঐক্যবদ্ধ ও ইতিবাচক ভূমিকার অভাব নারীদের অংশগ্রহণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে।

৭. নারীদের আত্মবিশ্বাসের অভাব: দীর্ঘকাল নারীরা মসজিদ থেকে দূরে থাকার ফলে তাদের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানভীতি গড়ে উঠেছে। তারা মসজিদে যেতে সংকোচ বোধ করেন। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক: অধিকাংশ মসজিদেই নারীদের জন্য নির্দিষ্ট নামাজঘর আছে। সৌদি আরব ও আরব আমিরাত: ইসলামের জন্মভূমিতেই নারী ও পুরুষ উভয়ের মসজিদে অংশগ্রহণ অনুমোদিত।[৬৮৮] বাংলাদেশ: সামাজিক মানসিকতা ও ধর্মীয় বিভ্রান্তির কারণে নারীদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে।বাংলাদেশে নারীদের মসজিদে অংশগ্রহণের বিষয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য: BRAC-এর ২০১৮ সালের একটি গবেষণা অনুযায়ী:

ঢাকা শহরের ৩০টির মধ্যে মাত্র ৫টি মসজিদে নারীদের জন্য আলাদা নামাজঘর ছিল। ৯০% নারী মসজিদে কখনও নামাজ আদায় করেননি, এমনকি ঈদের দিনেও না। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের (২০১৯) জরিপ অনুযায়ী: ৭২% নারী মনে করেন, মসজিদে যাওয়ার কোনো বাস্তব সুযোগ বা পরিক-ঠামো নেই। ৬৫% নারী বলেছেন, পরিবার বা সমাজের নেতিবাচক মনোভাব তাদের রুখে দেয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী: বাংলাদেশের প্রায় ২.৫ লাখ মসজিদের মধ্যে ১% এরও কম মসজিদে নারীদের নামাজের আলাদা স্থান রয়েছে।

---

৬৮৭ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, অনু.আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী,ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৬,পৃ.৯০

৬৮৮ ফাহমিদ-উর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৫. সঠিক ইসলামী জ্ঞানের ঘাটতি

বাংলার মুসলিম মানসে ধর্মীয় চেতনা ও গবেষণা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে তিনি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেছিলেন। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব পৃথিবীতে মোটেই কম নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেকগুণ বেশি। শিক্ষা ইসলামের প্রাথমিক মৌলিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। আদি শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তাই ফেরেশতারা বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি পবিত্র! আপনি যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই; নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।'[৬৮৯]

যে শিক্ষা মানুষের কল্যাণে উপকারে আসে না, তা শিক্ষা নয়। যে শিক্ষা দুনিয়ার শান্তি ও পরকালে মুক্তির সহায়ক, তাই প্রকৃত শিক্ষা। ইসলামি শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানবকল্যাণ, ত্যাগ ও বিনয়। যদি কোনো শিক্ষা হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অহংকার উদ্রেক করে, সে শিক্ষা মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন এবং আদর্শ গুণাবলিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৫.১ ইসলামী জ্ঞানের ক্রমশ হ্রাস

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতা ঈমান আকীদা আমল ইত্যাদি বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা। যদিও ধর্ম শিক্ষা নামে মাত্র দেয়া হয় তাও সঠিক নয় ভ্রান্ত দিনে দিনে ইসলামী শিক্ষার ক্রমশ হ্রাসই হচ্ছে।[৬৯০] যার ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি হচ্ছে। মনুষ্যত্ববোধ কমে যাচ্ছে। নীতি নৈতিকতা বলতে সমাজে কিছু থাকছে না।[৬৯১] এছাড়াও প্রচলিত শিক্ষার ফলে প্রযুক্তি অপব্যবহার বাড়ছে, প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় হচ্ছে, সামাজিক অসচেতনতা, অনৈতিক ভাবে ধনবান, যুব সমাজের অবক্ষয় ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার লাভ করছে। মনুষত্বের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষ নামের প্রকৃত স্বার্থকতা আয় মনুষত্বের বিকল্প সাধনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষা। তাই একটি জাতির উথান-পতনের অনেকটাই নির্ভর করে সেই জাতির শিক্ষাব্যবস্থার উপর। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি পূর্ণভাবে জাতির মধ্যে মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে তাবেই সম্ভব একটি আদর্শ জাতি তথা আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা কিন্তু আজ অন্যায় অনাচার, অনৈতিকতার সয়লাবে ভেসে যাওয়া এই সমাজের চিত্র এ কথা আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রচালিত বস্তুগত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব সত্ত্বার দুটি দিকের একটি অর্থাৎ জৈবিক সত্ত্বাকে উন্নত

---

৬৮৯ (قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ), আল-কুর'আন, ২:৩২

৬৯০ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৬৯১ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭

করতে পারলেও মানব সত্ত্বার মূল যে নৈতিক সত্ত্বার চরম উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের উন্নয়ন, এই কাজটি করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। দ্বীন ইসলামকে সমুন্নত রাখা : দ্বীনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা সমুন্নত ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইসলাম শিক্ষা অপরিহার্য। ইসলাম শিক্ষা ছাড়া দ্বীনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবন সম্ভব নয়। দ্বীন প্রচার প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবনের দায়িত্ব তার উম্মতের। আর এ দায়িত্ব পালন করার জন্য ইসলাম শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানীরাই হচ্ছেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। তবে নবীগণ তো ধন-দৌলতের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাননি বরং উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন ইলম বা ইসলাম শিক্ষা, যে ব্যক্তিই তা গ্রহণ করল, সেই একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পদ প্রাপ্ত হলো।

৫.২ শিক্ষকের মান ও প্রশিক্ষণের অভাব

বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক সংকট ও তাদের মানগত দুর্বলতা একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। অনেক মাদ্রাসায় শিক্ষকগণ শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়ে পারদর্শী হলেও আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের মনোবিজ্ঞান, এবং বহুমাত্রিক দক্ষতার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত। অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত পেশাগত উন্নয়ন বা প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকায় তারা নতুন শিক্ষণ প্রযুক্তি, আধুনিক পাঠদানের কৌশল ও গবেষণামূলক শিক্ষাদানের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হন না। এ কারণে শিক্ষাদানের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল ও সৃজনশীল দক্ষতা গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া কম বেতন ও সামাজিক মর্যাদার অভাবের কারণে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক আকৃষ্ট করাও কঠিন হয়, যার ফলে শিক্ষকের ঘাটতি তৈরি হয় এবং শিক্ষার মান ধীরে ধীরে অবনতি ঘটে। শিক্ষক উন্নয়নে প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা, স্টাডি গ্রুপ, এবং সরকার ও বেসরকারি পর্যায়ের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। মাদ্রাসায় কর্মরত অনেক শিক্ষক নিজেরাই প্রশিক্ষণহীন। তারা পঠন-পাঠনের আধুনিক কৌশল জানেন না। কোথাও কোনো নিয়মিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই, ফলে নতুন জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের সুযোগ সীমিত। শিক্ষার মান বাড়ে না, বরং পিছিয়ে পড়ে।[৬৯২] বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেয়। অনেক মাদ্রাসার শিক্ষক প্রফেশনাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, ফলে শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রায়শই প্রাচীন বা অনিয়মিত হয়ে থাকে। আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, ক্লাস ম্যানেজমেন্ট এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার ঘাটতি থাকে। সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিলেও তা সল্প পরিসরে এবং নির্বাচিত মাদ্রাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যার কারণে দেশের সব শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় না।[৬৯৩] ফলে শিক্ষার্থীরা শুধু ধর্মীয় জ্ঞানই সীমিতভাবে পায়, নতুন

---

৬৯২ মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. প্রাগুক্ত,পৃ.৪৫

৬৯৩ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৬

শিক্ষণ কৌশল ও সমসাময়িক বিষয় শেখার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের এই অভাব মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

৫.৩ ব্যক্তিগত অধ্যবসায়ের অভাব

সঠিক ইসলামী জ্ঞানের ঘাটতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ব্যক্তিগত অধ্যবসায়ের অভাব। অনেক মুসলমান ইসলামী জ্ঞান অর্জনকে শুধু আলেমদের দায়িত্ব মনে করেন এবং নিজেরা কোরআন-হাদিস অধ্যয়ন বা বুঝার চেষ্টাও করেন না। এর ফলে ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সীমিত, ভাসাভাসা বা প্রচলিত সংস্কার নির্ভর হয়ে পড়ে। এমনকি অনেক সময় ভুল তথ্য বা অপব্যাখ্যাকে তারা সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন। ব্যক্তি যখন নিজ উদ্যোগে কুরআনের মূল বক্তব্য, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনী, এবং সাহাবাদের শিক্ষা থেকে দূরে থাকে, তখন তার মধ্যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা উপলব্ধি করার সক্ষমতা তৈরি হয় না। এই অভাব তাকে দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণে বাধাগ্রস্ত করে এবং অন্ধ বিশ্বাস বা গোঁড়ামির দিকে ঠেলে দেয়। অথচ ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান অন্বেষণকে উৎসাহিত করেছে - "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর ফরজ" (হাদিস)। তাই ইসলামী জ্ঞানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও গভীর মনোযোগ অত্যন্ত জরুরি, যাতে একজন মুসলিম প্রকৃত ইসলামকে উপলব্ধি করে আত্মশুদ্ধি ও সমাজকল্যাণে অবদান রাখতে পারে।

৫.৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিকল্পনা, জনসম্পৃক্ততা ও আধুনিকায়নের অভাব

ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের ইসলামি শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ইসলামী সভা, সেমিনার, হালাকা ও তাফসীর কার্যক্রম পরিচালনায় এখনও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি রয়ে গেছে। প্রথমত, এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন অনেক সময় কেবল নির্দিষ্ট দিবস বা উপলক্ষে সীমাবদ্ধ থাকে, ফলে তা ধারাবাহিক শিক্ষার রূপ নিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সেমিনার বা তাফসীর মাহফিলে যে ভাষা ও উপস্থাপন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা অনেক সময় সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়, কিংবা তরুণদের জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠে না। তৃতীয়ত, আলোচনার বিষয়বস্তু অনেক সময় যুগোপযোগী ও সমসাময়িক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, ফলে মানুষের বাস্তব জীবনে তা প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ, অনলাইন হালাকা বা ভার্চুয়াল সেমিনারের উদ্যোগও এখনও পর্যাপ্ত নয়, যার ফলে শহরের বাইরে বা তরুণ প্রজন্মের মাঝে এই কার্যক্রমের প্রভাব সীমিত থেকে যায়। সব মিলিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এসব বিভাগে পরিকল্পনা, জনসম্পৃক্ততা ও আধুনিকায়নের অভাব

ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এসব ঘাটতি আরও গভীরতর হতে পারে।

ক. পরিকল্পনার অভাব

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে পরিকল্পনার অভাব একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। বেশিরভাগ প্রকল্প ও প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত হলেও দীর্ঘমেয়াদী ও সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব থাকায় স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না। ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা এবং ইসলামী নৈতিকতার প্রচারণার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রায়শই স্বতঃসিদ্ধ বা অপ্রতিসংগত প্রকল্প চালু হয়, যার ফলে প্রকৃত প্রভাব কমে যায়। এছাড়াও কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অভাব থাকায় পরিকল্পনা সংশোধন ও উন্নয়নও কঠিন হয়ে পড়ে।[৬৯৪] ফলস্বরূপ, ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টা অনেক সময় আংশিক বা সীমিতভাবে সফল হয়।

খ. জনসম্পৃক্ততার ঘাটতি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততার ঘাটতি একটি সুস্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা। সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চল, নারী ও যুবসমাজ, প্রায়শই কার্যক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয় না। এর ফলে ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রচারণা প্রায়শই সীমিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি, ওয়ার্কশপ বা ইন্টারেক্টিভ প্রোগ্রামের অভাব জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়। জনসম্পৃক্ততার অভাব ফাউন্ডেশনের প্রকল্পগুলোর প্রভাবকে কমিয়ে দেয় এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে ইসলামী মূল্যবোধ ছড়াতে বাধা সৃষ্টি করে।

গ. আধুনিকায়নের অভাব

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে আধুনিকায়নের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মাধ্যম ধর্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা ছড়ানোর ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু ফাউন্ডেশন এই ক্ষেত্রগুলোতে যথেষ্টভাবে উন্নত নয়। অনলাইন শিক্ষা, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার এবং তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টা সীমিত। এছাড়া, গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার না করা কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা কমিয়ে দেয়। তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করতে এবং ইসলামী কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এখনও পর্যাপ্ত নয়। এছাড়াও প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত সমাধান ও সফটওয়্যার ব্যবহারের অভাবও লক্ষ্য করা যায়, যা কার্যক্রমের সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নকে দুর্বল করে। ফলে, আধুনিকায়নের অভাবে

---

৬৯৪ মালিক বিন নাবী, *মুশকিলাহ আস-সাকাফাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টা প্রায়ই সীমিত ও আংশিকভাবে ফলপ্রসূ হয় এবং দেশের ইসলামিক কার্যক্রমের প্রসার ধীর হয়ে যায়।

৬. ইসলামি ব্যাংকিং এবং বীমায় সমস্যা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মুসলিম এবং ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে মূলত মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস অনেকাংশেই প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকে। অথচ এখন পর্যন্ত এখানে কোনো ইসলামী ব্যাংকিং আইন বা নীতিমালা তৈরি হয়নি।[৬৯৫] অথচ মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার আলাদা আইন ও নীতিমালা লক্ষ করা যায়। স্বাতন্ত্রিক নীতিমালা না থাকলে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ, তারল্য সংকটের সম্ভাবনাসহ জনআমানতের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্বাতন্ত্রিক আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের দৃষ্টি দেয়া দরকার। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রহণ ও করণের ক্ষেত্রে সুকুকসহ বিভিন্ন ইসলামী আর্থিক খাতগুলো ভূমিকা পালন করলেও বাংলাদেশের আর্থিক খাতের জন্য এটি একেবারেই নতুন ক্ষেত্র।[৬৯৬] এখানে এখনো মৌলিক অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। তাই তড়িঘড়ি করে সুকুক বাস্তবায়ন না করে আরো সময় নিয়ে আইনি, বিশেষজ্ঞ লোকবল, বাজার যাচাই ও গ্রাহককেন্দ্রিক দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করার প্রয়োজন ছিল।[৬৯৭] তবে যেহেতু এরই মধ্যে সুকুক বাস্তবায়ন অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে এর সুফল যাতে সাধারণ মানুষও ভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা করে দেয়া অর্থ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর অন্যতম দায়িত্ব। এককভাবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে এর পুরো নিয়ন্ত্রণ ও সুফল ভোগ করতে না পারে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তারল্য সংকটের অন্যতম কারণ হচ্ছে খেলাপি ঋণ। ঋণ দেয়ার আগে ঋণগ্রহীতার যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে যাচাই-বাছাই না করা ও আইনি কাঠামোকে গুরুত্ব না দিয়ে ঋণ দিলে সে ঋণ উচ্চমাত্রার ঝুঁকিতে পড়ে যায়। যেটি এরই মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমগুলোয় উঠে এসেছে। তাই তারল্য সংকটের ঝুঁকি পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনাকেই নিরাপত্তাহীন করে তোলে। কারণ তারল্য সংকটের কারণে গ্রাহকের মনে যদি তার আমানত ফেরত পাওয়া বা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রতি আস্থার সংকট দেখা দেয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই গ্রাহক তার আমানত তুলে নেবে, যা ব্যাংককে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি বা দেউলিয়াত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অন্তত ব্যাংক খাতের এ জাতীয় যেকোনো অনিয়মকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে এ তারল্য সংকটসহ আরো অন্যান্য ব্যাংকিং অনিয়মের পেছনে দুর্বল শরিয়া বোর্ড, ব্যাংক কর্তৃপক্ষের শরিয়া আইনের প্রতি

---

৬৯৫ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামের অর্থদর্শন ও বন্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা: পাথেয় পাবলিকেশন, ১৯৭১ খ্রি., পৃ. ১০৩

৬৯৬ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামের যাকাত বিধান-দ্বিতীয় খণ্ড*, খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ৬৭

৬৯৭ মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, অনু: মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৫৯

অনীহাও অনেকাংশে কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গভীর শরিয়া জ্ঞান রাখেন এমন গ্রহণযোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ স্বাধীন শরিয়া বোর্ড থাকলে সেখানে অনিয়মের মাত্রা অনেকাংশেই কমে আসবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশে ইসলামী অর্থবাজারের অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করতে পারে না। এই তহবিল ব্যবহার করা যায় না বলে আয়ের বদলে তা অলস ফেলে রাখতে হয়। কারণ, বাংলাদেশে সরকারি ট্রেজারি বিল, অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিল সব কিছুই সুদ উৎপাদক। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট বন্ড' চালু করে । ইসলামী ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে।

৬.১ আমানত হারাচ্ছে ইসলামী ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, গত ডিসেম্বরে ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৮৪ হাজার ১৩৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৩০৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাসের ব্যবধানে আমানত কমেছে ৮ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা। অথচ একই সময়ে এসব ব্যাংকের ঋণ বেড়েছে ৩ হাজার ৬৪২ কোটি টাকা। গত ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলোর ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ৪৫ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা। জানুয়ারিতে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৭৩ কোটি টাকা।[৬৯৮]

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ইসলামি ব্যাংকগুলোর আমানত কমলেও প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলোর আমানত বেড়েছে ২ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা। ডিসেম্বরে প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলোতে আমানতের পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ১১৮ কোটি টাকা। জানুয়ারিতে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ২৭০ কোটি টাকা। যদিও একই সময়ে এসব ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডোগুলোতে আমানত কমেছে ১ হাজার ৮১৬ কোটি টাকা।

সবমিলিয়ে গত জানুয়ারি শেষে ব্যাংক খাতে ইসলামি ধারার ব্যাংকিংয়ে (ইসলামি ধারার সব ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোসহ) মোট আমানতের পরিমাণ ৪ লাখ ১৩ হাজার ৯৬৯ কোটি টাকা। আগের মাস ডিসেম্বরে আমানত ছিল ৪ লাখ ২২ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাসের ব্যবধানে ইসলামি ধারার ব্যাংকিংয়ে আমানত কমেছে ৮ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা।

---

৬৯৮ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই আমানতের হিসেবেও গরমিল পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, গত ডিসেম্বরের তুলনায় ইসলামি ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখায় মোট আমানত দুই শতাংশ বা আট হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা কমে গত জানুয়ারিতে চার লাখ ১৩ হাজার ৯৬৯ কোটি টাকা হয়। দেশের ১০ ইসলামি ব্যাংকের আমানত সবচেয়ে বেশি কমেছে। গত জানুয়ারিতে এসব ব্যাংকের আমানত কমেছে আট হাজার ৮৩২ কোটি টাকা। তবে একই সময়ে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখায় আমানত বেড়েছে দুই হাজার ১৫৩ কোটি টাকা। ব্যাংক খাতে আস্থা ফেরাতে এবং দুর্বল ব্যাংককে টেনে তুলতে ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে গ্রাহকদের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে আমানত হারাতে শুরু করেছে কিছু ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত ডিসেম্বরে ব্যাংক মার্জারের (একীভূতকরণ) আলোচনা শুরু হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিশেষায়িত, বিদেশি ও ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলোর আমানত কমতে শুরু করেছে। ফলে শুরু হয়েছে তারল্য সংকট। এই তারল্য সংকটের কারণে ব্যাংকের নিয়মিত গ্রাহকগণ আমানত, লেনদেন বা বৈদেশিক রেমিট্যন্স নিয়ে বেশ দ্বিধায় ভুগছেন। এদেশের অধিকাংশ চাকুরীজীবী ধর্মভীরু মানুষ শেষ জীবনে পেনশনের টাকা ফিক্সড করে রাখে মুনাফা দিয়ে সুংসার চালানোর জন্য। কারণ এই বয়সে তাদের পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের ঝুঁকি বহন করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশের ইসলামী ধারার ব্যাংকের জন্য আলাদা কোন নীতিমালা বা রাষ্ট্রীয় আইন নেই। সাধারণ ব্যাংকের নীতিমালায় শরীয়াহ বোর্ডের মাধ্যমে এসব ব্যাংক চলে। কিন্তু বর্তমানে এসব ব্যাংকের চলছে তারল্য সংকট। এই সংকটে তাদের একমাত্র ভরসার জায়গা হলো বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চললে সেটা তো সুদের চক্রেই প্রবেশ করা হল। দেশে আলাদা ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী।

৬.২ ইসলামী বীমায় আস্থাহীনতা

বাংলাদেশে ১৯৯৯ সাল থেকে প্রথমবার ইসলামী বীমার কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশে পূর্ণ ও উইন্ডোসহ মোট বীমা কোম্পানির সংখ্যা ৭৬। তার মধ্যে ইসলামী বীমার সংখ্যা ২৬টি। তিনটি নন-লাইফ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা কোম্পানি, আটটি লাইফ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা কোম্পানি ও ১৫টি লাইফ ইসলামী বীমা উইং ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করছে।[৬৯৯]

১৯৩৮ সালের বীমা আইন, ১৯৫৮ সালের বীমা বিধিমালা ও ১৯৭৩ সালের বীমা করপোরেশন আইন দ্বারা বীমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এর একটিও ইসলামী বীমার জন্য করা হয়নি। ইসলামী বীমার অনেক নীতি ও পদ্ধতি এসব আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সর্বশেষ বীমা আইন, ২০১০-এর ১৮ মার্চে

---

৬৯৯ মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানী, *বীমা-তাকাফুল*, অনু. শাব্বীর আহমাদ, ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৫ খ্রি. পৃ. ৫১

একটি গেজেটের মাধ্যমে ইসলামী বীমা ব্যবসাকে শুধু অনুমোদন দেয়া হয়। তাতে বিস্তারিত কোনো নির্দেশনা নেই অথচ ইসলামী বীমাকে বাস্তব অর্থে ইসলামীকরণের জন্য স্বতন্ত্র আইনের বিশদ রূপরেখা ছাড়া সম্ভব নয়। এর আগ পর্যন্ত ১০ বছরের মতো কেবল মন্ত্রিসভার অনুমোদনে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালিত হয়েছে। আর নিবন্ধিত হতো ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট, ১৯৩৮-এর অধীনে।

আইডিআর এর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে যেসব কোম্পানি নামের সঙ্গে 'ইসলামি' শব্দ জুড়ে দিয়ে জীবনবিমা কোম্পানি পরিচালনা করছে । বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এমন অভিযোগের অন্ত নেই। এ জাতীয় কাজ ইসলামের নাম ভাঙিয়ে করা অবশ্যই অন্যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি বীমা কোম্পানিগুলো ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে যেসব সমস্যার মোকাবিলা করে, তার অন্যতম কয়েকটি হলো : পূর্ণ দুই বছরের আগে পলিসি সমর্পণে জমাকৃত টাকা ফেরত না পাওয়া, গ্রাহকের সমস্যার সমাধান দ্রুত না হওয়া, কোম্পানির ব্যবসার ভিত্তিতে শাখা খোলা ও বন্ধ করা, মৃত্যু দাবি বাতিল করা, মৃত্যুদাবি পেতে হয়রানি ও বিলম্ব, না জানিয়ে লিয়েন (বিশেষ আরোপিত শর্ত) ধার্যকরণ, তাবাররু (অনুদান) ফান্ড ও ঝুঁকির জন্য মাত্রাতিরিক্ত টাকা কাটা, গ্রাহকের তথ্য হালনাগাদ না থাকা, সারপ্লাস পদ্ধতিতে লভ্যাংশ প্রদান, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদারাবা বন্ডে বাধ্যতামূলক বিনিয়োগে লাভ কম দেওয়া, বীমা আইন ২০১০-এর উপবিধি তৈরি না হওয়া, বীমা বিক্রয়-বিপণনে অসত্য ও অনৈতিক কৌশল অবলম্বন, গ্রাহকের অসন্তুষ্টি ও জটিলতা, অতিরিক্ত উপরি ব্যয়, সমর্পণ মূল্য জমাকৃত প্রিমিয়ামের তুলনায় অতি সামান্য হওয়া, গ্রাহকের মুদারাবা ফান্ড থেকে এজেন্ট কমিশন দেওয়া, পলিসি চালু না থাকায় অতীতের জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ না দেওয়া, বোনাস ঘোষণা করে মেয়াদপূর্তি না হলে বোনাস না দেওয়া, প্রত্যেক বছর ঘোষিত বোনাস পরবর্তী বছরে মূলধন হিসেবে গণনা না করা, জমাকৃত টাকার ওপর লভ্যাংশ না দিয়ে পুরো বীমা অঙ্কের ওপর লভ্যাংশ প্রদান, ঊর্ধ্বতন কর্মীদের দ্বারা নিম্নস্তরের কর্মীদের কমিশন আত্মসাৎ, বীমা কর্মীদের ঘন ঘন কোম্পানি পরিবর্তন ও বীমা গ্রহীতাদের প্রতারিত করা।[৭০০]

একইসঙ্গে ইসলাম ও বীমা উভয় বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তির অভাব, ইসলামি বীমা উদ্ভাবনে ইজতিহাদ ও গবেষণার অভাব এবং এজেন্সি ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকাও বড় সমস্যা। উল্লিখিত ত্রুটিগুলোর প্রত্যেকটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদ থেকে শুরু করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইসলামি জ্ঞান ও আন্তরিকতার অভাবে এ জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৭. ইসলামী অর্থনৈতিক জ্ঞানের অভাব

---

৭০০ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানি, প্রাগুক্ত, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৩৪

জাতিসংঘের এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, চলমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি এক বছর আগের আনুমানিক ছয় শতাংশ থেকে কমে ৫.৬ শতাংশ হয়ে যেতে পারে। 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন অ্যান্ড প্রসপেক্টস (ডবি-উইএসপি) ২০২৪' শীর্ষক জাতিসংঘের ফ্ল্যাগশিপ অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে ২০২৫ অর্থবছরের জন্য ৫.৮ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক তাদের গত বছরের দৃষ্টিভঙ্গিতে (আউটলুক) ২০২৪ ও ২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জন্য একই প্রবৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করে। এতে মুদ্রাস্ফীতি সমাধানের জন্য আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সংস্কারের বিষয়টি সামনে এসেছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডবি-উইএফ) প্রকাশিত বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনার ঘাটতি না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ঝুঁকি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। কিছু উল্লেখ যোগ্য খাত হলো

৭.১ যাকাত ব্যাবস্থাপনায় ত্রুটি

ইসলাম যেমন মানুষের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, জীবন, ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার নিরাপত্তা বিধান করেছে, তেমনি আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তে যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। যদিও বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার অর্ধেকের নিচে নামিয়ে আনার পরিকল্পা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাস্তবে দারিদ্র্যের হার ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। অথচ যাকাতের বিধান সঠিকভাবে কার্যকর থাকলে দারিদ্রের হার কমিয়ে আনা সম্ভব। সূরা তাওবার ১০৩নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুহম্মদ (স.)-কে মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া উক্ত সূরার ৬০নং আয়াতে যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীর জন্য সুনির্দিষ্ট খাতও র্নিধারণ করা হয়েছে।

যাকাত প্রদান যে বাধ্যতামূলক ইবাদত এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের মুখ্য হাতিয়ার; এ ব্যাপারে জনগণের মাঝে স্বচ্ছ ধারণা নেই। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানায় যে যাকাত ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানে আল-কুরআন নির্দেশিত সকল খাতকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। এমনকি কোনো কোনো খাত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে যায়। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ফকির, মিসকিন ও ফি-সাবিলিল্লাহর নামে মাদরাসা, এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং ইত্যাদিতেই মূলত যাকাতের অর্থ প্রদান করা হয়।[৭০১]

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে এ যাবৎ সংগৃহীত টাকার ৫০% টাকা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন, দুঃস্থ পুরুষদের কর্মসংস্থান কার্যক্রম, যাকাত ভাতা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, নও-মুসলিম

৭০১ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামের যাকাত বিধান-দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৯

স্বাবলম্বীকরণ কার্যক্রম এবং দুঃস্থ-গরীব রোগীদের চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম খাতে জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে।[৭০২] যা সমস্যা অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়।

৭.২ মুদ্রাস্ফীতি,পণ্য গুদামজাতকরণ, ব্যবসায় অসাধুতা

ইসলামি বিজয়াভিযান শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম ভোগ-বিলাসের ক্ষতি সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারেন। ফলে, তারা একে অন্যকে এসব নিষিদ্ধ কাজে অনুৎসাহিত করতেন এবং ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করতেন। মূল্যস্ফীতির উল্লেখযোগ্য কারণ ভোগবাদী, দুর্নীতি, সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি, কালোবাজারি, মজুদদারি ও সিন্ডিকেট। যার প্রতিটিই ইসলামে নিষিদ্ধ। নীতির বিরুদ্ধে যে রীতি, সেটাই দুর্নীতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আটকে রাখা ও মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষা করা এবং মূল্য বেড়ে গেলে বাজারে ছাড়া ও অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'ইতহিকার' বলে।[৭০৩] রাসুল (স.) এ জাতীয় প্রহসনের প্রতি তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করে বলেন, 'যে ব্যবসায়ী পণ্য আবদ্ধ বা স্তূপ করে রাখে, সে গোনাহগার।'[৭০৪] রাসুল (স.) আরও বলেন, 'নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আবদ্ধকারী কতই না মন্দ! যদি পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমে যায়, তাহলে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। আর যদি মূল্য বেড়ে যায়, সে আনন্দিত হয়।'[৭০৫] আর বাংলাদেশে তো এটা ব্যবসায়ীদের নিয়মিত ঘটনা বিশেষ করে রমযানের আগে, আবার ঈদুল আযহা এর আগে। পরিকল্পিতভাবে জোটবদ্ধ হয়ে সিন্ডিকেট তৈরি করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়া এসব ব্যবসায়ীদের নিয়মিত ঘটনায় পরিনত হয়েছে।[৭০৬]

ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরবর্তীতে বেশি লাভে বিক্রি করার লোভে গুদামজাত করা বা বাজার থেকে সরিয়ে মিথ্যা সংকট তৈরী করা হারাম। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মদিনায় রাসূল (স.) ইসলামি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বনু কায়নুকার বাজারটির পরিচালনার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। এ বাজারটির বৈশিষ্ট্য ছিল-এখানে কোনো রকম ধোঁকা-প্রতারণা, ঠকবাজি, মাপে কম-বেশি করার বা পণ্যদ্রব্য মজুত অথবা গুদামজাত করে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি করে জনগণকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগই ছিল না। কারণ নিয়মিত নবী (স.) তা পরিদর্শন করতেন ও তদারকি করতেন। অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুত রাখা বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটা একটি ঘৃণ্য কাজ।

---

৭০২ ফরিদ উর রহমান, *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ৬৭

৭০৩ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামের অর্থদর্শন ও বন্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা: পাথেয় পাবলিকেশন, ১৯৭১ খ্রি., পৃ. ১০৩

৭০৪ (عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ **لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ**) মুসলিম ইবনে হজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, অনুবাদ: মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২, হাদীস নং ১৬০৫

৭০৫ (وَنِعْمَ الْمُحْتَكِرُ سُوءُ الْمُحْتَكِرِ، إِذَا رَخُصَ السِّعْرُ اغْتَمَّ، وَإِذَا غَلَا السِّعْرُ فَرِحَ),আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দারিমি, *সুনান আদ-দারিমি*, কিতাব: আল-বুইউ' (বিক্রয়-বাণিজ্য), باب كراهية الاحتكار (মজুদদারির প্রতি অপছন্দ), রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, হা. ১৩০৭

৭০৬ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামের অর্থদর্শন ও বন্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

ব্যবসা করাও একটি ইবাদত হবে যদি ব্যবসায়ী ভাইরা ব্যবসায় জুলুম, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, ঠকবাজি, মুনাফালাভের আশায় পণ্য গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারি এবং হারাম জিনিসের ব্যবসা থেকে বেঁচে থাকেন। আমাদের নবীজি (সা.)-ও ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। যাঁরা সৎভাবে ব্যবসা করেন, ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। চোরাকারবার যেমনভাবে দেশের অর্থনৈতিক ধ্বংস ডেকে আনে, কালোবাজারিও তেমনি সামাজিক অবক্ষয়ের গতি ত্বরান্বিত করে। এরই প্রতিবিধানের জন্য রাসুল (স.) মদিনায় হিজর নামে একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার কাজ ছিল ব্যবসায় অসাধুতা নিয়ন্ত্রণ করা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের পরিচালনায় নিয়ে আসা। খোলাফায়ে রাশেদিন (রা.) পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বহাল ছিল। তবে বাংলাদেশে দেখা যায় ব্যবসর অভিনব কৌশলে লোক ঠকানোর প্রতিযোগিতা। এখন আবার চলে অনলাইন ব্যবসা। এখানে তো লোক ঠকানো আরও সহজ। পণ্য দেখায় এক আর গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয় আরেক। কোন কোন ক্ষেত্রে রিটার্ন পলিসিও থাকেনা। অর্ডার করে গ্রাহক প্রতারিত হচ্ছে হরহামেশাই।

৮. প্রচলিত শির্ক, বিদআত এবং কুসংস্কার

ইসলাম এই ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পূর্বে এই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এই ভূখণ্ডও বহু ঈশ্বরবাদী আকীদার লালনভূমি ছিল। একত্ববাদকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সংস্কৃতি আবর্তিত হয়। এই ভূখণ্ডের যারা এই জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছিলেন, মূলতঃ তারা ছিলেন অন্য ধর্মাবলম্বী। নিষ্কলুষ একত্ববাদ কেন্দ্রিক ইসলাম এই ভূখণ্ডের জনসাধারণ যখন গ্রহণ করেছিলেন তখন তারা সরাসরি বহু ঈশ্বরবাদী দর্শনকে নিজেদের মন-মস্তিষ্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেললেও তাদের সমাজ-সামাজিকতা, আচার অনুষ্ঠান, কৃষ্টি-সভ্যতার সবকিছু বহু ঈশ্বরবাদী দর্শন মুক্ত হতে পারেনি।[৭০৭] পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ও হিমালয় উপমহাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত শির্কের প্রভাবও এ অঞ্চলের মুসলিম সংস্কৃতিতে লক্ষণীয়। এক দিকে চারিপার্শ্বে বহু ঈশ্বরবাদী শির্ক আকিদা বিশ্বাস প্রভাবিত আচার আচরণ, সমাজ সামাজিকতা, নিয়ম পদ্ধতি; অপরদিকে মুসলিম বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরাতন যুগ থেকে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের একটা বড় স্থান শির্ক দখল করে নিয়েছে। বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞানের স্বল্পতা, মানুষ হিসাবে স্বীয় মর্যাদার ব্যাপারে উদাসীনতা, পূর্ব পুরুষদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অন্ধ অনুকরণ, ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অতিরঞ্জন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল, ভ্রান্ত ধারণার প্রতি অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই শির্কের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। প্রচলিত অনেক রকমের শির্ক আর কুসংস্কারের মধ্যে কিছু

---

৭০৭ আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

হলো, তাবিজের ব্যবহার, মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, মাজার পূজা করা, পীরের মুরিদ হওয়া ও পীরকে সাজদা করা, কারও নামে মানত করা, শিশু সন্তানকে বদ নজর থেকে বাঁচাতে কাজলের টিপ দেওয়া,পাখী উড়িয়ে শুভ অশুভ নির্ধারণ করা, পীর দরবেশ, বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ী, উস্তাদকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কদমবুছি করা, সন্তানের আকিকার গোশত পিতা-মাতা খেতে পারে না, নবী করিম (স.)-এর নাম শুনলে হাতে চুম্বন খাওয়া, তদ্রুপ মক্কা-মদিনার ছবি দেখলে চুমো খাওয়া। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম না খাওয়া, কোরআন শরীফ হাত থেকে পড়ে গেলে আড়াই কেজি চাল 'সদকা' করতে হয়, না হলে মাথার চুল উঠে যায়,রাতে গাছের পাতা ছিঁড়া ও ফল তোলা না তোলা। গর্ভবতী নারীরজন্য কোনো কিছু কাটা-কাটি কিংবা জবাই করা নিষিদ্ধ, তাতে বাচ্চা ঠোঁট কাটা জন্ম নেয়। নারীদের হাতে বালা বা চুড়ি না পড়লে স্বামীর অমঙ্গল হয়। স্ত্রীর নাকে নাক ফুল পরিধান স্বামীর জন্য মঙ্গলজনক মনে করা। মৃতের বাড়িতে ৩ দিন পযন্ত মাছ-গোশত না খাওয়া, বাধ্যতামূলক নিরামিশ খাওয়া। কবরের খোদাইয়ের সময় প্রথম কোপের মাটি রেখে দেওয়া। মৃত ব্যক্তির রুহ ৪০ দিন পর্যন্ত গৃহে আসে, মৃত ব্যক্তির নামে আজমীর, খানকা, মাযার বা কবরের উদ্দেশ্যে মানত করে টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল ইত্যাদি পাঠানো, মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন পড়ার আয়োজন করা কিংবা মাইকে কুরআন তেলাওয়াত বাজানো ইত্যাদি।[৭০৮] এসব প্রচলিত কুসংস্কারের জন্যই আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস বহুলাংশে লোপ পায়। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের মানুষগুলোর এসব পালনের প্রবণতা আরও অনেক বেশি।

৯.অন্যান্য সমস্যা

কোন বিশেষ বা কয়েকটি বিষয়ে যে ইসলামী সংস্কৃতি বাধাগ্রস্ত হয় তা নয়। নানান বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি এ দেশের ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের পথে বাঁধা তৈরী করে। উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষতিকর প্রভাবের উল্লেখ করা হলো

৯.১ প্রযুক্তির অপব্যবহার

আধুনিক যুগে তথ্যপ্রযুক্তি ইসলামী জ্ঞান অর্জনের এক অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করলেও, এর অপব্যবহার সমাজে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাই-বাছাই না করে ইসলাম সম্পর্কে ভুল তথ্য, ভ্রান্ত ব্যাখ্যা কিংবা উগ্রবাদী মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।[৭০৯] ইউটিউব, ফেসবুক বা অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনেক ব্যক্তি নিজেকে আলেম দাবি করে চটকদার ও বিভাজনমূলক বক্তব্য দিয়ে ইসলামের প্রকৃত রূপকে আড়াল করে ফেলে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, যারা

---

৭০৮ কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার মুসলমানের কথা: শাশ্বত বঙ্গ*, ঢাকা: ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩খ্রি., পৃ.৯৬

৭০৯ ফরিদ উর রহমান, *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২১, পৃ. ৫৩

ইন্টারনেটে প্রচুর সময় ব্যয় করে, তারা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ না করে এসব ভিত্তিহীন বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এতে করে সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পরিবর্তে ভুলধারণা ও চরমপন্থার ঝুঁকি বাড়ে। অথচ প্রযুক্তি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হলে তা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক বিশুদ্ধ জ্ঞান সহজলভ্য করতে পারে। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা, নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে জ্ঞান গ্রহণ এবং ভুল তথ্য যাচাই করার মানসিকতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাপনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। তবে বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, ইসলাম চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় এবং এর বিধানও অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহার ইসলাম সঠিকভাবে পালনের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। প্রযুক্তির অন্যতম উপাদান হ'ল মোবাইল যা মানুষের মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্বকে জয় করেছে। কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে এখন কথা বলার চেয়ে অপসংস্কৃতির প্রচার, ব্লাকমেইলিং, অশ্লীল কার্যকলাপ যেন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যে স্মার্ট ফোন ব্যক্তিকে স্মার্ট করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারত, তা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম উপকরণ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগের চেয়ে নারী-পুরুষের অবৈধ যোগাযোগ, নারী-পুরুষের আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যা আমাদের সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরানিবত করছে। অথচ অশ্লীলতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'[৭১০] ইন্টারনেট প্রযুক্তি বিশ্বকে একই নেটওয়ার্কের মধ্যে এনেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কিশোররাও সহজেই পর্ণোগ্রাফীতে নিমজ্জিত হচ্ছে। এর খারাপ প্রভাব পড়ছে কিশোরদের মন-মগজে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অশ্লীল অডিও, ভিডিও প্রচারের ফলে অশ্লীলতার ব্যাপক ছড়াছড়ি হচ্ছে। ফলে নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, ইভটিজিং, এসিড সন্ত্রাস, হত্যা-গুম ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও রেডিও, প্রিন্ট মিডিয়া , টেলিভিশন সহ প্রতিটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রেরই ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। নৈতিক স্খলনের পাশাপাশি আছে সময়ের অপচয়, শারিরীক ও মানসিক অসুস্থতা, সামাজিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ইত্যাদি।

৯.২ ভ্রান্ত ধর্মীয় তথ্য প্রচার

বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের একটি প্রধান দিক হলো ভ্রান্ত ধর্মীয় তথ্যের প্রচার। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেমন ইউটিউব, ফেসবুক, টিকটক এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনেক ব্যক্তি বা

---

৭১০ (اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ), আল- কুর'আন,২৪: ১৯

গোষ্ঠী অজ্ঞতা বা স্বার্থান্বেষী কারণে কোরআন, হাদিস ও ইসলামের বিভিন্ন বিধানের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করছে। যাচাই-বাছাইহীন এসব তথ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম সহজেই এই ধরনের কনটেন্টের শিকার হচ্ছে, যা তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের মৌলিক ভিত্তিকে দুর্বল করছে।[৭১১]

ফলে, ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার সঠিক ধারার বিকাশে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

৯.৩ ইসলামবিরোধী কনটেন্টের প্রসার

বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের আরও একটি সমস্যা হলো ইসলামবিরোধী কনটেন্টের প্রসার। সামাজিক মাধ্যম, ব্লগ, ফোরাম এবং ভিডিও প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা, ছবি বা ভিডিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের কনটেন্ট ধর্মনিন্দামূলক বা উগ্র ভঙ্গিতে হতে পারে, যা সাধারণ মানুষ বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে ধর্মীয় অনাগ্রহ, বিভ্রান্তি এবং সন্দেহ সৃষ্টি করে। অনেকে এসব কনটেন্ট দেখে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করে, যা বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করছে।

৯.৪ ভণ্ড পীর ও ভ্রান্তপন্থার প্রচার

বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে ভণ্ড পীর ও ভ্রান্তপন্থার প্রচার একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভণ্ড বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পীর হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে অসচেতন মানুষদের ভ্রান্ত দাওয়াত দিচ্ছে।[৭১২] একই সঙ্গে ভ্রান্তপন্থী গোষ্ঠী ধর্মীয় আবেগকে প্ররোচিত করে অপ্রয়োজনীয় বিভাজন এবং সহিংসতার প্রসার ঘটাচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি, ভয় এবং অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের সরল ও শান্তিপূর্ণ সংস্কৃতির বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৯.৫ ইসলামী সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ

বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে ইসলামী সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনলাইন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে কোরআন তিলাওয়াত, নাশিদ, ওয়াজ-মাহফিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে শুধু ভিউ, লাইক বা অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হচ্ছে।[৭১৩] এতে ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষা প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে বিনোদনমূলক শিল্প বা ব্যবসায়

---

৭১১ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), *ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস*, অনু : আম্মার আবদুল্লাহ, অর্পণ প্রকাশন, ২০২০, পৃষ্ঠা. ৮৬

৭১২ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৭১৩ ফরিদ উর রহমান, *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

রূপান্তরিত হচ্ছে। এর ফলে ইসলামী সংস্কৃতির পবিত্রতা ও আন্তরিকতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুধাবনের গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে।

৯.৬ সময়ের অপচয় ও বিনোদননির্ভরতা

বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের একটি সমস্যা হলো সময়ের অপচয় ও বিনোদননির্ভরতা। তরুণ প্রজন্মের অনেকেই ইসলাম শেখার পরিবর্তে সোশ্যাল মিডিয়া, গেমস, ভিডিও এবং বিনোদনমূলক কনটেন্টে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করছে। এর ফলে তাদের ধর্মীয় জ্ঞান, নৈতিক শিক্ষা এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে।[৭১৪] প্রযুক্তি যদিও শিক্ষার উপকরণ হতে পারত, কিন্তু এর অযথাযথ ব্যবহার ইসলামী মূল্যবোধ ও সময় ব্যবস্থাপনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

৯.৭ হালাল-হারামের সীমা অমান্য

বাংলাদেশে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে হালাল-হারামের সীমা অমান্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনলাইন ও মিডিয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শিক্ষা বা নাশিদ উপস্থাপন করার সময় নারী-পুরুষের অনৈতিক মেলামেশা, অযাচিত নৃত্য-গান বা অভিনয়ের মাধ্যমে ইসলামের সরলতা ও পবিত্রতার ধারণা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের নৈতিক ও আচার-ব্যবহারের সঠিক ধারণা বিকৃত হচ্ছে এবং ইসলামী সংস্কৃতির শুদ্ধতা হ্রাস পাচ্ছে।

৯.৮ ইসলামী সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা

ইসলামী সংস্কৃতি মূলত কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের জীবনের মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, শিল্প, সাহিত্য, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস এবং সামাজিক রীতিনীতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বিস্তৃত জীবনব্যবস্থা। কিন্তু আজকের সমাজে এই সংস্কৃতিকে ঘিরে ব্যাপক অপব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই ইসলামী সংস্কৃতিকে কেবল কয়েকটি বাহ্যিক আচরণ, যেমন পোশাক বা দাড়ি-টুপি ব্যবহারে সীমিত করে ফেলে, অথচ এর নৈতিকতা, জ্ঞান, শিল্প, ও মানবিক দিকসমূহ অবহেলিত থেকে যায়।[৭১৫] আবার কেউ কেউ ইসলামের নামে সংস্কারবিরোধী, কঠোর, কিংবা সংকীর্ণ চিন্তাধারাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে প্রচার করে, যা ইসলামকে একটি জড় ও রূঢ় ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে। এর ফলে তরুণ সমাজ ইসলামের সৌন্দর্য, ভারসাম্য ও প্রাণবন্ত দিকগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অন্যদিকে, পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ ও মিডিয়ার নেতিবাচক প্রচারণাও ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত রূপকে আড়াল করে দেয়। এ ধরনের অপব্যাখ্যা শুধু ইসলামের ভাবমূর্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং সমাজে বিভ্রান্তি, গোঁড়ামি ও চরমপন্থার ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে। তাই ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার, প্রামাণ্য এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা সময়ের দাবি। মহানবী

---

৭১৪ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৭১৫ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩

হযরত মুহাম্মাদ (স.) যখন ইসলাম প্রচার করেছেন তখন অবিশ্বাসীরা নানা ভাবে তাঁকে নির্যাতন করেছেন। তিনি কখনো কাউকে অভিশাপ দেননি, কটু কথা বলেননি, বদদোয়া করেননি, তাদের ক্ষতি কামনা করেননি। পরবর্তীতে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি লড়াই করেছেন, জিহাদের ডাক দিয়েছেন।[৭১৬] কিন্তু বাংলাদেশের একদল সুবিধাদবাদী রাজনীতিবিদ নিজেদের প্রয়োজনে মনগড়া প্রচার -প্রচারণা চালায়। এমন এক রূপ হল জঙ্গিবাদী, মৌলবাদী , চরমপন্থী ইত্যাদি।[৭১৭] তারা জাতির ভালো মন্দের কথা বিবেচনা না করে সহিংসতা, বিদ্রুপাত্মক আচরণ, নানান কেলেঙ্কারি, ভুল বক্তব্য প্রদান, হাস্য রসাত্মক ভাবে ইসলামী বক্তব্য উপস্থাপনের মতো অনেক ঘটনা রয়েছে। ইসলামে পরনিন্দা, পরচর্চা, অহেতুক সমালোচনা ও অনর্থক তিরস্কার যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি সমাজ-সংস্কৃতি, গণমানুষের স্বার্থ, সর্বজনীন নীতিনৈতিকতা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সমালোচনাও অনুমোদিত। তাই কোন অপব্যাখ্যা বা ভুল ব্যাখ্যা প্রদানকারীকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা উচিত। ইসলামী সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা বর্তমানে সমাজে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়।[৭১৮] কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বিকৃতভাবে শুধুমাত্র কঠোর বিধি, শাস্তি বা নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা ধর্মের আসল উদ্দেশ্য নিরাপত্তা, ন্যায় ও মানবকল্যাণকে হ্রাস করে। নারীর অধিকার ও সামাজিক অংশগ্রহণকে সীমিত করার চেষ্টা বা ইসলামী ব্যবসায়িক নীতি বিকৃতভাবে অর্থলাভের নামে প্রয়োগও এর মধ্যে পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামের জ্ঞান ও চিন্তাশীল অধ্যয়নকে বাদ দিয়ে কেবল আংশিক বা রিটেন জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া, এবং শিল্প, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা, ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত রূপকে ক্ষুণ্ন করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক নীতিকে ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার, সামাজিক বৈষম্য বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি, এবং কুসংস্কার ও অতিরিক্ত পূজা-পদ্ধতির প্রচার সবই ইসলামী সংস্কৃতির অপব্যাখ্যার উদাহরণ। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ও মিডিয়ার মাধ্যমে ভুল তথ্য ও বিকৃত ব্যাখ্যা ছড়িয়ে দেওয়াও এ সমস্যা আরও বৃদ্ধি করছে। ফলে, সমাজে ইসলামের আসল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ বোঝার ক্ষেত্রে গুরুতর ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

৯.৯ বিভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ

সাধারণত দেশভেদে সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র রূপ থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এক্ষেত্রে যদি বাংলাদেশের কথা বলা হয় তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় ভারতীয় সংস্কৃতি বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রভাব সৃষ্টি

---

৭১৬ মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., *ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৭১৭ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪

৭১৮ ফরিদ উর রহমান, *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির রয়েছে একটি মৌলিক ধারাবাহিকতা। সেটা হলো মানুষকে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন বিশেষ কয়েকটি ধাপ ও পর্যায়ের মাধ্যমে। দুনিয়ার জীবনটি তাই মানবজাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানকার কর্মের উপরেই পরকালে ভালো থাকা না থাকা নির্ভরশীল।[৭১৯]তাই দুনিয়ার জীবনকে সৃষ্টিকর্তার আদেশ অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারলে মিলবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। কিন্তু পরকালে অবিশ্বাসীরা ভাবে দুনিয়া ভোগের জন্যই। ইসলাম যখন এই উপমহাদেশে প্রবেশ করে এই অঞ্চলে তখন নানান রকমের ধর্মবিশ্বাসীদের আবাসস্থল ছিল। তারা ইসলাম কবুল করলেও তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক সংস্কৃতি জীবনের অংশ হিসেবে রয়ে যায়।[৭২০] তারা এত গুরুত্ব দিয়ে তখন তা চিন্তা বা বিশ্লেষণ করতে যায়নি। সবচাইতে বেশি আমাদের দেশ প্রভাবিত হয় ভারতীয় সনাতনী ধর্মের আচার- অনুষ্ঠানের দ্বারা। বাংলাদেশে সনাতনী ধর্মের যাদের আদি নিবাশ ছিলো তারা তো কোন কিছু পরিত্যাগ করেইনি বরং তাদের প্রচলিত সংস্কৃতি মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। আবার প্রযুক্তির কল্যাণে নাকি অকল্যাণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চর্চাও এখন বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে চরম আকারে লক্ষ্য করা যায়।

৯.১০ মৌলিক ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহ

পৃথিবীতে মুসলমানের প্রধান কাজ আল্লাহর ইবাদত করা। ইবাদত না করলে পরকালীন জীবনে মুক্তির আশা করা যায় না। মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরস্থায়ী সুখময় জান্নাত লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে ইবাদত পালন করা আবশ্যক। এরপরও নেক আমলের ব্যাপারে আমরা অনেকে চরম অবহেলা প্রদর্শন করি। নেক আমলে বিশেষ সময় দিতে অনেকের কাছে একদম ভালো লাগে না। এ অনীহাবোধ জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনে। শয়তানের প্রধান কাজই হলো মানুষের অন্তরে নানা ধরনের কুমন্ত্রণা ঢেলে দেওয়া। শয়তানের কুমন্ত্রণা মানুষকে নেক আমল হতে উদাসীন করে রাখে। এ জন্য সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতে হবে। যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ পায়।[৭২১] আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।'[৭২২]মানুষের নফস নেক আমলের জন্য কোনো ধরনের কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। এ জন্য নেক আমলের ব্যাপারে সে চরম অবহেলা প্রদর্শন করতে চায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা হজরত

---

৭১৯ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত,পৃ.৬৭

৭২০ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৭২১ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩০

৭২২ (وَ مَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ), আল- কুর'আন, ৪৩: ৩৬,৩৭

ইউসুফ (আ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেন, 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয়, আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[৭২৩]

অসৎ সঙ্গীর প্রভাবেও নেক আমলে অনীহা সৃষ্টি হয়। অসৎ সঙ্গী নেক আমলের পথে বড় প্রতিবন্ধক। তাই সৎ লোকদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো'[৭২৪] যারা অসৎ সঙ্গ গ্রহণ করে তাদের আফসোসের সীমা থাকবে না। তারা এভাবে মাতম করবে'হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!'[৭২৫] মানুষ পরিবেশের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। অনেককে দেখা যায়, ভালো কোনো পরিবেশে থাকলে নেক আমলের ব্যাপারে বেশ ভালো আগ্রহ থাকে। কিন্তু খারাপ পরিবেশে সে আগ্রহ একদম থাকে না। তাই পরিবেশ পরিবর্তনের চেষ্টা করা। সফল না হলে অন্যত্র অনুকূল পরিবেশে চলে যাওয়া। ইবাদতে অনাগ্রহের প্রধান কারণ তাকওয়ার অভাব। যার অন্তরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় আছে সে নেক আমলে অনীহা প্রদর্শন করতে পারে না। তাকওয়া মানুষের অন্তরে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় সৃষ্টি করে। এর ফলে নেক আমলে আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। অনেকে আখেরাতে নেক আমলের সুফল এবং নেক আমলে অবহেলার ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সচেতন নয়। বিভিন্ন নেক আমলের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। এসব অনেকেই জানে না। ফলে এসব আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ ইলম অর্জনেও তারা কোনো চেষ্টা করে না। আর ইলম ছাড়া সঠিকভাবে নেক আমল করা সম্ভব নয়। এর ফলে নেক আমলেও তাদের অনীহা দেখা যায়। এ ছাড়া জ্ঞানহীনদের হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালা মোহর মেরে দেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,' এমনিভাবে আল্লাহ জ্ঞানহীনদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।'[৭২৬] ইসলামে মৌলিক ইবাদতসমূহ যেমন সালাত, সওম, যাকাত ও হজড়একজন মুসলিমের জীবনের মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বর্তমানে বহু মুসলমানের মাঝে এই মৌলিক ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা একটি উদ্বেগজনক সামাজিক ও ধর্মীয় সংকট। অনেকেই ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন না। ইবাদতের গুরুত্ব, এর ফজিলত এবং পরকালের হিসাব সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষকে উদাসীন করে তোলে। অনেক সময় মৌলিক ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহের পেছনে ভুল ধারণা ও কুসংস্কার কাজ করে।

---

৭২৩ (وَ مَآ اُبَرِّئُ نَفۡسِیۡ ۚ اِنَّ النَّفۡسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوۡٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیۡ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ), আল-কুর'আন, ১২: ৫৩

৭২৪ (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ کُوۡنُوۡا مَعَ الصّٰدِقِیۡنَ), আল- কুর'আন, ৯: ১১৯

৭২৫ (یٰوَیۡلَتٰی لَیۡتَنِیۡ لَمۡ اَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِیۡلًا), আল-কুর'আন, ২৫: ২৮

৭২৬ (کَذٰلِكَ یَطۡبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوۡبِ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ), আল-কুর'আন, ৩০: ৫৯

আধুনিক জীবনযাত্রা অত্যন্ত ব্যস্ত। চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষাজীবন ইত্যাদির চাপে মানুষ ইবাদতের সময় বের করতে চায় না। মনে করে, ইবাদত করলেই সময় নষ্ট হয়, যা মূলত এক ভুল দৃষ্টিভঙ্গি।

৯.১১ নৈতিক অবক্ষয়

নৈতিকতা বা মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। প্রতিটি মানুষ এটা স্বীকার করলেও মানছেন না সিংহভাগই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আলোচনায় আসি; তাহলে আমরা দেখবো, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়সহ যত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার প্রায় সবগুলোই নৈতিক স্খলন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে হচ্ছে। বিপর্যস্ত হচ্ছে পরিবার-সমাজ। ব্যক্তির যখন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়, তখন অবধারিতভাবে সে সংস্কৃতিক বিকলাঙ্গে ও আধ্যাত্মিক দেউলিয়ায় পরিণত হয়! তার কাছ থেকে বিদায় নেয় লজ্জা, মানবিকতা, আদব-আখলাকসহ যাবতীয় সুন্দর আচরণ। বিবেককে শাণিত করতে হলে, উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন করতে হলে, শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং আত্মিক উন্নয়ন প্রয়োজন।নৈতিক অবক্ষয় হলো সমাজে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার হ্রাস, যা ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক আচরণ পর্যন্ত প্রভাব ফেলে। আধুনিক সময়ে অসৎ প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা, অসৎ আচার-ব্যবহার, মিথ্যা, চুরি, প্রতারণা এবং অশোভন আচরণ নৈতিক অবক্ষয়ের সাধারণ চিত্র। পরিবারিক কাঠামো দুর্বল হওয়া, শিক্ষার মান হ্রাস, সামাজিক নিয়মাবলীর প্রতি অবহেলা এবং মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাবের কারণে নতুন প্রজন্ম নৈতিক মান বজায় রাখতে অসুবিধা বোধ করে। এছাড়াও ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্বের প্রতি উদাসীনতা এবং কেবল ব্যক্তিগত সুবিধা বা স্বার্থকে প্রধান্য দেওয়া সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা ও সততার অবনতি ঘটায়। এর ফলে সমাজে অসাম্য, অস্থিরতা ও অস্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর।

৯.১২ সুযোগ্য প্রতিনিধির অভাব

সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ ও দেশ গঠনে যোগ্য জনপ্রতিনিধির গুরুত্ব অপরিসীম। এই দায়িত্বে অযোগ্য কেউ নিয়োজিত হলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।[৭২৭] হাদিস শরিফের ভাষ্যমতে, অযোগ্য লোকের নেতৃত্ব লাভ কিয়ামতের আলামত। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, রাসুল (স.) বলেন, যখন কোনো

৭২৭ ড. রাগিব সারজানি, *মুসলিম জাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে*, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

অনুপযুক্ত ব্যক্তির ওপর কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।[৭২৮] নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কিছু বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হওয়া আবশ্যক। ইসলামী জ্ঞানের সঠিক প্রচার ও বাস্তব জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রয়োগে যোগ্য ও প্রজ্ঞাবান প্রতিনিধির ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা, প্রচার, ও রক্ষায় সত্যিকারের যোগ্য ও প্রভাবশালী প্রতিনিধি বা নেতার অভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক সময় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যুগোপযোগী জ্ঞান, আধুনিক চিন্তাভাবনা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপে দুর্বল ভূমিকা রাখেন। তারা তরুণ সমাজের মনোজগতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন, ফলে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সহজে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ছাড়া কিছু নেতার সীমাবদ্ধ জ্ঞান, উগ্র ভাষা, বা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ ইসলামের সৌন্দর্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বার্তাকে বিকৃত করে তুলে ধরে, যা ধর্মবিমুখতা ও চরমপন্থার পথ উন্মুক্ত করে। মিডিয়ায় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও অনেক সময় ইসলামপন্থী প্রতিনিধিত্ব দুর্বল ও খণ্ডিত হয়ে থাকে, যার ফলে নীতিনৈতিকতা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়। অথচ ইসলাম এমন ব্যক্তিত্ব চায় যারা জ্ঞানী, বিচক্ষণ, সহনশীল এবং সমাজে গ্রহণযোগ্যতা রাখে। ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে সুযোগ্য প্রতিনিধির অভাব সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। ইসলামী সংস্কৃতি শুধু ধর্মীয় বিধি বা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, যা নৈতিকতা, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক আচরণের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে বা অন্যান্য মুসলিম সমাজে এ সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা সীমিত। এর ফলে সমাজে ইসলামী নীতির প্রকৃত চর্চা ও তার সঠিক প্রচার কমে যায়। অনেক সময়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সমাজে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা শুধু আচার-অনুষ্ঠানের বা তাফসীরের জ্ঞান রাখেন, কিন্তু নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনের অন্যান্য দিকগুলোতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতে পারছেন না।

এই ঘাটতির কারণে ইসলামী সংস্কৃতি প্রায়শই অর্ধ-সত্য, বিকৃত বা সীমিত আকারে প্রচারিত হয়। শিক্ষাবিদ, বক্তা, সমাজসেবক বা শিল্পী যারা সংস্কৃতির স্বরূপ ও মূল্যবোধকে তুলে ধরতে পারতেন, তাদের অভাব সমাজে ইসলামী সংস্কৃতির সঠিক চর্চা ও উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে নবীন প্রজন্মও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না, এবং এটি দীর্ঘমেয়াদে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে।

---

৭২৮ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُسِّدَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: قِيلَ:) وَمَا وَسَادَةُ الْأَمَانَةِ؟ قَالَ: إِذَا أُمِّرَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ يَعْنِي غَيْرَكُمْ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, হা. ৬৫৩৬

তাই আজকের প্রেক্ষাপটে দরকার এমন সুযোগ্য প্রতিনিধি, যারা কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞান ও আধুনিক বিশ্বদৃষ্টির সমন্বয়ে ইসলামকে যুক্তিভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও মানবিকভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন, এবং বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরবেন।

৯.১৩ মসজিদের ইমামদের ভূমিকা

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে আছেন প্রায় ১০ লাখ ইমাম-মুয়াজ্জিন। সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে তাদের একটা আলাদা গ্রহণযোগ্যতা আছে, সম্মান আছে। কিন্তু মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিনদের আলাদা বেতন ভাতাদির কোন ব্যবস্থাপনা নির্দিষ্ট করে দেয়া নেই। আগে তো মুয়াজ্জিনরা এলাকার মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খাবার নিয়ে আসতো।[৭২৯] এখনো গ্রামে এই ব্যবস্থা চালু আছে। কোথাও কোথাও মসজিদ কমিটি এ কাজটি এলাকার মানুষের সহায়তায় করে থাকে। ইমাম এবং খতিবদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। খতিব সাহেব যেমন প্রতি জুমায় সমাজের সমস্যাগুলো তুলে ধরে এর ধর্মীয় সমাধান বর্ণনা করেন, সমাজের মানুষের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। মুসলমানদের সন্তানদের নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও থাকে ইমামের মমতার হাত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশে ইমামদের সামাজিক সম্মান-মর্যাদা থাকলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা চরম অবহেলায়। নেই প্রয়োজন পূরণের মতো সম্মানী, নেই আবাসন। আবার মসজিদের খতিব খুতবার সন্নত হিসেবে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে যান, নিজের অজান্তেই সমাজে বসবাসকারী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে কটাক্ষ করে কথা বলেন, নানান প্রকার উদাহরণ ও উপমা দেন।[৭৩০] যদিও বিষয়গুলো সত্য, কিন্তু ইসলাম রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলকে সম্মান ও অধিকারের কথা বলেছে। নবী (স.) ও সেভাবেই মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যাতে সমাজের মানুষ উপকৃত হয়, আর নিজেদের কর্মসম্পাদনে সচেতন হয়।[৭৩১]নবী (সা) এর আদর্শ হলো ইসলামের সুন্দর উপস্থাপন , যাতে অন্যরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা শুধু নামাজ পরিচালনা করেন না, বরং সমাজে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে ইমামদের অব্যবস্থাপনা বা সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। অনেক ইমাম আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মীয় দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন, ফলে মুসলিম সমাজে নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিছু ইমাম ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বা সামাজিক

---

৭২৯ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩

৭৩০ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১

৭৩১ ব্যারিস্টার মোঃ আব্দুল হালিম, *বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫০

স্বার্থের কারণে প্রায়শই দ্ব্যর্থবোধক শিক্ষা প্রদান করেন, যা ধর্মীয় জ্ঞান এবং সঠিক ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া, তরুণ সমাজের সঙ্গে সংযোগহীনতা, উদ্ভাবনী চিন্তার অভাব এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অক্ষমতা মসজিদের ইমামদের প্রভাবকে সীমিত করে। ফলস্বরূপ, ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সামাজিক ন্যায়, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে মানুষের জীবনে স্থান পায় না।

১০. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা

ইসলামী শিক্ষা মানুষের কাছে বর্তমান সময়ে এত অবমাননাকর হয়ে দাড়িয়েছে যে,

ইসলামিক স্টাডিজে পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থীর মনে আনন্দ নিয়ে, গর্ব করে বলা উচিত সে এই বিভাগের শিক্ষার্থী। কিন্তু সে হীনমন্যতায় ভুগে ভুগে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। প্রতিযোগিতার যুগে ইসলাম নিয়ে পড়লে সবাই হাসাহাসি করে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে করে।[৭৩২] যার জন্য তার ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ কোন জ্ঞান অর্জন করার কোন আগ্রহ বা উৎসাহ তৈরী হয়না। নির্দিষ্ট সময় পরে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলেই হল। এই হল মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষার গভীর অনুশীলন হওয়া সত্ত্বেও এখানেও ব্যবস্থাপনা ত্রুটিমুক্ত নয়। নানান ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করা হল।

ক. যুগোপযোগী গবেষণার অভাব

এখানে গবেষণাধর্মী নিত্যনতুন মাসয়ালার যুগোপযোগী স্বাধীন স্বতন্ত্র সমাধান উদ্ভাবনের পরিবর্তে তাকলিদ মাসয়ালার ওপর নির্ভর করা হয়। ফলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগী কম্পিউটার, ইন্টারনেট, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্যনীতি কারবার পদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচারনীতি, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষাদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী গবেষণার অভাব একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা যায়।[৭৩৩] বর্তমান সমাজে ইসলামী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার প্রয়োগ ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে, নতুন প্রজন্মের জীবনধারা, প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা বোঝার জন্য পর্যাপ্ত আধুনিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ নেই।

যুগোপযোগী গবেষণার অভাবের কারণে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক যেমন শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, আ-চার-আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ সমকালীন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঠিকভাবে সংযুক্ত হতে পারছে না। গবেষণার সীমাবদ্ধতা থাকায় নতুন ধারার সাহিত্য, গণমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী সংস্কৃতির সমন্বয় সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও, সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন

---

৭৩২ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., *ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৭৩৩ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩

সমস্যার (যেমন সামাজিক অসামঞ্জস্যতা, ধর্মীয় অজ্ঞতা, গোঁড়ামি ও উগ্রবাদ) সমাধান ও প্রতিকারের জন্য যথাযথ তথ্যভিত্তিক গবেষণার অভাবও লক্ষ্য করা যায়।

ফলস্বরূপ, ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে পরিকল্পিত উদ্যোগ, শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও নীতিনির্ধারণ প্রায়শই দৃষ্টান্তমূলক ও প্রয়োগযোগ্য নয়। সময়োপযোগী গবেষণা ও বিশ্লেষণ ব্যতীত, নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতির সংযোগ স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

খ. যুগোপযোগী সিলেবাসের অভাব

মাসয়ালা মাসায়েল ও আকাইদ সংক্রান্ত প্রাচীন কিতাব পড়ানো হলেও আধুনিক জিজ্ঞাসার জবাব সম্বলিত কিতাব পড়ানো হচ্ছে না। প্রাচীন ফেরকা মুতাজিলা, রাফেজি, খারেজি, জাবারিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে পড়ানো হলেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, তুলনামূলক ধর্ম, কাদিয়ানি ফেতনা সম্পর্কে পড়ানো হয় না। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিকাশে যুগোপযোগী সিলেবাসের অভাব একটি গুরুতর প্রতিবন্ধকতা।[৭৩৪] প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সময় বিষয়বস্তু অত্যন্ত ঐতিহ্যগত ও সংরক্ষিত থাকায় বর্তমান যুগের সামাজিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এর প্রাসঙ্গিকতা কমে যায়। শিক্ষার্থীরা ইসলামী সংস্কৃতির মূল বিষয়গুলো জানতে পারলেও তা আধুনিক জীবনের সমস্যার সমাধান, প্রযুক্তি ব্যবহার, আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না।

যুগোপযোগী সিলেবাসের অভাবের কারণে শিক্ষার্থীরা নতুন প্রজন্মের চাহিদা ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিক শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিককে ডিজিটাল মিডিয়া, আধুনিক সাহিত্য, বিশ্বসংস্কৃতি ও সমসাময়িক সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করার সুযোগ হারায়।[৭৩৫] ফলে শিক্ষার কার্যকারিতা সীমিত হয়, এবং শিক্ষার্থীরা আধুনিক সমস্যার সঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্ত ধারণা তৈরি করতে পারছে না।

গ. শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র না থাকায় শিক্ষকরা বিশ্বের আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন না। ফলে শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ সাধারণ শিক্ষায় পিটিআই, বি.এড, এমএডসহ নানা ধরনের উন্নত পদ্ধতি

---

৭৩৪ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

৭৩৫ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

অবলম্বন করছে বলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা যেভাবে শিক্ষা লাভ করে ইসলামী শিক্ষায় ছাত্ররা তা পারছে না।[৭৩৬] বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হলো মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব। অনেক সময় শিক্ষকরা প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতিতে দক্ষ হলেও আধুনিক শিক্ষণপ্রক্রিয়া, যুগোপযোগী বিষয়বস্তু উপস্থাপন, শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ ও সমসাময়িক সমস্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাবে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সমকালীন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংযুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করলেও তা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যা, সামাজিক আচরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ও বিশ্বায়নের প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োগ করতে পারছে না। এছাড়াও, শিক্ষকরা নতুন শিক্ষণশৈলী, শিক্ষার্থী কেন্দ্রীক পদ্ধতি, মনস্তাত্ত্বিক দিক ও শিক্ষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে অক্ষম হওয়ায় শিক্ষার মান কমে যায়।[৭৩৭]

ফলস্বরূপ, ধর্মীয় শিক্ষার কার্যকারিতা সীমিত হয়ে যায় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে অসুবিধা হয়। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ দক্ষতার অভাবে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাভাবনা গঠনে পূর্ণভাবে অবদান রাখতে পারছেন না।

ঘ. পৃথক পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম বোর্ড না থাকা

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় পৃথক কোন পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম বোর্ড না থাকায় শিক্ষার্থীদের সীমাহীন অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে, যা পাচ্ছে তাতে ভুলে ভরা, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে একই সংস্করণ পুনঃমুদ্রণ হওয়াতে ছাত্ররা বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে আরেকটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো পৃথক পাঠ্যপুস্তক ও স্বতন্ত্র কারিকুলাম বোর্ডের অভাব।[৭৩৮] বর্তমানে মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি স্বতন্ত্র, যুগোপযোগী ও মানসম্মত কারিকু-লাম নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রথাগত বইয়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে, যা অনেক সময় আধুনিক সমাজ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পৃথক পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলাম বোর্ডের অভাবে শিক্ষার একক মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিজস্বভাবে পাঠ্যবিষয় নির্বাচন বা সিলেবাস তৈরি করার চেষ্টা করে, যার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে বৈষম্য দেখা দেয়। এছাড়াও, শিক্ষার মান ও গবেষণার সুযোগ সীমিত থাকে, এবং শিক্ষার্থীরা সমসাময়িক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে পারছে না।[৭৩৯]

---

৭৩৬ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

৭৩৭ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩

৭৩৮ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

৭৩৯ মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামের অর্থদর্শন ও বন্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

ফলস্বরূপ, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি একটি কাঠামোগত ও যুগোপযোগী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পৃথক কারিকুলাম বোর্ড ও মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক থাকলে শিক্ষার ধারাবাহিকতা, প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষার্থীর চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব।

ঙ. গ্রন্থাগারের অভাব

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত গ্রন্থ তো দূরের কথা কোন প্রকার গ্রন্থাগারেরই অস্তিত্ব নেই। অথচ সাধারণ শিক্ষার চেয়ে বেশ কিছু নতুন বিষয়ের সংযোজন থাকায় নতুন করে কিছু গ্রন্থাগারের একান্ত প্রয়োজন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী আছে, কিন্তু তা অনেকটা অপ্রতুল। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিকাশে গ্রন্থাগারের অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা।[৭৪০] অনেক মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত বই, গবেষণা সামগ্রী ও আধুনিক তথ্যভিত্তিক সংকলন নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা সীমিত উৎস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং সমকালীন জ্ঞান, বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ ও গবেষণার সুযোগ হারায়। গ্রন্থাগারের অভাবে শিক্ষার্থীরা ইসলামী চিন্তাধারা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর স্বতন্ত্র ও গভীর জ্ঞান অর্জনে অক্ষম হয়। এছাড়াও, শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমের বাইরে নিজ উদ্যোগে অনুসন্ধান ও গবেষণার সুযোগ কমে যায়। ফলে শিক্ষার মান ও ইসলামী সাংস্কৃতিক চেতনার বিস্তার বাধাগ্রস্থ হয়।[৭৪১]

ফলস্বরূপ, আধুনিক গবেষণা, সৃজনশীলতা ও সমকালীন প্রয়োগের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষাকে সংযুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রন্থাগার ও তথ্যভিত্তিক সংস্থার অভাব একটি কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশকে সীমিত করে।

চ. বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোজন না থাকা

সিলেবাসভিত্তিক অধ্যয়নের পাশাপাশি মাদরাসা ছাত্রদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন- মৎস্য খামার, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগি পালনসহ যে কোন ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ নেই। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিকাশে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা হলো বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোজন না থাকা।[৭৪২] অনেক মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূলত তাত্ত্বিক পাঠ্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে শিক্ষার্থীরা প্রায়শই বাস্তব জীবনের দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। আধুনিক সমাজে ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা কার্যকরভাবে সামাজিক ও পেশাগত জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে গেলে প্রয়োজন বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যেমন কম্পিউটার ব্যবহার, ইংরেজি ও অন্যান্য আধুনিক ভাষা, ব্যবসায়িক দক্ষতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

---

৭৪০ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩

৭৪১ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮৩

৭৪২ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে শিক্ষার্থীরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে, কিন্তু তা জীবন ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে না। ফলে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা নতুন প্রজন্মের জীবনে সীমিত হয়ে যায়।[৭৪৩]

ছ. ডিপ্লোমা স্তরসহ প্রকৌশলী ও প্রযুক্তির সংযোজন না থাকা

সাধারণ শিক্ষায় বুয়েট, পলিটেকনিকে কম্পিউটার ডিপ্লোমা, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে আর্থসামাজিক নির্ভরশীল করে তোলার প্রচেষ্টা রয়েছে, অথচ ইসলামী শিক্ষায় এ জাতীয় শাখা খোলার কোন উদ্যোগ সরকারের নেই। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে আরও একটি প্রতিবন্ধকতা হলো ডিপ্লোমা স্তরসহ প্রকৌশলী ও প্রযুক্তির সংযোজন না থাকা। বর্তমানে মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রকৌশলী দক্ষতা বা প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে শিক্ষার্থীরা শুধু ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করলেও আধুনিক সমাজের প্রযুক্তিগত চাহিদা, উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে তা মিলিয়ে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না।

প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি শিক্ষার অভাবে শিক্ষার্থীরা সমকালীন শিল্প, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধকে সংযুক্ত করার সুযোগ হারায়।

এছাড়াও, ডিপ্লোমা বা প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব তাদের স্বাবলম্বিতা ও পেশাগত যোগ্যতাকে সীমিত করে, এবং ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে।

জ. বাণিজ্যিক বিভাগের অভাব

ইসলামী শিক্ষায় বাণিজ্যিক শাখার সংযোজন করা হয়নি অথচ এ শাখাটি জাতীয় স্বার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো বাণিজ্যিক শাখা, যেমন- ইসলামী ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, শেয়ার লেনদেনসহ বাণিজ্যিক সকল সেক্টরের জ্ঞান লাভ থেকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হলো বাণিজ্যিক বিভাগের অভাব।[৭৪৪] মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমে সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি বা কর্পোরেট প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে শিক্ষার্থীরা ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক নীতি যেমন মুদারাবা, মুশারাকা, হালাল বিনিয়োগ ইত্যাদি জীবন ও পেশাগত ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োাগ করতে সক্ষম হয় না।

বাণিজ্যিক বিভাগের অভাবে শিক্ষার্থীরা সমকালীন অর্থনৈতিক বাস্তবতা, ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সীমিত থাকে। এতে ইসলামী শিক্ষার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা কমে যায় এবং শিক্ষার্থীর স্বাবলম্বিতা ও আয়–উপার্জনের সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[৭৪৫]

ঝ. চরম বৈষম্যের শিকার

---

৭৪৩ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., *ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৬

৭৪৪ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭

৭৪৫ ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

ইসলামী শিক্ষার সকল স্তরেই রয়েছে চরম বৈষম্য, দাখিল ও আলিমকে এসএসসি ও এইচএসসি এর মান দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিষয়ে তাদেরকে অনার্সে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয় না। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ফাজিলকে ডিগ্রি ও কামিলকে মাস্টার্সের মান দিলেও এলএলবি, বিএ ভর্তিসহ সরকারি ও বেসরকারি সকল সেক্টরে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা হলো চরম বৈষম্যের শিকার শিক্ষার্থী ও সম্প্রদায়। অনেক সময় অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বৈষম্য মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রকাশ পায়, যার ফলে নির্দিষ্ট অংশের শিক্ষার্থী ও সম্প্রদায় শিক্ষার সমান সুযোগ ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলোর সন্তানরা প্রায়শই মানসম্মত শিক্ষক, আধুনিক পাঠ্যবই, প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকে।

চরম বৈষম্যের কারণে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য সমতার ভিত্তিতে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সঠিকভাবে পূর্ণ হয় না। বৈষম্য শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস, চেতনা ও সামাজিক সংযোগকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, এবং শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিকতা সীমিত করে। ফলে ইসলামী সংস্কৃতি শুধু একটি সংরক্ষিত জ্ঞান হিসেবে থেকে যায়, যা নতুন প্রজন্মের জীবনে প্রয়োগযোগ্যতা হারায়।

ঞ. শিক্ষাবোর্ডের অভাব

দেশের সাধারণ শিক্ষায় পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষাসহ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক বিভাগে শিক্ষাবোর্ড রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বেসরকারি মিলে প্রায় শতাধিক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও মাদরাসার ইবতেদায়ি বৃত্তি, অষ্টম বৃত্তি, পিএসসি, জেডিসি, দাখিল, আলিম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, সিলেবাস তৈরিসহ সকল কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র একটি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।[৭৪৬] বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা হলো শিক্ষাবোর্ডের অভাব। বর্তমানে মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি স্বতন্ত্র, যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষাবোর্ড নেই, যার ফলে শিক্ষার মান, পাঠ্যক্রমের সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অ-নিয়মিত থাকে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে পাঠ্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষার মান ও গুণগতমানে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।[৭৪৭]

শিক্ষাবোর্ডের অভাবে শিক্ষার্থীর জন্য ধারাবাহিক, সমন্বিত ও সমকালীন পাঠ্যক্রম নিশ্চিত করা যায় না। এছাড়াও, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষণ, পাঠ্যবই নির্বাচন ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে

---

৭৪৬ হোসেন আরা শাহেদ (সম্পাদক), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৪

৭৪৭ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩

কাঠামোগত সমস্যা দেখা দেয়।[৭৪৮] ফলস্বরূপ, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে যুগোপযোগী ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও মানসম্মত বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে যায়।

ট. ইবতেদায়ি মাদরাসাকে সরকারি না করা

সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারীকরণ করে দফায় দফায় তাদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে। অথচ ইসলামী শিক্ষায় ইবতেদায়ি মাদরাসাগুলোতে সরকারিকরণ তো দূরের কথা প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকও নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। ফলে এ প্রতিষ্ঠানগুলো চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা হলো ইবতেদায়ি মাদরাসাকে সরকারি না করা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক ইবতেদায়ি মাদরাসা স্বতন্ত্র বা বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়, যার ফলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, সহায়তা ও মান নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে কার্যকর হয় না। এতে শিক্ষার মানে বৈষম্য দেখা দেয় এবং শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।[৭৪৯]

সরকারি স্বীকৃতি বা সমন্বিত নিয়ন্ত্রণের অভাবে পাঠ্যক্রমের মান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার সুবিধা, যুগোপযোগী শিক্ষণ পদ্ধতি ও বৃত্তিমূলক সংযোজন সীমিত থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা আধুনিক সমাজ ও প্রযুক্তির সঙ্গে ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করতে পারে না। শিক্ষার এই সীমাবদ্ধতা ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করে।

১১. জাতীয় শিক্ষানীতি

বাংলাদেশ স্বাধীনের পর মোট সাতটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয় ২০১০ সালে। এ শিক্ষানীতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য রাখেন। আর এ শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২।[৭৫০] কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রতিফলিত হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শাখা থেকে ইসলামী শিক্ষাকে পুরোপুরি বাদ দেয়া হয়েছে।[৭৫১]

আর মানবিক শাখায় ইসলামী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ ছিল যে, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা'। শিক্ষানীতিতে

---

৭৪৮ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., *ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৭৪৯ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩

৭৫০ মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা*, শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ.৫৭

৭৫১ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

উল্লেখিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষাক্রমে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়ে গেল। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২তে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিটকে গেল। আবার প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২০তে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়টিকে দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা থেকে বাদ দেয়া হলো। অর্থাৎ দশম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়গুলোর বোর্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ফলে এ বিষয়গুলোর ক্লাস-পরীক্ষা নিয়মিত চালু থাকবে। বিষয়গুলোর সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে। এ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করেই একজন শিক্ষার্থীর গ্রেড নির্ধারিত হবে। কিন্তু ইসলামী শিক্ষাকে বোর্ড পরীক্ষা থেকে বাদ দেয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের কাছে এটি গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত হলো। এ বিষয়ে গ্রেড উন্নয়নের জন্য আর কোনো ক্লাস এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। কারণ, শিক্ষার্থীরা বোর্ড পরীক্ষা ব্যতীত এটি পড়তে কখনোই আর আগ্রহী হবে না। আর শিক্ষকগণও এ বিষয়ে আর কোনো গুরুত্ব দেবেন না। [৭৫২]শিক্ষানীতিতে ঘোষিত শিক্ষার্থীদের নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনের যে কথা বলা হয়েছে, সেটিও জাতীয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ স্কুল ও কলেজে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে পড়াশুনার আর কোনো সুযোগ রইল না। অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী আলিয়া মাদরাসার অবস্থাও ভালো না। অনাদর আর অবহেলায় আলিয়া মাদরাসা তার স্বকীয়তা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে। মাদরাসা থেকে আরবী বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনেকাংশেই লোপ পেয়েছে। পূর্বে এখানে ১০০ নম্বরের ইংরেজি ও ১০০ নম্বরের বাংলা পড়ানো হতো। বর্তমানে এখানে ২০০ নম্বরের ইংরেজি ও ২০০ নম্বরের বাংলা পড়ানো হয়। অর্থাৎ বাংলা ও ইংরেজির বিষয় সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দাখিল ও আলিমের বিজ্ঞান গ্রুপে আরবী সহিত্যকে সংকুচিত করে ৫০ নম্বর করা হয়েছে।[৭৫৩] অর্থাৎ আরবী ১ম ও ২য় পত্রকে যুক্ত করে দুটো মিলিয়ে ১০০ নম্বর করা হয়েছে। আরবী শিক্ষা সংকোচন করে এখানে ব্যাপকভাবে অন্যান্য শিক্ষাকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাদের মেধাকে যথাযথ মূল্যায়ন করছেন না। আলিয়া মাদরাসা হলো দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এক ইসলামী জ্ঞানকেন্দ্র।

আরবী ভাষার পাশাপাশি এখানে ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোলসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি আলীয়া মাদরাসাগুলোতে আরবী ভাষার বিভিন্ন বিষ-য়াবলির পাঠ দান করা হয়ে থাকে। আরবি, নাহু (বাগবিধি), সরফ (রূপতত্ত্ব), বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র), ফিকহ (আইনশাস্ত্র), ফালসাফাহ (দর্শন) ও সাহিত্য ছিল এ পাঠক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক কথায়, ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অনন্য সমন্বয় হচ্ছে আলিয়া

---

৭৫২ হোসেন আরা শাহেদ (সম্পাদক), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩০

৭৫৩ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত,পৃ.১৪৩

মাদরাসা।[৭৫৪] কিন্তু বর্তমানে এখানে এসব বিষয় সামগ্রিকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। অথচ, এসব আলিয়া মাদরাসা থেকে লেখাপড়া করেই শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়ে থাকেন। জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে ইসলামী শিক্ষাকে বাদ দেয়া একটি অযৌক্তিক ব্যাপার। এটা একদিকে জাতীয় শিক্ষানীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অন্যদিকে মুসলিম জীবনের কদর্য এক হীনমন্যতার বহিঃপ্রকাশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১৩ সালে স্থাপিত হয় ইসলামি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। ইসলামের মর্মবাণী ও চেতনা প্রসারের নিমিত্তে তিনি ১০১০টি দারুল আরকাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, ৫৬০টি মডেল মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৭৫৫] দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের মান প্রদান করেছেন। এমতাবস্থায় পাবলিক পরীক্ষা থেকে ইসলামী শিক্ষা বাদ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ধারায় দাওরায়ে হাদীস সাধারণত কওমি মাদ্রাসা পর্যায়ের সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ডিগ্রীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা "মুফতি", "হাদীস বিশেষজ্ঞ" বা "ইমাম" হিসেবে কার্যত দ্বীনি দায়িত্ব পালন করার উপযোগী হয়ে ওঠে। দেশে দাওরায়ে হাদীস শিক্ষার মান বিভিন্ন মাদ্রাসায় বিভিন্ন হলেও, সাধারণভাবে এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার উচ্চতর ধারণা ও সমাজে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া, এই ডিগ্রীর শিক্ষার্থীরা মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ইসলামী সংগঠনগুলোতে হাদীস সংক্রান্ত গবেষণা, শিক্ষাদান ও উপদেশ দেওয়ার কাজ করতে সক্ষম হয়। দাওরায়ে হাদীসকে মাস্টার্স সমমান ডিগ্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো শিক্ষাক্রমের স্বতন্ত্রতা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাব। কওমি শিক্ষার ধারা মূলত হাদীস ও ইসলামী শাস্ত্রের উপর কেন্দ্রীভূত, যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি বা বহুমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত নয়।[৭৫৬] ফলে শিক্ষার্থীদেরকে মাস্টার্স সমমানের সঙ্গে মানানসই আন্তর্জাতিক শিক্ষাগত মান এবং রিসার্চ দক্ষতা অর্জনে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এছাড়াও, সরকারি এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই সমমানের গ্রহণযোগ্যতা প্রাথমিকভাবে সীমিত থাকতে পারে, যা চাকরি বা উচ্চতর পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সামাজিক ও প্রশাসনিক দিক থেকেও কিছু বিতর্ক থাকে, যেমন কওমি শিক্ষার স্বতন্ত্রতা হারানোর আশঙ্কা বা ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার দ্বন্দ্ব।[৭৫৭] এই কারণে সমমান দেওয়া হলেও সঠিক সমন্বয় এবং পর্যাপ্ত মান নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এটি শিক্ষার্থীর জন্য পূর্ণ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে না।

---

৭৫৪ ড. ইউসুফ আল কারজাভি , *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

৭৫৫ হোসেন আরা শাহেদ (সম্পাদক), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৭৫৬ মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮

৭৫৭ ড. ইউসুফ আল কারজাভি , *ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, এর প্রধান অন্তরায় হলো ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার ঘাটতি, পশ্চিমা সাংস্কৃতিক প্রভাব, নৈতিক অবক্ষয়, এবং ইসলামী শিক্ষার সীমিত প্রয়োগ। গণমাধ্যম, শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থায় আধুনিকতার নামে ইসলামি চেতনার বিকৃতি এই সংস্কৃতির সঠিক বাস্তবায়নকে আরও জটিল করে তুলেছে। ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গঠন করলেই প্রকৃত অর্থে ইসলামী সংস্কৃতি এই দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং মানব জীবনের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধন হবে।

সপ্তম অধ্যায়
মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও বাস্তবায়নে করণীয়

সপ্তম অধ্যায়

মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও বাস্তবায়নে করণীয়

চারপাশে দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ্য করা যায় মানুষ দুনিয়ার জীবন নিয়ে খুবই ব্যাস্ত। ভালো থাকার প্রতিযোগিতা আর লড়াইয়ে নেমেছেন যেন সবাই। তাতে কারও ক্ষতি হলো কি লাভ হলো তা কারও দেখার সময় নেই। অর্থনৈতিক অসুস্থ্য প্রতিযোগিতা মানুষকে ন্যয়-অন্যায়, ভালো- মন্দ, উচিৎ-অনুচিতের পার্থক্যও বুঝতে বাধাগ্রস্থ করে। যে মানবজাতিকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে দুনিয়ায় সম্মানিত করেছেন, তারাই কেন যেন আজ একে অপরকে অসম্মানিত, অপদস্ত, অবমূল্যায়ন করার কাজে সদা ব্যস্ত। এর মূল কারণ এর কিছুই নয়, কেবল নৈতিক অবক্ষয় আর দুনিয়ামুখী জীবন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য থেকে জানা যায়-এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ প্রথমে ছিল রূহের জগতে, এরপর তার অবস্থান মায়ের উদরে, তারপর দুনিয়ার বুকে, এরপর দুনিয়ার এই জীবন পার করে সবাইকে যেতে হবে তার মূল গন্তব্য অর্থাৎ আখেরাতে। জীবন ও জগতের মূল কর্মকাণ্ড দুনিয়ামুখী হলে মানবজাতী চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই তার এই জীবনে অর্জন করা প্রয়োজন উৎকর্ষ। যেহেতু বাংলেদেশের মানুষের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে নানান জাতির মিশ্র সংস্কৃতি, তাই এইসকল অনৈসলামিক সংস্কৃতির ভীর থেকে ইসলামের মৌলিক সংস্কৃতির চর্চা এ অঞ্চলের মুসলমানদের জীবনে উৎকর্ষ নিয়ে আসতে সক্ষম। আবশ্যিক বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

১. আল-কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেয়া আছে ইসলামে, তথা আল-কুরআন ও সুন্নাহতে। ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন,"নিশ্চয় ইসলাম হলো আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা।'[৭৫৮] তাই আল্লাহর নিকট জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতাদর্শ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দ্বিন হিসেবে গ্রহণ করবে, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না, সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৭৫৯] আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম; আর তোমাদের জন্য

---

৭৫৮ (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ), আল- কুর'আন, ৩: ১৯

৭৫৯ (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ۖ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ), আল- কুর'আন, ৩: ৮৫

ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[৭৬০] আল্লাহ মানবজাতির কাছে ইসলামের বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনের জন্য প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঠিয়েছেন। তাই রাসুলের সব কথা ও কাজকর্ম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তিনি মনোবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। এটি তো তাঁর কাছে পাঠানো ওহি।'[৭৬১] মুমিন নিজে যেমন সৎকর্মশীল হবে, তেমনি অন্যদেরও ভালো কাজের নির্দেশনা দেবে। কারণ সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়ায় যেমন থাকবে, তেমনি আখিরাতেও এর ফল ভোগ করবে। মূলতঃ ইসলাম একটি দ্বীন ও একটি জীবনব্যবস্থা। আল কুরআনে দ্বীন শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: ১. দ্বীন মানে প্রতিদানঃ 'প্রতিদান দিবসের মালিক'[৭৬২]। 'তুমি কি তাকে দেখেছো, যে প্রতিদান (দিবসকে) অস্বীকার করে?'[৭৬৩] ২. দ্বীন মানে আইনঃ 'আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের দু'জনের প্রতি যেনো তোমাদের দয়া না হয়।'[৭৬৪] ৩. দ্বীন মানে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাঃ '(ফেরাউন বললো) আমি আশঙ্কা করছি সে (মূসা) তোমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পাল্টে দেবে অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।'[৭৬৫]৪. দ্বীন মানে ধর্ম ও নৈতিকতা, ৫. দ্বীন মানে আনুগত্য এবং ৬. দ্বীন মানে জীবন যাপন ব্যবস্থা। আল কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার শর্তাবলী হলো তাতে স্রষ্টার পরিচয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক বক্তব্য থাকতে হবে। তাতে অদৃশ্য বস্তুগুলো সম্বন্ধে জবাব থাকবে হবে। মানুষের মৃত্যুর পর কী হবে, যে বিষয়ের সঠিক, যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক বক্তব্য থাকতে হবে। সেটি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং গোপন এবং প্রকাশ্য সর্বজান্তা ও সর্বজ্ঞানীর প্রদত্ত হতে হবে। তাতে মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকতে হবে, সাফল্যের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত থাকতে হবে এবং তা মানুষের মানসিক প্রশান্তির কারণ হতে হবে। জীবনে উদ্ভূত সব সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা ও মূলনীতি থাকতে হবে।[৭৬৬]মানুষের জৈবিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের বিধি-বিধান থাকতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনি, আন্তর্জাতিকসহ সব বিষয়ের মূলনীতি ও দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

---

৭৬০ (اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا), আল- কুর'আন, ৫:৩

৭৬১ (وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)), আল-কুর'আন, ৫৩: ৩-৪

৭৬২ (مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ), আল-কুর'আন, ১: ৪

৭৬৩ (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ), আল-কুর'আন, ১০৭: ১

৭৬৪ (وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ), আল-কুর'আন, ২৪: ২

৭৬৫ (إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ), আল-কুর'আন, ৪০:২৬

৭৬৬ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, অনুবাদক আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ১ম প্রকাশ, ২০১৬, মাকতাবাতুল হেরা, পৃ. ১২

সততা, ন্যায়নীতি, পুণ্যকর্ম, পরোপকার ও ধার্মিকতার জন্য পুরস্কার লাভের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকবে। তাতে অন্যায়, অপরাধ ও দুষ্কর্ম, পাপাচার ও জুলুমের জন্য উপযুক্ত শাস্তি ও দণ্ডের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তার সম্পূর্ণ অবিকৃত ও শাশ্বত জ্ঞানের উৎস থাকতে হবে। পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার এ সব শর্তাবলী একমাত্র ইসলামেই রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। বিশ্বের সব ধর্ম ও মতবাদকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ওই মানদণ্ডে প্রত্যেকটি ধর্ম ও মতবাদে কোনো না কোনো অভাব রয়েছে। শাশ্বত নৈতিক দৃষ্টিকোণ, বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনের পবিত্র মূলনীতি; সামাজিক সুবিচার ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের মূলনীতি; সামগ্রিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক মূলনীতি; অর্থনৈতিক পূর্ণাঙ্গ ও সুষম নীতিমালা; আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা, চিরন্তন হালাল ও হারামের বিবরণ, উত্তরাধিকার বিধান; আইন ও বিচার বিধান; সমর নীতি, সত্য ও বাস্তব মানব ইতিহাস; সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব; মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ নির্দেশ; উদারনীতি এবং চিন্তা গবেষণা ও ইজতিহাদ করার অবকাশ; উন্নয়নের নীতিমালা।

১.১ পারিবারিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়ন

পরিবার হচ্ছে সমাজের মৌলিক একক ও মানবজীবনের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। ইসলামী দৃষ্টিতে একটি পরিবার কেবল রক্তের সম্পর্ক নয়; বরং পারস্পরিক দায়িত্ব, ভালোবাসা, দয়া, সহানুভূতি ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

"আর তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের মাধ্যমে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"[৭৬৭]

ইসলাম পিতা-মাতা, সন্তান, স্ত্রী-স্বামীর মধ্যে দায়িত্ব ও সম্মানের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যিনি তার পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণ করে, আর আমি আমার পরিবারের জন্য উত্তম।"[৭৬৮]

সন্তানদের প্রতি দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্মের পর আযান দেওয়া, উত্তম নাম রাখা, উত্তম লালন-পালন, এবং দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা। হাদীসে এসেছে:

"তোমরা সবাই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করবে।"[৭৬৯]

---

৭৬৭ (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ), আল-কুর'আন, ৩০:২১

৭৬৮ (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) মুহাম্মদ ইবন ইসা তিরমিজি, *জামি' আত-তিরমিজি*, বেইরুত: দারুল কিতাব আল-'আলমিয়্যাহ, ২০০০, হা. ৩৮৯৫

৭৬৯ (كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيّته), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.). *সহীহ আল-বুখারী*. কিতাব: আল-আহকাম (শাসনবিধান), বেইরুত: দার ইবনে কাসির, ১৯৮৭, হা. ৮৯৩

পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠি হলো তাকওয়া, ইনসাফ, সহনশীলতা, আদর্শিক নেতৃত্ব এবং আল্লাহভীতি। পারিবারিক সিদ্ধান্তে পরামর্শ গ্রহণ, নিয়মিত একত্রে ইবাদত, একে অন্যের ভুল ক্ষমা করা, সন্তানদের দীন ও দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত করা এসবই ইসলামী পরিবার গঠনের অংশ। এভাবে পরিবার হবে শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল, এবং সমাজ হবে নৈতিকতা ও দয়ার প্রতিচ্ছবি।

১.২ তরুণ সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা

তরুণরা জাতির ভবিষ্যৎ, ইসলামী সমাজের কাণ্ডারি। এই জীবনপর্বে একজন মানুষ শারীরিকভাবে যেমন শক্তিশালী, মানসিকভাবেও চঞ্চল ও সাহসী হয়।[৭৭০] ইসলামে এ বয়সকে ঈমান ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর..."[৭৭১]

অর্থাৎ তরুণদের সঠিক পথে রাখার দায়িত্ব পরিবার ও সমাজের ওপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) তরুণদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন:

"সাত শ্রেণির মানুষ আছে যাদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়া দেবেন তাদের মধ্যে একজন হলো সেই তরুণ, যে তার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে।"[৭৭২]

তরুণদের মাঝে আজ অবাধ প্রযুক্তি ব্যবহার, নৈতিক অবক্ষয়, মাদকাসক্তি, অশ্লীলতা ও ধর্মবিমুখতা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব থেকে রক্ষা করতে হলে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা চাই যেখানে কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে হৃদয় নির্মল হবে, রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, এবং দাওয়াহ, খেলাধুলা, সমাজসেবার মতো গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

একজন তরুণ যদি আল্লাহভীতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও হালাল-হারামের বোধ নিয়ে জীবনযাপন করে, তাহলে সে শুধু নিজের জীবনেরই নয়, বরং সমাজেরও একজন আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে। তাই পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, সমাজ সবখান থেকেই তার নৈতিক দিকনির্দেশনা পাওয়া জরুরি। ইসলামী সংস্কৃতির যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া এই দায়িত্ব পালন অসম্ভব।

---

৭৭০ ড. ইউসুফ আল কারজাভি, *আগামী দিনের সভ্যতা ইসলাম*, ২য় সংস্করণ, ২০২৩, মক্তব প্রকাশন,অনুবাদ; মুহসিনা বিনতে মুসলিম, কাজী সালমা বিনতে সলিম,পৃ. ৩৬

৭৭১ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ), আল-কুর'আন,৬৬: ৬

৭৭২ (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব আল- আযান, খণ্ড ১, দারুস সালাম, ১৯৯৭, হাদীস নং ৬৬০

১.৩ সামাজিক অনুষ্ঠানে ইসলামি নীতি প্রয়োগ

ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিয়েছে, তার ব্যতিক্রম নয় সামাজিক অনুষ্ঠানও। বিয়ে, জন্ম, দাওয়াত, জানাজা, মিলাদ, বা উৎসব সব কিছুতেই ইসলামী শালীনতা, পরিমিততা ও তাকওয়া থাকা উচিত। আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"[৭৭৩]

বর্তমানে আমাদের সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক অপচয়, গান-বাজনা, ফ্যাশন প্রদর্শন ও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় যা স্পষ্টভাবে ইসলাম পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন,

"যে কেউ অপচয়ী, সে জাহান্নামের মধ্যে থাকবে।"[৭৭৪]

ইসলামী দৃষ্টিতে বিয়ে একটি সহজ, সম্মানজনক ও ইবাদতমূলক সম্পর্ক। কিন্তু বাস্তবে তা এক ভয়ংকর আর্থিক চাপ ও সামাজিক প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। ইসলাম বলে, কম খরচে, বেশি তাকওয়ার সঙ্গে যে বিয়ে হয়, সেটাই সর্বোত্তম। এছাড়া জানাজার মতো গম্ভীর বিষয়েও বর্তমানে অহেতুক বিলাসিতা, কুলখানি, মিলাদ মাহফিলের নামে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, যেখানে ইসলামের সারল্য হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (স.) সাদাসিধে জানাজা ও দ্রুত দাফনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ইসলামী সংস্কৃতির যথার্থ প্রয়োগ বলতে বোঝায় সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোকে অপচয়, গর্ব, রেওয়াজ ও রিয়ার জায়গা থেকে সরিয়ে এনে খালিস নিয়ত ও সহজভাবে পালন করা, যাতে তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং সমাজে নৈতিকতার আদর্শ গড়ে ওঠে।

১.৪ মানুষকে সম্মান করা ও নম্র ব্যবহার করা

আজকের তরুণ সমাজ অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর, কিন্তু আত্মিক গুণাবলি ও সামাজিক শিষ্টাচারের চর্চায় দুর্বল। তাদের মধ্যে অহংকার, অধৈর্য, রূঢ়তা ও অশ্রদ্ধার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই ছোটদের সম্মান দিতে জানেনা, বড়দের সাথে অভদ্র ব্যবহার করে, শিক্ষকদের সাথে অশালীন আচরণ করে, এবং সমাজের সাধারণ মানুষকেও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ও ভার্চুয়াল জগতে মানুষ যখন-তখন কাউকে অপমান করে বসে, কটূক্তি ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য কওে যা একেবারেই ইসলামবিরোধী আচরণ। বাস্তব জীবনেও অফিস, বাসা,

---

৭৭৩ আল-কুর'আন, ৭:৩১

৭৭৪ (كُلُّ مُبَذِّرٍ فِي النَّارِ) আবু দাউদ, *সুনান আবু দাউদ*, কিতাব: আল-লিবাস, বেইরুত: দারুল কিতাব আল-'আলমিয়্যাহ, ২০০০, হা. ৩০২৫

বাজার কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক ক্ষেত্রেই ছোটদের অসম্মান, নারীদের প্রতি অবজ্ঞা, শ্রমজীবীদের অবহেলা কিংবা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রতি কটাক্ষের নজির দেখা যায়। এমনকি সন্তানদের সাথে বাবা-মায়ের রূঢ় ব্যবহার কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুর্ব্যবহারও দুঃখজনকভাবে বেড়েছে। আবু জার (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম, কোন ধরনের গোলাম মুক্ত করা উত্তম? তিনি বলেন, 'ওই গোলাম মুক্ত করা উত্তম, যে মুনিবের কাছে অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যদি তা করতে না পারি। তিনি বলেন, 'তাহলে অন্যের কাজে সাহায্য করবে অথবা কর্মহীনের কাজ করে দেবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি এমন কোনো কাজ করতে অক্ষম হই? তিনি বলেন, 'তোমার মন্দ আচরণ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখবে। এই হলো তোমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সদকা।'[৭৭৫]

প্রত্যেক মানুষকে পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করতে হবে, এটাই ইসলামের বিধান। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'হে ওই সব মানুষ! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে প্রোথিত হয়নি, তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিয়ো না, তাদের ভর্ৎসনা করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করো না। কেননা যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ায়, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন, তাকে অপদস্থ করবেন, সে তার বাড়িতে অবস্থান করলেও।'[৭৭৬]

তবে অতিরঞ্জিতভাবে কারো সম্মান করা বা প্রশংসা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এমনকি কারো সামনাসামনি প্রশংসা করাও নিষিদ্ধ। কেননা এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে অহংকার তৈরি হয়। আর কারো অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অহংকারের শেষ পরিণতি জাহান্নাম। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইজার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোনো একটি নিয়ে আমার সঙ্গে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। অন্য বর্ণনায় আছে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।' কারো সামনে কিংবা পেছনে অতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন রাসুল (স.)। তিনি বলেন, কারো সামনে তার প্রশংসা করা তার পিঠে ছুরি মারা বা তার গলা কেটে ফেলার সমান। তবে প্রশংসাকৃত ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে এবং এতে তার কল্যাণের

---

৭৭৫ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (রহ.), *সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ*, অনু. মোহাম্মদ খালেদ, ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ১২০

৭৭৬ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللِّسَانِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِالْقُلُوبِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّبُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنِ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ "),আবু দাউদ, *সুনান আবু দাউদ*, কিতাব: আল-আদব, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হা. ৪৮৮০

সম্ভাবনা থাকলে প্রশংসা করা যেতে পারে। অন্যদিকে বয়স অনুপাতে মানুষের প্রতি পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করা উচিত। এই মর্মে হাদিসে এসেছে, রাসুল (স.) বলেছেন, ' যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[৭৭৭]

মহানবী (সা.) আরো বলেন, যে আমাদের বয়োবৃদ্ধদের সম্মান করে না, সে আমাদের (ইসলামি) দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।"...। [৭৭৮]

শুধু ছোট বা বড়দের ক্ষেত্রে নয়, ধনী-গরিব, ব্যবসায়ী-চাকরিজীবী, উঁচু-নিচু তথা সমাজের সর্বস্তরে পারস্পরিক মান-মর্যাদা প্রদান করা হলে একদিকে যেমন ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে সে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

১.৫ মাদক, অশ্লীলতা ও অপরাধবিরোধী ইসলামী আন্দোলন

সমাজে মাদক, অশ্লীলতা ও অপরাধ শুধু ব্যক্তি নয়, গোটা জাতির নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম এ সকল পাপ কাজের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে।[৭৭৯] কুরআনে বলা হয়েছে,

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা, ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর এসব শয়তানের কাজ; সুতরাং এগুলো থেকে দূরে থাকো যাতে তোমরা সফল হও।"[৭৮০]

মাদক সেবন শুধু হারাম নয়, বরং তা জ্ঞান, বিবেক ও শরীরকে ধ্বংস করে। এর মাধ্যমে মানুষ নামাজ-রোজা ভুলে যায়, অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, এমনকি খুন ও ধর্ষণের মতো ভয়ংকর কাজে লিপ্ত হয়। অশ্লীলতা সমাজে যিনার দরজা খুলে দেয়, যা পরিবার ভাঙনের অন্যতম কারণ। আল্লাহ বলেন,

"তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।"[৭৮১]

বর্তমানে টিভি, ওয়েব সিরিজ, ইউটিউব ও সামাজিক মাধ্যমের অশ্লীল কনটেন্ট তরুণদের মনে যে বিকৃতি সৃষ্টি করছে, তা কেবল আইন দিয়ে নয় দীন দিয়ে রোধ করাই জরুরি।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

---

৭৭৭ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَا يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا) ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-আদাব, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হা. ৬১৪৯

৭৭৮ (مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا) ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব: আল-আদাব, বেইরুত: দারুল কিতাব আল-'আলমিয়্যাহ, ২০০০, হাদীস নং ২৩১৮

৭৭৯ Afzalur Rahman, *Islam: Faith and Practice*, Seerah Foundation Pakistan, 1991, pp. 47-78,https://books.google.com.bd/books?id=2njqEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

৭৮০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ),আল কুর'আন, ৫:৯০

৭৮১ আল কুর'আন, ১৭:৩২

"যে ব্যক্তি তোমাদের মাঝে কোনো অন্যায় দেখে, সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিরোধ করে। যদি সে না পারে, তবে মুখে প্রতিবাদ করুক; তাও না পারলে অন্তরে ঘৃণা করুক এটাই ঈমানের দুর্বলতম স্তর।"[৭৮২]

এইসব সামাজিক ব্যাধির প্রতিকারে প্রয়োজন সম্মিলিত ইসলামী আন্দোলন যেখানে মসজিদ, মাদ্রাসা, পরিবার, স্কুল, শিক্ষক, আলেম ও প্রশাসন একত্র হয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে। ইসলামী সভা, খুতবা, সেমিনার, সাহিত্য ও দাওয়াহের মাধ্যমে তরুণদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফেরাতে হবে। পাশাপাশি হালাল বিনোদন, খেলাধুলা ও সমাজসেবায় তরুণদের ব্যস্ত রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. ঈমান ও আমলের সমন্বয় ঘটানো

ঈমান হলো সকল প্রকার নেক আমলের মূলভিত্তি। প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রথম এবং একমাত্র দাওয়াতই ছিল ঈমানের দাওয়াত। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর বান্দার ভালো কর্মগুলো এর ওপর ভিত্তি করেই পৌঁছায়। তাই ঈমান একজন ব্যক্তির সবচাইতে অমূল্য সম্পদ। কারণ ঈমান হারা ব্যক্তি মৃত্যুর পরের জীবনে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে । সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে ঈমান ছাড়া মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার জন্য অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"[৭৮৩] আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ۝

" নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোত্তম।"[৭৮৪]

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ঈমানের সঙ্গে আমল অবিচ্ছেদ্য। আল্লাহ আরও বলেন:

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۝

"সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, তবে তারা নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে।"[৭৮৫]

২. হাদীসের আলোকে আমলের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

"ঈমানের সত্তর-অধিক শাখা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কিছু সরানো।"[৭৮৬] এখানে দেখা যাচ্ছে, ঈমানের প্রতিটি স্তর কোনো না

---

৭৮২ (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ), ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব: আল-ইমান, বেইরুত: দারুল কিতাব আল-'আলমিয়্যাহ, ২০০০, হা. ৭১

৭৮৩ আল-কুর'আন, ৫: ৭২

৭৮৪ আল-কুর'আন, ৯: ৭

৭৮৫ আল-কুর'আন, ১০: ১-৩

কোনো আমলের সাথে যুক্ত। তিনি আরও বলেন: " মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র ও আচার-আচরণ উত্তম।"[৭৮৭]

অর্থাৎ আমল ছাড়া ঈমানের পূর্ণতা হয় না। জীবনের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হওয়ার জন্য এসবের বাস্তব প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই। নিম্নে ঈমান ও আমলের সমন্বয়ের ধারাবাহিক প্রায়োগিক স্তরগুলো উল্লেখ করা হলো,

২.১ ইসলামের প্রথম ভিত্তি ঈমান

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথমটি হ'ল ঈমান তথা 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল' এই সাক্ষ্য দেওয়া। ইবনু ওমর (রা.) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. ছলাত প্রতিষ্ঠা করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৭৮৮]

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমার পূর্বে আমরা এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যার নিকটে এই অহি করিনি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর'।[৭৮৯] অন্য আয়াতে প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই'।[৭৯০] রাসূল (স.)-এর প্রথম দাওয়াতও ছিল ঈমানের। তিনি বলতেন, তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'। ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত ইখলাছ তথা ঈমানআল্লাহর নিকটে আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হ'ল ঈমান আনয়ন করা। কেননা ঈমানহীন আমল পত্র-পল্লবহীন নেড়া বৃক্ষের ন্যায়, যা কোন উপকারে আসে না। মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি, পুরুষ হোক বা নারী, সৎকর্ম করবে এবং সে ঈমানদার হবে, আমরা তাকে সুনিশ্চিতভাবে নৈতিক ও পূর্ণ জীবন দেবে এবং তাদের আমল অনুযায়ী

---

৭৮৬ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلْإِيمَانِ سَبْعِينَ شُعْبَةً أَعْلاَهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِالطَّرِيقِ), ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব: আল-ইমান, বেইরুত: দারুল কিতাব আল-'আলমিয়্যাহ, ২০০০, হা. ৭

৭৮৭ (أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا), ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-আদাব, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হা. ৬১৮৪, ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব: আল-ইমান, বেইরুত: দারুল কিতাব আল-'আলমিয়্যাহ, ২০০০, হা. ৭২

৭৮৮ (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّمُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ), ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-ইমান, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হা. ৮, ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব: আল-ইমান, বেইরুত: দারুল কিতাব আল-'আলমিয়্যাহ, ২০০০, হা. ২০

৭৮৯ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ), আল-কুর'আন, ২১: ২৫

৭৯০ (يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ), আল-কুর'আন, ৭:৫৯

উত্তম প্রতিদান প্রদান করব।"[৭৯১] ঈমানদারদের জন্য রয়েছে হেদায়াত ও দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা। ঈমানের আলোচনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন, 'এরাই হ'ল তাদের প্রতিপালকের প্রদর্শিত পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই হ'ল সফলকাম'।[৭৯২] মহান আল্লাহ বলেন, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন'।[৭৯৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ'[৭৯৪] তিনি বলেন, যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব ।'[৭৯৫] ঈমান মুমিনকে জান্নাতের পথ দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাদের ঈমানের মাধ্যমে নে'মতপূর্ণ জান্নাত সমূহের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়' [৭৯৬] মুজাহিদ (রা.) বলেন, তাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করবেন ফলে তারা সে আলোতে আলোকিত হয়ে পথ চলতে পারবে। পথ দেখানোটা দুনিয়া ও আখেরাতে হবে। দুনিয়াতে জান্নাতের পথ, ক্ষমার পথ দেখাবেন (আন'আম ৬/১২২, শুরা ৪২/৫২, হাদীদ ৫৭/২৮)।

ক্বাতাদা ও ইবনু জুরাইজ বলেন, ঈমানদারের আমল তার জন্য সুন্দর আকৃতি ও সুগন্ধিযুক্ত বাতাসের আকৃতি ধারণ করবে, আর যখন সে কবর থেকে উঠবে তখন তার সম্মুখীন হয়ে তাকে যাবতীয় কল্যাণের সুসংবাদ জানাবে। সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার আমল। তখন তার সামনে আলোর ব্যবস্থা করবে যতক্ষণ না সে জান্নাতে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য তার আমল কুৎসিত আকৃতি ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে আসবে এবং তার সার্বক্ষণিক সাথী হবে যতক্ষণ না সে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া। তাই রাসূল (স.) মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তথা ঈমানের তালক্বীন দেওয়ার

---

৭৯১ (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.), আল-কুর'আন, ১৬: ৯৭

৭৯২ (أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ), আল-কুর'আন, ২:৫

৭৯৩ (وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ), আল-কুর'আন, ৫: ৯

৭৯৪ (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ), আল-কুর'আন, ৬৪: ১১

৭৯৫ (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ), আল-কুর'আন, ১৬: ৯৭

৭৯৬ (اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ), আল-কুর'আন, ১০: ৯

নির্দেশ দিয়েছেন। ঈমানদার ব্যক্তিগণ মৃত্যুর সময় প্রশান্তি লাভ করবে। ত্বালহা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, 'আমার এমন একটি কালেমার কথা জানা আছে, যা কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় পাঠ করলে, তা তার চেহারাকে উজ্জ্বল করে এবং আল্লাহ তা'আলা তার থেকে বিপদাপদ দূর করে দেন' তাহলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। ঈমান অবস্থায় কারো মৃত্যু হ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু'আয বিন জাবাল (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, 'যার শেষ কথা 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে মৃত্যুর সময় সত্যচিত্তে অন্তর দিয়ে (ইখলাছের সাথে) এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। ঈমান অবস্থায় মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে আল্লাহ জান্নাত দিবেন। আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে ব্যক্তি এ বিষয় দু'টোর প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৭৯৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল' যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ এ কথা দু'টোর উপর ঈমান রেখে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না'।[৭৯৮] ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা থেকেও মুমিনগণ মুক্ত থাকবেন। আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের আগে ইয়ামান থেকে এক বাতাস প্রবাহিত করবেন যা হবে রেশম অপেক্ষাও নরম। যার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে তার রূহ ঐ বাতাস কবয করে নিয়ে যাবে'।[৭৯৯] ক্বিয়ামতের দিন ঈমানদারগণ আলো লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, 'যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের দেখবে তাদের সম্মুখে ও ডানে তাদের ঈমানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। (এ সময় তাদের) বলা হবে, তোমাদের জন্য আজ সুসংবাদ হ'ল জান্নাতের, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা'[৮০০]

২.১.১ ঈমান অনন্য নিয়ামত

---

৭৯৭ (مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ) ইমাম আবুল হুসাইন ইবন হাজ্জাজ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব: আল-ঈমান, অধ্যায়: ঈমান, বেইরুত: দার ইহইয়াউত-তুরাছিল আরাবী, ১৯৯১, হা. ২৮

৭৯৮ (مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لا يَلْقَى اللَّهَ بِهَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ), ইমাম আবুল হুসাইন ইবন হাজ্জাজ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব: আল-ঈমান, অধ্যায়: ঈমানের ব্যাখ্যা, বেইরুত: দার ইহইয়াউত-তুরাছিল আরাবী, ১৯৯১, হা. ২৭

৭৯৯ (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ رِيحًا مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْ), ইমাম আবুল হুসাইন ইবন হাজ্জাজ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব: আল-ফিতান, অধ্যায়: বাতাস প্রেরণ করা হবে যা মুমিনদের প্রাণ কবয করবে, বেইরুত: দার ইহইয়াউত-তুরাছিল আরাবী, ১৯৯১, হা. ২৯১৪

৮০০ (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ), আল- কুর'আন, ৫৭: ১২

ঈমান আল্লাহ প্রদত্ত এক অনন্য নিয়ামত! এই নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকে ধন্য ও সম্মানিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

'তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না, বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন।'[৮০১] ঈমানের দৌলত প্রদান করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর মহা অনুগ্রহ করেছেন! চিরকালীন জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন! কেননা, বেঈমান কাফেররা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে! তারা চিরকাল দোজখের শাস্তি ভোগ করবে! আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি! পক্ষান্তরে তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[৮০২]

২.১.২ শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড ঈমান

দুনিয়া আমাদের গন্তব্য নয়; বরং এটি একটি পরীক্ষাগার যেখান থেকে সফল হয়ে আমাদের পরকালের গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। ইসলামে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে বলা হয়নি, বরং দুনিয়াকে আখিরাতের জন্য ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হওয়ার ইসলাম-সমর্থিত একমাত্র মানদণ্ড হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন ও মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত ও রিসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অবিশ্বাসী বেঈমান কাফেরদের সৃষ্টির নিকৃষ্ট ও বিশ্বাসী মুমিন মুসলমানদের সৃষ্টির উৎকৃষ্ট আখ্যায়িত করে আল্লাহ বলেছেন, 'আহলে-কিতাব ও পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির উত্তম!'[৮০৩]

২.১.৩ ঈমানের স্তম্ভসমূহ

ঘর ও ভবনের যেমন স্তম্ভ ও খুঁটি রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ঈমানেরও স্তম্ভ ও খুঁটি রয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের স্তম্ভগুলো যত বেশি শক্তিশালী রূপে পাওয়া যাবে সেই ব্যক্তি তত বেশি পাক্কা ঈমানদার ও খাঁটি মুমিন বলে গণ্য হবে। তাই ঈমানের স্তম্ভগুলোকে শক্তিশালী ও মজবুত করা প্রত্যেক ঈমানদারের অবশ্য কর্তব্য। ঈমানের সাতটি স্তম্ভ রয়েছে। সেগুলো হলো- ১. একক উপাস্য হিসেবে

---

৮০১ (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ), আল-কুর'আন, ৪৯: ১৭

৮০২ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ), আল-কুর'আন,৩:৯১

৮০৩ (نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ), আল-কুর'আন, ৯৮: ৬-৭

আল্লাহকে বিশ্বাস করা; ২. আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; ৩. সব আসমানি কিতাবের ওপর বিশ্বাস পোষণ করা; ৪. সব নবী ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; ৫. তাকদির বা ভাগ্যের ভালো-মন্দের ওপর আল্লাহর ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা; ৬. পরকালের প্রতি বিশ্বাস লালন করা ও ৭. মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাকুল, তার কিতাবসমূহ, তার প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদির ও এর ভালো-মন্দের প্রতিও ঈমান আনয়ন করবে।'[৮০৪]

২.১.৪ ঈমান বৃদ্ধি ও কার্যকর রাখা

ঈমান হলো একজন মুসলমানের অন্তরের শক্তি, যা তার জীবনকে আলোকিত করে এবং প্রতিটি কাজের নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করে। ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়, বরং তা হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ঈমান বৃদ্ধি করার জন্য নিয়মিত কুরআন পাঠ, তফসীর ও হাদীসের অধ্যয়ন, দুআ ও স্মরণীয় জিকিরের মাধ্যমে হৃদয়কে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত রাখা অপরিহার্য। নামাজ, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জের মতো ফরজ ইবাদত যথাযথভাবে পালন করা ঈমানকে দৃঢ়তার সঙ্গে সুরক্ষিত রাখে। পাশাপাশি সদকাহ, অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সমাজে ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য, এবং কষ্ট-দুঃখের মুহূর্তে আল্লাহর ওপর ভরসা ঈমানকে প্রাণবন্ত রাখে। নেক কাজ ও ঈমানদার মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া হৃদয়কে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে। অন্যদিকে, গোনাহ, অনৈতিক আচরণ, অলসতা ও আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ঈমানকে ক্ষীণ করে। সুতরাং একজন মুসলমানের জন্য প্রয়োজন সতর্কতা, নিয়মিত ইবাদত ও নেক আমল, যাতে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়, দৃঢ় থাকে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে তার জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হয়।

২.১.৫ ঈমান সফল হওয়ার মাধ্যম

ইসলামের অনুসারী মুমিন মুসলমান ছাড়া অন্য সব মানুষ অনন্তকাল দোজখের আগুনে দগ্ধিভূত হবে। কুরআন শরিফে এসেছে, 'যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে সফল হয়ে যাবে।'[৮০৫] অপর দিকে, ঈমানদার মুমিন মুসলমানদের সফল হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'মুমিনগণ সফল হয়ে গেছে'।[৮০৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

---

৮০৪ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল- ঈমান, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হা. ১

৮০৫ (مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ), আল-কুর'আন, ৬: ১৬

৮০৬ (قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ), আল-কুর'আন, ২৩: ১

'যারা ঈমান আনয়ন করেছে সেসব বিষয়ের ওপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের ওপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর পরকালকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।'[৮০৭]

২.২ আমলের গুরুত্ব

মানুষের আমল পবিত্র হয় বিশুদ্ধ নিয়ত, হালাল জীবিকা ও জীবনযাপনের মাধ্যমে। অন্তরের ব্যাধি, অবৈধ উপার্জন ও হারাম কাজ মানুষের জীবন ও আমল কলুষিত করে। আল্লাহ কলুষিত আমল গ্রহণ করেন না। একাধিক স্থানে মুমিনদের হালাল জীবিকা গ্রহণের নির্দেষ দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসুলদের যা করার আদেশ করেছেন, মুমিনদেরও সেই কাজের আদেশ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো এবং নেক কাজ করো।"[৮০৮]

তিনি আরো বলেন, "হে মুমিনরা! তোমাদের আমি যেসব পবিত্র বস্তু জীবিকা হিসেবে দিয়েছি, তা থেকে আহার করো।"[৮০৯] নেক আমলের মাধ্যমে মানুষের দুনিয়ার জীবন যেমন সুখী ও প্রশান্তিময় হয়, তেমনি আখেরাতের জীবনও হয় ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ এবং নেয়ামতে পরিপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যে নারী বা পুরুষ ঈমানদার অবস্থায় নেক আমল করবে অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম আমলের প্রতিদান দেব।"[৮১০]এ জন্য আমাদের উচিত নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিকির, তেলাওয়াত, তাসবি-তাহলিল, দান-সদকা ইত্যাদি নেক আমল সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পালন করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁর ওপর অটল-অবিচল থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করত।"[৮১১]

---

৮০৭ (أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ), আল-কুর'আন, ২: ১৬

৮০৮ (يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ), আল-কুর'আন, ২৩:৫১

৮০৯ (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ), আল-কুর'আন, ২: ১৭২

৮১০ (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ), আল-কুর'আন, ১৬: ৯৭

৮১১ (وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ), আল-কুর'আন, ২৯: ৭

২.৩ নিয়মিত ও স্থায়ী আমল পছন্দনীয়

নিয়ম মেনে যেকোনো আমল নিয়মিত করা ছিল প্রিয় নবী (স.)-এর পছন্দের শীর্ষে। হজরত মাসরুক বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবীজি (স.)-এর কাছে কোন আমল সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল? তিনি বললেন, 'নিয়মিত আমল'। আর কেনইবা নিয়মিত আমল তাঁর প্রিয় হবে না, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কাছেও তা সর্বাধিক প্রিয়। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আল্লাহর কাছে কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যে আমল সর্বদা করা হয় চাই তা কম হোক'। আরেক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমরা সত্যের ওপর অবিচল থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা কাউকে তার আমল জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, আপনাকেও না? বললেন, না, আমাকেও আমল জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপন রহমত দ্বারা পরিবেষ্টন করবেন।

মনে রেখো, আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে পছন্দের আমল হলো যা নিয়মিত করা হয় যদিও তা পরিমাণে হয় অল্প।' মুমিন বান্দার লক্ষ্য থাকে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাই স্বভাবগতভাবেই আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ জেনে সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে। কেননা একজন মুমিনের সার্থকতা তার প্রভুর সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত। প্রত্যেক মুমিনের উচিত যেভাবে ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন সে সম্পর্কে ধারণা রাখা। অনেক ইবাদত একসঙ্গে নয়, বরং ধারাবাহিক আমলের প্রতি উৎসাহিত করেছেন রাসুলুল্লাহ (স.)। কেননা আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়মিত ইবাদতই অধিক পছন্দনীয়। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) শাবান মাসে যত সিয়াম পালন করতেন, সারা বছরে অন্য কোনো মাসে তিনি এত অধিক সিয়াম পালন করতেন না। আর তিনি (লোকদের উদ্দেশে) বলতেন, তোমরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যত বেশি পারো আমল করো। কেননা আল্লাহ তাআলা (তোমাদের সওয়াব দানে) ক্লান্ত বা বিরক্ত হবেন না, যতক্ষণ তোমরা অক্ষম হয়ে না পড়বে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে, যা কোনো বান্দা অব্যাহতভাবে করে থাকে যদিও তা পরিমাণে কম হয়। নিয়মমাফিক চেষ্টা এবং নিশ্ছিদ্র সাধনা মানুষকে উচ্চতার শিখরে নিয়ে যায়। সে কাজেই বরকত নিহিত যা নিয়মমাফিক করা হয়।[৮১২] একইভাবে অধিক পরিমাণে আমলের চেয়ে অল্প ধারাবাহিক আমলই আল্লাহর কাছে প্রিয়। এই ধারাবাহিকতার মাধ্যমে বান্দা বিশেষ স্তরে পৌঁছার সুযোগ পায়। অন্যথায় গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব হয় না।

---

৮১২ ড. ইউসুফ আল-কারযাবী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

যেকোনো জিনিস অর্জন করতে হলে সে কাজে অধ্যবসায় থাকতে হবে। আর তখনই তার লক্ষ্য অর্জিত হবে। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে এমন আমল সবচেয়ে প্রিয় যা কম হলেও স্থায়ীভাবে করা হয়। হাদিসের বর্ণনাকারী কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, আয়েশা (রা.) কোনো আমল শুরু করলে তা স্থায়ী ও অবশ্যকরণীয় করে নিতেন। প্রিয়নবী (স.) সাহাবিদের আমল শুরু করে আবার ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (স.) আমাকে বলেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না, সে রাত জেগে ইবাদত করত, পরে রাত জেগে ইবাদত করা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ আমরা জানি যে, ছোট ছোট অনেক আমল আছে, যা নিয়মিত করলে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। যেমন (১) 'যে ব্যক্তি সময়মতো নামাজ আদায়ে যত্নবান হয়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর প্রতিশ্রুতি' (২) 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে এবং একাগ্রচিত্তে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত'। (৩) 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করবে, তার জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা নেই'। (৪) নবীজি (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উভয় ঠোঁটের মধ্যভাগ (জিহ্বা) ও দুই রানের মধ্যভাগ (লজ্জা স্থান) হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব'। এছাড়াও রাসুল (স.) বলেন, 'আমি ও এতিমের লালনপালনকারী জান্নাতে একসঙ্গে এমনভাবে থাকব..'।[৮১৩] সুতরাং নিয়মিত এতিমের লালন করার দায়িত্বও নেওয়া যায়। দান-সদকা, মা-বাবার সেবা, ইলম অর্জন এবং আসমাউল হুসনা আয়ত্ত করাও জান্নাতের পথকে সুগম করে।

২.৪ সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন

মানব জীবনে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তি পর্যায় থেকেই নৈতিকতার বিকাশ জরুরি। ইসলামের শিক্ষায় বলা হয়েছে, একজন মুমিন কেবল ইবাদতকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তার চরিত্র, আচার-আচরণ, সততা, পরোপকারিতা, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং দায়িত্ববোধের মাধ্যমেই সমাজে আলোকিত হবে। কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "আর উত্তম কাজ ও মন্দ কাজ সমান নয়। তুমি মন্দকে এমনভাবে প্রতিহত কর, যা সর্বোত্তম। তখন দেখবে, তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে।"[৮১৪] অর্থাৎ, নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সামাজিক

---

৮১৩ (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال: وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما شيئًا), মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: জাকাত, অধ্যায়: এতিম লালন-পালনকারীর ফজিলত, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হা. ২৪০৫

৮১৪ (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ), আল-কুর'আন, ৪১:৩৪

জীবনেও কল্যাণ ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের চরিত্র, আচরণ, মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ইতিবাচক ও কল্যাণমুখী হয়ে ওঠে। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে শুধু নিজের জন্য নয়, বরং সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করে। তাই ব্যক্তিগত নৈতিকতা সমাজের সামগ্রিক অবস্থাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ইসলামের আলোকে সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো তাকওয়া, ইনসাফ, পরোপকার, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও অন্যের হক আদায়। আবার নৈতিক উন্নয়ন মানে হলো সত্যবাদিতা, আমানতদারী, নম্রতা, ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্বশীলতার মতো গুণাবলি অর্জন করা। যখন ব্যক্তি তার নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তখন সে অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, মিথ্যার পরিবর্তে সত্য প্রচার করে, হিংসা-বিদ্বেষের পরিবর্তে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব ছড়িয়ে দেয়। ফলে সমাজে ন্যায়বিচার, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। নৈতিকতার অভাবে সমাজে দুর্নীতি, অবিচার, শোষণ, সহিংসতা ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়, যা সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। কিন্তু ইসলামী নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে আধ্যাত্মিক শক্তি জোগায় এবং মানবিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানবিক মূল্যবোধ ও চারিত্রিক উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন। ইসলামী শিক্ষার আলোকে যদি সমাজ পরিচালিত হয়, তবে নৈতিকতা ও সামাজিক উন্নয়ন হাত ধর-াধরি করে একটি কল্যাণময় সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

এর পাশাপাশি ইসলামে বাবা-মার প্রতি দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বারবার তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন: "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি।"[৮১৫] বাবা-মা সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক, তাদের অবদানের বিনিময় কোনভাবেই শোধ করা সম্ভব নয়। তাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, তাদের সাথে দয়া, ভদ্রতা, সম্মান ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করা সন্তানের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, শহরকেন্দ্রিক জীবন ও কর্মজীবী সন্তানদের কারণে অনেক বাবা-মা একাকীত্বে ভুগছেন। পরিবারে দ্বন্দ্ব, অর্থ, সম্পদ, শিক্ষা, বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে মা-বাবা ও সন্তানদের মাঝে মতপার্থক্য বাড়ছে। সন্তান যেন নিজের জীবন গঠনের পাশাপাশি বাবা-মার খেদমত করে পিতা-মাতাও যেন সন্তানকে বোঝে, প্রজ্ঞাবান হয়, তাদের সিদ্ধান্তে অংশ নেয়। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি (সাহাবি) রাসুল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন, 'যথাসময়ে নামাজ আদায় করা, মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায়

---

৮১৫ (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ), আল-কুর'আন, ২৯:৮

জিহাদ করা[৮১৬]।' ইসলাম মা-বাবাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। মা-বাবার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে কথা বলো সম্মানসূচক নম্রভাবে'[৮১৭] মা-বাবার প্রতি সন্তানদের বিনয়াবনত থাকার এবং মা-বাবার জন্য দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাকো এবং বলো- হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন'[৮১৮]।

কুরআনে বহু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বারবার মা-বাবার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে অংশীদার স্থাপন করো না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো'[৮১৯]।

রাসূল (স.) মা-বাবার মর্যাদা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সা:! মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা হকদার ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তারপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপর তোমার বাবা'[৮২০]। ক্ষেত্র বিশেষে জিহাদে অংশগ্রহণ করার চেয়ে মা-বাবার খিদমতকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবী (স.)-এর নিকট এলো। এরপর সে তাঁর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইল। তখন তিনি

---

৮১৬ (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ), ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রহ.), *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: নামাজ, অধ্যায়: নামাজের গুরুত্ব ও সদাচরণ, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হাদীস নং ৫৫১

৮১৭ (تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا قَوْلًا كَرِيمًا), আল-কুর'আন, ১৭: ২৩

৮১৮ (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا), আল-কুর'আন, ১৭: ২৪

৮১৯ (اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا), আল-কুর'আন, ৪: ৩৬

৮২০ (جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟), মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-বিতর, অধ্যায়: পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হাদিস নং ৫৯৮১

বললেন, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তাদের উভয়ের (খেদমত করো) সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করো'।

বৃদ্ধাবস্থায় মা-বাবার খেদমাত করার ফজিলত যে কত বেশি তা উপলব্ধি করা যায় রাসূলের এই হাদিস থেকে। হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'নাক ধূলিমলিন হোক, আবারো নাক ধূলিমলিন হোক, আবারো নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তির, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেলো অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।[৮২১]

সন্তানের জন্য মা-বাবা আল্লাহর দেয়া অনেক বড় নিয়ামত। প্রতিটি সন্তানের উচিত হবে মা-বাবার সাথে সদয় ব্যবহার করা, মা-বাবার খেদমত করে জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করার চেষ্টা করা।

২.৫ আখিরাতের মুক্তির শর্ত

আখিরাতে মুক্তি প্রত্যেক মুসলিমের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পবিত্র কুরআনে এসেছে, হে আমাদের রব! তুমি নিশ্চয়ই মানুষদেরকে একদিনে একত্রিত করবে, সে দিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।[৮২২] এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে আখিরাতের প্রতিশ্রুতি অবধারিত, এবং সেই দিনে আল্লাহর ন্যায়বিচার ও রহমতের উপর নির্ভর করাই মুক্তির একমাত্র পথ। পৃথিবীতে মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরকাল চিরস্থায়ী। প্রকৃত সাফল্য কেবল আখিরাতে মুক্তি লাভের মধ্যে নিহিত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুক্তি লাভের জন্য কয়েকটি মূল শর্ত নির্ধারিত রয়েছে, যা পূরণ না হলে মানুষ আখিরাতে ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

১. তওবা ও আত্মশুদ্ধি

তওবা ও আত্মশুদ্ধি একে অপরের পরিপূরক। ইসলামে তওবা মানে হলো অতীতের পাপ ও ভুল থেকে অন্তরের সতর্ক অনুতাপ প্রকাশ করা, এবং ভবিষ্যতে সেই পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন নফস) হলো নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ থেকে বিরত থাকা, এবং হৃদয়কে পবিত্র করা।

তওবা মুমিনের আত্মশুদ্ধি নিশ্চিত করে, কারণ অনুতাপ ও সংকল্পের মাধ্যমে অন্তর পাপ থেকে মুক্ত হয়। কুর'আনে আল্লাহ বলেন,

---

৮২১ أَشْحَطُ الْأَنْفُ أَشْحَطُ الْأَنْفُ أَشْحَطُ الْأَنْفُ قيل: يا رسول الله، من؟ قال: الذي أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاالجنة), মুহাম্মদ ইবন ঈসমাঈল ইমাম তিরমিজি, *সুনান তিরমিজি*, কিতাব: আল-বিতার, অধ্যায়: পিতামাতার সম্মান ও সদ্ব্যবহার, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০২,হা. ১৯৪৭

৮২২ (رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ), আল-কুর'আন, ৩: ৯

"যারা পাপ করে, তারপর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, আমি তাদের তওবা কবুল করি।"[৮২৩]

অতএব, আত্মশুদ্ধি ও তওবা একত্রিত হলে মুমিনের হৃদয়কে পবিত্র ও স্থির রাখা সম্ভব হয়, যা আখিরাতে মুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তওবা ছাড়া মুক্তি পাওয়া কঠিন।

তওবা শুধু মুখে নয়; হৃদয়ের অনুতাপ ও ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়। আত্মশুদ্ধি বা নফসের পরিশোধন আখিরাতে মুক্তির অন্যতম ভিত্তি। ইসলামী দর্শনে আত্মশুদ্ধি হলো অন্তরের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, কুপ্রবৃত্তি ও পাপ থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমল অনুশীলনের মাধ্যমে হৃদয়কে পবিত্র করা। কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই সে সফল হবে, যার নফসকে পরিশোধন করা হয়েছে।" [৮২৪]

এতে বোঝা যায়, যিনি নিজের নফস পরিশোধন করেন, তার জন্য আখিরাতে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত।

২. ঈমানের দৃঢ়তা

ঈমানের দৃঢ়তা হলো একজন মুসলিমের বিশ্বাসের এমন এক অবস্থা যেখানে হৃদয়, জ্ঞান ও আচরণ সবমিলিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অটল ও স্থির থাকে। এটি কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তি বা নামাজ-রোযার মতো ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি কর্মকাণ্ডে ঈমানের প্রতিফলন দেখা দেয়।

ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করলে একজন ব্যক্তি পরীক্ষা, বিপদ, প্রলোভন ও নানান ধরনের সামাজিক ও নৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে স্থির থাকে। কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।" [৮২৫]

অতএব, ঈমানের দৃঢ়তা একজন মুসলিমকে শয়তানের ফাঁদ, অনৈতিক প্রলোভন ও অন্তরের দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে। এটি আত্মশুদ্ধি এবং তওবার সঙ্গে মিলিত হয়ে মুমিনকে আখিরাতে মুক্তি ও সাফল্যের পথ দেখায়। মুক্তির প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ ঈমান। কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান আনল এবং সৎকাজ করল, তারা জান্নাতের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" [৮২৬]

এখানে স্পষ্ট যে ঈমান ছাড়া মুক্তি অসম্ভব। ঈমান শুধুই মুখে স্বীকার নয়, হৃদয় ও কাজে তার বাস্তবায়ন আবশ্যক।

---

৮২৩ (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا), আল-কুর'আন, ৪: ১৭

৮২৪ (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا), আল-কুর'আন, ৯১:৯

৮২৫ (وَلِلَّهِ عِقْبَى الدِّينِ ۖ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا), আল-কুর'আন, ১৫:৪৯

৮২৬ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ), আল-কুর'আন, ২:৮২

৩. সৎকর্ম (আমলে সালেহ)

আখিরাতে মুক্তির আরেকটি শর্ত হলো মানুষের হক আদায় করা। হাদীসে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন সর্বাধিক দেউলিয়া সেই ব্যক্তি হবে, যে নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি আমল করেছে, কিন্তু অন্যকে গালি দিয়েছে, কারও সম্পদ হরণ করেছে বা রক্ত ঝরিয়েছে। তখন তার আমল অন্যদের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং নিজের পাপ তার ঘাড়ে ফিরে যাবে। (মুসলিম) ইখলাস (নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা): যে আমলে রিয়া থাকে, তা আখিরাতে কোনো ফল বয়ে আনে না। আল্লাহ বলেন, "তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা খাঁটি নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত কর।" [৮২৭]

মুক্তির জন্য প্রয়োজন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা। ঈমান ও আমল একে অপরের পরিপূরক। কুর'আনে বলা হয়েছে, "যে পুরুষ বা নারী ঈমানসহ সৎকর্ম করে, আমি তাকে সুন্দর জীবন দান করব এবং কিয়ামতের দিনে তার আমলের উত্তম প্রতিদান দেব।"[৮২৮]

সৎকর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ইবাদত, ন্যায়বিচার, দান-সদকা, মানুষের হক আদায় ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা।

৪. আল্লাহর রহমত প্রাপ্তি

আখিরাতে আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রাপ্তি মুসলিম জীবনের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। ইসলামে বোঝার্নো হয়েছে যে, মানবজাতির অবশ্যম্ভাবী দুর্বলতা ও ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, যারা তওবা করে, আল্লাহর কাছে দোয়া করে এবং সৎকর্মের মাধ্যমে নিজের অপরাধ কমানোর চেষ্টা করে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা অসীম দয়া প্রদর্শন করেন। কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি যারা তওবা করে মাফ চায় তাদেরকে ক্ষমা করি এবং যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মী, তাদের জন্য মহান প্রতিদান স্থির করি।"[৮২৯] আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির জন্য মুমিনদের উচিত সদা তওবা করা, অন্তরের দুর্বলতা সচেতন হওয়া, এবং নিয়মিত ইবাদত ও নেক আমল চালিয়ে যাওয়া। এই রহমত কেবল অতীত পাপের ক্ষমা নয়, বরং ভবিষ্যতের প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে স্থিরতা ও সহিষ্ণুতা অর্জনে সাহায্য করে। এক কথায়, আখিরাতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা অর্জন হলো মুমিনের চূড়ান্ত মুক্তি, শান্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তির প্রধান লক্ষ্য। আখিরাতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার প্রাপ্তি মুসলিম জীবনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্যগুলোর একটি। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, মানুষ জন্মগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং পাপপ্রবণ; তাই তওবা, ইবাদত ও সদকাসহ নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা অপরিহার্য। কুর'আনে আল্লাহ বলেন,

---

৮২৭ (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ), আল-কুর'আন, ৯৮:৫

৮২৮ (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ), আল-কুর'আন, ৪:৯৭

৮২৯ (فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ), আল-কুর'আন, ৫:৩৯

"আর তোমার রব তোমাদের জন্য যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে ক্ষমাশীল, দয়ালু। যদি কেউ পাপ করে তারপর তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [৮৩০] আল্লাহর রহমতের জন্য তওবা কেবল অতীত পাপ মাফ করাই নয়, বরং ব্যক্তির অন্তরের সংশোধন ও নৈতিক উন্নয়নের পথও সুগম করে। নবী করিম (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মুমিন হোক বা নেক কাজের মাধ্যমে তার জীবন পরিচালনা করে, আল্লাহ তাকে কৃপা ও ক্ষমার মাধ্যমে আখিরাতে মুক্তি দান করবেন। এই রহমত শুধু ব্যক্তিগত আখিরাতের স্বার্থে নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, সদাচরণ ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের প্রেরণাও হিসেবে কাজ করে। ফলে, মুমিনের জন্য আখিরাতে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার প্রাপ্তি হলো ঈমানের দৃঢ়তা, তওবা ও নেক আমলের ফলস্বরূপ অর্জিত সর্বোচ্চ মর্যাদা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

"তোমাদের কেউই তার আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আমি-ও নয়, যদি না আল্লাহ আমাকে আচ্ছাদিত করেন।"[৮৩১]

অতএব মুক্তির জন্য আমল অপরিহার্য হলেও চূড়ান্ত সফলতা নির্ভর করে আল্লাহর রহমতের উপর।

৩. ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন

ইসলামী শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং তা মানুষের চরিত্র গঠন, নৈতিক উন্নয়ন ও আল্লাহর প্রতি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করার পথ। ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন মানে হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যা মানবজীবনের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কে লক্ষ্য করে। বর্তমান বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যক্রম এবং মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষা প্রসার ঘটানো হলেও এর বাস্তবায়ন এখনো পূর্ণতা পায়নি। ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো ইবাদত ও আখলাক কেন্দ্রিক মানুষ গড়ে তোলা। এজন্য পাঠ্যবইয়ে ইসলামী মূল্যবোধ যুক্ত করা, শিক্ষকদের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইবাদত ও নৈতিকতা চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত একটি একীভূত ইসলামি শিক্ষা নীতি অনুসরণ করলে সমাজে আদর্শবান, দায়িত্বশীল ও আত্মসচেতন প্রজন্ম তৈরি হবে। ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন কেবল একজন ব্যক্তির আত্মশুদ্ধিই নিশ্চিত করে না, বরং একটি গোটা জাতির চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতিকে আলোকিত করে তোলে।

---

৮৩০ (وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا), আল-কুর'আন, ৪:১১০

৮৩১ (لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ وَلا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَطَّى اللَّهُ عَلَيَّ), মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আত-তমানী আদাবুল-মু'মিন, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হাদীস নং ৬৬১০

৩.১ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ সময়ের দাবিতে এক অনিবার্য বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানবিপ্লব, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ও কর্মজীবনমুখী দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে যদি ইসলামী শিক্ষা পিছিয়ে পড়ে, তবে শিক্ষার্থীরা সমাজে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়ে পড়বে। সুতরাং, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ মানে কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি অক্ষুণ্ন রেখে পাঠ্যক্রমে আধুনিক বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, ভাষাশিক্ষা এবং জীবনদক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা। একইসাথে, ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করাও অপরিহার্য। যেমন, মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি আধুনিক ও ইসলামি শিক্ষার সংমিশ্রণের আদর্শ উদাহরণ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কওমি ও আলিয়া মাদরাসা উভয় ধারায় একীভূত পাঠ্যক্রম চালু করা, দারসি কিতাবসমূহকে যুগোপযোগী করা এবং শিক্ষার্থীদের আরবি, ইংরেজি ও কম্পিউটার শিক্ষায় দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক ইসলামি কেন্দ্র, ইসলামি অনলাইন শিক্ষা অ্যাপ, ওয়ার্কশপ এবং জাতীয় পর্যায়ের ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে সরকার, আলেম সমাজ ও শিক্ষাবিদদের সমন্বিত প্রয়াসই পারে একটি বলিষ্ঠ, প্রগতিশীল ও আলোকিত ইসলামি শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে।

৩.২ জাতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা

জাতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা একটি সময়োপযোগী, নৈতিকতানির্ভর এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বর্তমান সমাজে যে নৈতিক অবক্ষয়, অপরাধপ্রবণতা, অশ্লীলতা ও ধর্মীয় বোধহীনতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ হলো শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার দুর্বল উপস্থিতি।[৮৩২] ধর্মীয় শিক্ষা কেবল ইবাদতের সীমায় নয়, বরং মানুষের চারিত্রিক গঠন, আত্মশুদ্ধি, দায়িত্ববোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির ভিত্তি। কুর'আনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

অর্থ-"আল্লাহ তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।"[৮৩৩] এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, জ্ঞান ও চরিত্রের পরিপূর্ণতা আনতে ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য।

---

৮৩২ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, প্রথম প্রকাশ:২০০৭, পৃ. ৭

৮৩৩ (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّب), আল-কুর'আন, ৬২:২

বাংলাদেশের সংবিধানের ৮(১) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক নীতি হলো "নৈতিকতা" এবং "মানবিক মূল্যবোধ" সংরক্ষণ ও বিকাশ। তাই জাতীয় পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে তাদের ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা, বিশ্বাস ও সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি হবে। বিশেষত, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষাকে মূল্যায়নযোগ্য ও জীবনের প্রয়োগযোগ্য করে তোলা প্রয়োজন, যাতে তা শুধু আনুষ্ঠানিকতা না হয়ে বাস্তব জীবনের নির্দেশনায় পরিণত হয়। এক্ষেত্রে ইসলামি ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্যও নিজ নিজ ধর্মভিত্তিক পাঠ্যক্রম উন্নয়ন জরুরি, যাতে বাংলাদেশ একটি ধর্মভিত্তিক সহনশীল, নৈতিক এবং আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।[৮৩৪]

৩.৩ নারীর শিক্ষা ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামী নির্দেশনা অনুসরণ

ইসলাম নারীকে জ্ঞানের অধিকার, মর্যাদা ও আত্মমর্যাদাশীল জীবনের অধিকার দিয়েছে এমন এক যুগে, যখন নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত দুর্বল। কুরআনে ও হাদীসে নারীর শিক্ষা ও সম্মান রক্ষায় যে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা মানবাধিকার ও সমাজবিকাশের অন্যতম ভিত্তি। ইসলাম নারীকে জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে এবং তার মর্যাদা রক্ষায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। কুর'আনে আল্লাহ বলেন,"পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৮৩৫] এ আয়াত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ বহন করে। রাসূল (স.) বলেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের (নারী-পুরুষ) উপর ফরজ।"[৮৩৬] ইসলামী সভ্যতায় নারীরা ছিলেন শিক্ষার অগ্রভাগে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) ছিলেন বহু হাদীসের বর্ণনাকারী ও ফিকহবিদ, যাঁর নিকট সাহাবাগণও জিজ্ঞেস করতেন। এই শিক্ষাদর্শ বাংলাদেশেও নারীর উন্নয়নের অনুকূল ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে রয়েছে কিছু কাঠামোগত ও সামাজিক সমস্যা। একদিকে রয়েছে দরিদ্রতা, বাল্যবিয়ে, পারিবারিক অনিচ্ছা ও ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা যা নারীর শিক্ষায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়; অন্যদিকে তথাকথিত আধুনিকতাবাদ, অশ্লীলতা, নারীর অবাধ মিশ্রণ ও পণ্যিকরণ নারী মর্যাদার প্রকৃত রক্ষার পরিবর্তে তার মানসিক ও আত্মিক ক্ষতি সাধন করছে। ইসলাম নারীর পর্দা, সম্মান, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষা করে যা তাকে সম্মানজনক জীবনযাপন ও সমাজে অবদান রাখার পথ দেয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারীর ইসলামসম্মত শিক্ষা, নারীবান্ধব পরিবেশ, পর্দা সম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে শরিয়াহভিত্তিক নৈতিক গাইডলাইন সংযোজন করা উচিত।

---

৮৩৪ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৩

৮৩৫ (اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ), আল-কুর'আন, ৯৬: ১

৮৩৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ, *সুনান ইবন মাজাহ*, বেইরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯১, হা. ২২৫

ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরা যেমন আলোকিত পরিবার গড়তে সক্ষম, তেমনি তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক কারিগর হিসেবে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারে। সুতরাং, ইসলামী নির্দেশনার আলোকে নারীর শিক্ষা ও মর্যাদা রক্ষা বর্তমান বাংলাদেশের জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩.৪ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা সহজলভ্য করা

তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইসলামী শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অভাবনীয় মাত্রায়। অতীতের তুলনায় আজ ইসলামি জ্ঞান, কুরআন-হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকীদা, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ অনেক সহজ ও দ্রুততর হয়েছে প্রযুক্তির কল্যাণে। এখন অনলাইন মাদ্রাসা, ইউটিউব চ্যানেল, ইসলামিক অ্যাপস, ওয়েবসাইট, ই-লাইব্রেরি, ভার্চুয়াল হালকাহ, পডকাস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বমানের ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। যেমন: Bayyinah TV, Quran.com, Al-Madina Institute, SeekersGuidance ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম যেমন কাজ করছে, তেমনি বাংলাভাষায় Peace TV Bangla, হুজুরদের ওয়াজ ইউটিউব চ্যানেল, ইসলামী বইয়ের PDF আর্কাইভ ইত্যাদি ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। এই সহজলভ্যতার পেছনে মূল চালিকা শক্তি হলো ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মাধ্যম। বাংলাদেশেও ই-তালিম প্ল্যাটফর্ম, মাদ্রাসাভিত্তিক অনলাইন ক্লাস, ফেসবুক লাইভ লেকচার, অনলাইন হিফজ ও আরবি শেখার কোর্স ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিয়া মাদ্রাসা পর্যায়ে ডিজিটাল কনটেন্ট, প্রেজেন্টেশন ও মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।[৮৩৭]

তবে এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করতে হলে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশুদ্ধ, সহিহ জ্ঞানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি এবং তা যাচাই-বাছাই করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ প্রযুক্তি যেমন ভালো কাজে লাগতে পারে, তেমনি বিভ্রান্তিমূলক কনটেন্টের দ্বারাও বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাকে সহজলভ্য করার পাশাপাশি উলামায়ে কেরাম, আলেম-শিক্ষক ও প্রযুক্তিবিদদের যৌথ সহযোগিতা নিশ্চিত করাও অপরিহার্য।

৩.৫ ইসলাম ও বিজ্ঞানকে একসাথে প্রচার

ইসলাম ও বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে সৃষ্টিজগৎ, মহাকাশ, জীববিজ্ঞান, সমুদ্র, ভ্রূণতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলির যে উল্লেখ রয়েছে, তা মানব জাতিকে পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও গবেষণার প্রতি আহ্বান জানায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা কি

---

৮৩৭ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৭৬

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করো না?"[৮৩৮] আবার কুরআনে বলা হয়েছে: "আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছের প্রশস্ত, যাতে তোমরা এতে চলাফেরা করো ও তাঁর রিজিক ভোগ করো।"[৮৩৯] এ আয়াতগুলো মানুষকে প্রকৃতি ও বাস্তবতাকে জানার জন্য উৎসাহিত করে, যা বিজ্ঞানের মূল প্রেরণা।

বাংলাদেশে ইসলাম ও বিজ্ঞানকে একসাথে প্রচারের সুযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ, ধর্মভিত্তিক স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির কুদরতের ব্যাখ্যা, এবং দাওয়াতি খুৎবা ও লেকচারে কুরআন-বিজ্ঞান সামঞ্জস্য আলোচনা এসব উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মাঝে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে গিয়ে ইসলামের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা তুলে ধরলে তারা দ্বীনের প্রতি অনুরাগী হয়। বাংলাদেশে কওমি, আলিয়া ও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটি সমন্বিত মডেল গঠন করে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণার অনুশীলন চালু করা জরুরি।

এছাড়া অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ইউটিউব চ্যানেল, বিজ্ঞান ও ইসলামভিত্তিক সেমিনার, পাবলিক লেকচার, এবং ইসলামি সায়েন্স প্রজেক্ট প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে এই দুই শাখাকে একত্রিত করে নতুন প্রজন্মকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও আলোকিত চিন্তা-চেতনায় গড়ে তোলা সম্ভব। ইসলাম যে বিজ্ঞানবিমুখ নয় বরং জ্ঞান ও গবেষণার ধর্ম এই বোধ তৈরিই হতে পারে আধুনিক যুগে ইসলামের সত্যতা প্রচারের একটি দৃঢ় হাতিয়ার।

৪. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের জীবনযাত্রা ও সমাজ ব্যবস্থাকে ন্যায়পরায়ণ ও সুষ্ঠু রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ অর্জনের নিয়ম নির্ধারণ করে না, বরং তা সম্পদ ব্যবহার ও বিতরণের নৈতিক দিকও নির্দেশ করে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ব্যাঙ্কিং ও দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারাম বিষয় আলাদা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ করা, ন্যায়পরায়ণ ও স্বচ্ছ বাণিজ্য নিশ্চিত করা, দারিদ্র ও সমাজের অসহায়দের প্রতি সদকাহ ও জাকাত প্রদান এসব মূলনীতি ইসলামী অর্থনীতির ভিত গঠন করে। ইসলামী সংস্কৃতি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজস্ব লাভের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সমাজের কল্যাণ ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া, সততা, অচোরাচারহীনতা, প্রতারণা ও অসততার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন ইসলামী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই নীতিমালা

---

৮৩৮ (أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ), আল-কুর'আন, ৪০:৬৭

৮৩৯ (هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖوَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ), আল-কুর'আন, ৬৭:১৫

অনুসরণ করলে ব্যক্তি ও সমাজ দু'জনই নৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধর্ম ও নৈতিকতার সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৪.১ মুয়ামালাত ও আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা

সাম্প্রতিক কালে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে আর্থিক লেনদেন বা মুয়ামালাত বিষয়টি বর্তমান সময়ে বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

'মুয়ামালাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ লেনদেন। পণ্যসামগ্রী বিনিময় বা যেকোনো ধরনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয়, বিক্রয়, সমন্বয়, উপহার ও অনুদান ইত্যাদি বিষয়ে লেনদেনকে মুয়ামালাত বলে। মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম ছিল খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা।

মহানবী (সা.)-এর ব্যবসায় লেনদেন নির্ভেজাল ব্যবসার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ব্যবহারকারীর সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে সর্বদা স্বচ্ছতা এবং তাঁর পরিপূর্ণ সততা তাঁকে ইসলামপূর্ব যুগে আল আমিন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

মুয়ামালাতের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো হলো- বিশ্বাস ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানবজাতির মর্যাদাপূর্ণ অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ইসলামী আইন সব সময় মানুষের মনন ও কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলা আনয়নে গুরুত্বারোপ করে থাকে। মুয়ামালাত এ ক্ষেত্রে মানবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশে ভূমিকা পালন করে। মুয়ামালাত যেকোনো বিনিময় কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সততা, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়।[৮৪০] প্রাত্যহিক লেনদেনসহ শরিয়াহ যেকোনো বিষয়ে সীমা লঙ্ঘনকে মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।'[৮৪১]

মুয়ামালাত মানুষকে ব্যাবসায়িক লেনদেনে উৎসাহিত করে, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করে। মহানবী (স.) ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে বলেছেন, 'জীবিকার ১০ ভাগের মধ্যে ৯ ভাগই রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে।'[৮৪২] লেনদেনের ক্ষেত্রে পক্ষদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি এড়াতে মুয়ামালার মূলনীতি কিছু মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করে। পক্ষরা যদি

---

৮৪০ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানি, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের ইসলামি রূপরেখা*, অনু মাওলানা মুহাম্মদ ছলিমুল ওয়াহেদ, ঢাকা: মদীনা কুতুবখানা, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৩৪

৮৪১ (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ), আল-কুর'আন, ২: ১৯০

৮৪২ (إِنَّ مَا تَسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ), আল-নুরি আল-হাকিম, *মুস্তদরাক আল-হাকিম*, কিতাবুল বুয়ু, বাংলা অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, হা. ২৮১০

লেনদেনের ক্ষেত্রে এগুলো অনুধাবন করে তাহলে তারা যেকোনো ধরনের অপরাধ, অসততা ও জালিয়াতি প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'যতবার তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন এবং তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়; আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের ভালোবাসেন না।'[৮৪৩] ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠা বজায় রাখা উচিত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে' মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম ওপরিণামে উৎকৃষ্ট।'[৮৪৪] লেনদেনের ক্ষেত্রে বেআইনি পথ পরিহার করে বৈধতার ধারা বজায় রাখতে হবে। লেনদেন চুক্তিতে চুক্তির কোনো শর্ত বা বিধান ভঙ্গ করার পরিণতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ থাকতে হবে।

মুয়ামালাতের বিধান মোতাবেক যেকোনো লেনদেনের পক্ষগুলোর ওপর চুক্তি পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।'[৮৪৫] যেকোনো পক্ষ লেনদেনের কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পক্ষকে শর্ত ভঙ্গের পরিণতি ভোগ করতে হবে। শাস্তি হিসেবে তা হতে পারে কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদন, কোনো ক্ষতি স্বীকার, কোনো সুবিধা বা অধিকারের মেয়াদ স্থগিতকরণ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

মুয়ামালাতের বিধান সম্পৃক্ত পক্ষদের অধিকার ও দায়িত্ব নিরূপণ ও কার্যকর করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। একটি চুক্তিভিত্তিক লেনদেনে এক পক্ষের দায়িত্ব মূল্য পরিশোধ করা এবং অন্য পক্ষের দায়িত্ব পণ্য বা মালামালের মালিকানা হস্তান্তর করা। এভাবে চুক্তিভুক্ত পক্ষরা নির্ধারিত শর্তাবলি পালন করতে বাধ্য থাকে। মুয়ামালাতে উভয় পক্ষ এভাবে দায়বদ্ধ থাকে যেকোনো পক্ষ চুক্তিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে যেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ঐশী বিধানের সব দিক মেনে যেকোনো লেনদেন চুক্তি সম্পাদনে শরিয়াহ সবার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে। চুক্তিভুক্ত পক্ষের মধ্যে এ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। কেননা আল্লাহ চান না মানুষ কোনো অসুবিধায় পড়ুক। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক তা চান না।'[৮৪৬] পক্ষদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা লালন করা লেনদেন চুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কেননা, পারস্পরিক উপকারের স্বার্থেই মানুষ লেনদেন করে। আর এ থেকেই লেনদেনে সম্পৃক্ত পক্ষগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের জাগৃতি ঘটে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না; অবশ্য তোমরা মিলেমিশে পারস্পরিক

---

৮৪৩ (كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ), আল-কুর'আন, ৫: ৬৪

৮৪৪ (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا), আল-কুর'আন, ১৭: ৩৫

৮৪৫ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ), আল-কুর'আন, ৫: ১

৮৪৬ (اللَّهُ يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ),আল-কুর'আন, ২: ১৮৫

সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করতে পারো। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা কোরো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।'[৮৪৭]

৪.২ মু'আমালাতের গুরুত্ব

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একজনকে অপরের ওপর নির্ভরশীল করে। এটা সত্য যে, কোনো মানুষের পক্ষে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু অর্জন সম্ভব নয়। একজনের যা রয়েছে, সে তা অন্যের জন্য ছেড়ে দিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তারও এমন জিনিসের প্রয়োজন হতে পারে, যা পেতে তাকে তা ক্রয় করতে হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে পণ্যসামগ্রী ও সেবা পরস্পরের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় করাকে উৎসাহিত করেছেন। এটা এ জন্য যে, এ ধরনের লেনদেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে এবং মানুষকে উৎপাদনশীল কাজে উৎসাহিত করে। আরবদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন ও বিনিময়ের প্রচলন ছিল। মহানবী (স.) এসব লেনদেনের যেগুলো শরিয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় সেগুলো অনুমোদন ও নিশ্চিত করেছেন। আর যেগুলো আংশিক বা পুরোপুরি শরিয়ার বিপরীত সে ধরনের চুক্তি নিষিদ্ধ করেছেন। এসব নিষিদ্ধ হওয়ার কতগুলো নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বেআইনি খাদ্যের ব্যবসা, প্রতারণানির্ভর লেনদেন, আত্মসাৎ বা অতিরিক্ত লাভ কিংবা চুক্তির যেকোনো পক্ষের প্রতি অবিচার ইত্যাদি।

৪.৩ মু'আমালাতে যা নিষিদ্ধ

মুয়ামালাতের মধ্যে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হলো- কোনো নিষিদ্ধ পণ্য যেমন: মদ, শূকরের গোশত বা অন্য কোনো নিষিদ্ধ পদার্থ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করা যাবে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনরা! তোমাদের আমি যে পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তা থেকে আহার করো এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, আর তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো।'[৮৪৮] এ আয়াত এটাই নির্দেশ করে যে কোনো নিষিদ্ধ বস্তু বা মালামাল গ্রহণের অধিকার মানুষের নেই।

৪.৪ জাকাত, ফিতরা ও ওয়াক্ফ ব্যবস্থার উন্নয়ন

ইসলামে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠায় জাকাত, ফিতরা ও ওয়ক্ফের গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো শুধুমাত্র দান-খয়রাত নয়, বরং সমাজের দুর্বল ও অসহায় মানুষের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা এবং সাম্য নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

---

৮৪৭ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا), আল-কুর'আন, ৪: ২৯

৮৪৮ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ), আল-কুর'আন, ২: ১৭২

জাকাত

ইসলামে জাকাত হলো অর্থনৈতিক শুদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এটি মুসলিমদের জন্য ফরজ ইবাদত, যা তাদের ধনসম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, দীনহীন এবং সমাজের অনাহুত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেয়। জাকাত কেবল দানের মাধ্যমে অর্থ প্রদান নয়, বরং এটি ব্যক্তির আত্মাকে ধন-পদার্থের আসক্তি থেকে মুক্ত করার, নৈতিক মানসিকতা গড়ে তোলার এবং আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সমাজে জাকাতের সঠিক প্রয়োগ অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে, দরিদ্রদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে এবং সম্পদের ন্যায্য পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করে। আধুনিক সময়ে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও স্বচ্ছ হিসাব ব্যবস্থার মাধ্যমে জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ আরও কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক করা সম্ভব, যা সমাজে সামাজিক ন্যায় ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

ফিতরা

ফিতরা হলো রমজান মাসে যাকাতুল ফিতরের মাধ্যমে দরিদ্র ও অভাবী মুসলমানদেরকে সাহায্য করার একটি ইসলামী ব্যবস্থা। এটি শুধু সমাজে দারিদ্র্য দূর করার একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি ইবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা রমজানের রোযার সমাপ্তি এবং ঈদের আনন্দের অংশ। ফিতরার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়, কারণ ধনী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য প্রদান করে গরিবদের জীবনমান উন্নয়নের অংশীদার হয়।[৮৪৯] ফিতরার সঠিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সামাজিক সেবাকে কার্যকর করে তোলে এবং মুসলিম সমাজে আত্মীয়তা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

ওয়াক্‌ফ

ওয়াকফ হলো ইসলামে একটি ধরণের স্থায়ী দান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যা সামাজিক কল্যাণের জন্য সংরক্ষিত হয়। এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দরিদ্রদের সাহায্য, মসজিদ নির্মাণ এবং বিভিন্ন দানের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। ওয়াকফ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। এটি ব্যক্তিগত দানের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সমাজের বড় ধরণের প্রকল্পগুলোকে স্থায়ীভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। প্রভাবশালী ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করা মানে হলো সাম্য, ন্যায় এবং সামাজিক কল্যাণের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা।

---

৮৪৯ M.U. Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, 1992

৪.৫ মজুদদারী

প্রাত্যহিক লেনদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্য। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে পণ্য ও মূল্যে যৌক্তিক বিনিময় আদান প্রদান হওয়া কাম্য হওয়া সত্ত্বেও যখন বিক্রেতা অতি মুনাফার লোভে চড়া মূল্যে বিক্রয় করার জন্য পণ্য সামগ্রী কুক্ষিগত করে, তখন একে বলে মজুদদারি। এর ফলে পণ্যের মূল্য বেড়ে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইসলাম এ সমস্যা সমাধানে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলাম মজুদদারিকে হারাম ঘোষণা করত: অতি মুনাফা অর্জনের মানসিকতা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে। মজুদদারির কারণে কোন ভাবেই যেন জনজীবন বিপর্যস্ত না হয়ে পড়ে, সে জন্য কুরআন ও হাদিসে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতে মজুদদারির ভয়াবহ শাস্তির কথা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান প্রভু কোরআনে কারিমে ঘোষণা করেন,'যে ব্যক্তি সেখানে (মক্কায়) অন্যায়ভাবে কোনো ধর্মদ্রোহী কাজ (মজুদদারি) করতে চাইবে আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।'[৮৫০] এ আয়াতে ধর্মদ্রোহী কাজ বলে এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী মজুদদারি ব্যবসা বোঝানো হয়েছে। পণ্য সামগ্রী আটকে রাখার ফলেও একই রকম সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সম্পদ পুঞ্জীভূতকারী এবং পণ্য মজুদকারী সমান অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়কে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনও মজুদদারির বিষয়ে কঠোর ছিলেন। খলিফা উমর (রা.) ব্যবসায়ীদের পণ্য মজুদকরণ সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের বাজারে কেউ যেন পণ্য মজুদ করে না রাখে। যাদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ আছে তারা যেন বহিরাগত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সমস্ত খাদ্যশস্য কিনে তা মজুদ করে না রাখে। যে ব্যক্তি শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট সহ্য করে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য নিয়ে আসে সে উমরের মেহমান।[৮৫১] অতএব সে তার আমদানির খাদ্যশস্য যে পরিমাণে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারবে, আর যে পরিমাণে ইচ্ছা রেখে দিতে পারবে"। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলিম সম্প্রদায়ের খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখবে আল্লাহ তাকে দুরারোগ্য ব্যাধি ও দারিদ্র্য দিয়ে শাস্তি দিবেন"।[৮৫২]

---

৮৫০ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُتْبَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَسَيُذِيقُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا), আল-কুর'আন, ২২: ২৫

৮৫১ মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, অনু. মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৮ খ্রি, পৃ. ৫৯

৮৫২ (مَا أَكْثَرَ النَّاسُ يَجْمَعُونَ الطَّعَامَ وَيَسْتَغْنُونَ بِهِ فَيَمْنَعُونَهُ عَنِ النَّاسِ فَيُصِيبُهُمُ اللَّهُ بِالْجُوعِ وَالْبَأْسِ), মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, খণ্ড: ৩, দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হাদিস নং ১৪৭৭, ইবনুল হজ্জাজ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, খণ্ড: ২, দার আল-ফিকর, ১৯৯১, হাদিস নং ১০৫৬

৪.৬ সুদভিত্তিক চুক্তি নিষিদ্ধ

ইসলামে সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।'[৮৫৩] সুদ ঈমান ও নৈতিকতা ধ্বংসকারী, নৈতিকতা বিরোধী আয়, বৈষম্যপূর্ণ মুনাফা সৃষ্টিকারী, দ্রব্যমূল্য বর্ধক, অন্যায়ভাবে অসংখ্য বার মুনাফা অর্জনে সহায়তাকারী, বিনিময়নীতি পরিপন্থী, বিনিময় বৈষম্য সৃষ্টিকারী, অযৌক্তিক বিনিময়, বিনিয়োগ প্রতিবন্ধক, মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিকারী, মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, জনস্বার্থ বিরোধী, এতে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বর্জিত, গরীবের স্বার্থ উপেক্ষিত, সৎ চরিত্রের প্রতিবন্ধক, বিবেকবিবেচনার পরিপন্থী, খারাপ চরিত্রের ফলশ্রুতি, মহৎ গুণাবলী হ্রাস কারক, দুশ্চিন্তার উদ্রেক, অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা মূলমন্ত্র, শান্তি ও স্বস্তি পরিপন্থী, শোষকগোষ্ঠীর উদ্ভব, হিংসাবিদ্বেষ সৃষ্টিকারী, সামাজিক অবক্ষয়ের বাহন, দরিদ্রতার পৃষ্ঠপোষক, শোষকদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিকারী, কৃপণতার জনক, বেকারত্ব বর্ধক, কর্মবিমুখতা সৃষ্টিকারী, শ্রমিক শ্রেণীর বঞ্চিত হওয়া, ধনসম্পদ ঘাটতি হওয়া, ধনসম্পদ বণ্টনে বৈষম্য, উৎপাদনে অন্তরায় সৃষ্টিকারী, শ্রমজীবীদের শ্রমে অনিহা সৃষ্টিকারী, শ্রমিকের মজুরি হ্রাসকারী। মোটকথা সুদপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম উপাদান হিসেবে পরিগণিত।

৪.৭ জুয়াসংশ্লিষ্ট চুক্তি ইসলামে নিষিদ্ধ

মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং কিছুটা উপকার; কিন্তু এর উপকারের চাইতে গুনাহ বেশি।'[৮৫৪]

যেসব চুক্তির মধ্যে অনিশ্চয়তা বা ধোঁকার অস্তিত্ব আছে, তা নিষিদ্ধ এবং বড় ধরনের ধোঁকা বা অনিশ্চয়তা (গারার) সম্পৃক্ত চুক্তি ত্রুটিপূর্ণ এবং বাতিল বলে গণ্য। যেসব বস্তুর কোনো ব্যবহার নেই বা মূল্য নেই তা উৎপাদন বা বিক্রয় করাও ইসলামে নিষিদ্ধ।

৪.৮ ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক মডেল বিস্তৃত করা

ইসলামী ব্যাংকিং হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ করে এবং ন্যায্যতা, সহযোগিতা ও ঝুঁকি ভাগাভাগির নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে সুদ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে- "যারা সুদ খায় তারা কবর থেকে উঠবে ঐ ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান পাগল করে দিয়েছে।"[৮৫৫] ইসলামী ব্যাংকিং তাই মুনাফা ও ক্ষতি উভয় ভাগাভাগির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এতে মুদারাবা,

---

৮৫৩ (وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا), আল-কুর'আন, ২: ২৭৫

৮৫৪ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا), আল-কুর'আন, ২: ২১৯

৮৫৫ (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا), আল-কুর'আন, ২: ২৭৫

মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা ইত্যাদি চুক্তি ব্যবহৃত হয়, যা ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী স্বচ্ছ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৮৫৬]

অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং শুধু সুদহীন লেনদেনেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সমাজকল্যাণ, সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথ সুগম করে। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত, ফিতরা ও ওয়াকফ সামাজিক নিরাপত্তা জালের ভূমিকা পালন করে, যা দরিদ্র বিমোচন ও আর্থিক বৈষম্য কমাতে সহায়তা করে। এই হাদীস ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটি প্রতিফলিত করে।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বহু দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মূলধন ও আমানত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ইসলামী ফাইন্যান্সের সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৮৫৭] এই অগ্রগতি প্রমাণ করে যে ইসলামী ব্যাংকিং শুধু ধর্মীয় বিকল্প নয়; বরং এটি বিশ্ব অর্থনীতির একটি শক্তিশালী ও নৈতিক মডেল।

তাছাড়া ইসলামী অর্থনীতি আজকের বৈষম্যপূর্ণ বিশ্বে একটি সমাধানমুখী দর্শন উপস্থাপন করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেখানে সুদ ও শোষণের কারণে দরিদ্র ও ধনী শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য বাড়াচ্ছে, সেখানে ইসলামী অর্থনীতি ন্যায্যতা, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণকে সর্বাগ্রে রাখে। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক মডেল বিস্তৃত করা শুধু মুসলিম সমাজের জন্য নয়, বরং পুরো মানবজাতির জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক ও স্থায়ী অর্থনৈতিক সমাধান হতে পারে।

৫. ইসলামী সংস্কৃতির সক্রিয়তা

ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প- সাহিত্য, রীতি-নীতি, জীবন পদ্ধতি ইত্যাদি কোন কিছু চর্চাকেই নিরুৎসাহিত করে না। ইসলামী সংস্কৃতির মূলনীতি ও মূল্যবোধ বিশুদ্ধ, যথার্থ, মহান ও সার্বজনীন। অর্থাৎ এটি এমন এক সংস্কৃতি যার মূলনীতি এতই বিশুদ্ধ যাতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। আর এটি এমন একটি সার্বজনীন সংস্কৃতি যা কোন দেশ, জাতি, ভাষা, বর্ণে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী সংস্কৃতি একটি মানবতাবাদী সংস্কৃতি। মহান আল্লাহর বাণী "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, যে তোমাদের মধ্যে খোদাভীরু"[৮৫৮] ইসলামী সংস্কৃতি একজন

---

৮৫৬ Islamic Financial Services Board (IFSB), Islamic Financial Stability Report 2020, M.N. Siddiqi, *Banking Without Interest*, 1983, Islamic Foundation

৮৫৭ Report of Islamic Financial Services Board, 2020

৮৫৮ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ), আল-কুর'আন, ৪৯:১৩

মুসলমানকে আনুগত্যশীল করে তোলে। সে আরো বেশি রাসূল (স.) এর সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করতে তৎপর হয়।

৫.১ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলা

আমাদের দেশের সরকারি ও বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোকে অধিকতর সক্রিয় করে তুলতে হবে। বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়ের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতা অব্যশই এ দেশের অধিকাংশ জনগণের বিশ্বাস ও চেতনার সপক্ষে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এসব প্রতিষ্ঠান ভিনদেশী সংস্কৃতি নিয়ে যতটা সক্রিয় ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ে ততটা উদাসীন। জনগণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানকে জনকল্যাণমুখী ও ইসলামী সাংস্কৃতিক বিষয়কে লালন করার জন্য ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের জন্য মিডিয়া একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া ছাড়া সংস্কৃতি বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। সরকারি মিডিয়া বিশেষ করে রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি বেসরকারি মিডিয়া গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক বিশ্বে মিডিয়া সুবাদে অপসংস্কৃতি যে ভাবে মুসলমানদের ঈমান আকিদাকে ধ্বংস করছে তার মোকাবেলায় ইসলামী অনুষ্ঠান মানা অর্থাৎ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে বেসরকারি চ্যানেলের কোনো বিকল্প নেই। চারু ও কারুকলার বিস্তার : মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যপ্রিয়। মানুষের এই শিল্প চেতনা যেন কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় সে জন্যই ইসলামী চারু ও কারুকলার বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন।

একজন মানুষের ঘরে প্রবেশ করলে বুঝা যায় লোকটি কোন প্রকৃতির। কেউ বা মূর্তি দিয়ে, আবার কেউবা সাজায় ফুল শোভায় বা ক্যালিগ্রাফিতে। এ জন্য চারু ও কারুকলা শিল্পে ইসলামের ছোঁয়া থাকলে মানুষ অশ্লীলতা থেকে এবং এমনকি প্রচ্ছন্ন শিরক থেকে রক্ষা পেতে পারে। সামাজিকভাবে ইসলামী আবহ সৃষ্টির জন্য। তাই চারু ও কারু শিল্পের ব্যাপক চর্চা হওয়া প্রয়োজন।[৮৫৯]

৫.২ সাহিত্য চর্চা

আধুনিক বিশ্বে মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বোধ সৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যে মাধ্যমটি তা হচ্ছে সাহিত্য, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ছড়া, এসব নান রকম ফর্মে সাহিত্যচর্চা চলে। শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সাহিত্যের কোনো না কোনো ফর্মের প্রতি আগ্রহ পোষণ করবে এবং সাহিত্য পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এভাবে পড়ার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারাই তার জীবনবোধ গড়ে

---

৮৫৯ আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৪

ওঠে।[৮৬০] ফলে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হলে ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী সাহিত্যের চাহিদা যত বাড়বে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকরা ততবেশি আগ্রহী ও সচেষ্ট হবে। তাই আমাদের মাসিক বাজেটে চাল-ডালের মত বই ক্রয়েরও একটি পরিকল্পনা করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ চাল-ডাল আমাদের দেহের ক্ষুধা মেটায় আর বই মেটায় আমাদের মনের ক্ষুধা।

৫.৩ ক্রীড়া, আনন্দ ও প্রতিযোগিতা

ইসলাম বাস্তববাদী জীবনবিধান। তা মানুষকে অবাস্তব কল্পনা বিলাস ও নানা চিন্তা ভাবনার পরিবেষ্টনে আবদ্ধ করে রাখতে ইচ্ছুক নয়। বরং এ বাস্তবতার পৃথিবীতে ঘটনাপ্রবাহের আবর্তনের মধ্যে সুষ্ঠু রূপে বসবাস করার রীতি ও পদ্ধতিই ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয়। তা মানুষকে নভোমণ্ডলে বিচরণকারী ফেরেশতা মনে করে কর্মবিধান তৈরি করেনি। খাদ্য-পানীয় গ্রহণকারী ও হাটে বাজারে বিচরণকারী মানুষ মনে করেই তার জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে। ইসলাম মানুষকে প্রকৃতি ও স্বভাবগত ভাবধারার উপর পুরো মাত্রায় লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এভাবে যে, পানাহার যেমন তার প্রকৃতির চাহিদা তেমনি আনন্দ-স্ফূর্তি ও সন্তুষ্টি-উৎফুল্লচিত্ত হয়ে থাকা এবং হাসি-তামাশা-খেলা ইত্যাদিও তার প্রকৃতিগত ভাবধারা হয়ে রয়েছে। এ সত্য কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। আনন্দ-স্ফূর্তি ও ক্রীড়ার বহু প্রকার ধরন ও পদ্ধতি এমন রয়েছে যা নবী করীম (সা.) মুসলমানদের জন্য জায়েজ করেছেন। এসব ক্রীড়া মানুষকে ইবাদত ও কর্তব্য পালনে- এসব কাজে তৎপরতা সহকারে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এসব শরীর চর্চামূলক ক্রীড়ার সাহায্যে শক্তিবর্ধক ট্রেনিং লাভ করতে পারে।

কিছু শর্ত পালনের মাধ্যমে সহজেই শরীর চর্চা বিষয়ক কর্মে অংশগ্রহণ করা যায়। খেলাধুলা বিষয়ে শরিয়তের কতিপয় শর্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো: ১. খেলাধুলার কারণে নামাজ থেকে বিরত হওয়া বা বিলম্ব করা যাবে না, ২.তাতে জুয়া মদ্যপান ও অশ্লীলতা থাকতে পারবে না, ৩. খেলার সময় খেলোয়াড় ও দর্শক নিজেদের মুখকে গালাগাল, কুৎসিত-অশ্লীল কথাবার্তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখবে, ৪.পোশাক পরিচ্ছদ শালীন ও শরিয়াহ্ সীমারেখার মধ্যে হতে হবে। ৫. খেলাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীল নৃত্য ও দেহের বিশেষ অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করা যাবেনা, ৬. পুরুষ ও নারী একত্রে খেলা করা যাবে না, ৭. খেলা শরীর চর্চামূলক, গঠনমূলক, শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক হতে হবে।

সুতরাং উল্লিখিত শর্ত পরিপালন করে খেলাধুলা করতে বিধিনিষেধ নেই। তবে এসব শর্ত লঙ্ঘিত হলে কিংবা তার অংশবিশেষও ভঙ্গ করা হলে সে খেলা হারাম হয়ে যাবে যা কাম্য হওয়া উচিত নয়।

---

৮৬০ ড. এ কে এম নূরুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

৫.৪ কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠন

সব ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুসংস্কার একটি সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজের অধঃপতন ঘটায়; সমাজের মধ্যে অশান্তি ও অমঙ্গল টেনে আনে; এর কারণে সামাজিক অবক্ষয় ঘটে। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। কুসংস্কার বলতে সেসব কৃষ্টি, আচরণ, অভ্যাস, প্রথা, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে সিদ্ধ, সভ্যতা, পুণ্য ও ধর্মের অংশ মনে করা হয় অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে তা সভ্যতা ও দ্বীনের আওতায় পড়ে না।[৮৬১]

বস্তুত সেগুলো ইসলামি রীতিনীতি ও সভ্যতার পরিপন্থি বলেই বিবেচিত। হাদিসে এ জাতীয় বিষয়কেই মুহদাসাতুল উমুর (নব আবিষ্কৃত বিষয়াদি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলোর ওপর আমল করা গোমরাহি, যা ব্যক্তিকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। রাসুল (স.) সমগ্র উম্মতকে সব ধরনের কুসংস্কার ও বিদাতকে পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর ও সাহাবিদের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এতেই রয়েছে চিরকল্যাণ ও শান্তি। মূলত সুষ্ঠু ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে কুসংস্কারের মূলোৎপাটন আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব হলো কুসংস্কার বা বিদাতকে কোনোরূপ প্রশ্রয় না দেয়া।

৫.৫ ধর্মীয় কুসংস্কার ও বিদআতের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা

ধর্মীয় কুসংস্কার ও বিদআতের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা মূলত সমাজে ইসলামের সঠিক শিক্ষার বিস্তার এবং মুমিন সম্প্রদায়ের মাঝে সঠিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, কুসংস্কার ও বিদআতের কারণে সমাজে অশান্তি, বিভ্রান্তি এবং অনৈতিকতার বিস্তার ঘটে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় মুসলিমদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, কোরআন ও হাদীসে বারবার সতর্ক করা হয়েছে যে, অজ্ঞতা, প্রচলিত কুসংস্কার ও অবৈধ অনুশাসন মানুষের চিন্তা ও চরিত্রে ক্ষতি করতে পারে।

গণসচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষাগত প্রচেষ্টা, ধর্মীয় বক্তৃতা, সেমিনার ও মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সঠিক জ্ঞান বিতরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামিক কেন্দ্রগুলো এই প্রচেষ্টায় মূল ভূমিকা পালন করে। জনসাধারণকে নিয়মিতভাবে ধর্মীয় শিক্ষায় যুক্ত করার মাধ্যমে তারা কুসংস্কার ও বিদআতের সঙ্গে লড়াই করতে সক্ষম হয়। এই সচেতনতার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার, সততা, সহমর্মিতা এবং আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পায়।

সরাসরি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নবী মুহাম্মদ (স.) তার সময়ে কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারণার বিরুদ্ধে বারবার প্রচারণা চালিয়েছেন এবং মানুষকে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

---

৮৬১ আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৬-৬৭

এছাড়াও, ইসলামী ইতিহাসে বিভিন্ন মুসলিম শাসক ও আলেমগণও বিদআতের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করার মাধ্যমে সমাজে নৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করেছেন। অতএব, ধর্মীয় কুসংস্কার ও বিদআতের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা কেবল একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথও।[৮৬২] সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ কুসংস্কার ও বিদআতের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে এবং ইসলামের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়।

৫.৬ আন্তধর্মীয় সম্প্রীতিতে ইসলামী সহনশীলতা চর্চা

আন্তধর্মীয় সম্প্রীতিতে ইসলামী সহনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা মুসলিম সমাজকে নৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রদান করে। ইসলাম শুধুমাত্র নিজস্ব অনুসারীদের জন্য নয়, বরং অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে শান্তি পূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশ দেয়। কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, বিশ্বাস না রাখার কারণে কাউকে অমানবিকভাবে আচরণ করা যাবে না, বরং সৌজন্য, ন্যায়পরায়ণতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তা'আলা বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ

"হে ঈমানদারগণ! ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে সাক্ষ্য দাও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ তোমাকে ন্যায়বিচার থেকে বিরত করুক না; বরং ন্যায়বিচার কর, এটাই পরহেযগারতার জন্য অধিক উপযুক্ত।"[৮৬৩]

এছাড়াও, নবী মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন থেকেই আমরা শিখতে পারি আন্তধর্মীয় সহনশীলতার উদাহরণ। তিনি মক্কা এবং মদিনায় বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং অন্য ধর্মের মানুষের ধর্মীয়য স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। এক হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি আমার অমুসলিম (ধর্মীয় চুক্তিবদ্ধ) নাগরিককে কষ্ট দেবে, আমি কিয়ামতের দিনে তার রক্ষক হব।"[৮৬৪]

এই নির্দেশনাগুলি সমাজে শান্তি, ন্যায় ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য মুসলিমদের দায়িত্বকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। ইসলামী সহনশীলতা মানে অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান দেখানো, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সব সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করা।

---

৮৬২ আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৮৬৩ আল-কুর'আন, ৫:৮

৮৬৪ (مَنْ أَذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ), মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-আকদিয়াহ ও আহকাম্ আল-ধিম্মাহ, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হা. ৩০১৫, ইবন আল-হজ্জাজ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব: আল-সিয়ার, বেইরুত: দার আল-ফিকর, ১৯৯১, হা. ১৭৭

৫.৭ জাতীয় উৎসবে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন

জাতীয় উৎসব একটি জাতির সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক। বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান দেশে জাতীয় উৎসবগুলোতে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো বিশেষভাবে জরুরি। কারণ, ইসলাম ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিক ইবাদত নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। জাতীয় উৎসব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ যেমন পরিশুদ্ধতা, শালীনতা, মানবিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায়নীতি ও শৃঙ্খলার প্রতিফলন ঘটলে তা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস কিংবা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এমন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে যেখানে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা হবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে, এবং দোয়া মাহফিল আয়োজনের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত কামনা করা হবে। উৎসব পালনের সময় অপচয়, অশ্লীলতা বা ভোগবাদী প্রবণতা এড়িয়ে চলা ইসলামের শিক্ষা। বরং এ উৎসবগুলোতে গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য সহায়তা প্রদান, সামাজিক সংহতি জোরদার এবং মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রম চালানো ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে পারে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

"তোমরা নেকির কাজ ও আল্লাহভীতির কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর, আর গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না।"[৮৬৫]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জাতীয় উৎসবে এমন কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত যা সমাজকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে। এছাড়া, নবী করিম (স.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।"[৮৬৬]

এই হাদীসের আলোকে উৎসব পালনে অশ্লীল গান-বাজনা, বেহায়াপনা বা ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে শিক্ষণীয়, নৈতিক ও ইসলামী সংস্কৃতিনির্ভর অনুষ্ঠান আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং, জাতীয় উৎসবে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিফলিত হলে তা কেবল একটি উদযাপন নয়; বরং একটি শিক্ষামূলক, কল্যাণমুখী ও মানবিক দিকনির্দেশনায় রূপ নেয়। এটি জাতীয় পরিচয়কে ইসলামী চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে এবং সমাজে শান্তি, ন্যায় ও সাম্যের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

৫.৮ ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক গণমাধ্যমের বিস্তার

---

৮৬৫ (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ), আল-কুর'আন, ৫:২

৮৬৬ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ), মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাব: আল-আদব, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭, হা. ৬০১৮

গণমাধ্যম সমাজের চিন্তা, সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে প্রভাবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে গণমাধ্যমের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সত্য প্রচার, মিথ্যা ও বিভ্রান্তি থেকে মানুষকে দূরে রাখা এবং নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। আধুনিক বিশ্বে গণমাধ্যম মানুষের মনন ও আচরণ গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে, তাই ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক গণমাধ্যম বিস্তার আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি। কুরআনে আল্লাহ বলেন: "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না।"[৮৬৭] এই আয়াত গণমাধ্যমকে সততা ও ন্যায়ভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনের শিক্ষা দেয়। ইসলামী গণমাধ্যম কেবল খবর পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদন, বিজ্ঞাপন সব ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, টিভি অনুষ্ঠান, রেডিও, সংবাদপত্র কিংবা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক বন্ধন, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার সমাজকে ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করতে পারে।

এছাড়া গণমাধ্যমকে এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে অশ্লীলতা, সহিংসতা, গুজব কিংবা বিদ্বেষ ছড়িয়ে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি না হয়। ইসলামী ইতিহাসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবাদের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে মৌখিক প্রচার, কবিতা এবং কাহিনী বলার কৌশল ব্যবহার করেছেন, যা ছিল সে সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী যোগাযোগ মাধ্যম। আজকের প্রেক্ষাপটে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সেই ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং ইসলামভিত্তিক গণমাধ্যমের বিস্তার সমাজে সত্য, ন্যায়, মানবিকতা ও আল্লাহভীতির পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামবিরোধী প্রচারণা বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে গণমাধ্যম, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে। ইসলামকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বা পশ্চাৎপদতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের প্রচারণা মুসলিমদের আত্মপরিচয় সংকটে ফেলছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে ইসলামের প্রকৃত চিত্র বিকৃত করছে। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো শান্তি, ন্যায়বিচার, মানবপ্রেম ও সহনশীলতা। তাই ইসলামবিরোধী প্রচারণার মোকাবেলায় মুসলিম সমাজকে দ্বিমুখী কৌশল অবলম্বন করতে হবে: একদিকে ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করা, অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

---

৮৬৭ (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ), আল-কুর'আন, ২:৪২

প্রথমত, মুসলিমদের উচিত শিক্ষা, গবেষণা ও প্রামাণ্য তথ্যের মাধ্যমে ইসলামের সত্যিকারের রূপ তুলে ধরা। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন, "আর আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[৮৬৮] এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলাম মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত একটি সর্বজনীন ধর্ম। নবী মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনচরিত, তাঁর দাওয়াতের ধরণ, অমুসলিমদের প্রতি সহনশীল আচরণ এসবের উদাহরণ তুলে ধরলে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারিত বিভ্রান্তি দূর হবে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামবিরোধী প্রচারণা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের সক্রিয় ব্যবহার অপরিহার্য। টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, অনলাইন পোর্টাল, ইউটিউব এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরা যেতে পারে। আধুনিক প্রজন্মের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় ইসলামি মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে বিভ্রান্তি প্রতিরোধ সম্ভব।

তৃতীয়ত, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আলেমসমাজকে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। সঠিক তাফসীর, হাদীস শিক্ষা ও ইসলামি চিন্তাধারার আলোকে মুসলিমদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে। নবী (স.) বলেছেন,"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য উপকারী।"[৮৬৯]তাই মুসলিমদের সামাজিক ও মানবিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখার মাধ্যমে ইসলামবিরোধী প্রচারের মোকাবেলা কার্যকর হতে পারে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ইসলামকে নিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়, তার জবাব দিতে বৈশ্বিক পরিসরে সম্মেলন, সেমিনার ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, ইসলামবিরোধী প্রচারের প্রতিরোধ কেবল প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান নয়; বরং ইতিবাচক, জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের শান্তি ও সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা।

৬. চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন

ইসলামের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মহানবী (স.) পৃথিবীতে আগমন করেছেন। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির জন্য প্রয়োগ যোগ্য সার্বজনীন উত্তম আদর্শ ও কল্যাণ নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেছেন রাহমাতুললিল আলামিন মহানবী (স.)। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। তার বাণীর সার্বজনীনতার আওতায় মুমিনগণ তো বটেই, এমনকি গোটা বিশ্ব, জীব-জন্তু, কীট-প্রতঙ্গ, নিসর্গ জগত, সকল মাখলুকাত কল্যাণ ও শান্তির আশ্বাস পায়। হিম্মত, দৃঢ়তা, সাহস, ধৈর্য,

---

৮৬৮ (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ), আল-কুর'আন, ২১:১০৭

৮৬৯ (تمثلوا للناس خيرًا فمن كان نافعًا للناس فهو خيرهم), মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারি, *সাহিহুল বুখারি*, কাজি প্রকাশনী, ২০০০, "কিতাবুল আমাল," হা. ৬০২

কৃতজ্ঞতা, নির্ভরতা, ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্টি, বিপদ সহ্য করা, ত্যাগ, অল্পে তুষ্টি, স্বাবলম্বিতা, দানশীলতা, নম্রতা, উন্নতি ও অনুন্নতি, এবং ছোট ও বড় সব রকমের নৈতিক বৃত্তি, সবগুলো একসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট পাওয়া যেত। সকল বিষয়ে সঠিক মনোভাব, ও পুর্ণাঙ্গ নৈতিকতার সমাবেশ দেখা যায় একমাত্র মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনে।

৬.১ সত্যবাদিতা

আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল (স.) আমাদের যে সকল ইসলামী চরিত্রের নির্দেশ দিয়েছেন, তার অন্যতম হচ্ছে সত্যবাদিতার চরিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও।"[৮৭০]

রাসুলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, "তোমরা সততা অবলম্বন গ্রহণ কর, কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় আর পূণ্য জান্নাতের পথ দেখায়, একজন লোক সর্বদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতি অনুরাগী হয়, ফলে আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।" [৮৭১]

৬.২ আমানতদারিতা

মুসলমানদের সে সব ইসলামী চরিত্র অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার একটি হচ্ছে আমানতসমূহ তার অধিকারীদের নিকট আদায় করে দেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট আদায় করে দিতে।"[৮৭২]

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আল আমীন উপাধি লাভ করেছিলেন, তারা তাঁর নিকট তাদের সম্পদ আমানত রাখত। রাসূলুল্লাহ (স.) এবং তার অনুসারীদের মুশরিকরা কঠোর ভাবে নির্যাতন শুরু করার পর যখন আল্লাহ তাকে মক্কা হতে মদীনা হিজরত করার অনুমতি দিলেন তিনি আমানতের মালসমূহ তার অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা না করে হিজরত করেননি। অথচ যারা আমানত রেখেছিল তারা সকলেই ছিল কাফের। কিন্তু ইসলাম তো আমানত তার অধিকারীদের নিকট ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছে যদিও তার অধিকারীরা কাফের হয়।

৬.৩ অঙ্গীকার পূর্ণ করা ও বিনয়ী হওয়া

ইসলামী মহান চরিত্রের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পূর্ণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, কেননা অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৮৭৩]

---

৮৭০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ), আল-কুর'আন, ৯:১১৯

৮৭১ (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا) মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারি, *সাহিহুল বুখারি*. কাজি প্রকাশনী, ২০০০, "কিতাবুল রিকাক," হাদীস নং ৬১৬০

৮৭২ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا),আল-কুর'আন, ৪:৫৯

৮৭৩ (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا),আল-কুর'আন, ১৭:৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী চরিত্রের আরেকটি হচ্ছে একজন মুসলমান তার অপর মুসলিম ভাইদের সাথে বিনয়ী আচরণ করবে। সে ধনী হোক বা গরীব। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তুমি তোমার পার্শ্বদেশ মুমিনদের জন্য অবনত করে দাও।" [৮৭৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলা আমার নিকট ওহী করেছেন যে, 'তোমরা বিনয়ী হও যাতে একজন অপরজনের উপর অহংকার না করে। একজন অপর জনের উপর সীমালংঘন না করে।" [৮৭৫]

৬.৪ আত্মীয়তা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামী চরিত্রের অন্যতম। আর তারা হচ্ছে নিকটাত্মীয়গণ যেমন, চাচা, মামা, ফুফা, খালা, ভাই, বোন প্রমূখ। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব, আর তা ছিন্ন করা জান্নাত হতে বঞ্চিত ও অভিশাপের কারণ।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ " যদি তোমরা ক্ষমতা পাও, তাহলে কি তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? তারা তো ঐ সব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। এতে তিনি তাদেরকে বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন।"[৮৭৬]

রাসুলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, "আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশেতে প্রবেশ করবে না।"[৮৭৭]

প্রতিবেশীর প্রতি সুন্দরতম ব্যবহার হচ্ছে ইসলামী চরিত্রের অন্যতম। যে আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী সে সুন্দর ব্যবহার ও অনুগ্রহের সবচেয়ে বেশী হকদার। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকীন নিকটতম প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতিও।"[৮৭৮]

এতে আল্লাহ নিকটতম ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করতে ওসিয়ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেনঃ 'জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে ওসিয়ত করছিল এমনকি আমি ধারণা কওে নিলাম যে, প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়ে দেয়া হবে।'[৮৭৯]

---

৮৭৪ (وَأَنْزِلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ وَالْمُؤْمِنَاتِ), আল-কুর'আন, ১৭:৩৪

৮৭৫ (لَا يَحِقُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَسْتَكْبِرَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَوْ يَظْلِمَهُ), ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাব আল-বিতর, বাংলায় অনুবাদ, প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, হা. ২৫৬৭

৮৭৬ (فَإِنْ أَضْلَفْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَفْسِدُوا فِيهَا وَاقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ), আল-কুর'আন, ৪৭:২২-২৩

৮৭৭ (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, বাংলায় অনুবাদ. ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, হা. ৫৯৮৪

৮৭৮ (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ), আল-কুর'আন, ৪:৩৬

৮৭৯ (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ), ইমাম বুখারি, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬, হা. ৬০১৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আমি মনে করেছিলাম যে ওয়ারিশদের সাথে প্রতিবেশীর জন্য মিরাসের একটি অংশ নির্ধারিত করে দেবে। রাসূলুল্লাহ (স.) আবু যর (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আবু যর! যখন তুমি তরকারী পাক কর তখন পানি বেশি করে দাও, আর তোমার প্রতিবেশীদের অঙ্গীকার পূরণ কর।"[৮৮০] ইসলামী চরিত্রের আরেকটি হচ্ছে মেহমানের আতিথেয়তা। রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণী, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।" [৮৮১]

ইসলামী চরিত্রের অন্যতম দিক হচ্ছে দান ও বদান্যতা। আল্লাহ তাআলা ইনসাফ, বদান্যতা ও দান কারীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে অতঃপর যা খরচ করেছে তা থেকে কারো প্রতি অনুগ্রহ ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য করে না, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাও করবে না।"[৮৮২]

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা হচ্ছে ইসলামী চরিত্রের অন্যতম বিষয়। অনুরূপভাবে মানুষদের ক্ষমা করা, দুর্ব্যবহারকারীকে ছেড়ে দেয়া ওজর পেশকারীর ওজর গ্রহণ করা বা মেনে নেয়াও অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন : "আর যে ধৈর্য্য ধারণ করল এবং ক্ষমা করল, নিশ্চয়ই এটা কাজের দৃঢ়তার অন্তর্ভূক্ত।"[৮৮৩]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তারা যেন ক্ষমা করে দেয় এবং উদারতা দেখায়, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেয়া কি তোমরা পছন্দ কর না?' রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "দান খয়রাতে সম্পদ কমে যায় না। আল্লাহ পাক ক্ষমার দ্বারা বান্দার মার্যাদাই বৃদ্ধি করে দেন। যে আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তার সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন।"[৮৮৪] তিনি আরো বলেন, "দয়া কর, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। ক্ষমা করে দাও তোমাদেরও ক্ষমা করে দেয়া হবে।" [৮৮৫]

---

৮৮০ (يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ), ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বীর্র ওয়াস্‌সিলাহ, অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭, হা. ২৬২৫

৮৮১ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ),ইমাম আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬,হা. ৬১৩৫

৮৮২ (ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ), আল-কুর'আন, ২:২৬২

৮৮৩ (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ),আল-কুর'আন, ৪২:৪৩

৮৮৪ (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ),ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল যাকাত ও খয়রাত, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫, হাদিস নং ২৫৮৮, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল যাকাত, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০০৩,হা. ১৩৯৫

৮৮৫ (رْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ),তিরমিজি, *সুনান তিরমিজি*, হাদিস নং ১৯৭৭ ; আহমদ বেন হানবাল, *মুসনাদ আহমদ*, খণ্ড ৩, হাদিস নং ১৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী চরিত্রের আরেকটি হচ্ছে মানুষের মাঝে সমঝোতা ও সংশোধন করে দেয়া, এটা একটি মহান চরিত্র যা ভালবাসা সৌহার্দ প্রসার ও মানুষের পারস্পারিক সহযোগিতার প্রাণের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তাদের অধিকাংশ শলাপরামর্শের মধ্যে কল্যাণ নেই। কেবল মাত্র সে ব্যক্তি ব্যতীত যে সাদকাহ, সৎকর্ম ও মানুষের মাঝে সংশোধনের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এসব করে অচিরেই আমরা তাকে মহা প্রতিদান প্রদান করব।"[৮৮৬]

৬.৫ লজ্জাশীলতা

ইসলামী চরিত্রের অন্যতম আরেকটি চরিত্র হচ্ছে লজ্জা। এটা এমন একটি চরিত্র যা পরিপূর্ণতা ও মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আহবান করে। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা হতে বারণ করে। লজ্জা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। ফলে মুসলমান লজ্জা করে যে, আল্লাহ তাকে পাপাচারে লিপ্ত দেখবে। অনু-রূপভাবে মানুষের থেকে এবং নিজের থেকেও সে লজ্জা করে। লজ্জা অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ বহন করে। নবী কারীম (স.) এরশাদ করেছেন,'লজ্জা ঈমানের বিশেষ অংশ।' রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, "লজ্জা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।" [৮৮৭]

ইসলামী চরিত্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে দয়া বা করুণা। এ চরিত্রটি অনেক মানুষের অন্তর হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে তাদের অন্তর পাথরের মত অথবা এর চেয়েও শক্ত হয়ে গেছে। আর প্রকৃত মু'মিন হচ্ছে দয়াময়, পরোপকারী, গভীর অনুভূতি সম্পন্ন উজ্জল অনুগ্রহের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "অত:পর সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হয় যারা ঈমান এনেছে পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য্য ও করুণার উপদেশ দিয়েছে। তারা হচ্ছে দক্ষিণ পন্থার অনুসারী।"[৮৮৮]

রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, "মুমিনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, করুণা, অনুকম্পার উপমা হচ্ছে একটি শরীরের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় গোটা শরীর নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"[৮৮৯]

---

৮৮৬ (ۚ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا),আল-কুর'আন, ৪:১১৪

৮৮৭ (ال عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ),ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল আল-বুখারি, *সহীহুল বুখারি*, হাদিস ৬১১৭, অধ্যায়: আচার-ব্যবহার (আল-আদাব), বর্ণনাকারী: ইমরান ইবনু হুসায়ন (রা.), আধুনিক প্রকাশনী, ১৪৩০ হিজরি. (২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৮৮৮ (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ),আল-কুর'আন, ৯০:১৭-১৮

৮৮৯ (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى),ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বীর ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, হাদীস নং ২৫৮৬, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬ ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা

ন্যায় পরায়ণতা ইসলামী চরিত্রের আরেকটি অংশ। এ চরিত্র আত্মার প্রশান্তি সৃষ্টি করে। সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন প্রকার অপরাধ বিমোচনের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ইহসান ও নিকটাত্মীয়দের দান করতে নির্দেশ দেন।"[৮৯০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "ইনসাফ কর, এটা তাক্বওয়ার অতীব নিকটবর্তী।"[৮৯১]

রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, "ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বরের উপর বসবে। তারা হল সে সব লোক, যারা বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে, পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে এবং যে দায়িত্বই পেয়েছে তাতে ইনসাফ করে।"[৮৯২]

৬.৭ স্বদেশপ্রেম

প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহপাক মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এটাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহতায়ালা সবাইকে বিবেক ও বিশ্বাসেরও স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'তোমার প্রভু-প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসত। তবে কি তুমি মোমেন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর বল প্রয়োগ করবে?'[৮৯৩] স্বদেশপ্রেমের চেতনা ও দেশাত্মবোধের প্রতি ইসলাম মানুষকে শুধু উদ্বুদ্ধই করেনি, বরং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করা এবং দেশমাতৃকাকে সুরক্ষা প্রদানে জীবনদানকে শাহাদাতের সম্মানজনক মর্যাদা পর্যন্ত দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহর আজ্ঞা মানো এবং রাসূলের আজ্ঞা মানো, এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে তাদেরও মানো।[৮৯৪] আল্লাহর রাসূল নিজে স্বদেশকে ভালবেসে আমাদের জন্য নমুনা উপস্থাপন করে গেছেন। রাসূল (সা.) তার দেশ মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন, মক্কার জনগণকে ভালবাসতেন। তাদের হেদায়াতের জন্য তিনি কঠোর অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। কোনোদিন মক্কাবাসীর অকল্যাণ পর্যন্ত কামনা করেননি। তায়েফে এত নির্যাতন করল তারপরও কোনো বদদোয়া করেননি। মহানবী (সা.) সাহাবিদের কাফিরদের অত্যাচারে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেও তিনি মক্কায় নির্যাতন সহ্য করে অবস্থান করলেন। পরিশেষে

---

৮৯০ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ) আল-কুর'আন, ১৬:৯০

৮৯১ (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ) আল-কুর'আন, ৫:৮

৮৯২ (إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ (নেতৃত্বের বই), অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল অজ্ঞাত, হাদীস নং ১৮২৭

৮৯৩ (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) আল-কুর'আন, ১০:৯৯

৮৯৪ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) আল-কুর'আন, ৪:৫৯

Dhaka University Institutional Repository

কাফিরদের কঠিন ষড়যন্ত্রের কারণে এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন মক্কার দিকে বারবার ফিরে তাকান। মুসলিম রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব হলো তার স্বদেশ ও মাতৃভূমিকে ভালোবাসা। প্রিয় নবীজি (স.) যখন স্বীয় মাতৃভূমি মক্কা শরিফ থেকে হিজরত করে ইয়াসরিব তথা মদিনায় যাত্রা করেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল এবং বলেছিলেন,'হে মক্কা! আমি তোমাকে ভালোবাসি। কাফেররা নির্যাতন করে যদি আমাকে বের করে না দিত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।'[৮৯৫]

৬.৮ চারিত্রিক উৎকর্ষতা:

ইসলামী চরিত্রের অন্যতম বিষয় হচ্ছে চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও পবিত্রতা। এ চরিত্র মানুষের সম্মান সংরক্ষণ এবং বংশে সংমিশ্রন না হওয়ার দিকে পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন : "যাদের বিবাহের সামর্থ নেই, তারা যেন চারিত্রিক পবিত্রতা গ্রহণ করে। যতক্ষণ না আল্লাহ তার অনুগ্রহে তাকে সম্পদশালী করেন।"[৮৯৬] রাসূল (স.) এরশাদ করেছেন, "তোমরা আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জিম্মাদার হও। তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব। যখন তোমাদের কেউ কথা বলে সে যেন মিথ্যা না বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন যেন খেয়ানত না করে। যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তা যেন ভঙ্গ না করে। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি অবনত কর। তোমাদের হস্তদ্বয় সংযত কর। তোমাদের লজ্জাস্থান হেজাফত কর।" ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন, মান-সম্মান ইত্যাদি সব কিছুই তাদের মানসিক বিকাশ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার ওপরই নির্ভর করে। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হচ্ছে,

১-আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা তাঁদের ভাগ্যে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে।[৮৯৭] ২- যে নিজেকে (আত্মাকে) শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়"।[৮৯৮] ৩-নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়।"[৮৯৯] চারিত্রিক উন্নতি বিকাশকে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। মূলত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এ চরিত্রের আলোকেই হয়ে থাকে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কে পৃথিবীতে পাঠানোর অন্যতম কারণ সচ্চরিত্রের বিকাশ সাধন। নবী করীম (স.) বলেন:

---

৮৯৫ (لَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مَا تَرَكْتُ مَكَّةَ أَبَدًا، أَنَا أُحِبُّكَ يَا مَكَّةُ)ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর (র.), *সহীহ আল-বুখারী*, খ.,৩, পৃ. ৪০৪, কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ১৬১৩, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩

৮৯৬ (وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا فَلْيَسْتَعْفِفُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ)আল-কুর'আন, ২৪:৩৩

৮৯৭ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)আল-কুর'আন, ১৩:১১

৮৯৮ (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّىٰهَا)আল-কুর'আন, ৯১:৯-১০

৮৯৯ (قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى)আল-কুরআন, ৮৭:১৪

Dhaka University Institutional Repository

১- 'আমাকে সচ্চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্তেই পাঠানো হয়েছে।' একদা জনৈক ব্যক্তি রসূল (স.) কে দ্বীনের সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, 'উত্তম চরিত্র।'[৯০০] এ কথা দ্বারা বুঝা যায় উত্তম চরিত্র দ্বীনের অন্যতম একটি রুকন,যা ব্যতীত দ্বীনের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। যেমন হজ সম্পর্কে রাসূলের বাণী: 'হজের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন হচ্ছে আরাফায় অবস্থান করা, যা ব্যতীত হজ আদায় হয় না, তেমনিভাবে সচ্চরিত্রতা ব্যতীত দ্বীন ও পরিপূর্ণ হয় না।

২- রাসূল(স.) বলেন, "উত্তম চরিত্র থেকে মীযানে অধিক উত্তম কোন আমল নেই।"[৯০১]

নবুওতের কাজের মধ্যে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধকরণ, চরিত্র গঠন, মহান আল্লাহর গ্রন্থের বাণী বোঝানো ও হেকমতের কথা শুনানো সবই অন্তর্ভুক্ত। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (স.) বলেছেন, 'আমাকে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতার জন্য পাঠানো হয়েছে।' চরিত্র নির্মাণের গুরুত্ব কত বেশি, খুব সহজে হাদিসটি দ্বারা অনুমান করা যাচ্ছে।

এজন্য যেভাবে ইবাদত, নামাজ, রোজা ইত্যাদি গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হয়। তেমনি চারিত্রিক শিক্ষাটাও খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। এটাকে শুধু আরাম-আয়েশ ও সৌন্দর্যের জিনিস মনে করা যাবে না। একদিক থেকে চরিত্রের গুরুত্ব ইবাদত থেকেও বেশি। ইবাদতে যদি কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা হলে আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেন। কিন্তু বান্দার হকের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি হলে বান্দা মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহও মাফ করেন না। ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য উত্তম চরিত্রে গুণান্বিত হওয়া। যেমন নামাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, ' নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[৯০২]

রোজার উপকারিতা বলা হয়েছে, এর দ্বারা তাকওয়া সৃষ্টি হয়। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা পরহেজগারি অর্জন করতে পার।'[৯০৩] হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাধিক পরিপূর্ণ সে ব্যক্তি, যার চরিত্র সর্বোত্তম। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা, যারা স্ত্রীদের সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণকারী।' পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য এ হাদিসে চরিত্রের পূর্ণতার শর্তারোপ করা হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.)

---

৯০০ (أُعْطِيتُ الْقُرْآنَ وَمَا أُعْطِيتُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْهُ، وَأُعْطِيتُ الْأَخْلَاقَ الْحَسَنَةَ)ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০০৫, হাদিস নং৬০৩৪

৯০১ (إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ الْخُلُقِ الْحَسَنِ)ইমাম ইবনু হাজ্জাজ মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আদাব, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০০৫, হাদিস নং ২৫৮৬

৯০২ (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)আল-কুর'আন, ২৯:৪৫

৯০৩ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ), আল-কুর'আন, ২:১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, রাসুলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন, আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র। আবারও জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন জিনিস বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান।'

ইবাদত দ্বারা যদি চরিত্রের উৎকর্ষ না আসে, তা হলে ইবাদতটা ওই গাছের মতো যেটাতে কোনো ফল আসে না এবং বলা যায় ওই চারা গাছের মতো, যার ফুলে না কোনো আকর্ষণ থাকে, না কোনো গন্ধ থাকে। নবী (স.) বলেছেন, 'যার নামাজ তাকে খারাপ কাজ থেকে বারণ করে না সে নামাজ খোদা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।' চরিত্রের উৎকর্ষের গুরুত্ব সংক্ষিপ্ত কথায় আমরা এভাবে বুঝতে পারি, ঈমানের পূর্ণতা চরিত্রের উৎকর্ষ ছাড়া হতে পারে না।

ঈমানের সাজসজ্জা, ঈমানের পরিচ্ছন্নতা সবকিছু চরিত্রের সৌন্দর্যের মাধ্যমে সম্ভব। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ ঈমান ওই ব্যক্তির, যার চরিত্র সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।' রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন,' আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব না, যার ওপর জাহান্নাম হারাম আর জাহান্নাম যার জন্য হারাম? তারা হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার মেজাজ নরম, কোমল স্বভাব, মানুষের সঙ্গে মিশুক এবং সহজ-সরল।'[৯০৪] চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণপনা ইসলামের প্রাণ, ঈমানের আত্মা। এর মাধ্যমে মানুষ ঊর্ধ্বজগতে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়। হাদিসে এসেছে, 'মানুষ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে ওই মর্যাদা পেতে পারে, যা রাতভর ইবাদত ও দিনভর রোজার মাধ্যমে অর্জন হয়।' আল্লাহর রাসুল (স.) অধিকাংশ সময় এ দোয়া করতেন,' হে আল্লাহ, আমাকে উত্তম থেকে উত্তম চরিত্রের পথে চালিত করুন, আপনি ছাড়া কেউ উত্তম চরিত্রের পথে চালিত করতে পারে না, আমাকে বদ চরিত্র থেকে ফিরিয়ে রাখুন, আপনি ছাড়া আর কেউ ফেরাতে পারে না।'[৯০৫]

৭. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

---

৯০৪ (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ غَدًا؟ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ)ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিজী (রহ.). *সুনান আত- তিরমিজী*. কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ, রিয়াদ: দারুসসালাম, ১৯৯৯, হাদীস নং ২৪৮৮

৯০৫ (اللَّهُمَّ اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ),ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আন-নিশাপুরি (রহ.). *সহীহ মুসলিম*. কিতাব: মুসাফিরীন (সালাতুল মুসাফিরীন ও কসর), বৈরুত: দার ইহইয়াউত-তুরাস, ১৯৯১, হাদীস নং ৭৭২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সংস্কৃতির রাষ্ট্রীয় প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ও সমাজে ইসলামি নীতি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এগুলো সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও নৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত হয়।

৭.১ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আধুনিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের আধুনিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী সমাজে ধর্মীয় নেতারা কেবল ধর্মীয় দিক নির্দেশক নয়, তারা সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রেও প্রভাবশালী।[৯০৬] রাষ্ট্র যদি তাদের আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সাহায্য করে এবং দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করে, তাহলে তারা সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রচার এবং মানুষের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

৭.২ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইসলামী নীতি অন্তর্ভুক্ত

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্তি। এর লক্ষ্য হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের ন্যায্যতা ও নৈতিকতার প্রতিফলন নিশ্চিত করা। মূল উপাদানসমূহ:

১. অর্থনৈতিক নীতি:

ইসলামী নীতির ভিত্তিতে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং হালাল বাণিজ্য নিশ্চিত করা। রিবার (সুদের) প্রতিরোধ এবং ন্যায্য বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমতা বৃদ্ধি করা।

২. সামাজিক নীতি:

সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, দাতা ও সামাজিক সহায়তা কার্যক্রমে ইসলামী নীতি প্রয়োগ। দুর্নীতি প্রতিরোধ, নৈতিক শিক্ষার প্রচার এবং মানবিক সহায়তার কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা।

৩. শিক্ষা ও সংস্কৃতি:

শিক্ষা নীতি ও পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা ও ইসলামী দর্শনের অন্তর্ভুক্তি। ইসলামী সংস্কৃতি, ইতিহাস ও চেতনার গবেষণা এবং প্রচার।

৪. পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলামী নীতির প্রতিফলন যেমন: প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য ব্যবহার, নদী খনন, বন ও পানি সংরক্ষণ। উদাহরণ: মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে জাতীয় অর্থনীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইসলামী অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

---

৯০৬ আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে, সরকারি নীতি ও পরিকল্পনায় ইসলামী নীতি অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নৈতিক ও মানবিক দিক প্রতিফলিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনায় ইসলামী মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করলে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয় এবং দেশকে নৈতিক ও স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়।

৭.৩ বিচারব্যবস্থায় ইনসাফ ও শুদ্ধতা নিশ্চিত করা

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো বিচারব্যবস্থায় ইনসাফ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। ইসলামী শিক্ষায় ন্যায়বিচার এবং পক্ষপাতহীনতা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। রাষ্ট্র যদি বিচার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে, তাহলে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯০৭] এর মধ্যে বিচারকদের প্রশিক্ষণ, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে নৈতিকতা বজায় রাখা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, রাষ্ট্রের নীতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী বিচার প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে সহজ ও সুবিচারযোগ্য সেবা প্রদান করা হয়, যাতে সকলের ন্যায্য অধিকার রক্ষা পায়।[৯০৮]

৭.৪ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইসলামী আদর্শ প্রবর্তন

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ প্রবর্তন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে সততা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা এবং জনগণের কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মকর্তা যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে দেশের জনগণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেন এবং অবৈধ বা অসৎ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন এড়ানো যায়। এছাড়া, ভোট ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা, নৈতিক রাজনৈতিক আচরণ প্রচার এবং জনগণকে ন্যায্য সেবা নিশ্চিত করা ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭.৫ ইসলামী সংস্কৃতি গবেষণায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা

রাষ্ট্র যদি ইসলামী ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতির গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা করে, তবে তা জাতির নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণা ও শিক্ষার মাধ্যমে জনগণ ইসলামী ঐতিহ্য, নৈতিক চেতনা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। এছাড়া, সরকারি অর্থায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন এবং প্রকাশনা ও সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি প্রচারে সহায়তা

---

৯০৭ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press, 2009, pp.56-89

৯০৮ আবদুল্লাহ আল-আজহারী, *ইসলামী বিচারব্যবস্থা: তত্ত্ব ও বাস্তবতা*, ১ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ.৩৭

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। এটি কেবল শিক্ষাব্যবস্থা নয়, সমগ্র সমাজকে নৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।

৮. পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ

মৃত্যু একটি সুনিশ্চিত এবং নির্ধারিত বিষয়। তাই একজন মুসলিমের প্রধান কাজ হলো মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা। কারণ মৃত্যুর স্মরণই মানুষকে সব সময় ভালো কাজের প্রতি পরিচালিত করে। বস্তুত দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্র। মানুষ শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ করে, বীজ বপন করে, যেভাবে পরিচর্যা করে; ঠিক সেরূপই ফল লাভ করে। তদ্রূপ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান আখিরাতে দেওয়া হবে। ইসলামি বিশ্বাস মোতাবেক, যে ব্যক্তি ইমান আনে, সৎকর্ম করে সে আখিরাতে শান্তিময় জীবন লাভ করবে। কবর থেকে শুরু করে আখিরাতের প্রতিটি পর্যায়ে সে সুখ, শান্তি ও সফলতা লাভ করবে। অন্যদিকে দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অবাধ্য হবে, পাপাচার করবে সে আখিরাতের সকল পর্যায়ে কষ্ট ভোগ করবে। তার স্থান হবে জাহান্নাম ।

পরকালীন যাত্রার ডাক আসা মাত্রই সবাইকে জগতের মায়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমাতে হয়। মহান আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,‘ আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেছেন। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। আবার তিনিই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। তারপরও মানুষ অতি-অকৃতজ্ঞ!’[৯০৯] তিনি আরো বলেন,‘ নিশ্চয়ই মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না। কেউ পার্থিব পুরস্কারের জন্য কাজ করলে তাকে তার পুরস্কার ইহকালে দান করব। আর যদি কেউ পরকালের জন্য কাজ করে তবে তার পুরস্কার সে পরকালে পাবে। শুকরিয়াকারী বান্দাদের কাজের ফল আমি নিশ্চয়ই দেবো।’[৯১০] তিনি আরো বলেন,‘ প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদের ভালো ও খারাপ অবস্থা দিয়ে পরীক্ষা করি। আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।’[৯১১]তিনি আরো বলেন, ‘প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।’[৯১২] পরকালীন যাত্রার যাত্রীকে কি প্রস্তুতি নিতে হবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে

---

৯০৯ (اللَّهُ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ), আল-কুর'আন, ২২:৬৬

৯১০ (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْكُمْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ), আল-কুর'আন, ৩:৩

৯১১ (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ), আল-কুর'আন, ২১:৩৫

৯১২ (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ), আল-কুর'আন, ৭:৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'[৯১৩] হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত আমর ইবনে মায়মুন রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,' তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের আগে গণিমত-সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। তোমার যৌবনকে কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার আগে, তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও তোমার অসুস্থতার আগে, তোমার সচ্ছলতাকে কাজে লাগাও অসচ্ছলতার আগে, তোমার অবসরতাকে কাজে লাগাও তোমার ব্যস্ততার আগে, আর তোমার জীবনকে কাজে লাগাও তোমার মৃত্যু আসার আগে।'[৯১৪] অপর আরেকটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,' বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই যে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।'[৯১৫] প্রস্তুতি বলতে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে একনিষ্ঠ ও মৌলিক আমল কার্যকর রাখা বুঝায়।

৮.১ তাওহিদ ও বিশুদ্ধ ঈমান

তাওহীদের ক্ষেত্রে রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত এবং আসমাউর-সিফাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এগুলো আল্লাহর একত্ব ও তার কার্যকারিতার ধারণাকে স্পষ্ট করে। ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রুবু-বিয়াত, উলুহিয়াত ও আসমাউর-সিফাতের ধারণা অপরিহার্য, কারণ এগুলোই মুসলিম ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, আচরণ এবং সামাজিক জীবনের মুল কাঠামো নির্ধারণ করে। রুবুবিয়াত আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বকে স্বীকার করায় মানুষকে নিজের কৃতকর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। এটি ব্যক্তিকে অহংকার ও অদক্ষতা থেকে রক্ষা করে এবং সমাজে ন্যায়বিচার ও দায়িত্বশীলতার সংস্কৃতি সৃষ্টি করে।

উলুহিয়াত মুসলিমদের মনে ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য স্থাপন কওে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতা, ধৈর্য, ধ্যান এবং পরিশুদ্ধ জীবনযাপনের প্রেরণা জন্মায়। সামাজিকভাবে এটি অন্যায়, কুপ্রবৃত্তি বা প্রতারণা এড়াতে সাহায্য করে, কারণ প্রতিটি কাজ আল্লাহর দৃষ্টিতে হিসাবযোগ্য। আসমাউর-সিফাত আল্লাহর গুণাবলীর জ্ঞান প্রদান করে এবং মানুষের চরিত্র গঠনে নৈতিক দিশা দেয়। যেমন, আল্লাহর রহিমত্ব এবং হাকীমত্ব অনুধাবন করে মুসলিমরা দয়া, সহমর্মিতা ও ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন শেখে। ফলে ইসলামী সংস্কৃতিতে এই তিনটি ধারণা একত্রে

---

৯১৩ (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ),আল-কুর'আন, ৭৩:২০

৯১৪ (اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মাজাহ (রহ.), *সুনান ইবনে মাজাহ*, কাইরো: দারুল কুতুব, ১৯৯৮, হাদীস নং ৪০৬৩

৯১৫ (مَنْ عَلِمَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَهُ، وَمَنْ زَكَّى نَفْسَهُ فَقَدْ أَحْسَنَهَا، وَمَنْ أَعَدَّ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَدْ أَعْطَاهُ أَجْرَهُ),ইমাম আল-তাবারানী (রহ.), *মুসনাদ আল-তাবারানী*, বেইরুত: দারুল কুতুব, ১৯৯৫, হাদীস নং ২৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি ও সমাজকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সুসংগঠিত রাখে এবং মুসলিম জাতিকে আল্লাহভক্ত, নৈতিক এবং মানবিক সমাজ গঠনে সহায়তা করে। পরকালীন জীবনে মুক্তির প্রথম ও প্রধান পাথেয় হলো তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সব প্রকার শিরক থেকে মুক্ত থাকা। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।'[৯১৬]তিনি আরো বলেন, 'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত করো। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর তত্ত্বাবধায়ক।'[৯১৭]তিনি আরো বলেন, 'এবং যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনের কল্যাণ চায়, সে জন্য চেষ্টা করে এবং সে বিশ্বাসী বা মুমিন হয়; তবে তাদের চেষ্টা ও কর্ম কবুল করা হবে।' [৯১৮]তিনি আরো বলেন, 'সময়ে কসম! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে এবং ভালোকাজ করে।'[৯১৯] মানুষ যখন অঙ্গীকার করে সে আল্লাহর অনুগত জীবন যাপন করবে, তখন তার জীবন সৌন্দর্য ও সুষমায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কেননা সে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার ভয় করে। তারা নেকির প্রতি দ্রুত এগিয়ে যায় এবং ভালো কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। শারীরিক ইবাদত হোক বা আর্থিক ইবাদত, সর্বত্র মুমিন এগিয়ে থাকার চেষ্টা করে।

৮.২ বিশুদ্ধ নেক আমল

আল্লাহর জন্য বান্দাহ কর্তৃক সব প্রকার ইবাদতই সংশ্লিষ্ট বান্দার নেক আমল। বান্দার যাবতীয় নেক আমল তার পরকালীন পাথেয়। যে আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয় এবং আমলনামায় এর সাওয়াব লেখা হয় পরকালীন জিন্দেগির প্রতিটি ধাপে তা উৎকৃষ্ট পাথেয় হিসেবে তা বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন,' নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং জাকাত দেয়; তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে পুরস্কার। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'[৯২০]

নেক আমলকারীরা আল্লাহ তা'আলার বন্ধু। যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোনো ভয় নেই বলে পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন,"জেনে রেখো! নিশ্চয়ই

---

৯১৬ (اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ), আল-কুর'আন, ২:১২২

৯১৭ (هُوَ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ), আল-কুর'আন, ৬:৬

৯১৮ (وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا), আল-কুর'আন, ১৭:১৯

৯১৯ (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ), আল-কুর'আন, ১০৩:১

৯২০ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ), আল-কুর'আন, ২:২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৯২১] আল্লাহর রাসুল (স.) আল্লাহর কাছে গুনাহমুক্ত অন্তরের প্রার্থনা করতেন। নফস বা প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করে চলতে পারা প্রকৃত মুমিনের পরিচয়। প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করতে পারা ব্যক্তির জন্য পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে, "আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে; জান্নাতই হবে তার আবাস।"[৯২২]কোনো আমল শুরুর আগে শুদ্ধ নিয়ত করা চাই। নিয়ত ইবাদতের মূল। নিয়ত অনুযায়ী বান্দা তার আমলের প্রতিদান ও পুরস্কার পাবে। হাদিসে এসেছে, হজরত ওমর (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি- 'প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়ত অনুসারে হয়। প্রত্যেক মানুষ তার কাজের ফলাফল আল্লাহর কাছে তদ্রুপ পাবে, যেরূপ সে নিয়ত করেছে।'[৯২৩] তাই যাবতীয় গুনাহ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করে যাওয়া। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে নিজের অনরকে গুনাহ থেকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য দোয়া করা।

৮.৩ তাকওয়া অবলম্বনকারী

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা-এরই নাম তাকওয়া।কোরআনের পরতে পরতে তাকওয়া অর্জনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মূলত তাকওয়া অন্তরের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সহজ বাংলায় বলা হয় আল্লাহভীতি।তাকওয়া হচ্ছে সব ভালো কাজের উৎস, পুণ্য কাজের জন্য পথের দিশারি। তাকওয়া হচ্ছে সব ভালো কাজের উৎস, পুণ্য কাজের জন্য পথের দিশারি। তাকওয়ার তিনটি স্তর

১. অন্তর ও সব অঙ্গ গুনাহ ও হারাম কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

২. মাকরুহ বা ঘৃণিত কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

৩. অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

পবিত্র কুরআনে এসেছে, নিশ্চয়ই তাকওয়াশীলদের জন্য সফলতা আছে।[৯২৪] তাকওয়াবান ব্যক্তি যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলে রত থাকে, ফলে ওই ব্যক্তির নেকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহপাক বলেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি

---

৯২১ (إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ), আল-কুর'আন, ৫:৫৯

৯২২ (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا),আল- কুর'আন, ১০:৬২

৯২৩ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমলাইল আল-বুখারী, অধ্যায়: ওহীর সূচনা, পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহর উপরে কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ১

৯২৪ (وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى), আল-কুর'আন, ৭৯: ৪০

Dhaka University Institutional Repository

যেন লক্ষ করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কী সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাকো। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সেসব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করো।'[৯২৫] তাক্বওয়া মুমিনের একমাত্র সম্বল। যা মানুষকে সম্মানিত করে। তাক্বওয়াশীলদেরকেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স.) সবচেয়ে সম্মানিত বলেছেন। আল্লাহকে যথার্থরূপে যে ভয় করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন এবং তাকে মর্যাদা দান করবেন।

আমার মুহতারাম সায়েখ মুফতী ইয়াহহিয়া দামাত রাকাতুহুমকে বলতে শুনেছি, হযরত ইবরাহীম খলীল আলাইহিসসাল্লাম মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে হযরত ইসমাইল আলাইহিসসাল্লামের বংশে বিশেষ গুণাবলী সম্পন্ন একজন রসূল প্রেরণের আবেদন জানিয়েছিলেন। কুরআনের ভাষা: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্যে (হযরত ইসমাইল আলাইহিসসাল্লামের খান্দানে) এমন একজন রসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরই মধ্য হতে হবেন এবং যিনি (১) তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন। (২) তাদেরকে কিতাব ও (৩) হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং (৪) তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন।[৯২৬]

৮.৪ আত্মশুদ্ধি অর্জনে ইসলাহী সভা ও দারস তারবিয়াত

বাংলাদেশে আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং নেক ও পরিশুদ্ধ চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলাহী সভা ও আত্মশুদ্ধিমূলক দারস তারবিয়াতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব এবং শিষ্টাচারের দুর্বলতার কারণে বর্তমান প্রজন্ম অনেক সময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। ইসলাহী সভা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে যেখানে ব্যক্তি তার আত্মা, নফস (অহংকার ও স্বার্থপরতা), কলব (হৃদয়) ও রূহ (আত্মা) পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করার শিক্ষা পায়। এই সভা ও দারসগুলিতে কোরআন ও হাদিসের আলোকে আত্মমর্যাদা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পদ্ধতি শেখানো হয়। এছাড়াও, যুব সমাজকে অশুদ্ধ অভ্যাস, অজ্ঞতা ও মন্দ পথ থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি ইসলামের নৈতিক আদর্শে অনুশীলিত হওয়ার সুযোগ দেয়। তার-বিয়াতমূলক দারস ব্যক্তিকে কেবল ধর্মীয় শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে না, বরং তার অন্তর ও মননকে স্থির, শান্ত ও আল্লাহর প্রতি নিবেদিত করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো সামাজিক ও নৈতিক চ্যালেঞ্জপূর্ণ পরিবেশে, যেখানে যুব সমাজ সহজে প্রলোভন, দুর্নীতি এবং নৈতিক বিপথগামীতার শিকার হতে পারে, সেখানে ইসলাহী সভা ও আত্মশুদ্ধিমূলক দারস তারবিয়াত একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এটি শুধুমাত্র ধর্মীয় দীক্ষা নয়, বরং মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের

---

৯২৫ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ), আল-কুর'আন, ৫৯:১৮

৯২৬ (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ), আল-কুর'আন, ২:১২৯

Dhaka University Institutional Repository

একটি কার্যকর প্রক্রিয়া, যা সমাজে সচেতন, দায়িত্বশীল ও নৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দু'আ আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর কাছ থেকে নেক নেতৃত্ব প্রার্থনার জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। পবিত্র কুরআনে তাঁর দু'আ তুলে ধরা হয়েছে, যা আমাদের আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর এই আবেদন কবুল করে হযরত মুহাম্মাদ (স.)কে আখেরী নবী ও সর্বশেষ রসূল হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়।[৯২৭]

৮.৫ নেক সন্তান প্রস্তুত করা

মৃত্যু সকলের জন্য অনিবার্য, তাই প্রতিটি পিতা-মাতার উচিৎ সন্তান -সন্ততিকে এমন ভাবে প্রস্তুত করা যাতে মৃত্যুর পরে এই সন্তানের দোয়া তার জন্য ক্ষমা এবং কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। যাদের মা-বাবা অনন্ত জীবনে পাড়ি দিয়েছেন, সুসন্তান হিসেবে তাদের উচিত মৃত বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করা। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল কখনো বন্ধ হয় না। ১) সাদকায়ে জারিয়া (এমন দান-অনুদান; যার সওয়াব চলমান থাকে) ২) এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং ৩) নেক সন্তান যে তার মৃত বাবা মায়ের জন্য সবসময় দোয়া এবং আমল করে।'[৯২৮]মৃত মা-বাবার জন্য কুরআনে বর্ণিত তিনটি দোয়া তুলে ধরা হলো।

এক. প্রশান্তির দোয়া

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন; যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।'[৯২৯]

দুই. ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

---

৯২৭ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ), আল-কুর'আন, ৩: ১৬৪

৯২৮ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.), *সহীহুল বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম*, কাইরো: দারুল কুতুব, ১৯৯৫, হাদীস নং: বুখারী ১৩৪২, মুসলিম ১৮৭৩

৯২৯ আল-কুর'আন, ১৭ : ২৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! রোজ কেয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন।'[৯৩০]

তিন. মা-বাবাসহ সব মুমিনের জন্য দোয়া:

رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِیْنَ اِلَّا تَبَارًا

অর্থ: 'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষদের ক্ষমা করুন এবং আপনি জালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।'[৯৩১]

৮.৫ সদকায়ে জারিয়া

পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়। যাওয়ার সময় সঙ্গে যাবে কেবল নিজের কৃত আমল। কিয়ামতের দিন কঠিন সময়ে তারাই মুক্তি ও সফলকাম হবে যাদের সৎ আমলের পাল্লা ভারি হবে। আর মৃত্যুর পরও সৎ আমলের পাল্লা ভারি হতে পারে একমাত্র সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে। একজন মুসলিমের জন্য বাঞ্ছনীয় হলো বিভিন্ন খাতে সদকা করা; যাতে করে প্রত্যেক শ্রেণীর নেক আমলকারীদের সাথে তার একটি ভাগ থাকে। সদকায়ে জারিয়া আরবি শব্দ। সদকা শব্দের অর্থ দান করা এবং জারিয়া অর্থ প্রবহমান, সদাস্থায়ী প্রভৃতি। সদকায়ে জারিয়া হলো- এমন দান যার কার্যকারিতা কখনো শেষ হবে না এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ এই পৃথিবী যত দিন থাকবে তত দিন পর্যন্ত কবরে শুয়ে শুয়ে সদকাকারী ব্যক্তি এর সওয়াব পেতেই থাকবে। বিধায় প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সদকায়ে জারিয়ার আমলের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা। তবে দান কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে করতে হবে। পরকালীন পাথেয় হিসেবে সদকায়ে জারিয়ার গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, সদকায়ে জারিয়ার সুফল মানুষের মৃত্যুর পর চলতে থাকবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেন, 'একজন মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমলনামায় যা থেকে নেকি যোগ হবে; তা হলো- যদি সে শিক্ষা অর্জনের পর তা অপরকে শিক্ষা দেয় ও প্রচার করে, অথবা নেক সন্তান রেখে যায়, অথবা ভালো বই রেখে যায়, অথবা মসজিদ নির্মাণ করে দেয়,অথবা মুসাফিরের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করে, অথবা নদী খনন করে দেয় অথবা জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য সম্পদ থেকে সদকা করে।' [৯৩২]

---

৯৩০ আল-কুর'আন, ১৪: ৪১

৯৩১ আল-কুর'আন, ৭১: ২৮

৯৩২ (مَسْجِدٍ بُنِيَ لِلَّهِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ إِلَّا انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ أَوْ طَرِيقٍ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُسَافِرِينَ، أَوْ نَهْرٍ حُفِرَ، أَوْ صَدَقَةٍ لِلصِّحَّةِ وَالْحَيَاةِ), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.) ও

Dhaka University Institutional Repository

মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ে আলোচনায় আমরা দেখতে পাই মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানভিত্তিক উন্নতির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। জীবনের উৎকর্ষ কেবল বাহ্যিক সফলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আত্মশুদ্ধি, সৎকর্ম, ন্যায় পরায়ণতা, বিনয়, দায়িত্ববোধ ও মানবকল্যাণের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা চিন্তা, বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন, যেন সে নিজের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। তাই মানবজীবনের প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন ব্যক্তি আল্লাহভীতি ও নৈতিকতার আলোকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শকে বাস্তবায়ন করে।

অতএব বলা যায়, মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন কোনো এককালীন কাজ নয়, বরং এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন আত্মিক ও নৈতিক সাধনা। আল্লাহভিত্তিক জীবনযাপন, জ্ঞানচর্চা ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মের মাধ্যমে মানুষই পারে নিজের ও সমাজের জীবনে প্রকৃত উন্নতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে।

ইমাম মুসলিম (রহ.), *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম*, কাইরো: দারুল কুতুব, ১৯৯৫, হাদীস নং: বুখারী ১৩৪২, মুসলিম ১৮৭৩

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করে মহান রব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্য, বিশেষত্ব ও অসীম ক্ষমতার নিদর্শন সকলের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। স্রষ্টার এই সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আর দিয়েছেন অনন্য এক অবস্থান, স্বীকৃতি ও বিশেষ মর্যাদা। যুগে যুগে মানুষকে সৃষ্টিকর্তার বিধান সম্পর্কে অবগত করার জন্য পাঠিয়েছেন অগণিত নবি রাসূল এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন বি-ভন্ন আসমানী কিতাব। যাতে মানুষ সহজেই তার গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

যুগে যুগে প্রেরিত নবী- রসূলগণ ছিলেন নির্দিষ্ট এলাকা, জাতি, গোত্র বা সময়ের জন্য নির্ধারিত। তাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনাও ছিলো ঐ বিশেষ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট। কালক্রমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরে। এর ভুলে যেতে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা ও আদেশের বিধান। শয়তানের প্ররোচনায় পরে মানুষ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে গ্রহণ করে সৃষ্টিকর্তার নানান অপ্রিয় ও নিষিদ্ধ জিনিস। মানুষ সৃষ্টি তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে নানান নেতিবাচক স্বভাবের সমন্বিত এক সত্ত্বা। তাই মানুষকে খুব সচেতন থাকতে হয় তার কৃতকর্মের ব্যাপারে। আর কোন নীতিমালার আলোকে মানুষ নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করবে সৃষ্টিকর্তাও তা জানিয়ে দিলেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলেন এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের জন্য মনোনীত জীবনবিধান কার্যকর করে দিলেন। পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের ধারাবাহিকতার ঘোষণাও দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য আর নতুন কোন বিধানের পয়োজন নেই।

সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এ জীবন ব্যবস্থায় ইহকালের জন্য রয়েছে আদর্শ ও উন্নত নীতিমালা ও পরিপালনের প্রকৃত সংস্কৃতি। সর্বপ্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ মানব জাতির জন্য যে সংস্কৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর মাধ্যমে তার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছে। জীবন বিধান মানে কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নয়, বরং সমগ্র জীবন যাপন প্রনালীর ধারাবাহিকতা। আর এরই নাম ইসলামী সংস্কৃতি। দুনিয়ায় আগমনের কারণ অনুসন্ধান এবং স্রষ্টিকর্তা প্রদত্ত বিধানাবলীর সঠিক জ্ঞান অন্বেষণ করা ও গবেষণা করা। নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সম্মান জনক স্থানে উন্নীত করার মাঝে রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে পরিচালিত মানুষের সফলতা ও সার্থকতা। কারণ আল কুরআন এমন এক বিধিবদ্ধ দিকনির্দেশনা সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ যাতে কেউ কখনো কোন ত্রুটি বা অসঙ্গতি খুঁজে বের করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি প্রবাহিত নদীর ন্যায়। নদী যেমন দুই কূল থেকে সবকিছু নিয়ে প্রবাহিত হয়, তার বুকে ঠাই দেয়, সংস্কৃতিও তেমনি নানান স্বভাব আর রীতি নীতিকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে তার নিজস্ব গতিতে ধাবমান হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেও এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মুসলিম আধিক্যের প্রমাণ মেলে নানান ভাবে। মানুষের ধর্মীয় জীবনে ইসলামের আবেগঘন স্থান লক্ষ্য করা যায় বারংবার। তবে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনাচরণের সাথে মিশে থাকা পূর্ববর্তী সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ইসলামের প্রকৃত আদেশ সম্পর্কে তাদের গাফেল করে রাখে। এমনও দেখা যায় মসজিদ থেকে সলাত আদায় করে বন্ধুর সাথে প্রবেশ করলো গানের কনসার্টে। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির চর্চার নামে চলে হিন্দু দেব-দেবীদের লোক কীর্তন। দেব দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত আহারে ভোজন রসিক মুসলমান উদর পূর্তি করে। অথবা পালা পার্বণে দেবদেবীর প্রতি অবচেতন মনে আবদার চলে, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শির্কের নামান্তর। যা বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রকৃত সংস্কৃতির দুয়ারে বার বারই কুঠ-ারাঘাত করেছে। বাঙালি সংস্কৃতি বলে বিজাতীয়, অনৈসলামিক সংস্কৃতির চর্চা করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব আল কু-রআনই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সম্বলিত নির্দেশিকা এবং নবী (স.) হলেন সর্বশেষ নবী।

দুনিয়ার সকল প্রান্তে সর্বশেষ নবী (স.) তাঁর জীবনাদর্শের বাণী পৌঁছে দেয়ার পবিত্র দায়িত্ব দিয়েছেন তার উম্মতদের। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির বাস্তব চর্চা নিজে করা এবং তার চারিপাশের পরিবেশে ব্যবহারিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

বাংলাদেশের ভউগোলিক অবস্থানের কারণে বারংবারই এ দেশের মানুষ নানান জাতি ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়েছে এবং জীবনের অংশ হিসেবে পরিপালন করেছে। এ দেশে ইসলামের আগমন এ অঞ্চলের মানুষের জন্য একটা ভিন্ন দিকনির্দেশনার বিষয় নিয়ে হাজির হল। পৌত্তলিকতা থেকে মানুষের বিশ্বাসের জায়গাটি প্রতিষ্ঠিত হল অদৃশ্য এক ও অবিনশ্বর সৃষ্টিকর্তার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে। জাতিগত বৈপরীত্য বা স্তরবিন্যাসের কোন স্থান ইসলামে নেই। মানুষের বিশ্বাস এবং আমলই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিপূর্ণ রুপে আত্মসমর্পণকারী ব্যাক্তিই মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান।

মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন মূলত নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বিত বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ইসলামী সংস্কৃতি এ দিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতি হিসেবে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে। বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ইসলামের গভীর প্রভাব এই সত্যকে প্রমাণ করে যে, ইসলামী মূল্যবোধই এ

Dhaka University Institutional Repository

দেশের মানুষের চারিত্রিক গঠন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং নৈতিক আদর্শ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আজকের বৈশ্বিক যুগে প্রযুক্তি, ভোগবাদ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে মানুষের মানসিক শান্তি ও সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষা আমাদেরকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায় কিভাবে পার্থিব অগ্রগতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে প্রকৃত উৎকর্ষ অর্জন করা যায়। বাংলাদেশের সমাজে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার কেবল একটি ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, বরং মানবিক উন্নয়ন ও জাতীয় সমৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি।

অতএব বলা যায়, ইসলামী সংস্কৃতির যথাযথ প্রয়োগ ও অনুশীলনই মানবজীবনের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক। এটি বাংলাদেশকে একটি নৈতিকভাবে শক্তিশালী, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে নিতে পারে। মুত্তাকী ব্যাক্তি সবচেয়ে বেশি আল্লাহর বিধানকে ভয় করেন, তাই তিনি ইসলামী সংস্কৃতি পালনে কোন হেরফের করেননা । কারণ এমন কোন বিধান নেই যা ইসলাম মানব জাতির জন্য নির্দিষ্ট করেননি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনই আদর্শ ইসলামী সংস্কৃতির বাস্তব উদাহরণ। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত, পারিবারিক শিক্ষা থাকে রাষ্ট্র পরিচালিনা শিক্ষা, জ্ঞান অর্জন থেকে অর্থ উপার্জন, ভোগ থেকে বন্টন, জীবনের প্রাপ্তি থেকে পরকালের হিসাব নিকাশ, সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকে শুরু করে আত্মসমর্পণ। এমন প্রতিটি স্পষ্ট নির্দেশনা ইসলামকে করেছে অনন্য। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ ইসলামের এই প্রকৃত সৌন্দর্য অনুসন্ধান করা। আর সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। বাংলাদেশ সৃষ্টিই হয়েছিল এক বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে, অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে। এ অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম মানুষের জন্য এক সময়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এখন মানুষের দিন বদলেছে, মানুষের অভাব কমেছে। এখন ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়ে সচেতনতাও কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে সত্যি, কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নে মানুষের হাতে হতে এখন ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির হাতিয়ার। নিজে ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি তা গোটা জাতির জন্য হুমকী স্বরূপ। পরিবার থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার থেকে অফিস আদালত, সামজিকতা থেকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সর্বত্রই ইসলামী সংস্কৃতির আসল রূপের জলাঞ্জলি হতে দেখা যায়। যে নবী (স.) আমাদের মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, খুলাফায়ে রাশীদিন ইসলামের প্রতিষ্ঠিত রূপের নিদর্শন রেখে গেছেন। যা সঠিক ভাবে অনুসরণের মাধ্যমে মানব জীবনের উৎকর্ষের পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব। ধারাবাহিকভাবে প্রেরিত আল্লাহর নবী পয়গম্বরগণ কেউই নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে পারেননি। বাঁধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, তবুও আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে আমৃত্যু কষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

করে গেছেন। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের এটা কর্তব্য যা মালিকের হুকুম যেন যথাযথ পালন করা হয়। তার জন্য প্রয়োজন জীবনাচরণের পদ্ধতিগত উৎকর্ষ সাধন। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ, যথযথ প্রয়োগে সমস্যা এবং বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়গুলিই আলোচ্য গবেষণার মূল চর্চিত বিষয়। মহান আল্লাহ এই বাংলাদেশের জমিনকে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক চর্চা এবং গবেষণার উপযুক্ত স্থান বানিয়ে দিন এবং এ অঞ্চলের ইসলাম অনুসারীদের জীবনকে আল্লাহ বরকতময় করে দিন, যাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে ইসলামী আদর্শের এক নমুনা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নাম ও উদাহরণ সবাই অনুসরণ করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুর'আন
আল-কুর'আনুল কারীম, অনূদিত ও সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৩ খ্রি.

আইনী, বদরুদ্দীন : *উমদাতুল কারী*, বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি., খ.২

আখতারুজ্জামান, ড. মো. : *মুসলিম ইতিহাসতত্ত্ব*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮খ্রি.

আজ-জিযানী, মুহাম্মদ ইবন হুসাইন : *মা'আলিমু উসূলিল ফিক্হ ইনদা আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত*,রিয়াদ: দারু ইবনুল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬খ্রি.

আল-হাকিম, আল-নুরি : *মুস্তদরাক আল-হাকিম*, বাংলা অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সহীহ হাদিসের বাংলা অনুবাদ, ২০০৭

আল-যাহাবী, আবু আব্দাল্লাহ শামস আদ-দ্বীন : *আল-'উলু লিল 'আলি আল-গাফফার*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩

আন-নববী, মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া : *রিয়াদুস সালেহীন*, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০৩খ্রি.

আন-নাসাফী, আল্লামা আবুল বারাকাত : *আল-আক্বিদাতুন নাসাফী*, মিসর: ১৯৯১খ্রি.,

আবু হানিফা, ইমাম : *আল-ফিকহুল আকবর: ইসলামী বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ*, অনুবাদ: ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০২

আবূ দাউদ, সুলায়মান আ-শ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.) : *সুনানু আবি দাউদ*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯হি.

আব্দুর রশীদ, ড. মুহাম্মদ; হক, মুহাম্মদ ছাইদুল ও রহমান, মোঃ আতীকুর : *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, খ. ১, ২০১১ খ্রি

আব্দুর রহীম, মওলানা মুহাম্মদ : *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৯৬খ্রি.

: *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯খ্রি.

: *ইসলামী শরী'আতের উৎস*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬খ্রি

আমিনুল ইসলাম, ড. : *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: নওরোজ কিতাব বিতান, ১৯৮৪খ্রি.

আলী, এম. শমসের ও অন্যান্য : *আল কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

আলী, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ : *কুরআনের আলোকে মানবজীবন*, ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.,

আমীর আলী, সৈয়দ : *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৭খ্রি.

আল-গাযালী, আবূ হামিদ মুহাম্মদ : *মুকাশাফাতুল-কুলূব*, অনুবাদ: মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লা, ঢাকা: দারুল ইফতা প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.

: *সৌভাগ্যের পরশমণি*, অনুবাদ: আব্দুল খালেক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.

: *এহ্ইয়াউল 'উলুমিদ্দীন*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, তা.বি.

: *সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ*, অনু. মোহাম্মদ খালেদ, ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ২০১৭ খ্রি.

: *আল-মাকসাদুল আসনা ফি শারহ মাআনি আসমা আল্লাহ আল-হুসনা*, সম্পাদনা: মাহমুদ বিজাবী কায়রো: আল-মাকতাবাহ আত-তাওফিকিয়্যাহ, ১৯৬৪,

Dhaka University Institutional Repository

	:	*সৃষ্টির রহস্য*, অনুবাদ. মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, ঢাকা: রশীদ বুক হাউস, ২০১১ খ্রি.,
আল-বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল	:	*সহীহুল বুখারী*, রিয়াদ: আল-কুতুবুস সিত্তাহ, ২০০০ খ্রি.
	:	*আল-আদাবুল মুফরাদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯ হি.
	:	*সাহিহুল বুখারি*, কাজি প্রকাশনী, ২০০০,
	:	*সহীহুল বুখারী*, বেইরুত: দার ইবন কাসির, ১৯৮৭
আলম, এ. জেড. এম. শামসুল	:	*মাদ্রাসা শিক্ষা*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০১৮ খ্রি.
আল-জুবায়রী, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ	:	*ইসলামী সমাজবিজ্ঞান: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা: ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ২০১৫,
আমিনুল,ইসলাম ড.	:	*বাংলাদেশে দর্শন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৫
আস-সুয়ূতী, আল্লামা জালাল উদ্দিন	:	*আল-ইতকান ফি 'উলূমিল কুরআন*, কায়রো: মাকতাবাতুল তাওফিকিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি.
	:	*তাফসীরে জালালাইন*, অনু. ইসলামিয়া সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-২০১১
আল-কারযাবী, ড. ইউসুফ	:	*ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪ খ্রি.
	:	*আগামী দিনের সভ্যতা ইসলাম*, ২য় সংস্করণ, ২০২৩, মক্তব প্রকাশন,অনু. মুহসিনা বিনতে মুসলিম ও কাজী সালমা বিনতে সলিম
	:	*ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি*, অনু.সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান,২০২২, গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস
	:	*ইসলামের যাকাত বিধান-দ্বিতীয় খণ্ড*, খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ২০১৭
আনিসুজ্জামান	:	*মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা: লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৮ খ্রি.,
আজাদ, এ পি জে আব্দুল কালাম	:	*উইংস অব ফায়ার*, অনু গোলাম রহমান, ঢাকাঃ কারুবাক, ২০২২ খ্রি
আমিন, আব্দুল্লাহ আল	:	*বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বই বাজার, ২০১২ খ্রি.
আবদুল্লাহ, আল আজহারী	:	*ইসলামী বিচারব্যবস্থা: তত্ত্ব ও বাস্তবতা*, ১ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০,
আলম, ড. এ কে এম নূরুল	:	সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য, কুষ্টিয়া: পেয়ারাতলা, ২০০২ খ্রি.
আল খামীস, ড. মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দির রহমান	:	উসূলুদ্দীন 'ইনদাল ইমাম আবী হানীফাহ, রিয়াদ: দারুস সুমাঈ, ১৪১৬হি.
আল-গামেদী, ড. আহমদ বিন সা'আদ	:	*আক্বিদাতু খাতমুন নাবী*, রিয়াদ: দার আত-তায়্যিবাহ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খ্রি.
আলী, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ	:	*কুরআনের আলোকে মানবজীবন*, ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.
আলী, এম শমসের	:	*ইসলাম বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: মুক্তধারা, ২০১৫ খ্রি
আলী, এম শমসের ও অন্যান্য	:	*আল কুরআনে বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.
আহসান, সৈয়দ আলী	:	*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা:বইঘর, ১৯৬৮ খ্রি.,
আলী, কে	:	*মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৫ খ্রি.,

Dhaka University Institutional Repository

আলী, সৈয়দ নজরুল : *বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি প্রভাব*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১০

আলী, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ : *কুরআনের আলোকে মানবজীবন*, ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.

আহমেদ, রফিকুল ইসলাম *বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫

আয যাহাবী, ইমাম : *কবীরা গুনাহ*, অনুবাদ: মাওলানা আকরাম ফারুক ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫ খ্রি.,

আশরাফ আলী থানভী, মওলানা : *বেহেশতী জেওর*, ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ২০০১খ্রি.
তরবিয়াতে আওলাদ (ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের প্রতিপালন), ঢাকা: মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ২০০৯ খ্রি.

আস সিজিস্তানী, ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ' (র.) : *আবু দাউদ শরীফ*, অনু. অধ্যাপক ইয়াকুব শরীফ ও অন্যান্য, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯০ খ্রি.,

ইসলাম, কাজী নজরুল : কাজী নজরুল ইসলাম, *নির্বাচিত কবিতা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০

ইবন কাসীর, আবুল ফিদা হাফিজ আদ-দামেশকী (র.), : *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, অনু. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন ও অন্যান্য, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি.,

ইবন কাছীর, ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল : *তাফসীর ইবনে কাছীর*, অনু. অধ্যাপক আখতার ফারুক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০০

ওদুদ, কাজী আবদুল : *বাংলার মুসলমানের কথা: শাশ্বত বঙ্গ*, ঢাকা: ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩খ্রি

ইমাম, শাফিঈ (রহ.) : *আল-মিসবাহুল মুনীর ফিতাহযীবি তাফসীর ইবন কাছীর*, বৈরুত: দারুস সালাম, ১৪২০১১ খ্রি.
তাফসীরুল কুরআনিল আযিম, রিয়াদ: দারুত তায়্যিবাহ, ১৯৯৯খ্রি
জামিউল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন, মিশর: মুয়াচ্ছাসাতুর রিসালাহ, ২০০০খ্রি.

ইবন মাজাহ, মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ : *সুনান ইবন মাজাহ*, বেইরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯১

ইয়াহিয়া,আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ : *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন*, ঢাকা: আল- আমিন রিসার্চ একাডেমি বাংলাদেশ, ২০০১ খ্রি.

ইবন তায়মিয়া, তাকীউদ্দিন আহমদ ইবন আব্দুল হালীম : *হৃদয়ের ব্যাধি ও প্রতিকার*, ঢাকা: দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০২১ খ্রি.

: *আল-কাওয়াশিফুল মুধ্যিয়াতু লি রিসালাতিল উবূদিয়্যাত*, বৈরুত: ঈমান, ২০০৪ খ্রি.

: *আল-ইখবার আল-ইলমিয়্যাহ মিনাল ইখতিয়ারাতিল ফিকহিয়্যাহ*, বৈরুত: দারুল 'আসিমাত, ১৩৬৯হি.

: আল-আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ, মাকতাবাতুস সুন্নাহ,২০২১

: *আল ফাতওয়া আলহামাউইয়্যা আল কুবরা*, অনু. ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, মাকতাবাতুস সুন্নাহ,২০২২

ইবন হিশাম : *সীরাতে ইবনে হিশাম*, ঢাকা: বাংলদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৮ খ্রি.

ইমাম তিরমিজি, মুহাম্মদ ইবন ঈসমাঈল : *সুনান তিরমিজি*, কিতাব: আল-বিতার, অধ্যায়: পিতামাতার সম্মান ও সদ্ব্যবহার, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০২

ইসলাম, এ.এম.এম সিরাজুল : *ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৪হি.

মুসলিম, ইমাম আবুল হুসাইন ইবন হাজ্জাজ : *সহীহ মুসলিম*, বেইরুত: দার ইহইয়াউত-তুরাছিল আরাবী, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, মুহাম্মদ নুরুল : *বিজ্ঞান না কোরআন*, ঢাকা: মম পকাশ, ২০২২ খ্রি.

ইসলাম,আমিনুল : *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১ খ্রি

উসমানী,মুফতি মুহাম্মাদ তকি : *বীমা-তাকাফুল*, অনু. শাব্বীর আহমাদ, ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৫ খ্রি.

উদ্দীন, প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ : *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৬ খ্রি

উসমানী, মুফতি মুহাম্মাদ ত্বকি : *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, অনু. মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৮ খ্রি

উদ্দীন, ড. আ.ত.ম. মুসলেহ : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২খ্রি.

এম. ইটন, রিচার্ড : ইসলামের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯

ওসমানি, ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ : *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের ইসলামি রূপরেখা*, ঢাকা: মদীনা কুতুবখানা, ২০০৭ খ্রি.

ওদুদ, কাজী আবদুল *বাংলার মুসলমানের কথা: শাশ্বত বঙ্গ*, ঢাকা: ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩খ্রি.,

করিম, আব্দুল : *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ খ্রি.,

: *বাংলার ইতিহাস*, সুলতানী আমল, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.,

: *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭ খ্রি.,

কুরতুবী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ : *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, খণ্ড ৫, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৯৬৭

খান,আকবর আলি : *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন,২০১৭ খ্রি.

খান,আরিফ : *বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা: বিএলবি, ২০১৮ খ্রি.

খালদূন, ইবনে : *আল-মুকাদ্দিমা* (অনুবাদ: গোলাম সামদানী কোরাইশী), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭

চৌধুরী, ড. আব্দুল মমিন : *প্রাচীন বাংলায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭ খ্রি.

চৌধুরী, মুহম্মদ এনামুল হক : *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান*. ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫

চৌধুরী, ড. আব্দুল মমিন প্রাচীন বাংলায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭ খ্রি.,

ছানাউল্লাহ, ড. মোঃ : *পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম*, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১১

ছফা,আহমদ : *বাঙালি মুসলমানের মন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১ খ্রি

জাভেদ, আহমেদ : *বাংলাদেশের সংবিধান : নানা প্রসঙ্গ*, ঢাকা: অন্যপ্রকাশ ২০২০ খ্রি.

জামান, ড. হাসান : *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.,

জাওযিয়্যাহ, ইমাম ইবনু কায়্যিমিল (রহ.), : *আর রূহ*, অনু. মাওলানা আব্দুল মতিন জালালাবাদি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০২০

জুহুরী : অপসংস্কৃতির বিভীষিকা, ঢাকা: উত্‌লু প্রকাশন, ১৯৮৫

জুরজানী, শরীফ আল : *কিতাবুত তা'রীফাত*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৮ হি.

তালিব,আব্দুল মান্নান : *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি.,

তালেব, মুহাম্মদ আবু : *বিজ্ঞানময় কোরআন, ঢাকা: ঢাকা বুক কর্ণার, ২০১৬ খ্রি.,*

তিরমিযী, ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ঈসা : *আল-জামি' আত-তিরমিযী*, দারুল গার্ব আল- ইসলামী, তাবি

নদভী, সাইয়েদ আবুল হাসান (রহ.) : *ধর্মহীন ধর্মবিশ্বাস*, অনু. আম্মার আবদুল্লাহ, অর্পণ প্রকাশন, ২০২০

Dhaka University Institutional Repository

: *ইসলাম ও অন্যান্য সংস্কৃতি*, অনু. মাওলানা লিয়াকত আলী, ঢাকা:আল কাউসার প্রকাশনী, ২০১১ খ্রি.

: *ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি*, অনূ. আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি

নাসিম, মাওলানা আবদুস শহীদ : *স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ২০০৫

নিজামী, মাহমুদুল হাসান : *সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান*, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৮ খ্রি.

নুরুল ইসলাম, ড. মো. : *বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা*, ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশনস, ২০১১ খ্রি.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সম্পাদিত) : *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী*, প্রথম ভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮,

বিশ্বাস, রঞ্জনা : *বাংলাদেশের লোকধর্ম* - ১ম খণ্ড, ২০২০,ঢাকা: বেহুলাবাংলা,

বুকাইলি, ড. মরিস : *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান*, আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ (অনুবাদক), ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০২৪ খ্রি

যাকারিয়া, আবুল কালাম মো. : *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ২০০৩ খ্রি.

মনির, শাহজাহান : *বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাধারা* (১৯১৯-১৯৪০), ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.

মজুমদার, মো. জয়নুল আবেদীন (সম্পাদিত) : *আমাদের সংস্কৃতি বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০১ খ্রি.,

মাবুদ, ড. মুহাম্মদ আবদুল : *রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫,

মাহমুদ, ড. সুলতান : *বাংলাদেশ সংবিধান প্রেক্ষিত এবং প্রাসঙ্গিকতা*, ঢাকা : আলেয়া বুক ডিপো, ২০২৩ খ্রি.

মাসঊদ, মাওলানা ফরিদ উদ্দীন : *ইসলামের অর্থদর্শন ও বন্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা: পাথেয় পাবলিকেশন, ১৯৭১ খ্রি.

মানযুর, ইবনে : *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারু সাদিও, তা.বি.

মিজানুর রহমান, মো. : *পারিবারিক আইন: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, ঢাকা: সুফি প্রকাশনী, ২০১৬খ্রি.*

মিয়া, বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান : ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.

মোস্তফা, গোলাম : *বিশ্বনবী (হযরত রসূল (স:) এর জীবনী)*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ২০১৩,

মুমেন, নূরুল : *মুসলিম আইন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪খ্রি

মুসাল্লাম, প্রফেসর ড. মুস্তাফা ও প্রফেসর ড. ফাতহী মুহাম্মাদ আয-যাগবী, : *আস-সাকাফাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, মদিনা: মাকতাবাহ আল-জামিয়া, সং-১, ২০০৭খ্রি.

মুসলিম, ইবন আল-হজ্জাজ : *সহীহ মুসলিম*, বেইরুত: দার আল-ফিকর, ১৯৯১ খ্রি.

মূসা, মুহাম্মদ ও মোজাম্মেল হক, মাওলানা মোঃ (সংকলিত) : *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,২০১৮খ্রি.

মোস্তাফিজুর রহমান, এ. এইচ. এম. : *সামাজিক সমস্যা*, ঢাকা: লেখা-পড়া, ২০১১খ্রি.

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান (সম্পাদক) : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা জোনাকী প্রকাশনী, ২০১৯ খি

মোহাম্মদ, ড. হাসান : *বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা*, ঢাকা:এশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খ্রি.

মোস্তাফিজুর রহমান, এ. এইচ. এম. : *সামাজিক সমস্যা*, ঢাকা: লেখা-পড়া, ২০১১খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান(সম্পাদক) : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, *ঢাকা জোনাকী প্রকাশনী*, ২০১৯খ্রি.

যিরকানী, আয *মানাহিল আল-ইরফান ফি উলুম আল-কুরআন*, কায়রো: ইসা আল বাবি আল-হিলবি ওয়া শুরাকায়ুহু, ২০১১খ্রি.

রহমান, ফাহমিদ-উর- : *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২১ খ্রি.,

রহমান, আতাউর : বাংলা ভাষায় ইসলামী প্রভাব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল*, খণ্ড ১২, সংখ্যা ৩, ২০১৮

রহমান, মুহাম্মাদ মতিউর : *মানবাধিকার ও ইসলাম*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম সংস্করণ, ২০০২

রশিদ, আ. ন. ম বজলুর : *আমাদের সুফী সাধক*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭ খ্রি.,

রহমান, গাজী শামছুর : *মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য*, খোশরোজ কিতাব মহল ঢাকা, খ্রি. ১৯৯৬

রহিম,বিচারপরি এম. ইনায়েতুর : *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, *ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স*,*২০২২ খ্রি.*

রহিম, আব্দুর : *বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, *ঢাকা: বাংলা একাডেমি*, *২০০৬*

রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর : *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা:খায়রুন প্রকাশনী ২০০৬ খ্রি.,

রহীম,ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর : *ইসলাম শিক্ষা*, ঢাকা: সোনালী সোপান প্রকাশন, ২০১২ খ্রি.,

রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর (রহ.) : বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা, শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮

রহমান, ফাহমিদ-উর- : *মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান*, ঢাকা:প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২১ খ্রি.,

রসুল, মুহম্মদ আবদুর : *আধুনিক বাংলা ভাষায় আরবি ও ফারসি শব্দমালার ব্যবহার*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বি.আই.আই.টি), ২০২২,

মুহাম্মদ রিযা, : *আল-ফারুক 'উমার ইবন খাত্তাব ছানিয়াল খুলাফায়ি রাশিদীন* লেবানন: দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.

লতিফ, সায়্যিদ আব্দুল : *ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ*, ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬ খ্রি.,

শামসুর রহমান, গাজী : *কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফৌজদারী আইনের সংশোধন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা, জুলাই, ১৯৯২ খ্রি.

শরীফ, আহমদ : *বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৭৮ খ্রি

শওকতুজ্জামান, সৈয়দ : *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩ খ্রি.,

শাহি, মাওলানা আবদুল্লাহ (সম্পাদনা) : *আল-আজহার: দোয়া ও ইবাদতের সংকলন*, অনুবাদ: মুহাম্মাদ আমিন, দারুস সালাম, ২০১০

শাহেদ, হোসেন আরা (সম্পাদক) : *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, ঢাকা সূচীপত্র, ২০১৯ খ্রি

শাহনাওয়াজ, ড. এ কে এম : *মানচিত্রে বাংলার ইতিহাস*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০২৪

সফাহানী, হাফিজ আবু শায়খই (র.) : *আখলাকুন নবী*, ঢাকা:ইসলামিক ফাইন্ডেশন, ২০০৬ খ্রি.

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.

সাকলায়েন, গোলাম : *বাংলাদেশের সূফী সাধক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

সাবূনী, মুহাম্মদ আলী — *আত্-তিবইয়ান ফী উলূমিল-কুরআন*, বৈরুত: আ'লিমূল কিতাব, সং-১, ১৯৮৫খ্রি.

সামাদ, এবনে গোলাম : *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, *ঢাকা: মজিদ পাবলিকেশন্স*, *২০১৯ খ্রি.*,

সালাম, বিচারপতি আব্দুস ও অন্যান্য সম্পাদিত : ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সারজানী, ড. রাগিব : *বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান*, অনু. মুফতি মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান, ঢাকা: মাকতাবাতুল হিজায, খ.১, ১৯৮৭ খ্রি.

সেন, সত্যেন : *মসলার যুদ্ধ*, ঢাকা: দ্যু প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রি.,

সাত্তার, ড. মো. আবদুস : *বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.

সৈয়দ আবুল হোসেন (সম্পাদক) : *বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধ*, ঢাকা: পারিজাত প্রকাশনী, ২০১৯ খ্রি.

হক, জিয়াউল : *ইসলামী শাসন ব্যবস্থা: মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলী*, ঢাকা:মদিনা পাবলিকেশন্স,২০০৭ খ্রি.,

হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল : *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, ঢাকা র‍্যামন পাবলিশার্স , ২০১৯ খ্রি.

হক, জিয়াউল — *ইসলামী শাসন ব্যবস্থা: মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলী*, ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স,২০০৭ খ্রি.

হক, এনামুল : *আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স*, আদর্শ পাবলিশার্স ২০২৩,

হক, ড. মুহাম্মাদ এনামুল : *মনীষা-মঞ্জূষা*, *ঢাকা: মুক্তধারা*, *১৯৯০খ্রি.*,

হক্কানি, শায়খ আব্দুল হাকিম — *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, *দারুল আরকাম*, *১ম সংস্করণ*, ২০২৩

হান্নান, ড. মোহাম্মদ : *প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০১৯ খ্রি.,পৃ. ১৩৪

হামীদুল্লাহ, ড. : *আহদে নববী মে নেযামে হুকুমরানী*, *নিউ দিল্লি: মাকতাবায়ে জামেয়া*, *১৩৬৩হি./১৯৪৪খ্রি.*

হালিম, মো আব্দুল : *সংবিধান*, *সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বীকন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খ্রি.

হালিম, ব্যারিস্টার মোঃ আব্দুল : বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা, ঢাকা: দ্য সিসিবি বুক সেন্টার, ২০১৯ খ্রি.

হান্নান, ড. মোহাম্মদ : *প্রাচীন বাংলায় মুসলিম আগমন*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০১৯ খ্রি.,

হোসেন, আবুল : *ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ২০১৩ খ্রি.,

হালিম, সৈয়দ আব্দুল : বাঙালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙালী জাতির বিকাশের ধারা -১ম খণ্ড, নবযুগ প্রকাশনী, ১ম, ২০১৫

at-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir : *The History of al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa 'l-muluk),* translated by W. Montgomery Watt and M. V. McDonald, State University of New York Press,1988

Drake,Richard, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell : *Gray's Anatomy for Students,* England: Churchill Livingstone- Oct 2004

Sembulingam, K, Prema Sembulingam : *Essentials of Medical Physiology,* India:Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 1999

Power, Henry : *Elements of Human Physiology,* Cassel and Company(ltd), London,Paris,Newyork,1884

Taylor, E.B : *Primitive Culture,* London: 1871

Dhaka University Institutional Repository

Hallaq, Wael B.	:	*An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press, 2009
Siddiqi, M.N.	:	*Banking Without Interest*, 1983, Islamic Foundation
Elias, Antoon Elias	:	*Modern Dictionary English-arabic,* Cairo: Modern Press,1951
Bagby, Philip	:	*Culture and History*, American Trust Publication, 1993
Watt, William Montgomery	:	*Muhammad at Medina,* London: Oxford University Press, 1956
	:	Muhammad Prophet and Statesman, London: Oxford University Press, 1961
Mahmoud, Hassan Ahmed and Ahmad Ibrahim Al-Sharif	:	*The Islamic World in the Abbasid's Era* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980, 4th Edition),
Chapra, M.U.	:	*Islam and the Economic Challenge*, 1992
Sajoo, Amyn B.	:	*A Companion to Muslim Cultures*, London:2011
Imamuddin, S.M.	:	A Political History of Muslim Spain (Dhaka: 1969),
Siddiqi, Dr. Amir	:	Hasan *Islamic State* ,Karachi: The Jamiyatul Falah Publications,
Sabiq, As-Sayyid	:	*Fiqh us –Sunnah*, Create Space Independent Publishing Platform:July 6,2017
Rasul, Muhammad Gholam	:	*The origin and development of Muslim Historiography*, Dhaka: Islamic Foundation, 1984,
Younus, Farid	:	*Islamc Culture:A Study of Cultural Anthropology,* Author House, November 14.2013
Manzoor-e-Khuda, Khaleda	:	*Islam-The Formative Background of Bangladesh,* Dhaka: Academic Press and Publishers Library,
Chandra, Satish	:	*History of Medieval India,* India:Orient Blackswan.2018,
Philips, Dr.Abu Ameenah bilal	:	*The Moral Foundation of Islamic Culture*, A.S.Noordeen, 2006
Rahman, Afzalur	:	*Islam: Faith and Practice*, Seerah Foundation Pakistan, 1991
Latif, Dr.Syed Abdul	:	*Principles of Islamic Culture*, New Delhi,1995
B. Hallaq, Wael	:	*An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press, 2009.
Djait, Hichem	:	*The Life of Muḥammad*, Translated by Janet Fouli, Tunisian Academy of Sciences, Letters and Arts Beït al-Hikma, 2014
Hindus, Milton	:	*Islamic Culture in Crisis*, Tunis Transaction Publishers, 2011
Iqbal, Afzal	:	*Culture of Islam*, Institute of Islamic Culture, London, 1967

Dhaka University Institutional Repository

Hakki, Prof. Ahmad and Dr. Marwan Sha'ban : *Islamic Culture*, London:2011

البخاري، محمد بن إسماعيل : *الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠١م

النيسابوري، مسلم بن الحجاج : *الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠١م

السجستاني، سليمان بن الأشعث : *سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٢م

الترمذي، محمد بن عيسى : *سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى الترمذي*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٣م

النسائي، أحمد بن شعيب : *سنن النسائي للإمام أحمد بن شعيب النسائي*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٤م

الغزالي، أبي حامد : *إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٥م

القرطبي، الإمام : *الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٦م

ابن الجوزية، ابن قيم : *كتاب الروح لابن قيم الجوزية*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٧م

عبد الرازق، الشيخ علي : *الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٨م

الفيروزآبادي، الإمام مجد الدين : *القاموس المحيط للإمام مجد الدين الفيروزآبادي*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٩م

الميداني، الشيخ عبد الرحمن حبنكة و فروخ، الشيخ عمر : *الثقافة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني والشيخ عمر فروخ*، دار الفكر، بيروت، ٢٠١٠م

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد : *المقدمة*، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٤م

أمين، أحمد : *فجر الإسلام*، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٢٨م

ضحى الإسلام، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٣م

دراز، محمد عبد الله : *النبأ العظيم*، دار القلم، الكويت، ١٩٧١م

دستور الأخلاق في القرآن، دار القلم، بيروت، ١٩٧٠م

ابن النديم، محمد بن إسحاق : *الفهرست*، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٨م

زيدان، جرجي : *تاريخ التمدن الإسلامي*، دار الهلال، القاهرة، ١٩١٢م

Dhaka University Institutional Repository

فكري، أحمد : *الفن الإسلامي في العصور الوسطى*، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٥٧م

النشار، مصطفى : *الفكر الفلسفي في الإسلام*، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٨م

ضيف، شوقي : *تاريخ الأدب العربي*، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٣–٢٠٠٢م

شلبي، أحمد : *موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية*، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٨٣م

مقارنة الأديان، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٧٠م

مؤنس، حسين : *التاريخ والمؤرخون*، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٣م

العالم الإسلامي في العصر الحديث، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠م

العقاد، عباس محمود : *الإنسان في القرآن – عباس محمود العقاد*، دار الفكر، القاهرة، ١٩٥٥م

مراد، فضل بن عبدالله : *القرآن وصناعة الإنسان والحياة – فضل بن عبدالله مراد*، دار الفكر، القاهرة، ١٩٩٠م

Journal

American Journal of Islamic Social Sciences, International Institute of Islamic Thought

(IIIT), USA, Volume 35, Number 1., ISSN 0887-7653, Winter 2018, ASA University Review, Centre for Socio-Economic Research, ASA University

Bangladesh, Volume 6, No.1 (10th Issue), January-June 2012Asian Affairs, Centre for Development Research Bangladesh, (CDRB), Dhaka, Bangladesh,

Volume 26, Number 3, ISSN 0254-4199, July-September 2004Arthanity Journal , The Journal of the Chittagong, University Economic

Association, Universty of Chittagong, Bangladesh, Volume xii, Number 2, ISSN 1995-

8447, January 2008Arthanity Journal (অণণদীমচ চাদণাম), The Journal of the Chittagong, University Economic

Association, Universty of Chittagong, Bangladesh, Volume xii, Number 1, ISSN 1995-

8447, July 2007Asia-Pacific Journal of Rural Development, Center on Integrated Rural Development for

Dhaka University Institutional Repository

Asia and the Pacific (CIRDAP), Dhaka, Bangladesh, Volume xviii, Number 2, ISSN-1018-
5291, December 2008Bangladesh Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institue of Islamic Thought, (BIIT),
Volume 10, Number 14, ISSN-1816-689X, July-December 2014Bangladesh Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institue of Islamic Thought, (BIIT),
Volume 10, Number 13, ISSN-1816-689X, January-June 2014Bangladesh Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institue of Islamic Thought, (BIIT),
Volume 11, Number 15,. ISSN-1816-689X, January-June 2015Biiss Journal, Bangladesh Institute of International Strategic Studies, Dhaka, Bangladesh,
Volume 28, ISSN 1010-9536, Number 3, 2007

Website

https://www.bb.org.bd/en/index.php/publication/publictn/0/2

https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/f2d8fabb_29c1_423a_9d37_cdb500260002/Chapter-5%20%28Bangla-2023%29_Draft%20%281%29.pdf

http://www.dss.gov.bd/site/view/policies, Date, July 15, 2018.

http://www.ebek-rdcd.gov.bd/site/page/984b3f01-50a8-4095-80c9-e29a981eadde/[front]

Date, June 30, 2018

https://www.islamicity.org/?gclid=EAIaIQobChMI98XL04-U7gIV1cCWCh1hJQ8zEAAYASAA-

EgK-bfD_BwE

https://tradingeconomics.com/bangladesh/population

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

https://www.irfi.org/islamic_books.htm

http://www.islamicfoundation.gov.bd/

https://www.islamicfoundation.org/

Dhaka University Institutional Repository

https://www.quranicthought.com/

https://islamhouse.com/bn/main/

https://www.banglapedia.org/

https://www.islamweb.net/en/

http://www.napd.gov.bd/

https://iiit.org/en/home/

http://www.iric.org/